বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ বর্ষ ।

শ্রাবণ ১৩৫৪ - আষাঢ় ১৩৫৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৪ – আষাঢ় ১৩৫৫

রচনাসূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

···আপনার থেকে আপনাকে কেবলি বাইরে আনবার চেষ্টা করি। নিজের সঙ্গে নিজে অত্যন্ত জড়িত হয়ে থাকতে চাইনে। যে মুহূর্ত্তে আপনাকে দূরে বাইরে সরিয়ে দিতে পারি সেই মুহূর্ত্তেই জীবনের ভার হাল্কা হয়ে যায়— চারিদিক সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আপনার সমস্ত কামনা যখন আপনাকে বন্দী করতে উদ্যত হয় তখন এক মুহূর্ত্ত আর বিলম্ব না করে পালাতে ইচ্ছা করে। সকলের চেয়ে বড় ছুটি নিজের কাছ থেকে ছুটি। সেই ছুটি যখন অত্যন্ত দরকার হয়ে ওঠে তখন মৃত্যুকে পর্য্যন্ত শ্রেয় মনে হয়। আমার টাকা নেই, কাজ রয়েছে, আমার অনেক অসুবিধা, তবু আমাকে আর বদ্ধ হয়ে বসে থাকতে দিচ্চে না, আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্চে যে কালের কোনো প্রয়োজন সংসারের কোনো দারিত্ব আমাকে কোনোমতেই বসে থাকতে দিচ্চে না। বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর এক দণ্ড ঘরে নয় এই কথাটা এমন করে অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে, আজ আমার আর অন্য কোনো কথা চিন্তা করবার জো নেই— এর কাছে অন্য সকল কথাই আমার কাছে তুচ্ছ— তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার একটুও ক্লান্তি বা কৃপণতা নেই— মন একবারো পিছনে ফিরে তাকাতে চাইচে না। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩১৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়াসু

শিলাইদহে এসেছি। কাল বোধ হয় বোটে চড়ব। এ জায়গাটি বেশ ভাল লাগচে— নির্জ্জনে ভাল থাকব বলেই মনে হচ্চে— পদ্মায় শরীরও ভাল থাকবে। যেমন করে হোক্ নিজের গর্ত্তটার ভিতর থেকে নিজের নির্ম্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে বাহির করে আনতেই হবে। এতে যতদিন সময় লাগে এবং যে

উপায়ই অবলম্বন করতে হয়। যদি বেশ আপনাকে সকল বাধামুক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পারি তা হলে বুঝব আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে এটাকে বদলে ফেলে আবার নতুন বাহন জুততে হবে— এ আর আমাকে কল্যাণের পথে বেশি দূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে না— বরঞ্চ ঈপ্সিত পথের মধ্যে ভেঙে চুরে সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমাকে আট্‌কে রাখবে— কিন্তু সে ত কোনোমতেই চলবে না— মৃত্যু ভাল কিন্তু মুক্তি চাই— অসত্য জীবন অকৃতার্থ সংকল্প ভয়ঙ্কর বোঝা হয়ে যেন চেপে না রাখে— খোলা রাস্তায় খোলা আলোয় খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে— কাজকর্ম্ম সব রইল পড়ে— ঘরের কোণ, আর নিজের কুণো মন, আর পর্দ্দার আড়াল আর ক্লান্তি আর ক্লেদ আর ধূলিশয্যা এ সব যাক্ দূরে! ভূমার মধ্যে একেবারে অবারিত অনাবৃত হয়ে নূতন হয়ে নবজাত হয়ে বেরিয়ে পড়ি— আবরণ সব জীর্ণ হয়েছে মলিন হয়েছে সেগুলো এবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক্—সর্ব্বাঙ্গে লাগুক আকাশ। ইতি ১লা নভেম্বর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল সকালে বোটে যাচ্চি। বোট ছেড়ে দিয়ে চলে যাব অতএব কোনো স্থির ঠিকানা থাকবে না। অঘ্রাণের ৫।৭ দিনের মধ্যে ফিরব। নদীতে নির্জ্জনে আমি বেশ ভালই থাকব আশা করচি। নিজের বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ঈশ্বরের কাছে আমি যে প্রার্থনা করচি সে প্রার্থনা একেবারেই সম্পূর্ণ সফল যদি নাও হয় জীবনটা যে সেইদিকেই অগ্রসর হচ্চে সন্দেহ নেই। নিজের মধ্যেই বেড়া দিয়ে আমি কখনই টিকতে পারবনা— চিরদিনই ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মুক্তিকে চেয়েছে— সেই মুক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব? কখনই না। আমাকে মুক্ত হতেই হবে, আমাকে সত্য হতেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না— আমার সমস্ত জীবনের অন্তরতম অভিপ্রায় কোনোমতেই ব্যর্থ হবে না। ইতি রবিবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি এই খোলা নদীতে নির্জ্জন চরের মধ্যে এসে ভারি আরাম বোধ করচি। বেশ বুঝতে পারচি একজন আছেন যিনি আমাদের সমুদয় বেসুরোকেই ধীরে ধীরে সুরে বেঁধে তুলছেন— জীবনের বীণাটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেই হল, আর কিছু নয়। নিজে ওটাকে নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত নাড়াচাড়া করতে গেলেই সমস্ত গোলমাল করে ফেলি। আঃ তাঁর হাতে একেবারে তুলে দিতে পারলে কি আরাম! আজ আমার মনে হচ্চে সমস্ত জলস্থল আকাশ যেন আমার ভার নিয়েছে— সূর্য্যালোকিত দিনগুলির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন অতি নিঃশব্দে আমার শুশ্রূষা করচে। এই আমার ঘর, আমার আপন ঘর, সুনীল সুন্দর সমুজ্জ্বল সহাস্য শান্তি, এই যে উদার বিস্তার, এই যে অবাধ আকাশ, এই যে আপনাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মেলে দেবার উদার প্রাঙ্গণ।— এমনি করে আপনাকে প্রতিদিন বাইরে মেলে দিতে পারলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রন্থিগুলো খুলে আসতে থাকে— আর আপনার মধ্যে সমস্ত জড়িয়ে-

মড়িয়ে রাখতে গেলেই কেবল জটার উপরে জটা পড়ে যেতে থাকে— মনে হয় মৃত্যু এসে তার খাঁড়া দিয়ে ছিন্ন করে না দিলে শেষ পর্য্যন্ত এগুলি যেন কিছুতেই সরল হবে না। কিন্তু সরল রাস্তা সহজ উ ..য় একেবারেই হাতের কাছে পড়ে রয়েছে। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

…নিজের বাইরের আবরণ বেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্যে মনে ভারি একটা বেদনা বোধ করচি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিচ্চে না। কেবলি বলচে, বেরও, বেরও,— না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পরে অন্ধকার— আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন। সেই দুঃখ আমাকে কেবলি এমনি আঘাত করচে যে কিছুতে স্থির থাকতে দিচ্চে না। কি করলে কেবল দেহরূপে অহংরূপে নয়, নিজের সুখদুঃখ ইচ্ছা অনিচ্ছারূপে নয়, বিশুদ্ধ সত্যরূপে আপনাকে পাব সেই তাগিদ আমাকে ধাক্কা দিচ্চে— যেখানে আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা সেইখানে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশের পথ কবে একেবারে অবারিত হবে— কবে দ্বারী বারবার ফিরিয়ে দেবে না। আমি যেন আর সহ্য করতে পারচিনে,— বেরও, বেরও, বেরও,— সমস্ত অসত্য থেকে সমস্ত স্থূলতা জড়ত্ব থেকে বেরও, বেরও— একবার নির্ম্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর— আর নয়— আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়— কোথায়, ভূমা কোথায়— কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

…আমি দূরে থাকলে বোধ হয় আরো বিশুদ্ধভাবে ও গভীরভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারব— অতএব তাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি না হয়ে ভালই হবে। তোমাদের পরেই বিদ্যালয়ের মঙ্গলভার পড়ল— ভার সম্পূর্ণ পড়লেই ভার বহনের আনন্দ ও চেষ্টা পূর্ণ হয়ে ওঠে— আমি থাকলে অনেক সময়ে তার ব্যবধান ঘটে— সব জিনিয আমার ভিতর দিয়েই হতে থাকে কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন নেই— এখন তোমাদের সকলের হৃদয়ের সহযোগে আনন্দের সম্মিলনে বিদ্যালয় মঙ্গলের দিকে নিজ শক্তিতেই অগ্রসর হতে পারবে। সেই তার স্থায়ী কল্যাণ। তোমরা ইচ্ছার সঙ্গে কাজের ভার নিয়েছ এরই একটা মস্ত সার্থকতা আছে— তোমাদের সেই ইচ্ছা কাজের বাহ্য সফলতার চেয়ে ঢের বেশি। আমি আশ্রম থেকে বিদায় লবার পূর্ব্বে এইটি যে দেখে যেতে পারলুম এতেই আমার মন নিরুদ্বিগ্ন এবং আনন্দিত হয়ে উঠেছে। মনে নিশ্চয় জানতে পারচি যে আমি ঠিক সময়েই বিদ্যালয় থেকে যাত্রা করেছি। ইতি ৪ঠা চৈত্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

বিদ্যালয় সম্বন্ধে নেপাল বাবুদের সঙ্গে এই দুদিন অনেক আলোচনা করেছি।

যেটাতে মঙ্গল তোমাদের সকলের চেষ্টার ভিতর দিয়ে, এমন কি, সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সেটা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠ্‌বে এতে কোনো সন্দেহ নেই— এই বিশ্বাসটি মনের মধ্যে বহন করে আমি আজ বিদায় হচ্চি।

আমাকে ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে আমার মধ্যে যেটুকু ভাল আছে সেইটুকুকেই তিনি আমার সকল কাজে ও সকল সম্বন্ধে বিকশিত করে তুল্‌বেন— আমার জীবনকে ব্যর্থ করবেন না— আমি যেখানে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অসত্যের দ্বারা সংসারকে আঘাত করেছি সেখানকার সমস্ত ক্ষতবেদনা নিজের হাতে তিনি জুড়িয়ে দেবেন।

বিদ্যালয়ের মধ্যে আমার সত্যজীবন যেটুকু রেখে গেলুম তার প্রতি তিনি যদি স্নেহদৃষ্টিপাত করেন তবে তোমাদের হাত দিয়েই তিনি তাকে পালন করিয়ে নেবেন— তোমাদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ তিনিই আকর্ষণ করবেন— তাঁরই সমস্ত জীবশিশুকে পিতামাতার দ্বারা তিনি ত এমনি করেই মানুষ করিয়ে নেন ;— আমাদের যে পুণ্যজীবন তার শৈশবের অসম্পূর্ণতা ও দৌর্ব্বল্য থেকে বেড়ে ওঠবার জন্য প্রয়াস পাচ্চে তার জন্যেও তিনি মা বাপকে নিয়োগ করচেন— কেননা সে যে তাঁরই আনন্দের ধন। যদি তোমাদের দৃষ্টির সামনে তিনি তাকে স্থাপিত করেন তবে তোমরাও তাকে কিছুতে ত্যাগ করতে পারবে না। অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে তোমাদের সকল অবস্থার মধ্যে মানুষ করে তুল্‌তে হবে।

তাই জন্যে আমি কোনো বাঁধা পথ নির্দ্দেশ করতে চাইনে। প্রয়োজন বিচিত্র হবে তোমাদের চেষ্টার পথও বিচিত্র হবে ;— নানাপ্রকার অভাব ঘটবে, নানাপ্রকার আঘাত আস্‌বে, তারই দ্বারা তোমাদের সেবার চেষ্টা বিচিত্রভাবে উদ্বোধিত হয়ে উঠ্‌বে এবং সেই সমস্ত বিঘ্নের সঙ্গে বারম্বার সংগ্রাম করেই তোমাদের অন্তরের স্নেহ প্রতিদিন সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে।

আজ আমার এই যাত্রাকালে তোমাদের সকলের কাছ থেকে একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা কামনা করি— তোমাদের তপঃপরায়ণ মাতৃহৃদয় প্রসারিত হয়ে আমার যাত্রাকে পবিত্র সত্যের মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করে দিক্।

বড়দাদাকে আমার শতসহস্র প্রণাম জানাবে। ইতি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমলতা দেবী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী। ইনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সহিত যুক্ত ছিলেন। ইঁহাকে লিখিত কোনো কোনো পূর্বমুদ্রিত চিঠিও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পুনর্মুদ্রিত হইল।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত। গত সংখ্যার অনুবৃত্তি

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

উপনিষদে আছে— ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগ.— অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া জানিবে। আমরা তাহাই করি না বলিয়া সংসার একেবারেই আমাদের মর্ম্মস্থানের উপরে চাপিয়া পড়িয়া আমাদিগকে বেদনা দেয়।

আমাদের অন্তর বাহির সমস্তই যখন তাঁহার দ্বারা আবৃত বলিয়া জানি তখন মাঝখানে তিনি থাকেন— বোঝা একেবারে আমাদের মাথায় চাপিয়া পড়ে না— আঘাত একেবারে আমাদের বুকে আসিয়া বাজে না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্চাটের মধ্যেও তাঁহাকে চারিদিকে আবির্ভূত বলিয়া অনুভব করিবার সাধনা করিলে তাঁহার সম্মুখে আর সমস্তই মাথা নত করে— যাহা ছোট তাহা ছোট হইয়াই থাকে, যাহা যথার্থ অন্তরের সামগ্রী নহে তাহা বাহিরেই পড়িয়া থাকে। জগতে যিনি সকলের বড় তিনিই আমাদের জীবনে সকলের চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকুন—তাঁহাকেই সংসারের চেয়ে ছোট করিয়া ফেলি বলিয়া এত দুঃখ পাই।··· ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মনের মধ্যে অবসাদ আসিতে দিয়ো না— "নাত্মানমবসাদয়েৎ" আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না শাস্ত্রের এই অনুশাসন আছে। আপনাকে যে আমরা দুর্ব্বল বলিয়া কল্পনা করি সে আমাদের একটা মোহ— নিজেকে সংসারের সমস্ত বাধা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপটি কি দেখিতে পার না? তোমার চারিদিকে যাহা কিছু জমিয়াছে তাহা ত চিরদিনের নহে। নিজেকে তাহারই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করিয়া দেখিতেছ কেন? নিজেকে অনন্তসত্যস্বরূপের মধ্যে দেখ— সংসারের মধ্যে দেখিয়ো না।···

ঈশ্বর তোমার চিত্তকে স্থির করুন, দৃঢ় করুন, তাহাকে ভারমুক্ত করিয়া দিন। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

এখনো বিলাতে যাত্রা করি নাই কিন্তু যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আগামী ৬ই চৈত্রে জাহাজ ছাড়িবে। এতদিন কলিকাতায় বিস্তর গোলমালে আমার দিন কাটিয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে কিছুদিন এখানকার নির্জ্জন নদীতীরে শান্তি উপভোগ করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। বোধহয় চৈত্র মাসের আরম্ভে কলিকাতায় যাইব। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া কবে দেশে ফিরিব তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। অনেকদিন যে সকল বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছি তাহার সমস্ত অভ্যাস ও সংস্কার হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই আমার এই তীর্থযাত্রা, যখন পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় আসিবে তখন যেন সমস্ত আবরণ কাটিয়া যায় এই আমার ইচ্ছা।

ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন, নিষ্ঠা দিন, শান্তি দিন এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১০ই ফাল্গুন ১৩১৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি কিছুকাল ধরিয়া ভ্রমণে ফিরিতেছিলাম— এখানকার কেহই আমার ঠিকানা জানিতেন না। সেইজন্য তোমার দুইখানি পত্র আমি বহুদিন পরে পাইয়াছি। আবার আমি ঘুরিতে চলিব। বসিয়া থাকার কাজ আমি ত একরকম সারিয়া লইয়াছি— এখন আর আপিস চলে না— দিনের শেষে বাহির হইয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে। বসিয়া থাকিলেই বোঝা বাড়িয়া ওঠে— চলিয়া চলিয়া সে সমস্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিতে হয়। অনেকদিনের অনেক বোঝা এবার ক্ষয় করিয়া তবে ত খালাস পাইব।

সংসারের পথ চলায় তোমাদের আমি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার আছে কি, মা? ভগবান আমার হাতে একটা খঞ্জনী দিয়াছিলেন। সেইটে বাজাইয়া বাজাইয়া এতদিন গান গাহিয়া ফিরিয়াছি— ভিক্ষাই ত ছিল আমার সম্বল। এবার ভিক্ষাপাত্র ভাঙিবার চেষ্টায় আছি— গানও বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে, তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া এমন সত্য হইয়া ওঠ যে, ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা না পান। ১৩ পৌষ ১৩২১।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মা, এই জগৎসংসারে সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্য যে কতদিকে কত পূর্ণ হইয়া আছে একবার সমস্ত মন দিয়া তাহা গ্রহণ কর তাহা হইলেই নিজের মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র যাহা কুশ্রী তাহা মিলাইয়া যাইবে। অতি বিরাট সঙ্গীতে আকাশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে জীবনের আবরণ মোচন করিয়া একবার সেই সঙ্গীতে দেহমনকে মগ্ন করিয়া ধৌত করিয়া নববর্ষে নূতন জন্ম লাভ কর। পুরাতনকে বার বার ত্যাগ করিয়া তবে আমরা অমৃতলোকের যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিব। যে পুরাতন মলিন, যাহা নির্জ্জীব, যাহা জীবনের উপর ভারের মত, তাহাকে প্রাণপণে এই জগদ্ব্যাপী আনন্দসাগরে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিসর্জ্জন দাও; নিজের ভিতরকার মৃত্যুহীন পবিত্র অমৃতরূপটি দেখ— দেখ একবার জীবন কি মহৎ, জগৎ কি আশ্চর্য্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী তিনি কি অন্তরতম— দুঃখগ্লানির ছায়ার খেলা কি তুচ্ছ, মানুষের আত্মার শক্তি মানুষের সংসারের অভিঘাতের চেয়ে কত বড়। এই নববর্ষ তোমার জীবনে সার্থক হউক। ৫ই বৈশাখ ১৩২২।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরমকল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার পত্র পাইয়া খুসি হইলাম। শরীর আমার ভালই আছে, আপাতত এইখানেই স্থির হইয়া বসিলাম। কিন্তু আবার কখন তলব আসে কিছুই বলা যায় না। আমার গণ্ডি ঘুচিয়াছে কাজেই দেশে দেশে আমাকে ফিরিতে হইবে— ঘরে আমার বাসা রহিল না। কাজ যদি আমারই হইত তবে অনেকদিন পূর্ব্বেই কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রভুর কাজ— তাহার শেষের খবর কিছুই জানি না।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সুখদুঃখের ঢেউ কাটিয়েই ত আমাদের জীবন বেয়ে নিয়ে চল্‌তে হবে। এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে সেই ঘটনাগুলোই চরম সত্য নয়। ব্যথা এড়াব এমন সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করব এটা আমাদের সাধনার অঙ্গ। যিনি চিরন্তন তাঁকে যদি দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে রাখ্‌তে পারি তাহলে যা চঞ্চল সে আমাদের আর আঘাত করতে পারে না। আমরা নিজেকে যখনই বড় করে দেখি তখনি নিজের ভার অত্যন্ত বেড়ে ওঠে— তখনি দুঃখসুখের ঢেউ জীবনকে বড় বেশি

তোলপাড় করে তোলে।— নিজেকে এবং প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতাকে নিজের সত্য আপন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দূরে রেখে দেখলে জীবনযাত্রা সহজ হয়। যে দুঃখে আমরা মরি সে আমাদের নিজের হাতের মার, তার মানে এ নয় যে সেই দুঃখের ঘটনা আমাদের নিজের সৃষ্টি। তার মানে এই যে, সেই ঘটনাকে আঘাত স্বরূপে নেওয়া আমাদের নিজেরই কাজ।

আমি বোধ হয় জানুয়ারি মাসের শেষ তারিখে কলকাতায় যাব। ইতি ২৫ পৌষ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চিত্ত যখন উদ্ভ্রান্ত হয় তখন মানুষ বাইরে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় কিন্তু মানুষের উপর আদেশ আছে তাকে আপনার আশ্রয় আপনি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজের অন্তরের মধ্যে যতক্ষণ না ফিরিয়ে আনতে পারি— ততক্ষণ সংসারের দীর্ঘ ও জটিল পথের আর অন্ত পাইনে। সব ভ্রমণ ও সব সন্ধানের শেষ নিজের মধ্যেই এইটে বুঝতে আমাদের অনেক সময় লাগে। নিজের মধ্যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই বলে পরিত্রাণ, বাইরে তাকে হাৎড়ে বেড়াই কোথায়? কিন্তু এ সব কথা কথা মাত্র বলে বিশেষ ফল নেই— অন্তরের মধ্যে সত্যে ধ্রুব হওয়া বল্‌তে কী বোঝায় সেইটে ঠিক মতো বুঝতে পারলেই রক্ষা পাই। মানুষের জন্মকাল থেকে হাজার পথে বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াই তার মনের অভ্যাস— কোন্ শক্তির দ্বারা সেই অভ্যাসকে দমন করা যেতে পারে এইটেই দুরূহ প্রশ্ন। এ সব বিষয়ে যেটা লক্ষ্য সেটাই উপায়, আর্থিক ব্যবসায়ে টাকা দিয়ে টাকা পেতে হয়— এও সেই রকম— নিজের মধ্যে পাথেয়রূপে যদি আনন্দ থাকে তবে সেইটেই গম্য স্থানের আনন্দনিকেতনে নিয়ে যায়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩০ আশ্বিন ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। সংসার থেকে সরে এসে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছ এই মুক্তির মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে নিজের অন্তর থেকে নিজের শান্তিকে উদ্ভাবন করতে পারবে। কর্ম্মজাল কাটিয়ে বেরিয়ে পড়বার পথ আমার নেই, যদিও ছুটি চাই। আমার শরীর মোটের উপর ভালোই আছে কিন্তু কাজকর্ম্ম করবার যোগ্যতা অনেক কমে গেছে। আমার বয়সে শক্তির এই খর্ব্বতা ভালোই— বাহিরের দাবি তাতে কমে যায়। কিন্তু এককালে যে ধনী ছিল সে নির্ধন হলেও চাল কমানো সহজ হয় না, ফলে এই হয় লোকের প্রত্যাশা সমানই থাকে অথচ তহবিলে টানাটানি।

তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় পতাকায় চক্রপ্রতীক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রতীকপ্রতিষ্ঠা মানুষের নানা সাধনার অঙ্গ বলে গণ্য হয়ে আসছে। প্রতি দেশের প্রতি যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির নানা বিভাগেই প্রতীকচিহ্ন ব্যবহারের নিদর্শন দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোহেনজো-দড়োর সীল ও পরবর্তীকালের কার্ষাপণ মুদ্রার কথা উল্লেখযোগ্য। পতাকাপ্রতীকও তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে কেতু, কেতন, ধ্বজা, পতাকা প্রভৃতি বহুল শব্দের প্রয়োগ থেকেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। প্রতীক মাত্রই ব্যক্তি- বস্তু- বা ভাব- বিশেষের পরিচয় জ্ঞাপন করে। দেবমানবনির্বিশেষে অনেকেরই বিশিষ্টতার লক্ষণ হিসাবে স্বতন্ত্র ধ্বজার উল্লেখ দেখা যায় প্রাচীন সাহিত্যে। কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, মীনকেতন প্রভৃতি নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'গরুৎমদঙ্ক' থেকে মনে হয় পরমভাগবত গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজকীয় প্রতীক ছিল গরুড়। প্রাচীন ভারতে প্রতীক তথা পতাকা ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

আধুনিক যুগেও পতাকা-প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি অত্যাজ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে। পতাকাপ্রতীক স্থাপন আধুনিক যুগ-সাধনারই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্যান্য প্রতীকের তুলনায় পতাকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে বহুজনের দৃষ্টি- ও উপলব্ধি- গোচর করা যায়। আধুনিক যুগ হচ্ছে সমষ্টিসাধনা ও গণপ্রচেষ্টার যুগ। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আধুনিক কালে গণ-সাধনার প্রতীক পতাকার রূপ গ্রহণ করেছে। সপ্তদশ শতকের ইতিহাসে শিবাজির নামের সঙ্গে গুরু রামদাস স্বামীর নির্দিষ্ট গৈরিক পতাকা অবিস্মরণীয় ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। পরবর্তী শতকে সিপাহি-বিপ্লবের সৈনিকরা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই সবুজ পতাকার তলে সমবেত হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বর্তমান শতকে কংগ্রেসপ্রমুখ নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের পতাকা স্বীকার করেছে। তার মধ্যে কংগ্রেসস্বীকৃত জাতীয় পতাকার গুরুত্বই সব চেয়ে বেশি। এই পতাকাই পরিকল্পিত হয় সকলের আগে, এটির বিবর্তনের ইতিহাসও সব চেয়ে বৈচিত্র্যময়, আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের সৈনিকগণকে সর্ববিধ দুঃখবরণে অনুপ্রাণিত করেছে একমাত্র এই পতাকাই। আজ ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে এই পতাকাই স্বাধীন ভারতের সর্ববাদিসম্মত রাষ্ট্রীয় পতাকা বলে গৃহীত হয়েছে।

এই জাতীয় পতাকার ইতিহাস বিবৃত করা বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়— এর সর্বশেষ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যটুকুই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গত ২২এ জুলাই তারিখে ভারতীয় গণপরিষদে জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মূল-অংশ এই: "ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা সমান্তরালভাবে সমান অংশে গাঢ় গৈরিক, শ্বেত ও গাঢ় সবুজ এই তিন বর্ণে অঙ্কিত ও প্রস্তুত হবে। শ্বেত অংশের মধ্যস্থলে চরকার প্রতিরূপ একটি নীল

রঙের চক্র থাকবে। চক্রটি অশোকের আমলে সারনাথের সিংহারূঢ় স্তম্ভশীর্ষে উৎকীর্ণ চক্রের আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে।” পতাকার বর্ণসমাবেশে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, পূর্বে যা ছিল তাই বজায় রাখা হয়েছে। পরিবর্তনের মধ্যে সমগ্র চরকার স্থলে তারই প্রতীকস্বরূপ ‘অশোকচক্রে’র প্রতিষ্ঠা। এই পরিবর্তনটুকু গণপরিষদে এবং তার বাইরে বহুজন কর্তৃক বহুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু বহু ব্যাখ্যার অন্তরালে এই চক্রের আসল রূপটি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। জাতির চিত্তে জাতীয় পতাকার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশক। তাই উক্ত চক্র যে ভাবধারার প্রতিভূ তার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকার চক্রটি যুগপৎ মহাত্মা গান্ধীর চরকা এবং প্রিয়দর্শী অশোকের চক্র উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথমে চরকার কথাই ধরা যাক। রাশিয়ার পতাকায় বিশিষ্টতা জ্ঞাপিত হচ্ছে কাস্তে ও হাতুড়ির দ্বারা। রাশিয়ার সরকার হচ্ছে মূলত শ্রমিক-সাধারণের প্রতিনিধি, তাই সে দেশে ফসলক্ষেতের কৃষক ও কারখানাঘরের মজুর উভয়ের হাতিয়ার কাস্তে ও হাতুড়ি রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকায় চরকা স্থান পেয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অভিপ্রায় অনুসারে। রাষ্ট্রকে শ্রমের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁরও লক্ষ্য এবং সে শ্রমের সার্থকতা মুখ্যত দেশের সর্বসাধারণের জন্য অন্নবস্ত্র উৎপাদনে। এই আদর্শ অনুসারে অন্নবস্ত্র উৎপাদনের প্রতীক হিসাবে লাঙ্গল এবং কাপড়কলের কোনো যন্ত্র জাতীয় পতাকায় স্থান পেতে পারত। কিন্তু মহাত্মাজির মতে এই উৎপাদনের দায়িত্ব কোনো শ্রেণীবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে না, দেশের প্রত্যেককে এ বিষয়ে যথোচিত ভাবে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে লাঙ্গল বা কাপড়ের কল চালনায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া কলকারখানা কেন্দ্রীভূত শ্রম তথা ধনিকপ্রাধান্য বা অন্যবিধ প্রভুত্বের পরিচায়ক। কিন্তু মহাত্মাজির মতে শ্রম হবে সর্বব্যাপ্ত এবং এই শ্রমের মধ্যে প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে লাঙ্গল, কাস্তে, হাতুড়ি বা অন্য কোনো যন্ত্রই তাঁর আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতীক হতে পারে না, পারে একমাত্র চরকা। তাই মহাত্মাজির সৃষ্ট ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্থলেই চরকার স্থান হয়েছে।

কিন্তু জবাহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সৌন্দর্যের প্রয়োজনে তথা অন্য কোনো কোনো কারণে পূর্ণাঙ্গ চরকার পরিবর্তে তার প্রতীকস্বরূপ চক্রকে গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করেছেন। ফলে আমাদের জাতীয় পতাকায় চরকা আর স্ব-রূপে বিদ্যমান রইল না, চক্রপ্রতীকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাতে জনসাধারণের দৃষ্টিতে চরকা তথা মহাত্মাজির গৌরবহানি ঘটে নি এমন কথা বলা যায় না। বস্তুত চরকাকে বাস্তব ও ব্যাবহারিক জগতের নিম্নভূমি থেকে ভাবজগতের ঊর্ধ্বলোকে তুলে নিয়ে যাওয়াতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগশক্তি পূর্ণভাবে সক্রিয় নাও থাকতে পারে। সম্ভবত এই আশঙ্কা আছে বলেই চরকার এই ভাবান্তর তথা রূপান্তর মহাত্মাজির মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন : “The improved condition of the Flag has value only if it answers the significance attached to the original. If it does not, it is valueless in my estimation. There is reason for this caution.······Hence, in my opinion nothing would have been lost if our councillors had never thought of interfering with the

design of the original flag." (*Harijan*, August 3, 1947), অর্থাৎ, "মূল পতাকা যে ভাবের দ্যোতক, তার এই উন্নত সংস্করণেও যদি সে ভাব অব্যাহত থাকে তবেই তার মূল্য আছে, নতুবা আমার বিবেচনায় তার কিছুমাত্র মূল্য নেই। এই সতর্কতা অবলম্বনের হেতু আছে।......সুতরাং আমার মতে আমাদের উপদেষ্টারা মূল পতাকার রূপ পরিবর্তনের কথা যদি মনে স্থান না দিতেন তা হলে কোনো ক্ষতি হত না।" মূল পতাকার সৌন্দর্যবর্ধন ও চক্রের বিবিধ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "When the original conception is kept intact no one has any right to cavil at a touch of art.......If any further but not inconsistent interpretations are added to this indispensable interpretation, the additions will be harmless." অর্থাৎ, "যদি মূল পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রাখা হয় তা হলে কলাসৌন্দর্যের খাতিরে একটুখানি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আপত্তি করা অনুচিত।...যদি আসল ব্যাখ্যার উপরেও আরও নূতন নূতন ব্যাখ্যা যোগ করা হয় এবং সেগুলি যদি আসলটির বিরোধী না হয় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই।" বোঝা যাচ্ছে চক্রটি যে আসলে চরকাই একথা যেন আমরা কিছুতেই ভুলে না যাই এটাই মহাত্মাজির অভিপ্রায়।

চরকার প্রতীক রূপে যে চক্র গৃহীত হয়েছে, তাও আবার সারনাথের অশোক-নির্মিত সিংহ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ চক্রের অনুরূপ। এই অনুকৃতির সার্থকতা কি, তাও বিচার্য। এই সার্থকতা ব্যাখ্যা করেছেন গণপরিষদে পতাকা-প্রস্তাবের উদ্‌যোক্তা জবাহরলাল স্বয়ং, এবং প্রস্তাবের সমর্থক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, সরোজিনী নাইডু-প্রমুখ মনস্বীরা। পণ্ডিতজি প্রথমেই বলেন: "A nation does not live merely by material things although they are highly important." অর্থাৎ, বেঁচে থাকার পক্ষে পার্থিব বস্তু অত্যাবশ্যক হলেও কোনো জাতিই কেবলমাত্র তা নিয়েই বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক জাতিকেই তার চিরাগত প্রতিভা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। চরকা জাতির দৈহিক জীবনেরই প্রতীক, ভারতীয় প্রতিভা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের বাহক সে নয়। তাই অশোকের আমলের সারনাথচক্রকে চরকার প্রতীকরূপে গ্রহণ করে জাতির পার্থিব প্রয়োজন ও অপার্থিব মহিমাকে একাধারে সমন্বিত করার প্রয়াস হয়েছে। পণ্ডিতজি অশোকের সময়ের এই চক্রটিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহুমুখী মহত্ত্বের প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন: "The Asoka wheel itself was a symbol of India's ancient culture and of many things that India stood for." শুধু তাই নয়, এই চক্রের সহিত অশোক-স্মৃতিকে জড়িত রাখার বিশেষ সার্থকতা আছে। অশোকের কীর্তিমহিমা যে শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অলংকৃত করেছে তা নয়, পৃথিবীর ইতিহাসও তাতে ধন্য হয়েছে। এদেশের ইতিহাসে সেসব যুগই সব চেয়ে গৌরবময় যখন ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহকেরা মৈত্রীর বার্তা নিয়ে অভিযান করেছে দেশে বিদেশে এবং নানা দেশের মৈত্রীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে এদেশে; এসব যুগের মধ্যে অশোকের রাজত্বকালই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সব চেয়ে গৌরবময়। সেটা সংকীর্ণ জাতীয় গৌরবের যুগ নয়, বিশ্বজনীন মহত্ত্বের উদার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সে-যুগের মহিমা। সে-যুগে ভারতবর্ষের দূতগণ বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের অগ্রণীরূপে নয়, শান্তি, মৈত্রী ও সংস্কৃতির বাহকরূপে: "The Asoka period was an essentially international period of Indian history. It was not a narrow national period. It was a period when

India's messengers went abroad to far countries not in the way of empire and imperialism but as messengers of peace, culture and goodwill." অশোকের স্মৃতিমণ্ডিত চক্রকে জাতীয় পতাকায় স্থান দেবার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বজগৎকে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী জ্ঞাপন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং সরোজিনী দেবীর বক্তৃতাতেও এই ব্যাখ্যাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মহাত্মাজির কি অভিমত তা জানতেও ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন : "The spinning wheel thus interpreted adds to its importance in the life of billions of mankind." অর্থাৎ, এই ব্যাখ্যায় কোটি কোটি মানবের পক্ষে চরকার তাৎপর্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অশোককে মহাত্মাজি কি দৃষ্টিতে দেখেন তার পরিচয় পাই এই বর্ণনায় : "That Prince of Peace, Asoka,……who…gave up the pomp and circumstance of power to become the undisputed Emperor of the hearts of men and became the representative of all the then known faiths‥that living store of mercy and love" (*Harijan*, August 3, 1947). অর্থাৎ, অশোক ছিলেন শান্তির রাজা যিনি রাজশক্তির সমস্ত গৌরব ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে মানুষের হৃদয়ের অবিসংবাদী আধিপত্য ও তৎকালীন সমস্ত ধর্মতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেছিলেন, আর প্রেম ও করুণার জীবন্ত আধার বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই অশোকের স্মৃতিবিজড়িত চক্রকে চরকার প্রতীকরূপে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সামান্য সুতো কাটার যন্ত্রকে চিরন্তন প্রেমধর্মের বাহন বলে গণ্য করা ('to recognise in the insignificant looking *charkha* the necessity of obeying the ever-moving Wheel of the Divine Law of Love')। তাই মহাত্মাজি চরকার এই রূপান্তরসাধন ও অর্থগৌরবসাধনের অনুকূলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় পতাকার এই চক্রের এসব ব্যাখ্যাতে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে বলেই মনে করি। পূর্ণতর ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে এই চক্রের ব্যাখ্যা করা এবং জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার করার প্রয়োজন আছে। এস্থলে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নেই, তাই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেই নিরস্ত হব।

প্রথমেই দুএকটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তির কথা বলা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী অশোককে ভারতবর্ষের অন্যতম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা (founder of an empire) বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ একথা বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন যে, তিনি কোনো সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেননি, পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। সারনাথের সিংহস্তম্ভের চক্রটিকে অনেকেই অশোকচক্র বলে অভিহিত করেছেন ; মহাত্মা গান্ধী বলেছেন Asoka disc (wheel না বলে disc কেন বললেন জানি না), আর জবাহরলাল বলেছেন Asoka wheel। বস্তুত এটিকে অশোকচক্র বলা সংগত নয়। সারনাথের এই চক্রটিকে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত করতে হয় তাহলে এটিকে বুদ্ধচক্র নামে অভিহিত করাই সংগত। ভগবান্ বুদ্ধ সারনাথেই (প্রাচীন নাম ইসিপতন মিগদাব) তাঁর সদ্য-উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রচার করেন। এই ঘটনাই বৌদ্ধ সাহিত্যে রূপকের ভাষায় 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত হয়েছে। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই প্রিয়দর্শী অশোক সারনাথের তীর্থভূমিতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ

করিয়েছিলেন। সেই স্তম্ভের শীর্ষস্থিত সিংহ হচ্ছে 'শাক্যসিংহ' অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধেরই প্রতীক, আর সিংহমূর্তির সম্মুখস্থিত চক্র হচ্ছে বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধর্মের প্রতীক। তাই চক্রটি প্রাচীন সাহিত্যে ধর্মচক্র নামেই পরিচিত। বুদ্ধপ্রবর্তিত চক্র বলে এটিকে বুদ্ধচক্র নামও দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু 'অশোকচক্র' বলা সমীচীন নয়। সারনাথে বুদ্ধদেব যে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন তা সেখান থেকে চতুর্দিকেই প্রসার লাভ করে। তাই স্তম্ভশীর্ষে চারটি সিংহমূর্তির সম্মুখে চারটি চক্র স্থাপন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। ভগবান্ বুদ্ধ সারনাথে যে ধর্মপ্রবর্তন করেন তা প্রতিষ্ঠিত ছিল চারটি আর্য সত্যের উপরে। সারনাথস্তম্ভের শীর্ষস্থিত সিংহের সম্মুখবর্তী চারটি চক্র বুদ্ধদেবের উপদেশ-চতুষ্টয়ের পরিচায়ক বলেও গণ্য হতে পারে।

উক্ত সিংহারূঢ় স্তম্ভশীর্ষটি সমগ্রভাবেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় সীলমুদ্রা বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং ওই সিংহমূর্তির দ্যোতনা সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সিংহ পশুরাজ নয়, এই মূর্তি আসলে শাক্যসিংহ অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবেরই প্রতিরূপ। সেজন্যই এটির সম্মুখে ধর্ম-চক্রটিকে স্থাপন করা হয়েছে। ভারতীয় ধারণায় সিংহমূর্তি পশুসুলভ হিংস্রতার পরিচায়ক নয়, শ্রেষ্ঠতারই পরিচায়ক। পুরুষসিংহ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি কথার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন সারনাথস্তম্ভের সিংহমূর্তি সম্রাট অশোকের রাজকীয় ঐশ্বর্য, দম্ভ ও পাশবশক্তির প্রতিরূপ। আসলে কিন্তু মানবের দুঃখে বিগলিতচিত্ত মৈত্রী ও করুণার মূর্তরূপ মানবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধেরই প্রতিনিধিত্ব করছে ওই সিংহমূর্তি। মহাত্মাজিও জাতীয় পতাকার প্রসঙ্গে সিংহমূর্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছেন তাতেও একটু ভ্রান্ত ধারণার আভাস পাওয়া যায়। যাকে তিনি 'সিংহারূঢ় অশোকচক্র' (Asoka's disc mounted with lions) বলে বর্ণনা করেছেন, সেটি হচ্ছে আসলে শাক্যসিংহের সম্মুখবর্তী ধর্মচক্র। কাজেই 'The lion is the undisputed King of forest life. Sheep and goats are his food.' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা একেবারেই অমূলক।

যা হোক, আমাদের জাতীয় পতাকায় যে চক্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাকে যদি অশোকচক্র বলা না যায় তাহলে উক্ত পতাকার সঙ্গে অশোকের পুণ্যস্মৃতিকে যুক্ত করা চলে না, এমন কথাও মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রথমত, চক্রসমন্বিত উক্ত স্তম্ভ অশোকেরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ভগবান্ বুদ্ধ যে ধর্মচক্রকে প্রবর্তিত করেছিলেন সারনাথে, অশোকই তার মর্মবাণীকে বহন করে নিয়েছিলেন বহু দেশ-বিদেশে। দক্ষিণ দিকে এই ধর্মচক্রের বার্তা বাহিত হয়ে গিয়েছিল চোল চের পাণ্ড্য সত্যপুত্র ও তাম্রপর্ণী (সিংহল) দেশে, পশ্চিম-এশিয়ায় গিয়েছিল সিরিয়া-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে মাজিদন ও এপিরাস (বা করিন্থ) রাজ্যে এবং উত্তর আফ্রিকায় মিশর ও সাইরিনিতে। প্রীতি- ও মৈত্রী-ধর্মের দ্বারা বিশ্ববিজয়ের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এইভাবে মানুষের চিত্তবিজয়কেই অশোক নাম দিয়েছিলেন 'ধর্মবিজয়'। সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধ যে মৈত্রী ও করুণার ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, অশোকের সাধনায় তাই বিশ্বব্যাপী ধর্মবিজয় রূপে পরিণতি লাভ করেছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকায় যে ধর্মচক্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে অশোকের নাম স্মরণ করা খুবই সংগত।

জবাহরলাল বলেছেন জাতীয় পতাকার পক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের পরিচায়ক হওয়া চাই। মহাত্মার পরিকল্পিত চরকার প্রতীক রূপে বুদ্ধপ্রবর্তিত ও অশোকস্মৃতিমণ্ডিত ধর্মচক্রকে স্বীকার করায়

ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের একত্র সমাবেশ ঘটেছে, আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম তিন জন মহাপুরুষের আদর্শ ও সাধনা একই সূত্রে গাঁথা হয়েছে। অহিংসা ও মৈত্রীর ধর্মসাধনা তিন জনের জীবনেরই মূল কথা। অশোক বলেছেন, 'ধর্মদানের ন্যায় দান নাই, ধর্মসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ নাই'। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে প্রীতির সম্বন্ধ তাকেই বলেছেন ধর্মসম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধ বিস্তারের দ্বারা মানুষের চিত্ত অধিকারকেই বলেছেন ধর্মবিজয়। সমগ্র বিশ্বে বিশেষত পাশ্চাত্ত্য জগতে এই ধর্মবিজয়ের পতাকা বহন করে নেওয়াই ছিল অশোকের লক্ষ্য। বিগত এশিয়া-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীও এই বিশ্বব্যাপী ধর্মবিজয়ের আদর্শই প্রচার করেছেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন (২ এপ্রিল ১৯৪৭): "I want you to go away with the thought that Asia has to conquer the West—through love and truth. If all of you put your hearts together···the conquest of the West will be complete and that conquest will be loved by the West itself." এই উক্তি নিঃসংশয়রূপে বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম এবং অশোকের ধর্মবিজয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সারনাথের ধর্মচক্র তো এই আদর্শেরই প্রতীক। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের দুই দিক্— এক তাঁর পার্থিব আদর্শের দিক্ যার প্রতীক হচ্ছে চরকা, আর তাঁর অতিপার্থিব আদর্শের দিক্ যার যথার্থ প্রতিরূপ হচ্ছে ধর্মচক্র। সুতরাং জাতীয় পতাকায় চক্রকে চরকার প্রতীকরূপে গ্রহণ করাতে মহাত্মাজিরই দ্বিবিধ আদর্শের একত্র সমাবেশ হয়েছে, অর্থাৎ জাতীয় পতাকার চক্ররূপী চরকায় তাঁর জীবনাদর্শেরই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে।

ভারতীয় ভাবধারায় চক্রের দ্যোতনাকে আরও গভীরভাবে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন : "মানুষের উদ্‌ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।" জড়ত্বের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার করে যে চক্র, তার বিস্ময় ভারতবর্ষের চিত্তকে অধিকার করেছে অতিপ্রাচীনকাল থেকেই। ইতিহাস বলে, চালনাশক্তির বাহনরূপে চাকার প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল সম্ভবত এই ভারতবর্ষেই, তার প্রমাণ রয়েছে মোহেনজো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। প্রথমে যা ছিল শুধু জড়বস্তুকে চালিত করার যন্ত্রমাত্র, ক্রমে তা উচ্চতর ভাবের বাহনরূপে কল্পিত হল। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্যেও তার নিদর্শন আছে। সূর্যের পরিক্রমণকে একসময়ে চক্রের আবর্তনরূপে কল্পনা করা হয়। ক্রমে জন্মমৃত্যুর পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাবকেই বলা হল সংসারচক্র, এমন কি বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভববিলয়ও সৃষ্টিচক্র বলে অভিহিত হল। এভাবে চক্রশব্দের রূপকার্থক ব্যবহারের ইয়ত্তা নেই। বুদ্ধকর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তন এই প্রকার প্রয়োগেরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এই চক্র-প্রবর্তনের ভাবটি যে শুধু বৌদ্ধদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তা নয়, গীতাতেও এই ভাবের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা :

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥—গীতা ৩।১৬

'এভাবে প্রবর্তিত (ধর্ম-)চক্রকে যে অনুবর্তন করে না সেই পাপাত্মা বৃথাই জীবন ধারণ করে।'

যাহোক, এইরূপে চক্রের ভাববিস্তার ঘটতে ঘটতে অবশেষে চক্রপ্রতীকের আবির্ভাব ঘটল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধের ধর্মচক্র এবং কৃষ্ণের সুদর্শনচক্র স্মরণীয়। বৌদ্ধ জগতে ধর্মচক্রের যে স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুদর্শন-চক্রেরও সেই স্থান। সুতরাং আধুনিক কালে জাতীয় পতাকায় চক্রপ্রতীক ব্যবহারে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ-কালের ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি অব্যাহত রইল। চক্রের প্রবর্তন প্রগতিরই সূচনা করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অধুনা যে নবযুগ প্রবর্তিত হল তাতে এই বিশ্বমৈত্রীর ধর্মচক্র আমাদের দেশকে নব নব বিকাশের পথে অগ্রগতি দান করবে এবং চক্রধ্বজ ভারতরাষ্ট্র জগতের কাছে ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রীতি ও শান্তির আদর্শ ই স্থাপন করবে, আজকের দিনে সকলেরই এই কামনা।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, চরকাও একটি মহৎ ভাবের দ্যোতক এবং এই দ্যোতনা কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, জনসাধারণ সহজেই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। চরকাকে চক্র-প্রতীকে পরিণত করার ফলে তার ভাববিস্তার ঘটল বটে, কিন্তু তার সাবেক ব্যঞ্জনা তথা তার নব দ্যোতনা উভয়ই দেশের জনসাধারণের সহজ বুদ্ধির অতীত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাহলে এই মহৎ পরিকল্পনা জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যেই পর্যবসিত হবে। সুতরাং এই নব পরিকল্পনার ভিতরের তাৎপর্যটি বালকবৃদ্ধনির্বিশেষে সকলের কাছেই নিরন্তর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব রইল নেতাদের উপরে। কেননা দেশের অধিকাংশের কাছেই যদি জাতীয় পতাকার কোনো অর্থ না থাকে তবে সে পতাকা মহৎ ভাবের বাহক হলেও সে ভাবের নিষ্ফলতা অনিবার্য।

প্রাচীন বাংলার পথঘাট

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

যাতায়াত ও বাণিজ্যপথ

সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে দেশ-পরিচয় লিখিতে বসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা নগর হইতে নগরান্তরে যাতায়াতের পথের উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যেসব গ্রামের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ ; অনেক সময় এই পথগুলিই এক বা একাধিক দিকে গ্রামসীমা অথবা কোনও ভূমিসীমা নির্দেশ করে, এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ। অনুমান করিতে বাধা নাই, এই পথগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে কামনপিণ্ডিয়া গ্রামের ডাম্বারডাম পল্লীর একখণ্ড ভূমির পূর্বদিকে এক রাজপথের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে ধনোয়ার অদূরে দুইটি বাঁধানো রাজপথের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া অথবা মাটি ভরাট করিয়া নূতন নূতন গ্রাম ও নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যাতায়াত-পথ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা চলে। এইসব সাধারণ স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদনদী, খাটা-খাটিকা, খালবিল, যানিকা-স্রোতিকা ইত্যাদি বাহিয়া জলপথ তো ছিলই। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এইসব জলস্রোতের উল্লেখ সুপ্রচুর ; এবং ইহাদের প্রেক্ষাপটে যখন সঙ্গে সঙ্গে লিপিগুলিতে দেখা যায়, এবং সমসাময়িক ও প্রাচীনতর সাহিত্যে পড়া যায় নৌসাধনোদ্যত সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর কথা, তাহাদের অসংখ্য নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, প্রভৃতির কথা, গূঢ় অধ্যাত্ম-সংগীতে (যেমন চর্যাপদে) নদনদী, নৌকা, নৌকার নানা উপাদান (যথা, দাঁড়, হাল, মাস্তুল, পাল, লগি, নোঙরের কাছি) ইত্যাদির উপমা, তখন সহজেই মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা প্রশস্ততর। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই নৌকা-যাতায়াত পূর্ব-বঙ্গে, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে, অর্থাৎ নদনদীবহুল নিম্নশায়ী দেশগুলিতেই বেশি ছিল।

এইসব সাধারণ যাতায়াত-পথ ছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত এবং দেশেরও সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যে-সব স্থল ও জলপথ বিস্তৃত ছিল, যে-সব পথ বাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে— সর্বোপরি শ্রেষ্ঠী, বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে—দেশের বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, তীর্থে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে, দেশান্তরের নগরে-বন্দরে যাতায়াত করিত, দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে সেই সব সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত বহুজন পদলাঞ্ছিত পথগুলির বিবরণই উল্লেখযোগ্য। এইসব পথ দেশের শুধু যাতায়াত-পথ নয়, বাণিজ্যপথও বটে এবং এইসব পথ বাহিয়াই বাংলাদেশে লক্ষ্মীর আনাগোনা। এইসব বিভিন্ন পথই, বর্তমান রেলপথগুলির পূর্ব পর্যন্ত, শুধু লক্ষ্মীর নয়, সরস্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল ; রেলপথগুলি সাধারণত সেইসব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত। জীবনধারণের প্রয়োজনে, জীবনবিকাশের প্রেরণায় মানুষ সুপ্রাচীন কালে দুর্গম বনজঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙিয়া, নদী ডিঙাইয়া, যে-সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে-সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন

হইয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, তাহার স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে, নূতন পথের মধ্যে সেইসব প্রাচীন পথ বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীতে সর্বত্রই তাহা ঘটিয়াছে, বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদনদী-প্রবাহ সুপ্রাচীন কালে জলপথ নির্ণয় করিত, এখনও করে, নদীর খাত যখন বদলায় সঙ্গে সঙ্গে পথও বদলায়; খাত মরিয়া গেলে নূতন খাতে জলপ্রবাহ ছুটিয়া চলে, জলপথও তাহার অনুসরণ করে। সমুদ্রস্রোত ও বিভিন্ন ঋতুর বায়ুপ্রবাহ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথ নির্ণয় করিত; বাষ্প-জাহাজপর্বের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই ছিল নিয়ম; বাংলাদেশেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। লিপিগুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলেন এবং সেইসব বাণিজ্যপথের বিবরণই তাঁহারা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তবু, ফাহিয়ান্ বা য়ুয়ান-চোয়াঙের মত পর্যটক যাঁহারা বাংলার এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত অন্তর্দেশের পথের ইঙ্গিতও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। ইৎসিঙের বিবরণে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের মত গ্রন্থে, দুই-চারিটি জাতকের গল্পে, লিপিমালায় দুই-একটি আকস্মিক উল্লেখেও এই জাতীয় পথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইসব পথ শুধু অন্তর্বঙ্গপথ নয়; বরং এইসব পথ বাহিয়াই বাংলাদেশ প্রাচীনকালে সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগরক্ষা করিত।

আন্তর্দেশিক স্থলপথ

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎসিঙ্ (সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেষি) তাম্রলিপ্তি হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) বারাণসী, বৈশালী, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ-চম্পা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কজঙ্গল দেশ আংশিকত বর্তমান উত্তর-রাঢ়, বাঁকুড়া-বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী অনুর্বর জঙ্গলময় প্রদেশ। কজঙ্গল হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ = বগুড়া-রাজসাহী-রংপুর-দিনাজপুর); পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পথে এক প্রশস্ত নদী পার হইয়া কামরূপ; কামরূপ হইতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি); সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর); তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা); এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে তাহা হইলে মোটামুটি আন্তর্দেশিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। কজঙ্গল বা উত্তর-রাঢ় অঞ্চল হইতে একটি পথ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত। চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা) হইতে তিনি আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। ভাগলপুর হইতে বর্তমানে যে রেলপথ রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণমুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সিউড়ি-রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পুরুলিয়ার দিকে, এই পথই ছিল য়ুয়ান্-চোয়াঙের পথ। কজঙ্গল হইতে উত্তরমুখী হইয়া এই পথ

ধরিয়াই য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ রাজমহল বা রাজমহলের কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পরে পূর্বমুখী হইয়া পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়াছিলেন। এখন ই-আই-আর পথের বর্ধমান-রানীগঞ্জ-সিউড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া লালগোলা ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া বি-এ-আর পথে উত্তর-বঙ্গে যাওয়া যায়, এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথ ধরিয়া কামরূপ। এই রেলপথও প্রাচীন রাজপথই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু, কামরূপ হইতে সমতটের পথ এখন বর্তমানকালে আর খুব পরিষ্কার ধরিতে পারা যায় না; ধলেশ্বরী-যমুনা-পদ্মা এই পথকে এমনভাবে ভাঙিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছে যে, তাহার রেখা কল্পনায় আনা হয়তো যায়, কিন্তু সুস্পষ্ট ধরিতে পারা কঠিন। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বোধ হয় স্থলপথে পদব্রজেই আসিয়াছিলেন, বিবরণী পাঠে এই কথাই মনে হয়; বর্তমান ভূমি-নকশা অনুযায়ী অন্তত দুইবার তাঁহার দুইটি সুপ্রশস্ত নদী, যমুনা ও পদ্মা অতিক্রম করা উচিত, কিন্তু তাহার উল্লেখ বিবরণীতে কিছু নাই। মনে হয়, যমুনা বা পদ্মার আজিকার কিংবা মধ্যযুগের মত প্রশস্ত অস্তিত্ব তখন ছিল না। অথচ, এখন এই দুইটি নদীই বি-এ-আর পথের গতি নির্ণয় করিতেছে। গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া একটি পথ বগুড়া-সান্তাহার-ঈশ্বরদী (পদ্মা) কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত; আর একটি পথ জগন্নাথগঞ্জ (যমুনা)-সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী (পদ্মা) হইয়া কলিকাতা। দুটি পথই বাঁকিয়া চুরিয়া নদনদী এড়াইয়া অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, সমতট হইতে ভাগীরথী পার হইয়া তমলুকের পথে তো এখনও বি-এন-আর পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীরথীতীর হইতে উত্তরাভিমুখী মুর্শিদাবাদ (কর্ণসুবর্ণ) ছাড়াইয়া ই-আই-আর পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এখনও বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদ হইতে ওড্র বা উড়িষ্যা পর্যন্তও ই-আই-আর ও বি-এন-আর পথে প্রাচীন রাজপথের ইশারা সহজেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ যে-সব সুদীর্ঘ পথগুলির দ্বারা পরস্পরযুক্ত ছিল সেইসব পথের ইঙ্গিত য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ হইতে পাওয়া গেল। এইসব পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু আগে হইতেই বহু যানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও বহু মানবের পদতাড়নায় এইসব পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাঁহার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এইসব পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আজিকার রেলপথে বিবর্তিত হইয়াছে। কোথাও রেলপথ প্রাচীন পথকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কোথাও প্রাচীন পথ রেলপথগুলির পাশাপশি চলিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রেলপথই নূতন সৃষ্ট নবাবিষ্কৃত পথ নয়, প্রত্যেকটিই প্রাচীন পথের নিশানা ধরিয়া চলিয়াছে।

বহির্দেশী স্থলপথ : পশ্চিমমুখী পথ

অন্তর্দেশের পথ ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশান্তরের পথগুলির ইঙ্গিত এইবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, বাংলাদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তর-বিহার ভেদ করিয়া (বর্তমান বি-এন্-ডব্লিউ-আর এই পথ অনুসরণ করিয়াছে) চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া (অথবা, পাটনা-আরা হইয়া) বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেখান হইতে একেবারে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গৌড় হইতে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্য-পথের ইঙ্গিত আছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতে এই পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতেই।

এই পথটি তাম্রলিপ্তি হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়া রাজমহল-চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পথটির আভাস পাওয়া যাইতেছে ইৎসিঙের বিবরণ এবং পূর্বোল্লিখিত হাজারীবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকীয় লিপিটিতে। এই পথ তাম্রলিপ্তি হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগয়ার ভিতর দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলাদেশ উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত; বাংলা ও উত্তর ভারতের যে-কোনও বর্তমান রেল-পথের নক্শা খুলিলেই দেখা যাইবে এই রেলপথগুলি সেইসব প্রাচীন পথই অনুসরণ করিয়াছে।

উত্তর-পূর্বমুখী পথ : উত্তরব্রহ্ম-মণিপুর-কামরূপ-আফগানিস্থান পথ

বাংলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ এই উত্তরশায়ী দেশ দুটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এবং কিয়া-তানের ভ্রমণবৃত্তান্তে, চীন-রাজদূত চাঙ্-কিয়েনের প্রতিবেদনে, এবং বোধ হয় মুহম্মদ ইব্ন্ বখতিয়ারের আসাম-তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত সুবিখ্যাত শিলালিপিটিতে। তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থেও বোধ হয় কামরূপের ভিতর দিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথের উল্লেখ আছে। এই সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে পথটির আভাস স্পষ্ট হইতে পারে। পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত দুইটি সুদীর্ঘ পথ যে ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী এসম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখে না; ইতিপূর্বেই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই দুই পথ দিয়া প্রাচীন কামরূপ এবং সুবর্ণকুড্যকের সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্রশিল্প, অগুরু, চন্দন, হাতী প্রভৃতি বাংলাদেশে আমদানি হইত, এবং বাংলার সামুদ্রিক বন্দর ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হইত। কিন্তু কামরূপই পূর্বাভিমুখী এই পথের শেষসীমা নয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙের অন্তত সাতশত বৎসর আগে চাঙ্-কিয়েন (Chang-Kien) নামে এক চৈনিক রাজদূতের প্রতিবেদনে দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রান্ত পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। চাঙ্-কিয়েন (খ্রী পূ ১২৬) ব্যাকট্রিয়ার বাজারে দক্ষিণ-চীনের য়ুন্নান এবং স্জেচোয়ান প্রদেশে জাত রেশমী বস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বাঁশ দেখিতে পাইয়া খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন, এই সমস্ত দ্রব্য আসিত চীন হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-ভারতবর্ষ জুড়িয়া লম্ববান সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া, সার্থবাহ দলের পশু ও শকটবাহিনী ভর্তি হইয়া। স্জেচোয়ান হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পথের খবর য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সপ্তম শতকেও শুনিয়াছিলেন কামরূপবাসীদের নিকট হইতে; কঠিন পার্বত্য পথ দুই মাসে অতিক্রম করিতে হইত, এখবরও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ পাইয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর গোড়ায় কিয়া-তান্ (৭৮৫-৮০৫ খ্রী) নামে আর একজন চীনা পরিব্রাজক টংকিন সহর হইতে কামরূপ পর্যন্ত আর একটি পথের খবর বলিতেছেন। কামরূপে আসিয়া এই পথটি চাঙ্-কিয়েন বর্ণিত পথের সঙ্গে মিলিত হইত, এবং সেখান হইতে করতোয়া নদী পার হইয়া, পুণ্ড্রবর্ধনের ভিতর দিয়া, গঙ্গা পার হইয়া কজঙ্গল এবং সেখান হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কজঙ্গল হইতে পুণ্ড্রবর্ধন হইয়া কামরূপের যে পথের কথা কিয়া-তান বলিতেছেন সেই পথই সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙের পথ ছিল।

চাঙ্-কিয়েন্ বর্ণিত পথটির এবং অন্য আর একটি পথের আরও ইঙ্গিত অন্য দুইটি সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মুহম্মদ ইব্ন বখ্তিয়ার নুদিয়া জয় ও ধ্বংস করিয়া, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাকে একটি সুপ্রশস্তা খরস্রোতা নদী (খরতোয়া = করতোয়া ?) পার হইতে হয় ; সেই নদীর কূল ধরিয়া দশ দিনের পথের পর কুড়িটি পাষাণনির্মিত খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হন। সেই সেতু পার হইয়া আরও ষোল দিনের পথের পর একটি প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখিতে পান, এবং সংবাদ পান যে, সেখান হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্তন বা করমবতন নামে একটি জায়গায় পঞ্চাশ হাজার তুরুস্ক (?) সৈন্য আছে ; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, এবং সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকাল বেলা পনের শ' টাঙ্গন (টাট্টু) ঘোড়া বিক্রয় হয়। লক্ষ্মণাবতীতে যে-সব ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় সে-সমস্তই সেই বাজারে কেনা। ঐ দেশের পথ-ঘাট পার্বত্যদেশ ভেদ করিয়া বিলম্বিত। তিব্বত হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পার্বত্য পথে পঁয়ত্রিশটি গিরিবর্ত্ম আছে এবং সেইসব গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত ঘোড়াগুলিকে আনা হয়। এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাস-যোগ্য বলা কঠিন। প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগরটি কোন্ নগর তাহা নির্ণীত হয় নাই। করবত্তন, করপত্তন বা করমবতন কোন্ স্থান নির্দেশ করে, তাহাও বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, করমবতনের ঘোড়ার হাট দিনাজপুর জেলার নেকদমার হাট ; সেই হাটে নাকি এখনও বহু ঘোড়া বিক্রয় হয়, এবং সে-সব ঘোড়া তিব্বত-ভোটানের টাট্টু ঘোড়া। কিন্তু, করমবতন হাট দিনাজপুর জেলায় হওয়া একটু কঠিন। গৌড় হইতে দিনাজপুর জেলার যে কোনও স্থান ছাব্বিশ দিনের পথ হইতে পারে না— দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হাঁটিলেও নয়। তাহা ছাড়া, অন্য যুক্তিও আছে ; তাহা এখনই বলিতেছি। যাহাই হউক, বখ্তিয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; মধ্যপথেই পর্যুদস্ত হইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্হাজ্ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিন্হাজের বিবরণ সব বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বখ্তিয়ার যে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্যর্থ একটা উত্তরাভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বরশীবোয়া নামক স্থানে পাষাণগাত্রে খোদিত একটি শিলালিপিতেই সুপ্রমাণিত। এই লিপিটির পাঠ এইরূপ :

> শাকে ১১২৭ [= ১২০৬, ২৭শে মার্চ, আনুমানিক]
> শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
> কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃক্ষয়মাযযুঃ ॥

লিপিটির নিকটেই পাথরের খিলানযুক্ত একটি সেতু আছে। এই সেতুই কি মিন্হাজ-কথিত বত্রিশ খিলানযুক্ত পাষাণ-সেতু ? এই সেতু পার হইয়া আরও ষোল দিনের পথ হাঁটিয়া বখ্তিয়ার যেখানে পৌঁছিয়াছিলেন সেখান হইতেও আরও পঁচিশ ক্রোশ দূরে করমবতনের হাট। কাজেই করমবতন দিনাজপুর জেলায় হইতেই পারে না। বরং মনে হয়, শিলালিপি ও মিন্হাজ-কথিত সেতু, প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর এবং করমবতনের হাট সমস্তই কামরূপসীমা হইতে তিব্বতের সুদুর্গম পার্বত্য পথে অবস্থিত ছিল। এই পথে অসংখ্য গিরিবর্ত্ম ছিল, এ খবর মিথ্যা না-ও হইতে পারে। যাহাই হউক, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর কম। কামরূপে আসিয়া

এই পথ চাঙ্-কিয়েন্ কথিত চীন-ভারত-আফগানিস্থান প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের সঙ্গে মিলিত হইত। হইতে পারে, এই পথ দিয়াও বৌদ্ধপণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন। গৌহাটি শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সোজা পঁচিশ মাইল উত্তরে একটি জায়গায় এখনও বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বিরাট মেলা বসে, সেই মেলায় বহু তিব্বতী ব্যবসায়ী কম্বল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে।

উত্তরে তিব্বতগামী পথ

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটি পার্বত্য পথ বোধ হয় ছিল। এই পথ উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি-দারজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া, তিব্বতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে (প্রথম শতক) বোধ হয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনদেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যে-সব পার্বত্য টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাথর ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, ঐ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।

কামরূপ হইতে তিব্বতের পথ বা জলপাইগুড়ি-দারজিলিং হইতে তিব্বতের পথ ইহার কোনোটাই এখন আর বহুল ব্যবহৃত নয়। পার্বত্য প্রদেশের লোকেরাই শুধু এই পথ ব্যবহার করিয়া থাকে বঙ্গ ও আসামের সমভূমিতে আসিবার প্রয়োজনে— কম্বল, ঘোড়া, সোনা, পাথর ইত্যাদির বিনিময়ে লবণ, বিলাস-দ্রব্য ইত্যাদি কিনিবার জন্য। কামরূপ হইতে উত্তর-পূর্ব আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, যে-পথ দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চলিয়া গিয়াছে, যে-পথের কথা চাঙ্-কিয়েন্ বলিয়াছেন সেই পথে লোকযাতায়াত বরাবরই কিছু কিছু ছিল; মধ্যযুগেও ছিল, এবং বর্তমান যুগেও আছে। আসামে ও বাংলায় গোপনে আফিম আমদানি তো এই পথেই হইয়া থাকে। কিন্তু গত ভারত-ব্রহ্ম-চীন-জাপান যুদ্ধের তাগাদায় এই পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা-মণিপুর পথ

বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিতেই হয়। এ-পথটি পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান, শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য-ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দুই রাজ্যের সংযোগ ছিল এই সদ্যোক্ত পথে। এই পথের সংবাদও স্থানীয় লোক ছাড়া আর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, অথচ মধ্যযুগে মণিপুর-ব্রহ্মযুদ্ধের সৈন্যসামন্ত তো এই পথ দিয়াই যাওয়া-আসা করিয়াছে। চোরাই ব্যবসাও বরাবরই এই পথে চলিত। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় সেই পথ আবার বহুজনের পদচারণে প্রশস্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম-আরাকান পথ

আর একটি পথের প্রতি একান্ত সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই পথ দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া নিম্ন-ব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আনুমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আধিপত্য সুবিদিত। চট্টগ্রামের সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সমান সুপরিচিত। মধ্যযুগে আরাকান মুসলমান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের প্রচুর সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল ; এই সাহিত্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় এই চট্টগ্রাম-আরাকান-প্রোম পথও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অবশ্য এই পথের সমান্তরালবাহী সমুদ্রকূলশায়ী জলপথ তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলই।

তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণমুখী পথ

আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথবৃত্তান্ত শেষ হইবে। এই পথটি তাম্রলিপ্তি-তমলুক হইতে, কর্ণসুবর্ণ হইতে, সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া বাংলা-দেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এই পথ ধরিয়াই কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজারা এই পথেই দক্ষিণ-দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল, এবং পূর্ব-গঙ্গবংশের রাজারা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল এবং দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন। এই পথেই বর্তমান কালের বি-এন-আর এবং মান্দ্রাজ-রেলপথ বিস্তৃত।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

স্থলপথের কথা বলা হইল। এইবার আন্তর্দেশিক নদী বা সামুদ্রিক জলপথের কথা বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য কয়েকটি জাতক-কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। শঙ্খ জাতক, সমুদ্দবাণিজ জাতক, মহাজনক জাতক ইত্যাদি গল্পে দেখা যায় মধ্যদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা-ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তি আসিত এবং সেখান হইতে বঙ্গসাগরের কূল ধরিয়া সিংহলে, অথবা উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইত সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন-ব্রহ্মদেশ)। সুবর্ণভূমির পথে বহুদিন বণিকেরা কূলভূমির চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে সম্ভবত স্ট্রাবো এই তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথী-গঙ্গার উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাওয়া আসা করিত। নদীপথে গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যোগাযোগ ছিল। এই তথ্য নিঃসন্দেহ, এবং জলপথে তাহাই তো একমাত্র পথ। এ-পথ প্রাগৈতিহাসিক পথ এবং রেলপথে দ্রুত বাণিজ্য-সম্ভার যাতায়াতের সূত্রপাতের আগে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। উনবিংশ শতকেও বাঙালী এই নৌকাপথে কাশীধামে যাওয়া আসা করিত, এই স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংলার অন্য দুইটি প্রধানতম নদনদী, করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য-পথে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াতের সাক্ষ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে, কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত এক জলপথের ইঙ্গিত বোধ হয় পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে,

হর্ষবর্ধন-ভাস্করবর্মা-সংবাদ প্রসঙ্গে। কিন্তু, এই জলপথ কি ব্রহ্মপুত্র ভাটি এবং গঙ্গা উজান বাহিয়া, না কামরূপ হইতে স্থলপথে উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া তাহার পর কোশী বা মহানন্দার ভাটি বাহিয়া গঙ্গাতীরস্থ কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। যাহা হউক, একথা অনুমান করিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে, উত্তর-আসামের রেশমজাতীয় বস্ত্রসম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান, গুবাক্ বা সুপারি, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা বাহিয়াই বাংলাদেশে আসিত। বাঁশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় ইত্যাদি তো এখনও ভাটির স্রোতে ভেলায় ভাসাইয়া বাংলাদেশে আনা হয়। পাট এবং ধান চাল তো আজও নৌকাপথেই আমদানি রপ্তানি হয় বেশি, বিশেষত পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং আসামে ও সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে। করতোয়া (খরতোয়া ?) যে এক সময় খুবই প্রশস্তা ও খরস্রোতা নদী ছিল এবং সোজা গিয়া সমুদ্রে পড়িত একথা তো আগেই বলিয়াছি। উত্তর-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে যোগাযোগ এই নদীপথেই ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। একথাও আগে বলিয়াছি যে, এই নদীমাতৃক দেশে স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য প্রশস্ততর ছিল ; লিপি এবং সমসাময়িক সাহিত্যেই যে শুধু সে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই নয় ; মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত লোকের অভ্যাস ও সংস্কারের মধ্যেও তাহার আভাস ও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বহির্দেশী সমুদ্রপথ : বঙ্গ-সিংহল পথ

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার কথা বলিয়াছি। দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের পথের কথাই আগে বলা যাক্। সিংহলী ইতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে উল্লিখিত লাঢ়দেশী রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক সমুদ্রপথে সিংহল গমন এবং দ্বীপটি অধিকার ইত্যাদির গল্পেতিহ্য বাঙালী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্যাণে সুপরিচিত। কিন্তু এই লাঢ়দেশ কি প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদ, না প্রাচীন গুজরাত বা লাটদেশ, এই লইয়া পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে, এবং এই সম্পর্কীয় আলোচনা নানা ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং শব্দতাত্ত্বিক বিতর্কে কণ্টকিত। কিন্তু এ-সাক্ষ্য ছাড়াও এই সম্বন্ধে অন্য প্রাচীন সাক্ষ্য বিদ্যমান। পেরিপ্লাসের সাক্ষ্য আগে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল ; সমুদ্রমুখে গঙ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্যসম্ভার কোলণ্ডিয়া (Colandia) নামক এক প্রকার জাহাজে বোঝাই হইত এবং সেই জাহাজগুলি দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে যাতায়াত করিত। প্লিনিও এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, আগে প্রাচ্যদেশ হইতে সিংহলে যাইতে কুড়ি দিন লাগিত, পরে (অর্থাৎ প্লিনির সময়ে এবং কিছু আগে) লাগিত মাত্র সাত দিন ('a seven days' sail according to the rate of speed of our ships')। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান্ যখন তাম্রলিপ্তি হইতে এক বাণিজ্য-জাহাজ চড়িয়া সিংহল যান তখন লাগিয়াছিল চৌদ্দ দিন ও রাত্রি। সিংহল তো খ্রীষ্টপূর্বকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং কালক্রমে এই হিসাবে এই দ্বীপটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ফাহিয়ানের পর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক সিংহলে-বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তাহা সদ্যোক্ত সমুদ্রপথেই। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণী পাঠে জানা যায়, ঐ সময়

অসংখ্য চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে সিংহলে ঐ পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সূত্র ধরিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং কিছু কিছু নাগরী লিপির বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সিংহলে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না ; তবে মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাত পর্যন্ত সমুদ্রপথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, অথবা এই সব পথের সুপ্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যেমন মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। সিংহল হইতে মালয়, নিম্ন-ব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্রপথ তো ছিলই, এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর।

তাম্রলিপ্তি-আরাকান-ব্রহ্ম-মালয়-যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপ পথ

তাম্রলিপ্তি হইতে নিম্ন-ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমির দ্বিতীয় সমুদ্রপথের ইঙ্গিত যে মহাজনক জাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, সে-কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এই পথ সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম-আরাকানের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া। একাদশ শতকে এবং পরে মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আনাগোনা যে এই পথেই অনেকটা হইত তাহা কতকটা অনুমান করা চলে। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যেও বাংলার সঙ্গে নিম্ন-ব্রহ্মের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এবং এই বাণিজ্যপথের সুদূর স্মৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুপারগ জাতক নামে আর একটি জাতকের গল্পেও পূর্ব-ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা আছে। মধ্যযুগে চীন বণিক ও পরিব্রাজকেরা (যেমন, মা-হুয়ান), আরব বণিকেরা এবং পরে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেহ্-টি-গান্ বা চট্টগ্রাম হইতে এই সমুদ্রোপকূল বাহিয়াই আরাকান ও নিম্ন-ব্রহ্মদেশে যাওয়া আসা করিতেন, এমন প্রমাণ একেবারেই দুর্লভ নয়। ইৎসিঙ্ সপ্তম শতকেই বলিতেছেন, হিউয়েন-তা নামে একজন চীন পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী কেডা (Keddah) হইতে সোজা তাম্রলিপ্তি গিয়াছিলেন। এই পথটির আভাস বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতেই পাইতেছি। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের যে-লিপিটি মালয়-উপদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে সেই লিপিটিতে দেখিতেছি, বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হইতে সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন মালয়ে বাণিজ্য-ব্যপদেশে। এই রক্তমৃত্তিকা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (য়ুয়ান্-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হইতে পারে ; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। নবম শতকের মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা-লিপিতেও বঙ্গসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তখন তাম্রলিপ্তি বন্দর অবলুপ্ত ; বাংলার আর কোনও সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখও পাইতেছি না। কাজেই, এই পথ সমুদ্রতীর বাহিয়া, না কোনাকুনি বঙ্গসাগর বাহিয়া, উড়িষ্যার কোনো বন্দর হইয়া তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না।

তাম্রলিপ্তি-পলৌরা-মালয়-সুবর্ণভূমি-পথ

তৃতীয় আর-একটি পথের কথাও বলিতে হয়। এই পথের সর্বপ্রাচীন সংবাদ দিতেছেন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বেত্তা টলেমি। তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত উড়িষ্যা দেশের পলৌরা (Paloura) বন্দরে, এবং সেখান হইতে কোনাকুনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলিতে।

তেজারতি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভাইপো কোঁদন মাথার পাকা চুল তুলিতে তুলিতে একটু সংকুচিতভাবে বলিল, "মেজকাকা, একটা কথা বলব, রাখবে?"

অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াছি; ছুটি করাইয়া লয়, সিনেমা দেখিবার অনুমতি আদায় করিয়া লয়; উত্তর করিলাম, "না-শুনে বলতে পারছি না; কথাটা কি?"

একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সংকোচটা কাটাইয়া বলিল, "তেমন শক্ত কথা নয়,—বলছিলাম কাকা, চুল তোলার পয়সা একটু বাড়িয়ে দেবে না?"

একটা বই পড়িতেছিলাম শুইয়া শুইয়া, সামনের কমার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলাম, "হঠাৎ?"

"অনেক দিন থেকে তুলছি তো, হাত পেকে এসেছে।"

এবার আমাকেই একটু চুপ করিয়া যাইতে হইল, কালে কালে এ হইল কি?— পাকা চুল তোলারও এক্‌স্‌পার্ট রেট্‌ চায়! মনের ভাবটা প্রকাশ না করিয়া সহজ কণ্ঠেই একটু মৃদু ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "বলি, পয়সারও অভাব বেড়েছে নাকি?"

বোধ হয় সেকেণ্ড পাঁচ-সাত বিলম্ব হইল, তাহার পর আমার চেয়েও সহজ কণ্ঠে বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, মেজকাকা, একটু দরকার পড়েছে।"

বেশ বোঝা যায় প্রশ্নটা করিয়া ওর যেন মস্ত একটা সুবিধা করিয়া দিয়াছি।

প্রশ্ন করিলাম, "দরকারটা কিসের শুনতে পারি?"

"একটা ব্যাবসা ফাঁদব মনে করেছি।"

কোঁদনের বয়স সাতবছরের কয়েকমাস উপরে, সবে স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনের গঠনের দিক দিয়া একটু ভারিক্কে গোছের, মুখে স্কুলের ছেলেদের চেয়ে স্কুলের মাস্টারদের বুলিই বেশি; বাপের পায়ের সামনে নেকড়ার বল রাখিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, কোমরে দুটি হাত, 'শট্‌'টা ভাল হইলে পিঠ-ঠোকার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া বলে—গুড্‌, গুড্‌, এস্‌সেলেণ্ট!

চুল তোলায় 'হাত পাকা'র কথায় তেমন বিস্মিত হই নাই, ইডিয়মের কানটা ভালো, কোথাও সংগ্রহ করিয়া বসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু 'ব্যাবসা ফাঁদা'র কথায় বই মুড়িয়া ফিরিয়া চাহিতে হইল। কোঁদন একটুও অপ্রতিভ হইল না, অবিচলিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি আবার পূর্ববৎ শয়ন করিলাম, মনে মনে ব্যাপারটুকু লইয়া একটু চিন্তা করিতেই বুঝিতে পারিলাম রেট বাড়ানোর প্রস্তাবে একটু সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক কোঁদনের, কিন্তু ব্যাবসা ফাঁদার আলোচনা আজকাল যত্র তত্র, এমন কিছু নূতন কথা বলিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না।

প্রসঙ্গটা একটু চালাইবার ইচ্ছা হইল, প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাবসাটা কি তা জানতে পারি?"

উত্তর পাইলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া আর কোণঠাসা করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তবে একটু কৌতুক করিবার লোভটা পরিহার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তা নাই বল কোঁদন। আর নিয়মও তাই,— ব্যাবসার আসল কথাটা পাঁচ কানে তুলতেও নেই। কিন্তু ব্যাবসা করতে নামছ, হিসেব জিনিসটা বোঝ তো ?"

"কত ধানে কত চাল ?"

ওর বাপের মুখের কথা, সে সাধারণত ব্যাবসার বিরুদ্ধে, ভাইয়েদের সঙ্গে তর্কে এই কথাটা প্রায় ব্যবহার করে, কোঁদন আয়ত্ত করিয়াছে। ঠোঁটের হাসি চাপিতে পারিলাম না, বলিলাম, "হ্যাঁ, বোঝ ?"

"তা বুঝি মেজকাকা, এদিকে একশ পর্যন্ত গুণতে পারি—, আর…"

বলিলাম, "ঐতেই হবে, আর কি দরকার ?" বেশ, তাহলে হিসেব যখন বোঝই কোঁদন, তো অমন বে-হিসেবির মতন কথা বলছ কেন ?"

"কি মেজকাকা ?"

"চুল যখন আমার কম পাকা ছিল, তোমার খুঁজতে মেহনত হ'ত, তুলতে সময় লাগত, তখন পাঁচটাতে এক পয়সা হয়েছে ; এখন কত বেশি, টপ টপ করে চোখ বুজে তুলে যাচ্ছ, সেই এক পয়সাতে দশটা তুলে দেওয়া উচিত নয় তোমার ?"

কোঁদন চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, "অথচ চাইছ তুমি বেশি পয়সা, তার মানে দুটো তুলেই তুমি বোধ হয় এক পয়সা জমা ধরছ। আমিই বরং বলতে পারি— কোঁদন, এক পয়সায় দশটা না হোক, গোটা ছয় দাও তুলে, আরও পাকলে তখন দশটা, তারপর পনেরটা, তারপর কুড়িটা, তারপর……"

কোঁদন বাধা দিয়া বলিল, "পাঁচটাই থাক্ মেজকাকা, ঠাট্টা করছিলুম।"

২

কয়েকদিন আর কোঁদনের ব্যাবসার হালচাল জানি না। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা একটার পর একটা অসুখে পড়িয়া গেছে, আরাম করিয়া মাথার পাকা চুল তোলাইব কি, ঘাড়ের উপর মাথাটা আদৌ আছে কিনা সে হিসাবই রাখিতে পারি নাই।

সবে দিনদুয়েক নিশ্বাস লইতে সমর্থ হইয়াছি, গোছগাছ করিয়া লইয়া একটু বই-খাতা লইয়া বসিব, বাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "মেজকাকা, কোঁদনের অসুখ করেছে।"

সত্য কথা বলিতে কি, মনটা খিচড়াইয়া গেল, বলিলাম, "খুশি হলাম ; পই পই করে বারণ করছি, খারাপ সময় যাচ্ছে, রোদে হাওয়ায় বেড়াসনে ওরকম ছুটোছুটি করে, তা শুনবে কথা ?— ভুগুক, না ভুগলে ধাঁক্ হবে না। যাও।"

বয়সে এই দুটিতে সব চেয়ে কাছাকাছি, সেইজন্য অত্যন্ত বেশি ভাব এবং অত্যন্ত বেশি আড়াআড়ি। এখন নিশ্চয় ভাবের পালা চলিতেছে, বাবু মুখটি নিচু করিয়া বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগের ঝোঁকেই আবার কাজে মন দিয়াছিলাম, ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাছে কে আছে ?"

"কেউ নেই।"

"কেন, ওর মা ?"

"ঘুমচ্ছেন, মেজকাকা।"

রাগে গা'টা আরও জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, "ঘুমচ্ছেন ;···বেশ, ঘুমতে দাও নিশ্চিন্দি হয়ে। এই করেই তো হচ্ছে এই সব,— মায়েরা ঘুমোন, ছেলেরা দুপুর রোদ্দুরে লুটোপুটি করে ফিরুক, জল খাক্ ঢক্ ঢক্ করে।···যাও, আমায় আর জ্বালাতন কোরো না।"

আবার টেবিলের দিকে ঘুরিয়া বসিলাম।

বাবু মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। যখন বাইরের উঠানটা পার হইয়া গেছে, ডাক দিলাম, "এদিকে আয়।"

কাছে আসিলে প্রশ্ন করিলাম, "বলেছিস ওর মাকে ?"

"না।"

"বলিস নি তো জানবেন কি করে শুনি ? যা, তাঁকে বল্ উঠে জ্বরটা দেখতে। আমায় বলে যা কত জ্বর আছে।"

বাবু ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কাজে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে খেয়াল হইল বাবু খবরটা দিয়া যায় নাই, চেয়ারটা ঠেলিয়া উঠিতে যাইব, দুয়ারের আড়ালে একটি কচি মুখ সট্ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ডাকিলাম, "কে ? এদিকে আয়।"

তরুণ বাহির হইয়া মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, যখন ঝগড়া না থাকে সংবাদবাহকের কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?— দোরের আড়াল থেকে ওরকম উঁকিঝুঁকি মারছিলি যে ?"

"বাবু পাঠিয়েছে।"

"তিনি বুঝি নিজে আসতে পারলেন না ? জ্বর কত কোঁদনের ?"

"একশ পাঁচ।"

"একশ পাঁচ কি রে! বলিস কি !"

তরুণ নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"ছটফট করছে খুব ?"

তরুণ নির্বিকার ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

"ওর মাকে মাথায় জলপটি দিতে বল্‌গে। আমি এক্ষুনি আসছি।" বরফ আনিবার জন্য চাকরটাকে উঠাইয়া ঘরে আসিয়া টাকা লইবার জন্য ড্রয়ারটা খুলিয়াছি, পিছনে চাপা কণ্ঠের আওয়াজ কানে গেল—"মেজকাকা।"

ঘুরিয়া দেখি অনিল ; তরুণের সমবয়সী, বাড়ির শিশু-রাজনীতিক্ষেত্রে জায়গাটাও অনুরূপ ; প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

অনিল বাহিরের উঠানের ওদিকে বাড়ির দোরগোড়ায় একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু মগ্ন স্বরে বলিল, "কোঁদনের অসুখ তো করে নি।"

"অসুখ করে নি! তবে যে তরুণ বলে গেল একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। একেবারেই কিছু হয় নি?"

অনিল আর একবার দরজার পানে দৃষ্টিপাত করিল, আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে বাবুর মুখের খানিকটা নজরে পড়িয়া গেল। অবশ্য নিমেষে অন্তর্হিতও হইল সেটুকু, কিন্তু অনিল আর কিছু উত্তর দিল না, শুধু মাথাটা নিচু করিয়া আড়চোখে মাঝে মাঝে ওদিককার দরজার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মাথা গুলাইয়া আসিতেছে। ওদের পলিটিক্স্ লইয়া মধ্যে মধ্যে এই রকম বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। দুপুরবেলা সবাই আপিসে থাকে, মেয়েরা ঘুমায়, যতই বাঁচাইয়া চলিতে চাই-না কেন কূটনীতির ধকলটা আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, আর এই সময়ই চারিদিক নিষ্কণ্টক দেখিয়া বাড়িয়াও যায় ওদের আদান-প্রদান, সন্ধি-বিগ্রহ, নালিশ-ফরিয়াদ।···ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অসুখে পড়াটা এদের অনেক সময় একটা পোয়া-বারো— পড়ার হাঙ্গাম নাই, নেবু-বেদানা আছে, যাদের মুখে অষ্টপ্রহর খিঁচুনি, গালমন্দ, তাদের কাছে একটু 'আহা-উহু'ও পাওয়া যায়— তাই জ্বরে পড়িলে ওদের জগতে প্রতিপক্ষের হয় হিংসার উদ্রেক— হয়তো অনিলের সঙ্গে এখন আড়ির পালা চলিতেছে···

কিন্তু একশ পাঁচ ডিগ্রির সবটুকুই কি ভুয়ো? "আয় তো, দেখি।" বলিয়া ভিতরবাড়ির দিকে পা বাড়াইলাম।

বাড়িতে সবাই ঘুমাইতেছে; অনিল অগ্রসর হইয়া আমায় দোতলার মাঝের ঘরের সামনে পর্যন্ত লইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গিয়া দেখি মেয়েদের কেহই নাই, চৌকির মাঝখানে কোঁদন শুইয়া আছে, কাঁথা-চাদর যতগুলা সংগ্রহ হইয়াছে সব তাহার উপর চাপানো, মুখটা পর্যন্ত ঢাকা, মাথার কাছে বাবু এবং পায়ের কাছে তরুণ বসিয়া আছে। দুজনেই খুব বিমর্ষ, আমি গিয়া দাঁড়াইতে একবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।

একটা কোনো গভীর ষড়যন্ত্র যে চলিতেছে এটুকু বুঝিতে পারিয়াও আমি একবার কাঁথার ভিতর হাত দিয়া কপালটা আর বুকটা দেখিলাম, ঘামে ভিজিয়া টেম্পারেচার প্রায় পঁচানব্বইয়ে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাড়ীটাও টিপিলাম একবার, বেশ চঞ্চল, তবে সেটা যে আমি ধরার জন্যই সেটুকু বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্যাপারখানা কি?— এর তাপ দেখিতে হইবে তো! অনেক কষ্টে কোনরকমে হাসিটা চাপিয়া চক্ষু দুইটা কড়িকাঠ-সংলগ্ন করিলাম, মুখে যতটা সম্ভব চিন্তার ভাব ফুটাইয়া একটু মাথা দুলাইয়া বলিলাম, "হুঁ···।"

তাহার পর বাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিলাম, "কে বললে একশ পাঁচ?— কে দেখেছে?"

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, চঞ্চল স্বভাব, উৎসাহের মুখে চোখ দুইটা যেন জ্বলিতে থাকে; থার্মোমিটার নাই, আমার আদেশমতো কোঁদনের মাকেও সে ডাকে নাই সব ভুলিয়া একটু গলাটা তুলিয়া বলিল, "আমি মেজকাকা।"

বলিলাম, "একশ পাঁচ, মোটে? একশ পনেরর এক ডিগ্রিও কম নয়। যখন জানিস না হুট্ করে বলতে যাস কেন অমন করে? মোটে একশ পাঁচের ওষুধ খেয়ে এক্ষুনি যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত, তখন?"

এতবড় সফলতা বাবু আশা করে নাই, ভিতরের উল্লাসে চোখ দুইটা চক্‌চক করিয়া উঠিল, উহারই মধ্যে যথাসাধ্য চিন্তার ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হবে মেজকাকা তা'হলে ?"

বলিলাম, "ওষুধ খেতে হবে, কুইনিন।"

উৎসাহে তরুণের মুখও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যবস্থা দেখিয়া দুজনের মুখই একেবারে যেন ছাইপানা হইয়া গেল, রোগীও কাঁথার নিচে আড়ামোড়া দিয়া উঠিল।

বলিলাম, "কিন্তু কথা হচ্ছে, একশ পনের ডিগ্রি জ্বরের মতন অত তেতো কুইনিন পাওয়াই যায় বা কোথায় ?"

কোঁদন মুখের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিল, ঘামে যেন সমস্ত মুখটা সিদ্ধ হইয়া রাঙা হইয়া গেছে, চুলগুলা পর্যন্ত গেছে ভিজিয়া। "ওকি, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!" বলিয়া কাঁথাটা টানিয়া দিতে যাইতেছিলাম, কোঁদন হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "অত জ্বর হবে না মেজকাকা।"

বলিলাম, "এক ডিগ্রিও কম নয়। তুই তো বলবিই, ভাত খাওয়া বন্ধ হবে কিনা।"

কুইনিনের উপর ভাত বন্ধ— এত সব হিসাব করিয়া দেখে নাই, কোঁদনের যেন ঘামের বন্যা নামিল, বাবুর আর তরুণের মুখ গেছে আরও শুকাইয়া, তিনজনেই একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল ; অকূলে পড়িয়াছে। ঢাকাটা আমি দিলাম টানিয়া। তাহার পর "এখন কুইনিনটা পাওয়া যায় কোথায় ?" বলিয়া চিন্তিতভাবে দৃষ্টি আবার কড়িকাঠে তুলিলাম।

কাঁথার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "মেজকাকা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

উত্তরে জড়াইয়া কি বলিল ভালো বোঝা গেল না, কানটা সরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বললি ?"

"বলছিলাম— বেশি তেতো কুইনিন খেলে বেশি টাকা পাব তো ?"

"টাকা! এর মধ্যে টাকার কথা আসে কোথা থেকে ? অসুখ হয়েছে, ওষুধ খাবি, এই তো সোজা বুঝি— টাকা তো এমনি ডাক্তারে ওষুধে কত বেরিয়ে যাবে আমাদের।"

বেচারিরা মতলব আঁটে খুব বড় বড় কিন্তু কখনও শেষ রক্ষা করিতে পারে না ; সব প্ল্যান কাঁচিয়া গেল, তাহার উপর উল্টা উৎপত্তি, বাবু যেন মরিয়া হইয়াই বলিল, "মেজকাকা, একটা কথা বলব ?"

উত্তর করিলাম, "বলো।"

দুইবার ঢোঁক গিলিল, তাহার পর বলিল, "কোঁদন বলছিল— এ-অসুখে ডাক্তারও ডাকতে হবে না, ওষুধও কিনতে হবে না, টাকা পেলেই ওর ভালো হয়ে যাবে।...কটা টাকা রে কোঁদন ?"

কানটা আগাইয়া লইয়া গেল। আমিও কানটা কাত করিয়া দিয়াছি, ফিস্‌ফিসানির মধ্যে দিয়া শুনিলাম, "দুটো।"

বাবু উকিল ভালো দাঁড়াইবে, কেস্‌টা যে খুব মজবুত নয় বুঝিয়াছে, বলিল, "বলছে— একটাকা হলেই হবে মেজকাকা।"

আমি গলাটা পর্যন্ত কড়িকাঠের দিকে উঁচু করিয়া দিলাম, অন্যথা হাসি লুকানো কঠিন হইয়া পড়িত।

৩

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হইল, কোঁদনের পুঁজিসংগ্রহের ফিকির। অসুখে পড়িলেই ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু কিছু জমা হয়, ঔষধ আছে, আবদার আছে, আবার নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াও দেয় এক-আধজন—বেশ একটা রোজগারের পথ। পাকা চুলের দিক দিয়া প্রয়োজনমতো অর্থ সঞ্চয় হইয়া না ওঠায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কোম্পানি যে গঠন হইয়াছে তাহার মধ্যে বাবু এবং তরুণও যে শেয়ারহোল্ডার এটাও স্পষ্ট; অনিল প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাংচি দিয়া পুঁজির বাজার নষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে। দলে আর কে আছে জানি না, তবে ওদের গণ্ডির মধ্যে ব্যাপারটা যে একটা সাড়া জাগাইয়াছে এটা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু ব্যবসাটা কি?

কয়েকদিন একটা স্মিত কৌতুক জাগিয়া রহিল মনে, তাহার পর ব্যাপারটা খেয়াল থেকে নামিয়া গেছে এমন সময় একদিন একটি দৃশ্যে হঠাৎ একটু সচকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের দুইটা বাড়ির মাঝখানে এককালি জমি আছে, দুইদিকে দুই বাড়ির দেয়াল। দুপুরবেলা, গন্‌গনে রোদ, দুইটি বাড়িই নিস্তব্ধ, আমার ঘর থেকে হঠাৎ নজর গেল— কোঁদন আর ও-বাড়ির ভুলুর মধ্যে কি একটা গভীর পরামর্শ চলিতেছে, কোঁদন যেমন ওর বুকের মাঝখানে চারিটা আঙুল চাপিয়া আছে তাহাতে মনে হয় কোনো একটা ব্যাপারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজি করাইবার চেষ্টা করিতেছে যেন।

আমি আগাইয়া গিয়া একটা আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইব ভাবিতেছি এমন সময় কোঁদন ঘুরিয়া এদিকে পা বাড়াইল, মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল একটা কিছু ঠিক হইয়াছে, দুই পা আসিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এক্ষুনি আসছি, দাঁড়িয়ে থাকবি।"

ছেলেটি বড় নিরীহ গোছের, বয়সেও কম এদের চেয়ে, মাথাটা কাত করিয়া জানাইল, থাকিবে দাঁড়াইয়া। কৌতূহলটা গেল বাড়িয়া। কোঁদন আসিয়া আমাদের বাড়ির একেবারে উল্টা দিকে বাগানের দিকটায় যাইতেছে দেখিয়া, আমি আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলাম, রান্নাঘরে দাঁড়াইলে ওদিকটা দেখা যায়, জানালাটা সামান্য একটু খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কোঁদন ততক্ষণে পৌঁছিয়া গেছে। আমাদের প্রতিবেশী রামকিষণের বাড়ির কানাচে দাঁড়াইয়া গলা-খাঁকারি দিতেছে। বিস্ময়ে আমি একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেছি; রামকিষণ বেচারি গরিব লোক, জেলাবোর্ডের রাস্তা আগলায়, ওর বাড়িতে কোঁদনের কি দরকার পড়িল হঠাৎ, সে-দরকারের সঙ্গে ভুলুর বা সম্বন্ধ কি এমন!

কয়েকবার গলা-খাঁকারি দিতেই রামকিষণের ছোট নাতিটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পেয়ারাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "এনেছ?"

কোঁদন মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

"দাও দেখি।"

"তুই বের কর্‌ আগে।" নিজে হাফপ্যান্টের পকেটে হাত সাঁদ করাইয়া দিল।

ছোঁড়াটা নিজের কোমরের কাপড়ের মধ্যে হইতে একটা ছোট্ট কাঠিতে জড়ানো মান্‌ঝা-করা গোলাপী রঙের ঘুড়ির সুতা বাহির করিয়া কোঁদনের দিকে বাড়াইয়া ধরিল, কোঁদনও পকেট থেকে একটা

আটআনি বাহির করিল, লেন-দেন হইল। ছোঁড়াটা প্রশ্ন করিল, "আরও চাই খোঁধাবাবু? বল তো জোগাড় করি।"

কোঁদন উত্তর করিল, "কর্ জোগাড়, তবে বড্ড দাম, কমাতে হবে।"

যখন ফিরিল, সমস্ত মুখটা দেখিলাম— কী সস্তাই যেন মারিয়াছে, চোখে মুখে উল্লাস যেন ধরে না।

দুই বাড়ির সেই গলিটার দিকে চলিল; আমিও আগের চেয়ে আরও কাছে একটা আড়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম।

ভুলু সেইখানেই উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোঁদন আসিয়া বলিল, "বের কর্।"

দুজনেই হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিল। ভুলু বাহির করিল একটা টাকা, কোঁদন সেই ঘুড়ির সুতার বাণ্ডিলটা, নিঃশব্দে হাতফের হইল।

গোলাপী বাণ্ডিলটুকুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভুলুর ঠোঁটে সে যে কী হাসি ফুটিল— কোঁদন যেন আকাশের চাঁদ ধরিয়া আনিয়া দিয়াছে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া যেন আর আশ মেটে না।

কোঁদন উৎসাহ দিয়া বলিল, "বড্ড দাম, তুই ভাই তাই সস্তায় ছেড়ে দিলুম। আরও পাবি, যা টাকা জোগাড় কর্‌গে।"
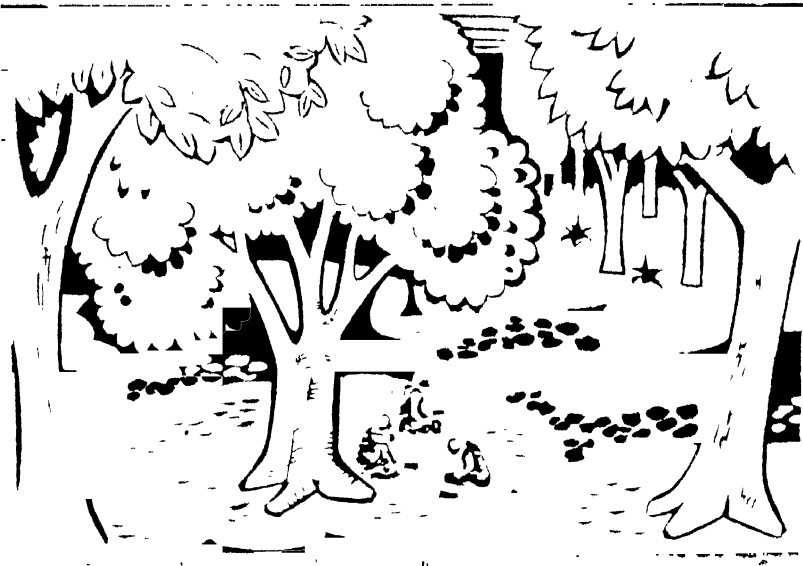
নারীর দায়াধিকার

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে

মানুষের সামাজিক অধিকার বুঝিতে হইলে তাহার দায়াধিকার প্রভৃতি সকল অধিকারের বিষয়ই আলোচনা করিতে হয়। ভারতে পারিবারিক ধারা পুরুষদের বংশগত পরম্পরা ধরিয়াই চলে। সম্পত্তিও যদি সেই ভাবে চলে তবে বিশেষ কোনোপ্রকার অসুবিধা হয় না। কিন্তু মুশকিল হয় নারীদের দায়াধিকার লইয়া। অথচ নারীদের দায়াধিকার না বুঝিলে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা ঠিক বুঝা যায় না।

নারীরা পিতৃকুলে জন্মিয়া শ্বশুরকুলের অন্তর্ভুক্ত হন। অনেকে মনে করেন, তাঁহাদের যদি সম্পত্তি-ভাগ দেওয়া হয় তবে উভয়দিকের অংশ পাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য বেশি হইয়া পড়ে। আর তাহাতে পিতৃকুলের সম্পত্তিরও বৃথা বহু ভাগ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া পতিগৃহ হইতে নারী পিতৃকুলে প্রাপ্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা সংরক্ষণ বা চাষবাস করিতেও পারেন না। একদিকে এই কথা সত্য, দুই কুলের সম্পত্তির ভাগ পাইলে নারীদের ভাগ বেশি হইতে পারে। আবার দুই স্থানে তাহাদের দাবি হইতে পারে বলিয়া কোনো কুলেরই দাবি যদি তাহার না থাকে তবে তাহাও অন্যায় হয়। হিন্দীতে একটা কথা আছে, ধোপার যে কুকুর সে না-ঘাটের, না-ঘরের।

বৈদিক যুগে সম্পত্তির এত জটিলতা ছিল না। ভাগাভাগিরও এত হাঙ্গামা ছিল না। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৩,১,৯,৪) দেখা যায়, মনু তাঁহার সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। নাভানেদিষ্ট তাহাতে বাদ পড়ায় মনু তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন, কি ভাবে আঙ্গিরসদের প্রসন্ন করিয়া গোধন লাভ করা যায়। এই ভাগ-ব্যাপারে দেখা যায়, শুধু গবাদি জঙ্গম সম্পত্তিরই ভাগ হইয়াছিল। ভূমির ভাগ হয় নাই। তখন ভূমির তো টানাটানি ছিল না তাই ভূভাগের প্রয়োজন উঠে নাই। কিন্তু পরে ভূমির টানাটানি হইলে ভূমি ভাগ করাই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিল।

এইজন্যই বৈদিক যুগে কন্যাদের গবাদি অস্থাবর সম্পত্তি দিয়া, বসনভূষণ, অলংকারাদি সহ পতিগৃহে পাঠানো হইত। ভূভাগ দেওয়ার প্রয়োজন তখনও হয় নাই। তবে পরবর্তী যুগে (শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সময়ে) কথা উঠিল, কন্যারা দায়াধিকার পাইবে না। মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৪,৬,৪) বলিলেন, "পুমান্ দায়াদঃ স্ত্র্যদায়ার্থ" ইত্যাদি, অর্থাৎ পুরুষ দায়াদ, স্ত্রীরা নহে। ঋগ্বেদে কন্যাকে "সম্রাজ্ঞী হও" বলিয়া যে আশীর্বাদ করা হইত পরবর্তী যুগে তাহা আর বলা চলিল না। বৌধায়ন (২,২,৪৫-৪৬) বলিলেন, নারী পিতা স্বামী বা পুত্রের অধীনে থাকিবে, স্বাধীনতা পাইবে না। তাহারা শক্তিহীনা কাজেই দায়াধিকারী নহে ইহাই শ্রুতির মত (২,২,৪৭)। উত্তরাধিকার বিষয়ে আপস্তম্ব (১৪,২-৪) বলিলেন, পুত্রাভাবে সপিণ্ড, সপিণ্ডাভাবে আচার্য, আচার্যাভাবে ছাত্র, অথবা দুহিতা। স্ত্রী শুধু পাইবেন অঙ্গধৃত অলঙ্কার (২,৯)। কাহারও কাহারও মতে তাহাই স্ত্রীর প্রাপ্য, তাহাও সর্বসম্মতিতে নহে। গৌতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতিরও এই মত।

মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৪,৬,৪) বলিলেন, কন্যা জন্মিলে সবাই তুচ্ছ করে, সে ফেল্‌না, পুত্র তো ফেল্‌না নহে তাই কন্যা উত্তরাধিকার পায় না, পুত্র পায়। কন্যা পরের ঘরে যায়, তাই সে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

বেদের প্রথম দিকে সংসারে পিতাই ছিলেন কর্তা। জ্ঞাতিবৃদ্ধেরাই সমাজকৃত্য নির্ণয় করিতেন। অর্থাৎ পুরুষদের হাতেই সব ব্যবস্থা। তাহার পর এদেশে ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্যও ক্রমে লড়াই প্রভৃতি করিতে হইত। তাই কি সম্পত্তি রক্ষার্থ যুদ্ধে অসমর্থ কন্যাদের আদর ক্রমে কমিল ? পুত্রই তো শক্তি-শালী, কন্যা নহে। তাহা ছাড়া শূদ্রাদের বিবাহ করায় নারীও সুলভ হইয়া গেল। এই ভাবটা বেদের শেষভাগেই দেখা যায়। মোট কথা, ক্রমে কন্যাদের গৌরব কমিতে চলিল। তাহার পর সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার কন্যাদেরও স্থান ক্রমে একটু ভাল হইতে লাগিল। যাস্কের নিরুক্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬,৫,৮,২৭) আছে—

সোমো নাতিষ্ঠত স্ত্রীভ্যো গৃহ্যমানস্তং ঘৃতং বজ্রং
কৃত্বা অঘ্নন্ তং নিরিন্দ্রিয়ং ভূতম্ অগৃহ্ণন্।
তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ নিরিন্দ্রিয়াঃ অদায়াদীঃ অপীতি
পাপাৎ পুংসঃ উপস্তিতরম্ বদন্তি ॥

ভাল বুঝিবার জন্য সংহিতাবচনটি সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া লিখিত হইল। ইহার অর্থ হইল—

নারীদের দ্বারা গৃহ্যমান হইতেছে ইহা সোম সহ্য করিতে পারিল না। তাই ঘৃতকে বজ্র করিয়া মারিল। যখন তাহা শক্তিহীন হইল তখন তাহারা গ্রহণ করিল। তাই নারীগণ 'নিরিন্দ্রিয়' অর্থাৎ শক্তিহীনা, তাই তাহারা নীচ পুরুষ হইতেও নীচু হইয়া কথা বলে, এইজন্যই তাহারা 'অদায়াদী' অর্থাৎ দায় প্রাপ্তির অযোগ্য।

এই কথাই আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র ব্যাখ্যায় হরদত্ত (২,১৩,১, পৃ ২৯২) এবং তৎসমর্থনে মনুরও ৯।১৮ শ্লোক দেখাইয়াছেন—

নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ স্ত্রিয়োনিত্যমিতি স্থিতিঃ।

বঙ্গবাসী-সংস্করণে মনুর সেই শ্লোকার্ধ—

নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ ॥৯।১৮

'নিরিন্দ্রিয়' কথাটি পারিভাষিক। তাহার আসল অর্থটা কি শক্তিহীনা ? এখানে নিরিন্দ্রিয় অর্থে "যাহার সোমপান-অধিকার নাই" ইহাই বুঝাইবে। কাজেই শ্রুতির 'নিরিন্দ্রিয় বলিয়া অদায়াদী' কথার অর্থ অন্যরূপ হইবে। এই বিচারটি বরদরাজ তাঁহার ব্যবহার-নির্ণয়ে (পৃ ৪৫৯) উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। পরে ব্যবহার-নির্ণয় আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বলা যাইবে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩১শ সূক্তের প্রথম ঋক্—

শাসদ্ বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাৎ।

ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন, প্রসঙ্গক্রমে ঋষি কুশিক একজনকে শাস্ত্রার্থ বলিতেছেন, অপুত্র পিতার পুত্রীই পুত্রিকারূপে দায়াধিকারিণী—

অপুত্রস্য পিতুঃ পুত্রী দায়াদা পুত্রিকা সতী।

এই ঋকেরও মোট কথা এই যে, পুত্রহীন পিতার কন্যা থাকিলে সেই কন্যার গর্ভজাত নাতিই পৌত্রের স্থান অধিকার করে।

এই মন্ত্রটির আলোচনায় যাস্কের নিরুক্তে (৩,৪) দেখা যায়, পুত্র ও কন্যা দুইই প্রজনন-যজ্ঞের ফল, দুইই সর্বদেহ ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন (প্রজনন-যজ্ঞস্য রেতসো বাঙ্গাদঙ্গাৎ সংভূতস্য হৃদয়াদধিজাতস্য), কাজেই উভয়েই দায়াদ। তাহাই এই দুইটি ঋক্ শ্লোকেও উক্ত। আত্মাই তো পুত্র হইয়া জন্মায়। তবে কোনো কোনো আচার্য বলেন, পুরুষই দায়াদ, স্ত্রীলোক দায়াদ নহে। তাই কন্যা জন্মাইলে লোক অবজ্ঞা করে, পুত্রকে তুচ্ছ করে না। কন্যাকে দান-বিক্রয়-ত্যাগ করা চলে, পুত্রকে দান-বিক্রয়-ত্যাগ করা চলে না। কিন্তু আর একদল আচার্য বলেন, পুত্রকেও দান-বিক্রয়-ত্যাগ চলে, শৌনঃশেপে তাহা দেখা গিয়াছে। শুনঃশেপের উপাখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭,১৩-১৮) বর্ণিত।

ন দুহিতর ইত্যেকে তস্মাৎ পুমান্ দায়াদোঽদায়াদা স্ত্রীতি বিজ্ঞায়তে তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসমিতি চ স্ত্রীণাং দানবিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে ন পুংসঃ পুংসোঽসীত্যেকে শৌনঃশেপে দর্শনাৎ।— নিরুক্ত (৩,৪) যাস্কের বৃত্তিতে দুর্গাচার্য দেখাইতেছেন যে দুহিতাও দায়াধিকারী, এতদর্থে ঋক্ও দেখাইয়াছেন। তাহার নিষ্কর্ষ আনন্দাশ্রম সংস্করণ হইতে দেওয়া যাইতেছে—দুহিতা দায়াদ্যমর্হতীত্যর্থে ঋক্ (পৃ ২০৮)। পুত্রগণ কন্যাগণ সকলেই দায়াদ ইহা এই ঋক্ শ্লোকদ্বয়ে বলা হইল—

পুত্রাদুহিতারশ্চোভয়েপি দায়াদাইত্যক্ শ্লোকাভ্যামুচ্যতে। —ঐ ২০৯

লোকব্যবহারেও দেখা যায়—

লোকব্যবহারোঽপি মন্ত্রাণাং বিষয়ো ভবতি। —ঐ

'অঙ্গাদঙ্গাৎ' এই মন্ত্রে স্পষ্টই দুহিতারও পুত্রত্ব দেখা যায়—

অঙ্গাদঙ্গাদিত্যনেন দুহিতুঃ পুত্রত্বং স্পষ্টীক্রিয়তে। —পৃ ২১০

মনুবচনও সর্ব অপত্যেরই অধিকারত্ব সূচিত করে (ঐ, ২১০)। তবে ব্রাহ্মণবচনে দুহিতাদের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই (ঐ, ২১০)। কারণ কন্যার দান-বিক্রয়-ত্যাগ চলে (ঐ, ২১১)।

মহাভারতে কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ (ঐ)। আর পুত্রের দান-বিক্রয়-ত্যাগ করা দেখা যায় (ঐ)। শৌনঃশেপ উপাখ্যানেই তাহার প্রমাণ। যাস্কেই দেখা গেল, স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির আদিতেই বলিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে দায়াধিকারে ধর্মতঃ কোনো প্রভেদ নাই—

অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ —নিরুক্ত, ৩, ৪

যাস্ক এই বিবাদ মিটাইতে গিয়া বলিলেন যে পুত্র না থাকিলে কন্যারই এইরূপ অধিকার। পুত্রিকা বলিয়া এই দাবি। "সপিণ্ড ধনাধিকার পাইবে" এই পুরাতন কথাটা লইয়া গোল বাধিল। পিণ্ড শব্দে দেহ। সেই অর্থে জ্ঞাতিরা বিত্ত পায়। আর শ্রাদ্ধে দেয় পিণ্ড অর্থ ধরিলে কন্যাও শ্রাদ্ধে অধিকারিণী। পুত্রাভাবে শ্রাদ্ধের অধিকারী বলিয়া কন্যার গৌরব পরে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তখনকার দিনে দত্তক পুত্রের স্থান খুবই নীচে ছিল।

তাহার পর আসিল কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রের যুগ। অর্থশাস্ত্র বলিলেন, পুত্র থাকিলে পুত্র অথবা ধর্মবিবাহজাতা কন্যা উত্তরাধিকারিণী—

পুত্রবতঃ পুত্রা দুহিতরো বা ধর্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ। —৩, ৫, ৯

ধর্মবিবাহে জাত না হইলেও কন্যা অধিকারিণী হয়, তবে তখন ভাই ও সহজীবীরা পাইবে দ্রব্য এবং সেই কন্যা পাইবে রিক্থ (ঐ)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার' (যোগেন্দ্র-রিসার্চ প্রাইজ প্রবন্ধ) নামে একখানা ভাল পুস্তক বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয়ে খুঁটিনাটি সব সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি পড়া উচিত। তাঁহার গ্রন্থ আইনব্যবসায়ী ও স্ত্রীধন লইয়া যাঁহাদের কাজ করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় উপাদেয়।

আমরা প্রধানতঃ এখানে দেখিতেছি সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে। ব্যবস্থাপকদের পক্ষে তাহা জানা প্রয়োজন হইলেও আরও নানা দিকে তাঁহাদিগকে বিচার করিতে হয়।

মনুর (৯, ১১৮) সিদ্ধান্ত অনুসারে পুত্রেরা যাহা পাইবে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ প্রত্যেক ভাই কন্যাদের দিবে। মূলে আছে কন্যা। কুল্লুক অর্থ করিলেন, অনূঢ়া ভগিনী। অনূঢ়া ভগিনী না হইলেও যে অধিকারিণী হওয়া যায়, তাহা বুঝা যায় মনুর আর একটি শ্লোকে—সম্পত্তিবিভাগকালে ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যে ভাই মৃত বা সন্ন্যাসী হইবে তাহার অংশ লুপ্ত হইবে না। সহোদর ভ্রাতারা ভ্রাতা এবং সৌদর্য্যা ভগিনীরাও ঐ অংশ হইতে সমান ভাগ পাইবে—

ভ্রাতরো চ সংসৃষ্টা ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ। —৯, ১১২

যাজ্ঞবল্ক্য (২, ১১৭) বলিলেন, স্বামিদত্ত বা শ্বশুরদত্ত স্ত্রীধন না থাকিলে সম্পত্তি ভাগ করিবার সময় পত্নীদেরও সমান অংশ থাকা উচিত। পুত্রদের এক-চতুর্থাংশ কন্যা পাইবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাপ্যংশং সমং হরেৎ।

—ব্যবহারাধ্যায়, দায়বিভাগ প্রকরণ, ৮, ১২৩

এখানে মাতারও সমানাংশ দাবির কথা স্বীকৃত। বৃহস্পতি বলেন, মায়েরা সমান অংশ, কন্যারা চারি ভাগের এক ভাগ পাইবে—

সমাংশা মাতরস্তেষাং তুরীয়াংশশ্চ কন্যকাঃ।

বীরমিত্রোদয়ে ব্যবহারপ্রকাশের প্রমেয়নিরূপণ প্রকরণে দায়ভাগে সমবিভাগে পত্নীর অংশও স্বীকৃত হইয়াছে (দায়ভাগে সমবিভাগে পত্নীনামপ্যংশঃ—সপ্তম ভাগ, পৃ ৪৪৯)। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের সময়ে হয়তো পিণ্ড দিবার অধিকারিণী বলিয়া ক্রমে কন্যাদের একটু গৌরব বাড়িতে লাগিল। তাই মনু (৯, ১৩০) বলিলেন, আত্মার সমান পুত্র, পুত্রের সমান কন্যা। সেই আত্মা থাকিতে কেন অন্যে ধন হরণ করিবে।

পূর্বে নিয়ম ছিল, পুত্রহীন লোক কন্যাকে বিবাহ দিবার সময় এই নিয়মে নিয়ত করিয়া বিবাহ দিত যে এই কন্যার পুত্র তাহার মাতামহের বংশরক্ষা করিবে। মনু এই ভেদ তুলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, দৌহিত্র ও পৌত্রে কোনো ভেদ নাই—

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষোনোপপদ্যতে। —মনু, ৯, ১৩৯

কাজেই তখন হইতে নিয়ত ও অনিয়ত পুত্রিকা-পুত্রভেদ আর রহিল না।

মনু (৯, ১৩১) বলেন, অপুত্রের সমস্ত বিষয় দৌহিত্র পাইবে।

বিবাহকালে বরকন্যা একত্র বসিয়া যে ধন আশীর্বাদরূপে পায় তাহাই যৌতুক। মনু (৯, ১৯৪) যে ছয় প্রকার স্ত্রীধন বলিয়াছেন তাহা অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিকর্মে দত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত, ইহার মধ্যে তো যৌতুক নাই। অথচ মনুই (৯, ১৩১) বলেন, মায়ের যাহা যৌতুক তাহা কুমারী কন্যারই প্রাপ্য—

মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।

এই যৌতুক তবে কি? বীরমিত্র বলেন, বিবাহকালে বর কন্যা একত্র বসিলে বন্ধুদের কাছে উপহার স্বরূপে প্রাপ্তধন, তাহাই যৌতুক (বীরমিত্রোদয় ব্যবহারপ্রকাশের প্রমেয়নিরূপণ প্রকরণ, সপ্তম ভাগ, পৃ ৫৪৮)।

জীমূতবাহনের দায়ভাগ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত টীকা সহিত ভরতশিরোমণি মহোদয় ১৯০৭ সালে সংস্কৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখি, পুত্রহীন মৃতের পত্নী তাহার ভাগহারিণী হইবে। এইরূপ সনাভি সহোদর ভাই থাকিতেও পত্নীর অধিকার আছে বুঝা যায়—

তেষু সত্স্বপি পত্ন্যা ধনসম্বন্ধং যোধয়তি। —পৃ ১৯০

পুত্র না থাকিলে মাতা দায় পাইবেন। ইহাতে বৃহস্পতিরও সম্মতি আছে (ঐ, পৃ ২০৫, ২০৬)। বিষ্ণুশ্রুতি অনুসারে, পিতার অভাবে মায়ের অধিকার (ঐ, পৃ ২০৭)। পুত্র না থাকিলে কন্যা অধিকারী এই কথা মনু নারদ উভয়েরই সম্মত (ঐ, পৃ ১৯৪)। দুহিতাদের মধ্যে প্রথমে কুমারীরই দাবি, কুমারী কন্যা না থাকিলে বিবাহিত কন্যাও পাইবে (ঐ, পৃ ১৯৫)। এ বিষয়ে পরাশরই মত দিয়াছেন—

অপুত্রস্য মৃতস্য কুমারী রিকৃথং গৃহ্নীয়াৎ তদভাবে চোঢ়া। —ঐ, ১৯৫

কলিতে পরাশর-মতই সকলের উপরে— "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ"। তবু বিজ্ঞানেশ্বর কন্যাদের অধিকার সমর্থন করিতে গিয়া পরাশরের এই বচন উল্লেখ করেন নাই। অথচ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির বচনের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে কন্যাদের দায়াধিকার যে যাইতে বসিয়াছিল তাহার ক্রমে একটু উন্নতি দেখা গেল যাস্কের যুগে। তিনি কন্যাদের অধিকার-বিরোধী এবং অধিকার-সমর্থক, উভয় দলের কথা লইয়া বিচার করিয়া অপুত্রের কন্যাতে অধিকার দিয়া সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, নারীদের দায়াধিকার আর একটু ভাল হইয়াছে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকর্তাদের সময়েও নারীদের দায়ের অধিকার অনেকটা স্বীকৃত হইল। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে ভারতে নারীদের সামাজিক স্থান যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার আর উন্নতি হইল না। মনু নারীদের সম্বন্ধে "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু বিশেষোনাস্তি কশ্চন" (৩, ৫৬) বলিলেন। বলিলেন, যে গৃহে নারীরা সুখী সে গৃহে দেবতারা প্রসন্ন। স্ত্রীদের 'রত্ন'ও বলিলেন (২, ২৩৮), স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি থাকিলেই কল্যাণ (৩, ৬০)। তথাপি তিনি তাহাদিগকে সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিলেন না (৫, ১৪৭-১৪৯, ৯, ৩ ইত্যাদি)।

তাহার পর আসিল নিবন্ধকারদের যুগ। অর্থাৎ বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি আচার্যগণ নানা স্মৃতি তুলনা ও বিচার করিয়া দেশ ও কালধর্ম আলোচনা করিয়া যে সব ব্যবস্থাগ্রন্থ লিখিয়া গেলেন তাহাই নিবন্ধ। মাধবের লেখা "পরাশর" টীকাগ্রন্থ হইলেও তাহা নিবন্ধের মতই বৃহৎ এবং সেইরূপ বিচার ও আলোচনায় পূর্ণ এবং তাহা নিবন্ধেরই মত সর্বত্র মান্য। ইহা চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা।

বঙ্গদেশে দায়বিষয়ে চলে জীমূতবাহনের দায়ভাগ, আর অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই দায়বিষয়ে

মিতাক্ষরাই মান্য। মিতাক্ষরা রক্তের সম্বন্ধ দিয়াই দায়াধিকারের ক্রমব্যবস্থা করিয়াছেন। দায়ভাগে পিণ্ডাধিকার দিয়াই বিচার। অর্থাৎ মিতাক্ষরার মতে রক্তসম্বন্ধে যে যত ঘনিষ্ঠ তাহার তত বেশি দায়াধিকার। আর দায়ভাগে জীমূতবাহন দেখিয়াছেন, শ্রাদ্ধে এবং পিণ্ডে কাহার দাবি বেশি। "সপিণ্ড" কথাতে দুইই সূচিত হয়। পিণ্ডের অর্থ দেহও হয়। আসলে বৈদিক যুগের পর নারীগণের অধিকার যে ক্রমে একটু ভাল হইল তাহার কারণ এই পিণ্ড দিবার অধিকার।

যুক্তির দিকেও দেখা যায় নারীদের যদি স্বাধীনতা না-ই দেওয়া হয়, আর অভিভাবকের মৃত্যুর পর তাহারা যদি তাহার ধনাধিকারও না পায় তবে তাহাদের ভরণপোষণের কি হইবে? স্বাধীন উপার্জন অসম্ভব। কারণ স্বাধীনতা নাই। জ্ঞাতিরা পোষণ করিবেন, এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধান থাকিলেও হয়তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল জ্ঞাতিরা পোষণ করেন না। তাহাতে নারীদের পেটের জন্য নানা নৈতিক অধোগতি স্বীকার করিতেই হয়। কখনও যাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, সাধু স্বাধীন অর্জনের কোনো পথ যাহার পক্ষে উন্মুক্ত নাই, তাহার পক্ষে হঠাৎ বিষম দশায় পড়িলে অত্যন্ত হীনবৃত্তি স্বীকার ছাড়া গতি কি? এমন করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে পতিতাদের দলবৃদ্ধি হয়। বাল্যকালে কাশীতে দেখিয়াছি বহু বহু অভিজাতা নারী জ্ঞাতিদের ও পিতৃকুলের লোকের দ্বারা বৃত্তি-বঞ্চিত হইয়া কাশীতে দাসী বা পাচিকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ বা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুরবস্থায় পড়িয়া কেহ কেহ বা পতিতা হইতেও বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই নাম ধাম ও ইতিহাস কাশীতে লোকের জানা আছে। এই সব দুর্গতি আশঙ্কা করিয়াই হয়তো নিবন্ধকারগণের অনেকে নারীদের দায়াধিকার অল্পবিস্তর সমর্থন করিলেন। অবশ্য সেক্ষেত্রেও পুরুষদেরই প্রাধান্য সর্বাগ্রে দেওয়া হইল।

এখন তো প্রাচীন যুগের একান্নপ্রথা ভাঙিয়াই গিয়াছে। চাকুরির জন্য ভদ্রলোকেরা সবাই এখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই। এখন যদি চাকুরিস্থলে কেহ মারা যান তবে এক মুহূর্তে পরিবার নিরাশ্রয়। একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই এক মহাসমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে দায়ে পড়িয়া কত স্থানে কত দুর্গতি ও দুর্নীতি বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা বলা যায় না। অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা না করিলে আর গতি নাই। এখন যদি নারীদের দায়াধিকার সম্বন্ধে ভাল কোনো ব্যবস্থা না হয় তবে ভবিষ্যতে আরও কত দুর্গতি আছে, তাহা কে জানে?

নিবন্ধকারেরাও বোধ হয় এইসব কারণে পরবর্তী শ্রুতিতে "স্ত্রিয়ঃ অদায়াদীঃ" বলা সত্ত্বেও নারীদের দায়াধিকার সমর্থনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা হইতে জীমূতবাহনের দায়ভাগ ভাল। দায়ভাগে নারীদের অধিকার একটু বেশি দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীরের অপরার্ক (দ্বাদশ শতাব্দী) তো স্পষ্টই বলিলেন, শ্রুতির অভিপ্রায়, পুত্র থাকিলে কন্যারা পাইবে না। তবে পুত্র না থাকিলে কন্যারা পাইবে না কেন? স্মৃতিচন্দ্রিকায় (১৪ শতাব্দী) বলা হইল, এই কথাতে বিধবাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে— কুমারী এবং সধবারা দায়াধিকার পাইতে পারেন। যদিও ইহাতে বিধবার প্রতি সুবিচার করা হইল না তবু দেবণ্নভট্ট শ্রুতির অন্যায় ব্যবস্থাকে যতদূর সরাইয়া রাখা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। নিবন্ধকারেরা যতটা পারেন করিয়াছেন, কিন্তু এখন অবস্থাগতিকে এই বিষয়ে আরও সুবিচার ও সংস্কারের প্রয়োজন। শুধু সামাজিক স্বাধীনতা হইলেই তো হইবে না, আইনের বাধাও দূর করিতে হইবে। বোম্বাই প্রদেশে মিতাক্ষরা চলে। সে দেশে নারীদের অবরোধ নাই, কিন্তু মিতাক্ষরাতে নারীদের

দায়াধিকার সংকুচিত। বাংলাদেশে নারীদের অবরোধ আছে, অথচ বাংলাদেশেই নারীদের দায়াধিকার অপেক্ষাকৃত ভাল।

ধর্মব্যবহারে বেদ ও স্মৃতি মান্য হইলেও, সারা ভারতবর্ষে এখন লোকে সাধারণতঃ চলে নিবন্ধকারদের নির্দেশ অনুসারে। বিচারালয়ে সাধারণত বাংলাদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগ (১১শ শতাব্দী) রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব বা দায়ভাগতত্ত্ব (১৬শ শতাব্দী) চলে। রঘুনন্দন অনেকটা জীমূতবাহনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। জীমূতবাহন আসাম ও নেপালেও চলে। আসামের প্রামাণ্য নিবন্ধকার পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশও (১৬শ শতাব্দী) জীমূতবাহনের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার দায়-কৌমুদী বিবাদ-কৌমুদীর অন্তর্গত। তাহা ছাড়া ভবদেব ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার, শ্রীনাথ তর্কচূড়ামণি, রামভদ্র, অচ্যুতানন্দ, মহেশ্বর প্রভৃতির মতামতও বঙ্গদেশে সমাদৃত। মিথিলাতে বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা (১১শ শতাব্দী) খুবই সমাদৃত। মিতাক্ষরা বঙ্গ আসাম ও পূর্ব নেপাল ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। উড়িষ্যা, কাশী, বিহার, দক্ষিণ-ও উত্তর-ভারতে ইহা অতিশয় সমাদৃত। মিথিলাতে মিতাক্ষরা ছাড়া চণ্ডেশ্বরের বিবাদরত্নাকর (১৪শ শতাব্দী), বিবাদচন্দ্র (ঐ), বাচস্পতি মিশ্রের বিবাদ-চিন্তামণি (১৫শ শতাব্দী), ব্যবহার-চিন্তামণি (ঐ), কমলাকর ভট্টের বিবাদ-তাণ্ডব (১৭শ শতাব্দী) প্রভৃতিও খুব চলে। চণ্ডেশ্বরের কিছু স্বাধীন মত ছিল, আর বাকি সকলেই মিতাক্ষরার পথবর্তী। কাশী প্রদেশে মিত্র মিশ্রের (১৬শ শতাব্দী) বীর-মিত্রোদয় সমাদৃত। মিতাক্ষরা তো আছেই। নির্ণয়সিন্ধুও কাশীপ্রদেশে চলে। পাঞ্জাবে মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় চলে। কাশ্মীরে চলে অপরার্ক।

মহারাষ্ট্র, উত্তর-কর্ণাট, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে চলে মিতাক্ষরা, বিশ্বেশ্বর ভট্টের মদন-পারিজাত (১৪শ শতাব্দী), নীলকণ্ঠ ভট্টের ব্যবহার-ময়ূখ (১৭শ শতাব্দী)। নীলকণ্ঠ দেবণ্ণভট্টের রীতি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত দেবণ্ণ-ভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা (১২শ শতাব্দী)। বরদরাজকৃত ব্যবহারনির্ণয় রচনার যে কাল অধ্যাপক কাণে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। মাধবের পরাশর টীকাও এই অঞ্চলে অতিশয় সম্মানিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সরস্বতী-বিলাস (১৬শ শতাব্দী) উড়িষ্যায় রচিত হইলেও দক্ষিণ ভারতে বিলক্ষণ সমাদৃত।

এইসব গ্রন্থ ও আদালতের নজির দেখিয়া এখন বিচার চলে। সেজন্য মেন সাহেবের রচিত *Hindu Law*, কোলব্রুক রচিত *Digest*, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *Marriage and Stridhana* মোল্লা রচিত *Hindu Law* প্রভৃতি এখন মান্যগ্রন্থ।

সেই যুগেও নিবন্ধকারদের মধ্যে যাঁহারা নারীদের এই দুর্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া বেদপ্রমাণ লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি নাম উল্লেখযোগ্য। একজন হইলেন দক্ষিণভারতের বরদরাজ। তাঁহার ব্যবহার-নির্ণয় ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য সেই দেশেরই মাধবাচার্য-লিখিত দায়বিভাগ (১৪শ শতাব্দী)।

শ্রুতির 'নিরিন্দ্রিয়' বলিয়া স্ত্রীলোকেরা যে দায়াধিকারী হইবে না তাহার অর্থ যে একেবারে ভিন্ন, তাহা প্রথম দেখাইলেন ব্যবহার-নির্ণয়। মাধব তাঁহাকেই অনুসরণ করিলেন।

নারীদের বিবাহ প্রভৃতি সব বিষয়েই ব্যবহার-নির্ণয়ের বিচার দেখা উচিত। তাই ব্যবহার-

নির্ণয়ের একটু বিশদ পরিচয় পরবর্তী প্রকরণে দেওয়া যাইতেছে—উহাতে আগাগোড়া বরদরাজের বিচারপদ্ধতিই আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্যবহার-নির্ণয় ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত। তখন ভারতের বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। মুসলমানদের আক্রমণে দেশ ব্যস্ত। বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপিত তখনও হয় নাই, তবে হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষার জন্য এক বিরাট চেষ্টা চলিতেছিল। বরদরাজের গ্রন্থে সেই চেষ্টার পরিচয় পাই। যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে হিন্দুসমাজ শক্তিশালী হয় সেই প্রয়াসই ছিল বরদরাজের।

বরদরাজকৃত ব্যবহার-নির্ণয়

একই সংস্কৃতির মানুষ নানা কারণে কালে কালে নানা দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তখন তাহারা নিজেদের পুরাতন ঐক্যসূত্রটি বাঁচাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং বিচ্ছিন্ন নানা শাখার মধ্যেও আচারব্যবহারের ও ধর্মাচরণের সাম্য রক্ষা করিয়া নিজেদের ঐক্য বজায় রাখিতে চায়। তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ সংকট স্থলে কর্তব্য-সংশয় উপস্থিত হইলে যদি প্রাচীন সব বিধি-বিধানের সহায়তা পাওয়া যায় তবে মীমাংসার অনেক সুবিধা হয়। এইসব কারণেই বৈদিকযুগের উত্তরভাগে আমরা গৃহ্যসূত্র, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতির উদ্ভব দেখিতে পাই। এইসব সূত্রের দ্বারা নানা বিষয়ে প্রাচীন বিধিবিধান নানা শাখার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তখনকার দিনে নানা প্রদেশে বিচ্ছিন্ন ভারতের সমগ্র আর্য সংস্কৃতির ঐক্য-রক্ষার ও সংশয়-মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তাহার পর আরও বহুকাল চলিয়া গেল। নানা দেশে গিয়া নানা শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ সব নূতন আচার-ব্যবহার প্রবর্তিত হইল। তখন আরও অনেক বিষয়ে নূতন নূতন নির্দেশের প্রয়োজন হইল। তখনই হইল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি নানা স্মৃতির উদ্ভব। এই স্মৃতির মধ্যে কতকগুলি সর্বত্রই অতিশয় সম্মানিত। কতকগুলি স্মৃতি অন্যত্র সম্মানিত হইলেও দেশবিশেষেই বিশেষভাবে অনুসৃত। তাই দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে ও মুখ্যগৌণভেদে স্মৃতির সংখ্যা অনেক। সেইসব স্মৃতির মধ্যে মনুর সমাদর সর্বত্র। এইসব স্মৃতিকারেরাও নানাস্থান হইতে প্রাচীন মতামত সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের গ্রন্থের নাম সংহিতা। শ্রীযুত পি. ভি. কাণের গ্রন্থ দেখিলে নানাবিধ স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাই আনন্দাশ্রম মন্বাদি প্রধান প্রধান স্মৃতি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত গৌণ ২৭টি স্মৃতি একত্রে ১৯০৫ সালে মুদ্রিত করেন।

এইসব কারণে স্মৃতি অনেক। ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে স্থানগত ও কালগত প্রয়োজন অনুসারে কখনও কখনও আচার-ব্যবহারের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঝোঁক বা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

স্মৃতির পরবর্তী কালে দেখা গেল যে, সংসার-যাত্রার নানা সংশয়স্থলে নানা স্মৃতির তুলনা করিয়া আশ্রয় না নিলে এবং নানা প্রমাণ একত্র করিয়া বিচার না করিলে সব সময় ঠিক চলে না। এই জন্য পরবর্তী যুগে হইল সব ধর্ম-নিবন্ধের উদয়। বাংলাদেশে যেমন রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র সংকলিত করিয়া যুক্তি ও বিচার করিয়া তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সমন্বিত নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তেমনি ভারতের নানা স্থানে নানা যুগে সব নিবন্ধকারদের উদয় হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রধানত রঘুনন্দনেরই সমাদর। অন্যান্য বহু প্রদেশে চলে বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা। তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহারকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরাশরসংহিতার ব্যবহারকাণ্ডের উপর রচিত হইল মাধবভাষ্য। মিথিলাতে চণ্ডেশ্বর ঠক্কুরের বিবাদ-রত্নাকর ও উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের সরস্বতী-বিলাস সমাদৃত। দক্ষিণ-ভারতে বরদরাজকৃত ব্যবহার-নির্ণয়, দেবণ্ণভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা এবং মাধবাচার্যের ব্যবহার-মাধবীয়ই সমধিক আদৃত।

দায়াদি বিষয়ে নারীদের অধিকারের কথা প্রাচীন নানা নিবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। তবে ব্যবহার-নির্ণয় এই বিষয়ে যেমন উদারভাবে দেখিয়াছেন তেমন সকলে দেখেন নাই। পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের এই বিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা থাকিলে বরদরাজ তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে সেইসব নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতামত অতিশয় স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কাজেই নারীদের দায়বিচারে এই গ্রন্থখানির ভালরূপ আলোচনা প্রয়োজন।

দক্ষিণদেশে এই গ্রন্থের প্রভূত সমাদর। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্ দেশে ব্যবহার-মালা নামে ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার রচিত হইয়াছিল। তাঞ্জোরাধিপতি মহারাজা সরফোজীর (১৭৯৮-১৮৩৩) নামে সংকলিত ব্যবহার-প্রকাশের মূলভিত্তিও বরদরাজকৃত ব্যবহার-নির্ণয়। পরব্রহ্ম শাস্ত্রীর ব্যবহার-দর্পণও বরদরাজকৃত ব্যবহার-নির্ণয়েরই সংক্ষিপ্ত রূপ। এইসবই বরদরাজীয় গ্রন্থের সমাদরের প্রমাণ।

মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রে বরদরাজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার যুক্তি ও বিচারও ছিল খুব গভীর অথচ স্বাধীন। তাঁহার বুঝিবার ও বুঝাইবার রীতিও অনন্যসাধারণ। ব্যবহার-মাতৃকা ও ব্যবহারের বিষয়ে আইনের মূলনীতি ও আইনের বিধি সম্বন্ধে তিনি খুব বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহার-বিষয়ে তাঁহার ব্যবহার-নির্ণয় গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে বিদ্যা ফলাইবার চেষ্টা একটুও দেখা যায় না। সহজ ও অসন্দিগ্ধ ভাষায় সোজাসুজি মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি দেখাইতেই বরদরাজের আগ্রহ। মাধবীয় গ্রন্থে এই গুণটি দুর্লভ। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার উপর বরদরাজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মিতাক্ষরাকে অনুসরণ করিলেও মিতাক্ষরা বরদরাজীয় ব্যবহার-নির্ণয়ের মত প্রাঞ্জল নহে। অনেক সময় মিতাক্ষরার বিপুল বিচারজালের মধ্যে আসল কথাটিই চাপা পড়িয়া যায়।

মনু ও বৃহস্পতির স্মৃতির উপর বরদরাজ বেশি নির্ভর করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিলেও তিনি যুক্তিকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। তাই গ্রন্থারম্ভশ্লোকেই তিনি বলিয়াছেন, যুক্তি ও স্মৃতির সহায়তায় আমরা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি—

নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽস্মাভির্যুক্তিস্মৃত্যনুরোধতঃ।

অথচ স্মৃতি-চন্দ্রিকার দেবণ্ণভট্ট বলেন, সবই আমার শাস্ত্রানুসারে লেখা, নিজের মতামত তাহাতে কিছুই ফলাই নাই (সংস্কারকাণ্ড, ২য় শ্লোক)। যুক্তি বাদ দিয়া শুধু শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিতে গেলে ধর্মহানি হয় ইহাই বৃহস্পতির মত। এই মতের সঙ্গে বরদরাজের মনের মিল থাকায় তিনি বৃহস্পতির এই বাণীটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ। —পৃ ১৩৯

দক্ষিণ-ভারতের দায়ভাগ ও নারীদের অধিকারের কথা বলিতে গিয়া বাংলাদেশের দায়ভাগ ও নারীদের অধিকারের কথাও একটু আলোচনা করা উচিত।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের বিষয়ে জীমূতবাহনের দায়ভাগই প্রধান। জীমূতবাহন ছিলেন বাঙালি এবং একাদশ শতাব্দীর লোক। দায়ভাগ তাঁহার বৃহত্তর গ্রন্থ ধর্মরত্নেরই অংশবিশেষ। বাংলাদেশের নিয়মের সঙ্গে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, মিথিলার ঠিক মিল নাই। সে সব দেশে মিতাক্ষরারই সমাদর। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই মিতাক্ষরা, তাহাও একাদশ শতাব্দীর।

অনেকে মনে করেন, দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরাতে নারীদের দায়াধিকার বেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। বিবাহাদির জন্য অনূঢ়া কন্যা পিতৃধনের অংশ পাইতে পারেন ইহাই মিতাক্ষরার মত। তাহাদের ঠিক দায়াধিকার নাই। মিতাক্ষরার মতে, নারীদের দ্বারা ধর্মতঃ উপার্জিত ধনেও স্বামীরই অধিকার। তাহাও স্ত্রীধন নহে। স্ত্রীধন একটি পারিভাষিক শব্দ। অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, অন্বাধেয়, যৌতুক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধনই স্ত্রীধন। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে পাওয়া ধনও স্ত্রীধন হইতে পারে, ইহা কোথাও কোথাও দেখা যায়। স্ত্রীধন ছাড়া আরও কোনো কোনো ধনে বা খোরপোষ পাইতে নারীর অধিকার আছে, কিন্তু তাহাতে নারীর দান-বিক্রয়াদির পূর্ণাধিকার নাই। স্ত্রীধনে নারীরই অধিকার। স্বামী তাহা হইতে কিছু যদি লইতে বাধ্য হন তবে তাহা পরিশোধ করিতেও বাধ্য। তবে আপৎকালে স্বামী অসমর্থ হইলে স্বতন্ত্র কথা।

দায়ভাগ বা মিতাক্ষরার মতামত অনেকেই জানেন। দেশপ্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধাদি আলোচনা করিয়া সেই বিষয়ে শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বহুযত্নলিখিত 'হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার' গ্রন্থখানির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা পড়িয়া দেখিলে সকলেই উপকৃত হইবেন। তাহার বিশেষ আলোচনা না করিয়া বরদরাজকৃত ব্যবহার-নির্ণয়ের মতামতই এখানে দেখানো যাইতেছে।

ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিজাতীয়া পত্নী ও তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে তাঁহাদের মধ্যে ধনবিভাগ কিভাবে হইবে তাহা বরদরাজ মনু হইতে (৯,১৫২) উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৪২৮)। বৃহস্পতির ব্যবস্থাও বরদরাজ দেখাইয়াছেন (ঐ)। বিষ্ণু বলেন, সর্বত্রই আনুলোম্যে জাত, পিতার একপুত্র পিতার সমগ্র ধন পাইবে—

সর্বত্রানুলোম্যেন জাতঃ পিতুরেকঃ পুত্রঃ পিত্র্যং সর্বং ধনমর্হতি।—পৃ ৪২৯

দেবলও এই কথাই বলেন—

আনুলোম্যৈকপুত্রস্তু পিতুঃ সর্বস্বভাগ্‌ভবেৎ।

তবে অনুলোমজ হইলেও শূদ্রাতে জাত পুত্রের পক্ষে এই বিধি চলিবে না—

শূদ্রায়াং জাতপুত্রব্যতিরিক্তবিষয়মিদম্‌॥　—ঐ

বৃহস্পতি বলেন, দ্বিজাতির যদি মাত্র শূদ্রকন্যাতে এক পুত্র হয় তবে সেই পুত্র অর্ধভাগ পাইবে—

দ্বিজাতেঃ শূদ্রায়াং জাতস্ত্বেকপুত্রোঽর্ধভাগিতি বৃহস্পতিঃ।　—ঐ

বিষ্ণুও বলেন—

দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্ধহরঃ।—ঐ

দেবল বলেন, ব্রাহ্মণের যদি শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান থাকে তবে পিতার মরণে সে এক-তৃতীয়াংশ ও শ্রাদ্ধাধিকারী, সপিণ্ড সকুল্যেরা দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে—

নিষাদ একপুত্রস্তু বিপ্রস্য দ্ব্যংশভাগ্ ভবেৎ।
দ্বৌ সপিণ্ডঃ সকুল্যো বা স্বধাদাতা তু সংহরেৎ ॥—পৃ ৪৩০

শূদ্রের যদি দাসীগর্ভজাত পুত্র থাকে তবে সেও পিতার ধনের অংশ পাইবে—

দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যচ্ছূদ্রস্য সুতোভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥—পৃ ৪৩১

যাজ্ঞবল্ক্যও তাহা সমর্থন করেন—

জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ।—ঐ

এইখানে বলা উচিত যে 'অংশ' ও 'দায়' এক কথা নয়। দায়ে নির্দিষ্ট ভাগ অভিপ্রেত, অংশ শব্দে অনির্দিষ্ট কিয়ৎপরিমাণ ভাগমাত্র বুঝায়। তাহা ভরণপোষণ বা খোরপোষ এই দুইয়েরই বহির্ভূত। যাহার দায়ে বা অংশে কোনো দাবি নাই সেও খোরপোষ পাইতে পারে। যথা, প্রতিলোমজাত পুত্রদেরও ভরণপোষণ দিতে পিতা বাধ্য, এই কথা গৌতম বলেন—

প্রতিলোমানামপি সংব্যবহার্যাণাং সুতানাং শুশ্রূষূণাং।
জনকেন জীবনং দেয়মিত্যাহ গৌতমঃ ॥—পৃ ৪৩০

নারীদের দায়াধিকারের কথাপ্রসঙ্গে দেখা যায় বরদরাজ খুবই উদার ও যুক্তিযুক্তভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতির মতে তিনি বলেন, মায়েরা পুত্রেরই ভাগানুসারে ভাগহারিণী হইবেন—

মাতরঃ পুত্রভাগানুসারিভাগহারিণ্য ইতি।—পৃ ৪২৯

বরদরাজ বলেন, কেহ কেহ পত্নীদের ভাগ স্বীকার করেন না—

তত্র পত্নী নির্ভাগেতি কেচিৎ।—পৃ ৪১৪

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, স্বামী বা শ্বশুর যদি নারীকে স্ত্রীধন না দিয়া থাকেন তবে পুত্রদের সমান অংশ পত্নীকে দেওয়া উচিত—

যদি কুর্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা ॥—পৃ ৪১৫

যদি পিতা সব পুত্রদের ভাগ সমান করিয়া দেন তবে সজাতীয় পত্নীদেরও সমান ভাগ দেওয়া উচিত। যদি স্বামী বা শ্বশুরের দেওয়া কিছু স্ত্রীধন নারীরা পাইয়া থাকেন তবে যতটা দিলে পুত্রদের সঙ্গে তাঁহাদের ভাগ সমান হয় ততটা দেওয়া কর্তব্য—

যদা স্বেচ্ছয়া পিতা সর্বানেব সুতান্ সমভাগিনঃ করোতি, তদা স্বজাতীয়পত্ন্যশ্চ পুত্রসমাংশভাজঃ কর্ত্তব্যাঃ। যাসাং পত্নীনাং ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বা স্ত্রীধনং দত্তং, দত্তে চ স্ত্রীধনে তদপেক্ষয়া ভাগপরিপূরণং কর্ত্তব্যম্।—পৃ ৪১৫।

মিতাক্ষরাতেও ঠিক এই বিধানই দেখা যায় (২, ১১৫)। কাজেই মিতাক্ষরাও এই মতই সমর্থন করেন (ঐ)।

পিতার জীবৎকালে বিভাগ হইলে মাতাদের ভাগ সমান হইবে। এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পিতা মৃতেও মাতারা সমাংশভাগিনী হইবেন।

এবং জীবদ্বিভাগে সমাংশভাগিত্বং মাতৄণামুক্ত্বা পিতরি মৃতেঽপি সমাংশভাজো ভবন্তীত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—ব্যবহার-নির্ণয়, পৃ ৪১৫

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন, পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগকালে মাতাও সমান অংশ পাইবেন।

পিতুরূর্ধ্বং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশং সমং হরেৎ।—ঐ

নারদও বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর মাতা সমাংশভাগিনী। বৃহস্পতির মতেও

সমাংশভাগিনী মাতা পুত্রাণাং স্যান্মৃতে পতৌ।—ঐ

তদভাবে তু জননী তনয়াংশসমাংশিনী।—পৃ ৪১৬

ব্যাসও এই কথা সমর্থন করেন এবং পিতামহীকেও মাতার মত ভাগাধিকার দেন—

অসুতাস্ত[১] পিতুঃ পত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

পিতামহশ্চ সর্বাস্ত মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

কাজেই মায়েদের মত পিতামহীদেরও ভাগাধিকার থাকা উচিত—

পিতামহ্যা অপি মাতৃবদ্ভাগকল্পনং যুক্তমিতি।—ঐ

বিষ্ণু বলেন, মাতা এবং অবিবাহিতা কন্যা পুত্রভাগানুসারী ভাগহারী—

মাতরঃ পুত্রভাগানুসারিভাগহারিণ্যঃ অনূঢাশ্চ দুহিতরঃ।—ঐ

বৃহস্পতি বলেন, মায়ের ভাগ সমান, কন্যার ভাগ একচতুর্থাংশ—

সমাংশা মাতরস্তেষাং তুরীয়াংশা চ কন্যকা।—ঐ

কাত্যায়নও অবিবাহিতা কন্যার এক-চতুর্থাধিকারই সমর্থন করেন—

কন্যকানাং ত্বদত্তানাং চতুর্থো ভাগ ইষ্যতে।

ভ্রাতৄণাং চ ত্রয়ো ভাগঃ সমং ত্বল্পধনে স্মৃতম্॥

সামান্য সম্পত্তি হইলে কন্যা ও পুত্রদের ভাগ সমানই হইবে।

মনু বলেন, ভাইরা আপন আপন ভাগ হইতে কন্যাকে ভাগ দিবেন। না দিতে চাহিলে ভ্রাতারা পতিত হইবেন—

স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্ত কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।

স্বাৎস্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ॥—ঐ

শঙ্খ-লিখিত বলেন, দায়ভাগকালে কন্যা আপন ভাগের সহিত নিজ অলংকার ও বৈবাহিক স্ত্রীধনও পাইবেন—

বিভজ্যমানে দায়াদ্যে কন্যালংকারং বৈবাহিকং স্ত্রীধনং চ কন্যা লভেত।—পৃ ৪১৭

পৈঠীনসি বলেন, কন্যা এই সঙ্গে বৈবাহিক স্ত্রীধনও পাইবেন—

কন্যা বৈবাহিকং স্ত্রীধনং চ লভেত।—ঐ

বোধায়ন বলেন, মায়ের সাম্প্রদানিক অলংকারও কন্যারই প্রাপ্য।

পুত্রাভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে বরদরাজ বহু প্রাচীন বিধি সংকলিত করিয়া বিচার করিয়াছেন (পৃ ৪৪৮-৬১)। স্ত্রীধনের দায়াধিকার বিষয়ে যে অনেকের ভাল সম্মতি নাই

১ 'সমুতা' পাঠও আছে।

তাহা তিনি দেখাইয়াছেন এবং সেইসব প্রতিকূল মত খণ্ডন করিয়া আপন মতটি স্থাপন করিয়াছেন। বরদরাজ বলেন, অনেকে মনে করেন, পুত্রাভাবেই কন্যারা পিতার সম্পত্তি পাইতে পারেন—

যানি পুনর্দুহিতৄণাং ধনপ্রতিপাদকানি বাক্যানি তানি পুত্রিকাবিষয়াণি।—পৃ ৪৫৬

আবার অনেকে মনে করেন, স্ত্রীগণের দায়সম্বন্ধ নাই—

অন্যে তু স্ত্রীণাং ন দায়সম্বন্ধঃ।

কারণ শ্রুতিতে (আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে) আছে—"তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ"।

এইখানে বরদরাজ স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বিস্তর প্রতিকূল বচন একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ এমন সব বচন, যাহাতে নারীদের উত্তরাধিকার নাই। কোনো কোনো পুরাণবাক্যে আছে, স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবাকে যে খোরাক-পোষাকমাত্র দিতে হইবে, তাহাও দিবে বিশেষ ভাবে হিসাব করিয়া। ব্যাসবচন আছে—

বসনাশনবাসাংসি বিগণয্য ধবে মৃতে।—পৃ ৪৫৬

কোনো কোনো স্মৃতিতে আছে, সব দ্রব্যই যজ্ঞার্থ উৎপন্ন। যজ্ঞে নারীর অধিকার নাই, তাই তাহাদের উত্তরাধিকারও নাই। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন নারীরা পাইতে পারে—

যজ্ঞার্থং দ্রব্যমুৎপন্নং তত্র নাধিকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

অরিকৃথভাজস্তাঃ সর্বা গ্রাসাচ্ছাদনভাজনাঃ॥—পৃ ৪৫৬-৫৭

বৃহস্পতি বলেন, যৌবনে বিধবা হইলে নারী কর্কশা হইয়া যায়। তাই জীবনযাপন করিবার মত তাহাকে সামান্য কিছু খোরপোষ দিলেই চলে—

বিধবা যৌবনস্থাচেন্ নারী ভবতি কর্কশা।

আয়ুষঃ ক্ষপণার্থং তু দাতব্যং জীবনং তদা॥—পৃ ৪৫৭

মনুর মতে অপুত্রা বিধবা সৎপথে থাকিলে ভরণপোষণমাত্র পাইতে পারে। প্রজাপতি বলেন, বিধবার খোরাকী বলিয়া মাত্র আঢ়কপ্রমাণ শস্য তাহাকে দিবে—

আঢ়কং ভর্তৃহীনায়া দাতব্যং বিধবাশনম্।—ঐ

তাহার প্রাপ্য অন্নার্থ একপ্রস্থ চাউল। অপরাহ্ণে ইন্ধন ও একপ্রস্থ চাউল তাহাকে দিবে, এইরূপ কথাও আছে—

অন্নার্থং তণ্ডুলপ্রস্থমপরাহ্ণে তু সেন্ধনম্।—ঐ

বরদরাজ বলেন, এই সব কথায় বুঝা যায় ব্যবস্থাপকদের মতে জ্ঞাতিদের কাছে বিধবা খোরাকী মাত্র পাইতে পারেন। দায়াধিকার বিধবার নাই (পৃ ৪৫৭)। কিন্তু সেই সব কথায় কোনো যুক্তি নাই।

বিষ্ণুর মতকে প্রমাণ করিয়া বরদরাজ বলেন, পুত্রহীন পরলোকগতের ধন পত্নীতেই যাইবে, পত্নী না থাকিলে দুহিতা, দুহিতার অভাবে পিতা অধিকারী—

অনপত্যস্য প্রমীতস্য ধনং পত্ন্যাভিগামি। তদভাবে দুহিতৃগামি। তদভাবে পিতৃগামি। তদভাবে মাতৃগামি ইত্যাদি। —পৃ ৪৪৮

বৃহস্পতি বলেন, ভার্যাসুতবিহীন পরলোকগতের ধনাধিকারিণী মাতা বা তদাজ্ঞায় ভ্রাতা—

ভার্যাসুতবিহীনস্য পুরুষস্য মৃতস্য চ।

মাতা রিকৃথহরা জ্ঞেয়া ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়া॥—ঐ

বৃদ্ধ মনু বলেন, অপুত্রা সাধ্বী-পত্নী স্বামীর পিণ্ডদানের এবং সম্পূর্ণ অংশের অধিকারিণী—

পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেত চ। —ঐ

এখানে বরদরাজ একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেন। শ্রুতি প্রভৃতি অনুসারে স্বামী ও স্ত্রী দুইই এক সত্তারই দুই অর্ধভাগ। কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীতে স্বামী অনুবর্তন করেন (continues to exist)। তাই স্বামীর অভাবে স্ত্রীর যে অধিকার তাহাকে উত্তরাধিকার বলা উচিত নহে। স্ত্রীর মধ্যে যে স্বামী এখনও বর্তিয়া আছেন। এ যেন ব্যাঙ্কে Payable to either or Survivor—অর্থাৎ এখানে উভয়েরই যুক্তাধিকার। একজনের অভাবে আর একজনের মধ্যে সেই অধিকার চলিতেই থাকিবে। কাজেই ইহা উত্তরাধিকার নহে। ইহাতে অধিকারের অনুবৃত্তি (continuation) মাত্র দেখা যায়। শ্রুতির প্রমাণ দিয়াই এই বিচারের আরম্ভ।

কাত্যায়নের মতেও[১] অব্যভিচারিণী পত্নী স্বামীর ধনহারিণী, তদভাবে তাঁহার কন্যা যদি সে তখনও অনূঢ়া থাকে—

পত্নী ভর্তুর্ধনহরী পত্নী যা স্যাদব্যভিচারিণী।

তদভাবে তু দুহিতা যদ্যনূঢ়া ভবেৎ তদা॥ —পৃ ৪৫০

দেবল বলেন, পিতৃদ্রব্য বৈবাহিক ধন কন্যাদের দিতে হইবে। অপুত্রদের ধর্মজা কন্যা পুত্রবৎ পিতৃধনের অধিকারিণী—

কন্যাভ্যশ্চ পিতৃদ্রব্যং দেয়ং বৈবাহিকং বসু।

অপুত্রকস্য স্বং কন্যা ধর্মজা পুত্রবদ্ধরেৎ॥ —পৃ ৪৫১

মনু-নারদ উভয়েই বলেন, পুত্র যেমন আত্মসম, দুহিতাও তেমনি পুত্রসমা। কাজেই আপনার ও পুত্রকন্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। সেই আপনি বাঁচিয়া থাকিতে, অর্থাৎ পুত্রকন্যা থাকিতে, কেন অন্যে ধন হরণ করিবে—

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।

তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥ —ঐ

প্রসঙ্গবশে এই শ্লোকটির উল্লেখ পূর্বেও করা হইয়াছে। মনুও (৯,১৩০) বলেন—

যথৈবাত্মা তথাপুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।

নারদও বলেন, পুত্র কন্যা উভয়ই সমান। কাজেই পুত্রাভাবে দুহিতাই পুত্র। পুত্রকন্যা উভয়ই পিতার বংশ রক্ষা করে—

---

১ প্রজাপতিকে উদ্ধৃত করিয়া বরদরাজ বলেন, ভার্যা অর্ধাঙ্গিনী, পুণ্যাপুণ্যফলভাগিনী, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর ধন কেন অন্যে পাইবে?

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ। শরীরার্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা। যস্য নোপারতা ভার্যা দেহার্ধং তস্য জীবতি। জীবত্যর্ধে শরীরেঽর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ॥ —পৃ ৪৪৯

শ্রুতির মতেও স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে এক পূর্ণস্বরূপেরই দুই অংশ। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হন তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর মধ্যে তিনিই বর্তিয়া থাকেন (continues to exist), কাজেই তখনও উত্তরাধিকারের প্রশ্নই উঠে না। কারণ তখনও অধিকারীর আর এক অংশ বাঁচিয়া বর্তিয়াই আছেন। সুতরাং তখন ধন অধিকারী বলিয়াই সেই অর্ধাঙ্গের প্রাপ্য। উত্তরাধিকারী বলিয়া নহে। পত্নী না থাকিলে,তখন সন্তানদের উত্তরাধিকারের কথা। সেখানেও পুত্র অপেক্ষা কন্যার দাবি কম কেন হইবে?

বৃহস্পতিও বলেন, পত্নী স্বামীর ধনহারিণী, পত্নীর অভাবে দুহিতা। ভর্তুর্ধনহরী পত্নী তাং বিনা দুহিতা স্মৃতা।—ঐ। পিতামহও বলেন অপুত্র স্বামীর পত্নীই স্বামীর ভাগহারিণী।—অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণী। —ঐ

পুত্রাভাবে তু দুহিতা তুল্যসন্তানদর্শনাৎ।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভৌ পিতুঃ সন্তানকারকৌ॥ —ঐ

বৃহস্পতি বলেন, পত্নী স্বামীর উত্তরাধিকারিণী। পত্নী না থাকিলে দুহিতাই শাস্ত্রবিহিত উত্তরাধিকারিণী। অঙ্গ-অঙ্গ হইতে সম্ভূতা কন্যা তো মানুষের পক্ষে পুত্রেরই সমান। তাহার পিতৃধন কেন অন্য লোক হরণ করিবে ?

ভর্তুর্ধনহরী পত্নী তাং বিনা দুহিতা স্মৃতা।
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা নৃণাম্।
তস্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্যঃ কথং গৃহ্ণীত মানবঃ॥ —পৃ ৪৫১-৫২

দুহিতা না থাকিলে দৌহিত্রেরা পাইবেন ইহাই বরদরাজের মত—

দুহিত্রভাবে দৌহিত্রাঃ। —পৃ ৪৫২

পুত্র উপার্জন করিতে পারেন। পিতৃধন না হইলেও তাঁহার চলে। কন্যার উপার্জনক্ষমতা বা ধন যদি না থাকে তবে পিতৃধন না পাইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহার দাবি বরং বেশি। পতির জীবৎকালে স্ত্রীর অঙ্গে যে অলংকার থাকে তাহাতে পতিকুলস্থ লোকের কোনো দাবি নাই। দাবি করিলে তাঁহারা পতিত হন। মনুর এই মত বরদরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে॥ —পৃ ৪৬৮

ইহাতে কাত্যায়নের যে সমর্থন তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে—

স্ত্রীণাং ভর্তৃকুলাল্লব্ধং পিতুঃ কুলত এব বা।
ভূষণং ন বিভাজ্যং স্যাৎ জীবনে ন চ যোজয়েৎ॥ —ঐ

পতির বা পিতার কুলের কাছে প্রাপ্ত সব অলংকারই স্ত্রীর নিজস্ব। জ্ঞাতিগণ তাহার দ্বারা সেই নারীর খোরপোষের দাবি চুকাইতে পারিবেন না।

আপস্তম্ব যদিও বলিয়াছেন, কেহ কেহ কিন্তু ভার্যার অলংকারকেও জ্ঞাতিধন বলেন—

অলংকারো ভার্যায়া জ্ঞাতিধনং চেত্যেকে। —পৃ ৪৬৯

এইখানে বরদরাজ নারদের মতের দ্বারা এই বৃথা দাবি নিরস্ত করিয়াছেন। নারদ বলেন, স্বামীর দ্বারা প্রীতিদত্ত অলংকার স্বামীর মৃত্যুর পরেও সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর। তাঁহারই ভোগ-ত্যাগের দান-বিক্রয়ের পূর্ণাধিকার। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই—

প্রীতিদত্তস্যালংকারস্য স্বত্বে প্রাপ্তে স্থাবরেঽপবাদমাহ নারদঃ
ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ॥
সা যথা কামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্ বা স্থাবরাদৃতে॥ —ঐ

কাজেই স্থাবর সম্পত্তিতে নারদের মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বত্ব হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেক শাস্ত্রকারের মতে প্রীতিদত্ত স্থাবরেও স্ত্রীরই স্বত্ব হয়—

প্রীতিদত্তং স্থাবরং দাতরি মৃতে স্ত্রিয়া ন স্বং ভবতি ইত্যর্থঃ। কেচিৎ তু প্রীতিদত্তং স্থাবরমপি স্বমেব। —ঐ

এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বিশেষ বিধি বরদরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষে, ধর্মকার্যে, ব্যাধিতে, রাজার হাতে বন্দী হইলে যদি স্বামী স্ত্রীধন হইতে কিছু নেন তবে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাহা পুনরায় আদায় করা অনুচিত—

দুর্ভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সংপ্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্রা নাকামো দাতুমর্হতি ॥ —ঐ

এইখানে কাত্যায়ন বলেন, স্ত্রীধনে স্বামী-পুত্র-পিতা-ভ্রাতা কাহারই কোনো অধিকার নাই। যদি ইঁহাদের মধ্যে কেহ বলপূর্বক তাহা ভোগ করেন তবে তিনি দণ্ডনীয় এবং সুদ সহ তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য—

নৈব ভর্তা নৈব সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ।
যদি হ্যন্যতরো হ্যেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্ বলাৎ
সবৃদ্ধিকং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডং চৈব সমাপ্নুয়াৎ ॥—পৃ ৪৬৯

তবে কাত্যায়ন বলেন, যদি ইঁহাদের কেহ ঠেকায় পড়িয়া স্বত্বাধিকারিণীর রাজিখুশিমত আজ্ঞানুসারে কিছু ভোগ করেন তবে তাহাও ধনবান হইলেই সেই মূলধন তিনি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। ব্যাধিত ব্যসনার্ত বা ঋণের দায় দেখিয়া যদি স্বত্বাধিকারিণী আপন খুশিতে তাহাকে কিছু সাহায্য করিয়াও থাকেন তবে পরে সেই স্ত্রীধন আপন ইচ্ছায় তাঁহারই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত—

তদেব যদনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতিপূর্বকম্।
মূলমেব স দাপ্যঃ স্যাৎ যদাসৌ ধনবান্ ভবেৎ ॥
ব্যাধিতং ব্যসনার্তং চ ধনিকৈর্বোপীড়িতম্
জ্ঞাত্বা নিসৃষ্টং যৎ প্রীত্যা দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া তু সঃ ॥ —পৃ ৪৭০

দেবল বলেন, বৃত্তি আভরণ শুল্কলাভ সব সমেতই স্ত্রীধন। স্ত্রীই তাহা ভোগ করিবেন। বিপদ্‌গ্রস্ত না হইলে পতির তাহাতে কোনো দাবি নাই। যদি বিনা কারণে পতি তাহা ভোগ করেন তবে স্ত্রীকে সুদসমেত ফিরাইয়া দিতে তিনি বাধ্য। তবে পুত্রের পীড়ার প্রতিকারে স্ত্রীধন পাওয়া যাইতে পারে—

বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভং চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।
ভোক্ত্রী তৎস্বয়মেবেদং পতি র্নার্হত্যনাপদি ॥
বৃথা মোক্ষে চ ভোগে চ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাৎ সবৃদ্ধিকম্।
পুত্রার্তিহরণে চাপি স্ত্রীধনং ভোক্তুমর্হতি ॥ —ঐ

এই বিষয়ে ইহার পরেও বরদরাজ (পৃ ৪৭০-৭১) নানা শাস্ত্রকারের মতামত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীধনের বিষয়ে নানা দিক দিয়া বিচার করিয়াছেন।

স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি নারীদের অধিকার বিষয়ে বরদরাজ অতিশয় স্পষ্টভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুত্র-পত্নী-কন্যাদের অসদ্ভাবেই আত্মীয়েরা ধন পাইতে পারেন ইহাই শাস্ত্রকারগণের অনেকের মত—

যদিদং সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমুক্তং তৎপুত্র-পত্নী-দুহিতৃণামভাবে ইতি কেচিৎ। —পৃ ৪৭৬

বৃহস্পতির মতে, কেহ মারা গেলে বা প্রব্রজ্যা লইলে সে যদি অপুত্র ও অপত্নীক হয় তবেও তাহার ভাগ লুপ্ত হইবে না। সোদর তাহার ভাগ পাইবেন। ভগিনীও পাইবেন॥—

যা তস্য ভগিনী সা তু ততোঽংশং লব্ধুমর্হতি। —ঐ

নারদবচনেও ইহা সমর্থিত (পৃ ৪৭৭)। বরদরাজ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতামত আলোচনা করিয়া বলেন, ভার্যা না থাকিলেই আত্মীয়েরা ধনাধিকারী হইতে পারেন—

ভার্যাঽসম্ভাব এব সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমিতি গম্যতে। —ঐ

যে সব স্মৃতিকার যোষিৎ, বিধবা, নারী স্ত্রী, ভার্যা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীর জন্য ভরণপোষণ মাত্র ব্যবস্থা করেন। আর যে সব স্মৃতিতে পত্নী শব্দের প্রয়োগ, তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়াধিকার পত্নীকেই দেন। ইহাই বৃদ্ধদের মত—

ইতি নারদবচনাৎ ভার্যাসম্ভাব এব সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমিতি গম্যতে। সত্যম্, পত্নী দায়াযোগ্যা স্ত্রীষু নারদবচনমিত্যবিরোধঃ। যাসু স্মৃতিষু যোষিদ্বিধবা নারী স্ত্রী ভার্যেত্যাদিশব্দ প্রয়োগঃ, তাসু তাসাং ভরণমেব। যাসু স্মৃতিষু পত্নীশব্দপ্রয়োগঃ তাসু দায়গ্রহণমিতি বৃদ্ধাঃ। —ঐ

অর্থাৎ তখনকার দিনেও বৃদ্ধদের জানা ছিল, একদল ব্যবস্থাপক স্ত্রীর দায়াধিকার ভাল করিয়া না মানিলেও আর একদল তাহা মানেন। যাঁহারা স্ত্রীদের অধিকার মানেন না তাঁহারা স্ত্রীকে বুঝাইতে 'যোষিৎ' 'বিধবা', 'নারী', 'ভার্যা', প্রভৃতি হীনতাবাচক শব্দ ব্যবহার করেন। আর যাঁহারা অধিকার মানেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ববাচক 'পত্নী' শব্দ ব্যবহার করেন। বরদরাজ শেষোক্ত দলেরই মত সমর্থন করেন। তাঁহার মতে স্ত্রী সম্মানার্হা, 'পত্নী'-পদবাচ্যা।

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রজাপতি প্রভৃতি যে সব শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে জ্ঞাতিদের কাছে খোরপোষের ব্যবস্থামাত্র মানেন, দায়াধিকার মানেন না, তাঁহাদের সঙ্গে বরদরাজ একমত নহেন। তাঁহারা বলেন জ্ঞাতিরাই দায়াধিকারী। বরদরাজ অতি স্পষ্ট ভাবে বলেন, এই সব কথা অতিশয় অন্যায় ও একেবারে যুক্তিহীন।—অপুত্রায়া বিধবায়া জ্ঞাতিভরণমাত্রমেব ন দায়প্রাপ্তিঃ। দায়প্রাপ্তিস্তু জ্ঞাতীনামেব মন্যন্তে। এতৎ সর্বময়ুক্তম্।—পৃ ৪৫৭। মনু যে বলেন, পিতা হরেদপুত্রস্য রিক্থং ভ্রাতর এব বা। ইহাতে বরদরাজ বলেন, এখানে 'এব' শব্দের দ্বারা পিতা হইতে ভ্রাতার প্রাথম্য বুঝায় মাত্র, স্ত্রীর স্বত্ব নাই এইরূপ বুঝায় না, কারণ ইহাতে ক্রমপ্রতিপাদক শব্দের অভাব রহিয়াছে—ক্রমপ্রতিপাদকশব্দাভাবান্ ন প্রথমং পত্নীব্যুদাসঃ। এবকারাৎ পিত্রপেক্ষয়া ভ্রাতুঃ প্রাথম্যম্।—পৃ ৪৫৮। তথা অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ। এই মনুবচনেও ক্রমপরশব্দাভাববশতঃ পত্নীর দাবি অস্বীকৃত হইল না।

ইতি মনুবচনেঽপি ক্রমপরশব্দাভাবান্ ন পত্ন্যা ব্যুদাসঃ। —পৃ ৪৫৮

বরদরাজ বলেন, শঙ্খ-লিখিতোক্ত এবং দেবল বচনে যদিও সোদর ভ্রাতাদেরই প্রথম ধনগ্রহণ বুঝা যায় তবু, নানা শাস্ত্রকারদের বচন আলোচনে বুঝা যায়, সাধ্বাচারা পত্নীর সকলধনগ্রহণ প্রথম বহুবচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। সেই সব বচনের সঙ্গে সুসংগত করিয়াই শঙ্খ-লিখিতোক্ত এবং দেবলোক্ত বচনের ব্যাখ্যান করা উচিত। শঙ্খলিখিতদেবলবচনয়োঃ যদ্যপি সোদরভ্রাতৃণাং প্রথমং ধনগ্রহণং প্রতীয়তে, তথাপি[১]

১ এই তর্কের মাঝখানে বরদরাজ অনেক শাস্ত্রকারদের মতের যে নিষ্কর্ষ দিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যাউক—

সাধ্বাচারায়াঃ পত্ন্যাঃ সকলধনগ্রহণং প্রথমং বহুভিঃ বচনৈঃ প্রতীয়ত ইতি, তেষামানুগুণ্যেন তয়োর্বচনয়োঃ ব্যাখ্যানং কর্তব্যম্। —পৃ ৪৫৮-৫৯

সর্ব মতেই প্রমাণিত হয়, সাধ্বী পত্নী স্বামীর সকল ধন পাইতে পারেন। শঙ্খ-লিখিত ও দেবলের বচন ইহার সহিত সুসংগত করিয়া বুঝিতে হইবে—ইহাই বরদরাজের সিদ্ধান্ত।

তবে এখন বিচার করিতে হইবে শ্রুতির বচনে ইহাতে কোনো বাধা আছে কিনা। পূর্বে যে শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—"তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ" তাহার কি করা যায়? ইহাতে যদি নারীদের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধই হইয়া থাকে তবে পূর্বোক্ত সব ব্যবস্থাপক মুনিগণ কখনই তাঁহাদের গ্রন্থে নারীদের উত্তরাধিকারব্যবস্থা দিতে পারিতেন না। তবে আপস্তম্বধর্মসূত্রোক্ত বচনটির যথার্থ তাৎপর্য কি? এই বচনে দেখা যায়, তাই নারীরা "নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ"। এখন 'নিরিন্দ্রিয়' কথার প্রকৃত অর্থ কি?

এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে বীর্য বুঝায় না, কারণ শাস্ত্রে নারীদের বীর্যবত্ত্ব দেখা যায়। তাই সেই ভাবে স্ত্রীগণকে নিরিন্দ্রিয় বলা যায় না। ইহাতে বুঝা যায় এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে সোমই বুঝাইতেছে,……… "স্ত্রীণামপি বীর্যবত্ত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ স্ত্রিয়ো 'নিরিন্দ্রিয়া' ইতি বক্তুং ন শক্যত ইতি—ইন্দ্রিয় শব্দঃ সোমপর এব যুক্তঃ" —পৃ ৪৫৯। কাজেই নির্বীর্য বলিয়াই স্ত্রীগণের দায়াধিকার নাই ইহা বলা অসংগত। বীর্য না থাকিলে তখনকার দিনে ভূসম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হইত না ইহা সত্য। কিন্তু এই মত যদি এখনো চালানো যায় তবে আমাদের দেশে এখন পুরুষদেরও অধিকার নিষিদ্ধ হয়। কারণ এখন এদেশে পুরুষদেরই বা বীর্য কই? তবে আসল কথা নিরিন্দ্রিয় অর্থে নির্বীর্য নহে। বরদরাজ ইন্দ্রিয়ের অর্থ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে তাহাতে "সোমপীথ" বা সোমপান বোঝায়— ইন্দ্রিয়ং বৈ সোমপীথঃ ইতি ইন্দ্রিয়শব্দস্য সোমে দর্শনাৎ।—পৃ ৪৫৯। সোমপানের অধিকারও যজ্ঞবিশেষেই নারীর নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্বে দেখানো গিয়াছে এককালে নারীরা সোমপানেরও অধিকারী ছিলেন এবং যজ্ঞের সোম পান করিতেন। রামায়ণে দেখা যায়, কৌশল্যা ছিলেন দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী। কুন্তী বলেন, আমি বিধি অনুসারে সোমপান করিয়াছি—পীতঃ সোমো যথাবিধি।—মহাভারত, আশ্রমিক, ১৭,১৭। যাহা হউক, সোমপানাধিকার না থাকিলেই যে স্বামীর ধনে অধিকার থাকিবে না ইহা কোনো যুক্তিযুক্ত কথা নহে।

ইন্দ্রিয় অর্থে বরদরাজ কেন-যে সোম ধরিয়াছেন তাহার প্রমাণও তিনিই দিয়াছেন। সোমার্থে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আমরাও বহু স্থলে পাই। ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডলে, ৮৪ সূক্তের প্রথম ঋকে 'ইন্দ্রিয়ম্' অর্থে সায়ণ "সোমপানোৎপন্নম্ প্রভূতম্ সামর্থ্যম্" ধরিয়াছেন। সায়ণমতে, ঋগ্বেদে ১,১১১,২; ১,১০৭,২; ৫,৩১,৩; ৬,২৫,৮ ঋকে 'ইন্দ্রিয়' অর্থ ধন ঐশ্বর্য। ঋগ্বেদে ৯,২৩,৫ ঋকে 'ইন্দ্রিয়' অর্থ ইন্দ্রিয়বর্ধক রস (ইন্দ্রিয়বর্ধকং রসম্) অর্থাৎ সোমরস। ৮,৯৩,২৭ ঋকে ইন্দ্রিয়ং অর্থে সায়ণ বলেন "বীর্যবন্তং সোমম্"। ১০,৩৬, ৮ম ঋকে মূলেই আছে, "সুরস্মিং সোমম্ ইন্দ্রিয়ং যমীমহি"। ১০,১১৩, প্রথম ঋকে মূলেই আছে

"অনপত্যস্য প্রমীতস্য ধনং পত্ন্যভিগামী" (অর্থাৎ অপুত্র মৃতের ধন পত্নীতে যাইবে)—ইতি বৈষ্ণববচনাৎ, "ভার্যাসুতবিহীনস্য"—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ, "অপুত্রা শয়নং ভর্তুঃ"—ইতি বৃদ্ধমনুবচনং, "আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ"—ইতি প্রাজাপত্যবচনাৎ, "ভর্তুর্ধনহরী পত্নী"—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ, "অপুত্রস্যাথ কুলজা"—ইতি কাত্যায়নবচনাৎ, "কুলেষু বিদ্যমানেষু"—ইতি পিতামহবচনাৎ, "অসুতস্য প্রমীতস্য"—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ, "পত্নীদুহিতরশ্চ"—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।—পৃ ৪৫৮

"ইন্দ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য"। ৮,৩,২০ ঋকে "ইন্দ্রিয়ো রসঃ"—সায়ণ অর্থ করেন "ইন্দ্রেণ সেব্যো রসঃ"। ৯,৮৬,১০ "ইন্দ্রিয়ো রসঃ" অর্থে সায়ণ করেন, "ইন্দ্রেণ জুষ্টো রসঃ"। ১০,৬৫,১০ ঋকে "ইন্দ্রিয়ং সোমম্" মূলেই আছে। সায়ণ অর্থ করেন "ইন্দ্রজুষ্ট সোম"। ৯,১০৭,২৫ ; ১০,১১৬,১ম ঋকেও তাই। অথর্ববেদের ১৯,২৭,১ ঋকে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ সায়ণ করেন, ইন্দ্রসৃষ্ট বা ইন্দ্রজুষ্ট। সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ অভিধানও ইন্দ্রিয় অর্থে প্রথমেই রস ও সোম ধরিয়াছেন। তাহার পরে আসিতেছে অন্য সব অর্থ।

'ইন্দ্রিয়' শব্দের আসল এবং আদি অর্থই হইল যাহা 'ইন্দ্রযোগ্য', 'ইন্দ্রজুষ্ট', 'ইন্দ্রবিষয়ক'। সোমরসই ইন্দ্রের প্রিয়। শক্তি ও বীর্যও ইন্দ্রের প্রিয়। আমাদের তথাকথিত ইন্দ্রিয়গুলিই সেই শক্তি ও বীর্য প্রকাশের উপায়। সেই হিসাবে বরদরাজ 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ করিতে কষ্টকল্পনা মাত্রই করেন নাই। তাঁহার গৃহীত অর্থই আদিম অর্থ এবং তাহা সর্বভাবে শ্রুতিসংগত। তাহা না হইলে তাঁহার মত লোক এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতেন না।

তবু যে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে দায়াধিকারে নারীদের অধিকার নাই এই কথা বলা হইয়াছে, সেখানেও বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ সেই সেই স্থলে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। তাই বরদরাজের চরম সিদ্ধান্ত হইল, সুশীলা পত্নীর সর্বধনগ্রহণ যুক্তিযুক্ত—

সাধুবৃত্তযুক্তায়াঃ পত্ন্যাঃ সকলধনগ্রহণং যুক্তমেব। —পৃ ৪৬১

এই কথাটি আরও স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে ঐ গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র আর একটি অনুবন্ধে (পৃ ৫৩৭)। সেখানে বরদরাজোক্ত শাস্ত্রসিদ্ধ রীতিতে রিক্‌থগ্রাহীদের অর্থাৎ দায়াধিকারীদের প্রাধান্য-অনুসারে পর-পর ক্রম দেখানো হইয়াছে,— (১) ঔরস পুত্র, (২) পত্নী ; (৩) দুহিতা, (৪) অনূঢ়া কন্যা, (৫) দৌহিত্র, (৬) মাতা, (৭) পিতা, (৮) সহোদর, (৯) তৎপুত্র, (১০) ভিন্নোদর ভ্রাতা, (১১) তৎপুত্র, (১২) সমানোদক জ্ঞাতি, (১৩) সগোত্র, (১৪) আত্মবান্ধব, (১৫) পিতৃবান্ধব, (১৬) মাতৃবান্ধব, (১৭) শিষ্য, (১৮) সব্রহ্মচারী, (১৯) শ্রোত্রিয়। ৪৫০ পৃষ্ঠায় যাজ্ঞবল্ক্য রিক্‌থগ্রাহীদের আর একটি ক্রম দিয়াছেন। সেখানেও দেখা যায়,

পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা—ইত্যাদি।

সর্বভাবেই দেখা গেল, ঔরসপুত্র না থাকিলে প্রথম দাবিই হইল পত্নীর। আর পত্নী স্বামীরই অংশ বলিয়া তাঁহার দাবিকে উত্তরাধিকার না বলিয়া স্বামীর অধিকারেরই অনুবৃত্তি বা continuity বলা যায়। শ্রুতি বা যুক্তি অনুসারেও পতির বিত্তে পত্নীর অধিকারে উত্তরাধিকারের প্রশ্নই ওঠে না।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর পটভূমিকা

শ্রীসুকুমার সেন

পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী খোঁজে রূপ—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর ভিত্তি। "সুন্দর" শব্দটি আসিয়াছে বৈদিক "সুনর"—উত্তম নর—হইতে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে রূপক আরো পরিষ্কার হয়। বিদ্যাপতি শব্দের মূল অর্থও এই রূপকের সাহায্যে সুগম হয়। বিদ্যার স্বামী চতুর পুরুষ। তাই চতুর বা জ্ঞানী অর্থে বিদ্যাপতি শব্দ চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এখন কোন প্রয়োগ দেখা না গেলেও এককালে যে বিদ্যাপতি শব্দটি চতুর বা জ্ঞানী অর্থে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। "বিদ্যাপতি"-র একটি প্রাকৃত রূপ "বিদ্দপই" হইতে ফারসী-আরবী "বিদ্‌পই" হইয়াছিল। ফারসী-আরবী-সিরীয় প্রাচীন সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদে মূল লেখকের নাম বিদ্‌পই পিলপই বা পিল্‌পে।

বর্তমান সহস্রাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর দুইটি পৃথক্ রূপ উত্তরাপথে প্রচলিত হইয়াছিল। একটি কাহিনীর মূলে শিক্ষা অথবা বিচার উপলক্ষ্যে কবি-পণ্ডিত গুরুর এবং কলাবিৎ-রাজকন্যা ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার। অপর কাহিনীর মর্ম হইতেছে চতুর (প্রাকৃত "চউর", বাঙ্গালা "চোর") কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজবালা-প্রণয়িনীর গোপন মিলন। এই কাহিনীটিই বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকার মূলে আছে।[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের বিদ্যাসুন্দর-আখ্যায়িকার প্রধান অবলম্বন এই কাহিনীই। তবে সেই সঙ্গে প্রথম কাহিনীর ইঙ্গিত পাই বিদ্যার্থী সুন্দরের পড়ুয়া-রূপে এবং নিশীথে রাজান্তঃপুরের বিজন কক্ষে বিদ্যা-সুন্দরের প্রহেলিকা-বিলাসে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, নায়কনায়িকার মধ্যে হেঁয়ালিবিচার অপভ্রংশ কাব্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পুরানো বাঙ্গালা কাব্যে, চণ্ডীমঙ্গলে এবং ধর্মমঙ্গলে, এই বিশিষ্টতার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে কবি রাজশেখর-সূরির লেখায় প্রথম কাহিনীর যে রূপটি পাইতেছি তাহা বলি যথাসম্ভব মূল অনুসরণ করিয়া।

উজ্জয়িনীতে ছিলেন এক দিগম্বর জৈন সাধু, নাম বিশালকীর্তি। তাঁহার শিষ্য মদনকীর্তি। সে পূর্ব পশ্চিম উত্তর এই তিন দিগ্‌ভাগের সকল তার্কিককে জয় করিয়া "মহাপ্রামাণিকচূড়ামণি" এই আখ্যা অর্জন করিয়া নিজগুরুর পাট উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিল এবং গুরুকে বন্দনা করিল। লোক-পরম্পরায় শিষ্যের খ্যাতি আগেই গুরুর কর্ণগোচর হইয়াছিল। সাক্ষাতে পাইয়া তিনি মদনকীর্তিকে খুব প্রশংসা করিলেন। মদনকীর্তি খুব খুশি হইল।

কিছুদিন পরে মদনকীর্তি গুরুর অনুজ্ঞা চাহিল দক্ষিণদেশ বিজয় করিবার জন্য। গুরু বলিলেন, দক্ষিণদেশে যাইও না, ও দেশ ভোগনিধি, ওখানে গেলে জ্ঞানবান্ তপস্বীও তপোভ্রষ্ট হয়। গুরুর এবংবিধ নির্দেশ না মানিয়া বিদ্যামদমত্ত মদনকীর্তি নিজের শিষ্য ও লোকজন লইয়া মহারাষ্ট্রবাসী পণ্ডিতদের জয় করিয়া অবশেষে কর্ণাটদেশে পৌঁছিল এবং সেখানে বিজয়পুর রাজধানীতে কুন্তীভোজ রাজাকে অসামান্য

১ চৌরপঞ্চাশিকার "চৌর" চোর নয়, চতুর-নায়ক।

কবিত্বশক্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল। রাজা তাহাকে প্রাসাদের কাছে বাসা দিয়া বলিলেন, আমার পূর্বপুরুষদের প্রশস্তি করিয়া একখানি কাব্যরচনা কর। মদনকীর্তি বলিল, আমি প্রত্যহ পাঁচ শত শ্লোক রচনা করিতে পারি মুখে মুখে, কিন্তু অত শ্লোক লিখিয়া উঠিতে পারি না, আমাকে এমন একজন লোক দাও যে রচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকগুলি লিখিয়া লইবে। রাজা বলিলেন, আমার কন্যা মদনমঞ্জরী শ্লোক লিখিয়া যাইবে পর্দার আড়ালে থাকিয়া। মদনকীর্তি সম্মত হইল এবং এইভাবে কাব্যরচনা চলিল কিছুদিন ধরিয়া।

মদনকীর্তির সুকণ্ঠের শ্লোকআবৃত্তি শুনিতে শুনিতে একদিন মদনমঞ্জরীর মনে হইল, ইহার রূপও নিশ্চয়ই সুন্দর হইবে, পর্দার আড়াল হইতে ইহাকে দেখা যায় কিরূপে। একটা উপায় করি, ব্যঞ্জনে নুন্ বেশি দিতে বলি। মদনকীর্তিও বিদুষী সুস্বরা রাজবালাকে চাক্ষুষ করিতে উৎসুক হইয়াছে। পরদিন ভোজনে বসিয়া ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য অনুভব করিয়া মদনকীর্তি বলিয়া উঠিল, "অহো লবণিমা"।[২] রাজপুত্রী উত্তর করিল, "অহো নিষ্ঠুরতা"। এই উপলক্ষ্যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হইলে উভয়ের মধ্যে মর্যাদাময়ী যবনিকার ব্যবধান সরিয়া গেল। রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মদনকীর্তি বলিয়া উঠিল,

নিরর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম্।

রাজকন্যা শ্লোক পূরণ করিয়া উত্তর দিল,

উৎপত্তিরিন্দোরপি নিষ্ফলৈব দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন॥

অতঃপর কাব্যরচনা আর পূর্বের মত দ্রুত অগ্রসর হয় না। ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন অপরাহ্নে রাজা বলিলেন, আজ রচনার পরিমাণ এত কম কেন ("কো হেতুরদ্য স্তোকং নিষ্পন্নম্")। মদনকীর্তি চালাকি করিয়া রচনার মধ্যে দুই একটি করিয়া কঠিন শ্লোক প্রক্ষেপ করে। সে উত্তর করিল যে, আমার রচনার মানে না বুঝিলে আমি লিখিতে দিই না। আজিকার শ্লোকগুলি বুঝিতে আপনার কন্যার অনেক কষ্ট ও অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে, তাই আজ গ্রন্থকর্ম অল্পই হইয়াছে। রাজা বুঝিলেন, গতিক ভালো নয়, "শঠোত্তরমেবেদং দৃশ্যতে", একদিন দেখিতে হইতেছে ইহারা কি করে। একদা রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া একাকী মদনকীর্তি ও মদনমঞ্জরীর কাব্যরচনাকক্ষের এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। প্রথমে আসিল মদনকীর্তি, তাহার পর মদনমঞ্জরী। রাজকন্যা প্রবেশ করিলে মদনকীর্তি এই শ্লোকটি বলিল পূর্বদিনের প্রণয়কলহের অবসান বাঞ্ছা করিয়া,

সুভ্রু ত্বং কুপিতেত্যপাস্তমশনং ত্যক্তা কথা যোষিতাং দূরাদেব নিরাকৃতাঃ সুরভয়ঃ স্বর্গন্ধধূপাদয়ঃ।
রাগং রাগিণি মুঞ্চ ময্যবনতে দৃষ্টে প্রসীদাধুনা সত্যং ত্বদ্‌বিরহে ভবন্তি দয়িতে সর্বা মমাঙ্গা দিশঃ॥

অর্থাৎ—অয়ি শোভন ভ্রূশালিনি, তুমি কুপিতা হইয়াছ বলিয়া পান-ভোজন ছাড়া হইয়াছে, নারীর কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে, সুরভি স্বর্গীয় গন্ধধূপ ইত্যাদি দূর করা হইয়াছে। হে রাগিণি, রাগ ছাড়, অবনত আমাকে দেখিয়া এখন প্রসন্ন হও। তোমার বিরহে, হে প্রিয়ে, আমার সর্বাঙ্গ যথার্থই বিস্রস্ত হইতেছে।

আড়াল হইতে এই শ্লোক শুনিয়া রাজা উভয়ের দৌঃশীল্য বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মদনকীর্তিকে তখনই ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, পণ্ডিত, এই নবীন পদ্যটি কি—"সুভ্রু ত্বং কুপিতেত্যপাস্তমশনম্" ইত্যাদি। দিগম্বর পণ্ডিত বুঝিল রাজা ব্যাপার বুঝিয়াছেন,

২ "লবণিমা" শব্দটির এখানে দুইটি অর্থ—লবণত্ব (অর্থাৎ লবণাধিক্য) এবং লাবণ্য।

দেখিয়াছেন এবং অপরাধীকে পাকড়াইয়াছেন। কিন্তু যাহা হউক একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। একটু ভাবিয়া লইয়া মদনকীর্তি বলিল, দেব, দুই দিন হইতে আমার চোখের পীড়া হইয়াছে। তাই এই ছুটকা শ্লোকটি পড়িয়াছিলাম চোখের প্রতি অনুনয় করিয়া। এই প্রস্তাবনা করিয়া মদনকীর্তি তৎক্ষণাৎ শ্লোকটির নেত্র-পক্ষে ব্যাখ্যা করিল।[৩] তাহার কবিত্বে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রাজা অন্তরে তুষ্ট হইলেন কিন্তু অকার্যকরণের জন্য তাঁহার রোষ গেল না। তিনি ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভৃত্যদের বলিলেন, "বধ্নীত রে অমুং কুকর্মকারিণম্ ঘাতয়ত চ"। মদনকীর্তিকে তাহারা তখনই বাঁধিয়া ফেলিল।

রাজকন্যার কানে এই খবর পৌছিলে সে নিজে এবং তাহার বত্রিশজন সখী ছুরি হাতে লইয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, যদি আমার এই দয়িতকে ছাড়িয়া দেন তবে ভাল। যদি না ছাড়েন তবে চৌত্রিশজনের হত্যার পাপ আপনার হইবে,—এক দিগম্বর সাধুর হত্যা, আর তেত্রিশজন যুবতীর হত্যা। রাজা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, দেব, আপনিই রাজকন্যাকে দিগম্বরের সঙ্গে জোটাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দোষ দিবেন কাহার? দিগম্বরকে মুক্ত করুন এবং তাঁহার হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করুন। রাজা তাহাই করিয়া রেহাই পাইলেন। মদনকীর্তি রাজ্যের অংশভাগী হইল। দিগ্‌বিজয়ের ধন সে শ্বশুরকে দিল। ব্রহ্মচর্যব্রত ত্যাগ করিয়া মদনকীর্তি সংসারী হইল।

উজ্জয়িনীতে গুরু বিশালকীর্তি শিষ্যের এই পরিণতি শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া এক বিচক্ষণ ছাত্রকে মদনকীর্তির কাছে পাঠাইলেন এই শ্লোকটি দিয়া,

বিরমত বুধা যোষিৎসঙ্গাৎ ক্ষণভঙ্গুরাৎ কুরুত করুণাপ্রজ্ঞামৈত্রীবধূজনসঙ্গমম্।
ন খলু নরকে হারাক্রান্তং ঘনস্তনমণ্ডলং ভবতি শরণং শ্রোণীবিম্বং ক্বণন্মণিদাম বা॥

অর্থাৎ—হে পণ্ডিত, তোমরা ক্ষণস্থায়ী নারীসঙ্গসুখ হইতে বিরত হও এবং করুণা-প্রজ্ঞা-মৈত্রী-রূপ বধূজনের সঙ্গ কর। নরকে হারভূষিত ঘনস্তনমণ্ডলের ও কলকিঙ্কিণীমণ্ডিত শ্রোণীবিম্বের ভরসা নিশ্চয়ই নাই।

ছাত্র গিয়া মদনকীর্তিকে এই শ্লোক শুনাইয়া বলিল, "গুরুভির্বোধ্যমানোঽসি বুধ্যস্ব মা মুহঃ"। মদনকীর্তি উত্তরে এই তিন শ্লোক গুরুর কাছে পাঠাইয়া দিল,

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসৌ গুরুর্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

প্রিয়াদর্শনমেবাস্তু কিমন্যৈর্দর্শনান্তরৈঃ।
প্রাপ্যতে যেন নির্বাণং সরাগেণাপি চেতসা॥

অর্থাৎ—প্রিয়ার দর্শনই আমার হউক, অন্য দর্শনে কাজ কি। প্রিয়ার দর্শনে অনুরাগরঞ্জিত চিত্তেও নির্বাণপ্রাপ্তি হয়।

সন্দষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ॥

শুনিয়া গুরু নীরব রহিলেন।

---

৩ নেত্র-পক্ষে ব্যাখ্যা তেমন শক্ত নয়। "রাগিণি" অর্থে রাঙা ধরিলেই হইল। আসলে ইহাই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ। রাজকন্যা পক্ষে "রাগ" ও "রাগিণি" অর্থে ক্রোধ ও ক্রুদ্ধা বুঝিতে হইবে। রাগ শব্দের এই অর্থ অর্বাচীন।

বিহ্লন ও তাঁহার নামিত চৌরপঞ্চাশৎ কবিতা লইয়া যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে তাহারই একটি বিশিষ্ট ও প্রাচীন রূপের পরিচয় দিতেছি।[৪] এটিকে বিদ্যাসুন্দর-আখ্যানের দ্বিতীয় কাহিনীর আদর্শ বলা চলে।

কনকাদ্রির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষ্মীমন্দির। সেখানে রাজা ছিলেন মদনাভিরাম, রানী মন্দারমালা। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান সুন্দরী যামিনীপূর্ণতিলকা সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিল, কিন্তু লেখাপড়ায় নয়। রাজা কন্যার জন্য ভালো শিক্ষক খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে বিহ্লনকে পছন্দ হইল। বিহ্লন উত্তম কবি এবং ষড়্‌ভাষাভিজ্ঞ। বিহ্লন কুষ্ঠীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, রাজকন্যা ভয় করিত অন্ধকে। শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতা না হয় সেইজন্য রাজকুমারীকে বলা হইল তাহার শিক্ষক অন্ধ আর বিহ্লনকে জানানো হইল রাজকুমারী কুষ্ঠরোগিনী। শিক্ষক-ছাত্রীর মাঝখানে রহিল পর্দার আড়াল। একদা বসন্তপূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাজকন্যা তাহার শিক্ষককে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া এই দুই শ্লোক পড়িতে শুনিল,

নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশির্নৈমাশ্চ তারা নবফেনখণ্ডাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো নায়ং কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ॥

ইন্দুমিন্দুমুখি লোকয় লোকং ভানুভানুভিরমুং পরিতপ্তম্।
বীজিতুং রজনিহস্তগৃহীতং তালবৃন্তমিব নালবিহীনম্॥

অর্থাৎ—অয়ি ইন্দ্রমুখি, ভানুর কিরণে সন্তপ্ত জগৎকে বীজন করিবার জন্য রজনীর হাতে নেওয়া দণ্ডবিহীন তালপাতার পাখার মত চন্দ্রকে দেখ।

শুনিয়া রাজকন্যা পর্দা সরাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর গল্প চৌরপঞ্চাশৎ-কাহিনীর পরিচিত সরণী অনুসরণ করিয়াছে।

---

৪ রহস্যসন্দর্ভ প্রথম পর্ব একাদশ খণ্ড।

ডাকঘর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডাকঘর নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ইহার রচনা-কাল। ইহা গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বে লিখিত। খেয়া কাব্য রচনার সময় হইতে বলাকা-ফাল্গুনী রচনার মধ্যবর্তী পর্বটা কবিজীবনের একটা স্বভাববিরুদ্ধ সময়; এমন সময় তাঁহার জীবনে ইহার পূর্বেও আসে নাই, আর পরেও নয়। কবিজীবনের এই স্বভাববিরুদ্ধতা সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থে আমি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তৎকালে প্রমাণাভাবে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি নাই।

সম্প্রতি তাঁহার যে-সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই পর্বের উপরে আলোক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সব চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, এই পর্বে উৎকট একটা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কবিকে পাইয়া বসিয়াছিল। এমন উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক সুস্থ মনের লক্ষণ নয়; রবীন্দ্রনাথের তো নয়ই, কারণ এমন সুস্থ, স্বাভাবিক, বলিষ্ঠ দেহ-মন কদাচিৎ দেখা যায়। তবে এই সাময়িক স্বভাববিরুদ্ধতার কারণ কি? যথাকালে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব—কিন্তু আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত না হইলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎপূর্বে কবি-লিখিত চিঠিপত্রের সাক্ষ্য শোনা যাক।

> "এখানে [শিলাইদহে] আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেক দিন পাই নি। এই জিনিসটি খুঁজতেই আমি দেশদেশান্তরে ঘুরতে চাচ্ছিলুম কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণ ভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে আমি জীবনের ঝঞ্ঝাটে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছুকাল থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বাণ মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে— কিন্তু যস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যুঃ,— মৃত্যুও যাঁর অমৃতও তাঁরি ছায়া— এতদিনে আবার সেই অমৃতের পরিচয় পাচ্ছি।···১৯১২"— চিঠিপত্র ২, পৃ ২১

পরবর্তী একটি পত্রখণ্ডে এই উৎকট মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার অধিকতর পরিচয় আছে।

> "কিছুদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে উৎপাত দেখা দিয়েছে সেটা একটা শারীরিক ব্যামো। সে কথা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে।— তার দুটো কারণ আমার মনে আসছে।
>
> "প্রথম, কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous breakdown হয়েছে তার সন্দেহ নেই। যখন আমার কানে এবং মাথার বাঁ দিকে ব্যথা করতে লাগল তখন বুঝেছিলুম সেটা ভালো লক্ষণ নয়। যে কোনো কাজ করতুম অত্যন্ত জোর করে করতে হত। আর মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি অকারণে লেগেই ছিল।
>
> "তার পরে Younan ডাক্তার এর জন্যে যে ওষুধ দিলেন সেটা হচ্ছে Aurum, খুব high dilution। এটা কেন দিলেন আমি বুঝতে পারি নি। কানাইবাবু বলেছিলেন, এতে আমার অনিষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস এই ওষুধের ফলে আমার কানের ব্যথা সেরে গেল বটে কিন্তু এই

ওষুধের যে mental effect সে আমাকে চেপে ধরেছে— ওর মানসিক লক্ষণ নিচে লিখে দিচ্ছি—

"Melancholy, with inquietude and desire to die.— Irresitible impulse to weep. Sees obstacles everywhere. Hopeless, suicidal; desperate. Great anguish. Excessive scruples with conscience. Despair of oneself and others. Grumbling, quarralsome humour. Alternate Peevishness and cheerfulness.

"মেটিরিয়া মেডিকাতে যা লিখেছে এর সব লক্ষণই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয় নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তার পরে যখন রামগড়ে ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করেছে যে, বিদ্যালয়, জমিদারি, সংসার, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করি নি— আমার উচিত ছিল নিঃসংকোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা ; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনের মধ্যে এই রকম সুগভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বলেই আমি যাদের খুব ভালোবাসি তাদেরই সম্বন্ধে যত রকম মন্দ এবং অকল্যাণ আমার কল্পনায় বারম্বার তোলাপাড়া করেছে, কোনোমতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি নি।…

"এ রকম একান্ত মূঢ়ের মতো মনের ভাব আমার কোনোকালেই ছিল না। আমি বরঞ্চ স্বভাবতই নিরুদ্বিগ্ন স্বভাবের। তোদের কারো জন্যে কখনো মিছিমিছি ভাবি নি। সেইজন্যই শিশুকাল থেকে তোদের এত অজস্র স্বাধীনতা দিতে পেরেছি, কিন্তু এখন এমন অদ্ভুত ভীরুতা মনে এসেছে যে তুই হয়তো বাইসিকেলে করে একটু কোথায় গেলে আমার ভয় হয় তোর বিপদ হবে— দেরি করে এলে মনে হয় কিছু একটা বিপদ হয়েছে। আমি এমন নির্লিপ্ত এবং নিশ্চিন্ত স্বভাবের অথচ আমার এমন দশা হঠাৎ কি করে হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না। আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উলটো চালে চলছি…। সেজন্যে নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে।…কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর মোহজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব। আজ আমি আমার এই ব্যাধিগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ স্বভাবকে কতকটা যেন বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছি বলেই Materia Medica খুলে সেই Aurum ওষুধের লক্ষণ মিলিয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়েছি— একেবারে সম্পূর্ণ মিলে গেছে। আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম— জীবনে আমার লেশমাত্র

তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তই যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলুম। এ রকম একেবারে উলটো মানুষ যে কি রকম করে হতে পারে এ আমার একটা নতুন experience— সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘন জাল। তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব— এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।…এই অবস্থায় যা কিছু করেছি তার জন্যে আমি দায়ী নই। … আমার জন্যে তোরা আর ভাবিস নে। আমি কিছুদিন সুরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই— মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোন সন্দেহ নেই! [১৯১৫]।"—চিঠিপত্র ২, পৃ ২৭-৩২

চিঠিখানা ডাকঘর রচনার পরবর্তী, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ডাকঘর রচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই মনোভাব কাটিয়া যায় নাই; যে মনোভাব হইতে ডাকঘরের উদ্ভব, তাহা তখনো চলিতেছিল। ইহার আগের চিঠিখানার তারিখ ১৯১২। এখন ১৯১১ (ডাকঘর রচনার সময়) হইতে ১৯১৫ পর্বের আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত হইলে এই সময়ের রহস্য অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে, এমন আশা করা যায়।

যে বছরে ডাকঘর রচিত হয় সেই বছরে লিখিত একখানা চিঠি হইতে কবির পূর্বোক্ত মনোভাবের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই বলছে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর তো সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে— আমার চার দিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চার দিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়— বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।…ইতি ২২শে আশ্বিন, ১৩১৮।" —দেশ, ১০ আশ্বিন ১৩৪৮

এই সময়কার আর একখানি পত্রে পাই—

"বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়্, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর একদণ্ড ঘরে নয় এই কথাটা এমন করে অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে, আজ আমার আর অন্য কোনো কথা চিন্তা করবার জো নেই— এর কাছে অন্য সকল কথাই আমার কাছে তুচ্ছ। …২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮।"*

এই কয়েকটি পত্রখণ্ডে ডাকঘরের প্রত্যক্ষতঃ উল্লেখ নাই; ডাকঘরের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে অনুমানলব্ধ মাত্র। কিন্তু এবারে যে অংশ উদ্ধার করিতে যাইতেছি, তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ

* সম্পূর্ণ পত্রখানি এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ডাকঘরের কথা আছে ; ডাকঘর যে-মনোভাব হইতে উদ্ভূত তাহার উল্লেখ আছে ; তাহা জানিবামাত্র পূর্বোক্ত পত্রখণ্ডত্তর সঙ্গে ডাকঘরের যে-সম্বন্ধ অনুমানগম্য ছিল তাহা অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

"ডাকঘর নাটকটিই তাঁর নিজের মৃত্যুকল্পনা অবলম্বনেই লেখা। ১৩২২ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সকলের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ; ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল ডাকঘর। সেই বক্তৃতাগুলি তখন আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ তাঁর দিনলিপি-পুস্তকে লিখে রেখেছিলেন, এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখি নি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, চল বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।···আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন, তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত, অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি ? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল, বহু দূরে সে অজানা রয়েছে, [তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু বিস্মৃত অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল, সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না, থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে, সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে— আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই ভাব যদি কারো সম্পূর্ণ অপরিচিত হয় তবে হেঁয়ালি বলতে পারে। এই বেদনা যদি কারো মধ্যে থাকে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী।"—'রবীন্দ্র-সংগীত', শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃ ১৩৭-৩৯

এই কয়েকখণ্ড রচনা হইতে ডাকঘর-পর্বে কবির মনের অবস্থা জানিতে পারা যায়। মানসিক

এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলে ডাকঘর নাটক খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইবে ; পূর্বাপরের সহিত ইহাকে যুক্ত করা যাইবে না ; আর পূর্বাপরের সহিত সংযুক্ত তথ্যেরই নাম সত্য।

পূর্বোক্ত রচনাগুলি হইতে কবির মনের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি ভাবকে পাওয়া যায়। প্রথমত, উৎকট মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা ; দ্বিতীয়তঃ অনির্দিষ্ট কোন্ এক সুদূরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা ; তৃতীয়তঃ, প্রবাসবেদনার কাতরতা। যেন যেখানে আছি, তাহা গৃহ নয়. আসল গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে ; যে-বেদনা শীতের শেষে প্রবাসী হাঁসের দলকে অলক্ষিতে মানসোৎকা করিয়া তোলে।

দেহে মনে রবীন্দ্রনাথের সুস্থতা অসাধারণ ; তবে এমন ঘটিল কেন? যে কেবল মাত্র সাহিত্য-সমালোচক তাহার পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ ইহার মূল বহুদূরব্যাপী ; বিশেষ, কবিজীবনের এই পর্ব সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত অল্পই জানা গিয়াছে ; এখনও তথ্যের ভিত্তি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তবে সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যবয়সে, পঞ্চাশের কাছাকাছি এমন একটা অস্বাভাবিক সময় আসে যখন সে একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখে, আর সমস্তকে কেন্দ্রচ্যুত, ঝাপসা, মাত্রাহীন বলিয়া মনে করে। তখন সে ছোটকে বড়, বড়কে ছোট, তুচ্ছকে নিত্য, সবসুদ্ধ জড়াইয়া একটানা একটা নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতা অনুভব করিতে থাকে। মধ্যবয়সের এই বিভীষিকা মানুষের প্রকৃতিকে অনেক সময় পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। অধার্মিক হঠাৎ ধর্মবাতিকগ্রস্ত হইয়া ওঠে, বিশ্বাসী নাস্তিক হয়, বদান্যব্যক্তি নিতান্ত কৃপণস্বভাব হইয়া পড়ে ; অল্প লোকেই এই সাময়িক বিভীষিকার হাত এড়াইয়া পুনরায় পূর্বের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া পায়।

রবীন্দ্রনাথ যে সগৌরবে পূর্বের স্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছেন, ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ চারিত্রের ফল। অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান হইলে এখানেই তাঁহার কবিজীবন পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

এখন, সাধারণ মানুষের জীবনে যে অভিজ্ঞতা ঘটে, সূক্ষ্ম-অনুভূতি-প্রবণ কবিদের জীবনে তাহা অধিকতর তীব্রতায় ঘটিয়া থাকে ; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। একদিকে যেমন অপসরণশীল যৌবন ও প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য কবির পক্ষে আনন্দদায়ক হয় নাই, তেমনি আবার আর একদিকে কঠিন দৈহিক পীড়া তাঁহার পক্ষে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০২ সালে পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে ১৯১৩-এর শেষভাগে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত কবির জীবনের একটা শঙ্কাজনক সময়। কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই যদি ধরা যায়, তবে ইহার পূর্বে বা পরে কখনো তিনি এত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তাঁহার প্রায় সব বয়সের প্রতিকৃতিই আছে, কিন্তু এই সময়ের ছবিগুলিতে যে কৃশতা, স্বাস্থ্যহীনতা এমন কি একটা রুগ্ন নিস্তেজতা দেখা যায় এমন আর কখনো নয়। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ পর্যন্ত তাঁহার চেহারাতে যে দিব্য কান্তি ছিল, মুখে যে প্রতিভার অলৌকিক দ্যুতি ছিল, এই সময়টায় তাহা যেন কথঞ্চিৎ ম্লান ; সেই কান্তি, সেই দ্যুতি পঞ্চান্নর কাছাকাছি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদের অলৌকিক আবাস পরিত্যাগ করে নাই— না, মৃত্যুর পরেও তাহারা সেই আশ্রয় জড়াইয়া পড়িয়া ছিল— কি অসম্ভব আশায়, মুগ্ধ বিশ্বাসে! এই সময়টাতে দৈহিক রোগের প্রভাবে তাঁহার প্রতিভায় কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল?— এ জটিল গ্রন্থি উন্মোচন অবশ্য আমার মত অব্যবসায়ীর দ্বারা হইবার নয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে অপসরণশীল যৌবন, প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য এবং দৈহিক কঠিন

পীড়া— এই তিনটিতে মিলিয়া কবির দেহে এবং মনে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহারই ফলে তাঁহার জীবনের এই সাময়িক অস্বাভাবিকতা : মৃত্যুর উৎকট আকাঙ্ক্ষা, অনির্দেশের আকুতি ও প্রবাসীর গৃহবেদনা।

ইহার মধ্যে দৈহিক পীড়ার উপশম ইংলণ্ডে চিকিৎসার দ্বারা হইয়াছিল; কিন্তু ব্যাধিমুক্ত হইলেও মানসিক পীড়ার কারণ দূরীভূত হয় নাই। আধি মোচন কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়— নিজের সাধনার দ্বারাই কবিকে তাহা দূর করিতে হইয়াছে—"তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব— এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।"

মানসিক অশান্তি হইতে কবি নিজের সাধনা দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন; এই মুক্তির একাধারে ঔষধ ও প্রমাণ, বলাকা ও ফাল্গুনী।

দেহের যৌবন অপসরণশীল হইলেও তাহা সত্যই জীবন হইতে একেবারে চলিয়া যায় না, নূতনতর মহিমায়, গভীরতায় দ্যোতনায় জীবনে আবার ফিরিয়া আসে; দেহের রঙমহল হইতে অন্তরের খাসমহলে তাহার আসন পাতা হয়। "প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।" "আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।" ইহাই গভীরতর সেই যৌবনের স্বরূপ।

'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' বিগত যৌবন বার্তা পাঠাইয়া দেয়—

"লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে।…
লিখেছে সে
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।…
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।"

বলাকার ২৫, ২৬ ও ৪৪ সংখ্যক কবিতায় এই নূতন যৌবনের, প্রৌঢ়ের যৌবনের বার্তা।

আর প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য! তাহার সমাধান ফাল্গুনীতে। যৌবনের দল চিরন্তন বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য বিশ্বের রহস্য-গুহার মধ্যে তলাইয়া গেল— সেখান হইতে যাহাকে টানিয়া বাহির করিল, সে চিরন্তন বৃদ্ধ নয়, চিরন্তন যুবক, তাহাদেরই দলপতি জীবন সর্দার। যৌবনের দলকে সে চালাইয়া লইয়া যায়। যৌবনের দলপতি জীবন সর্দার, তাহার কাজ বিপদ হইতে বিপদে চালনা করা। এই প্রতীকটীর অর্থ কি আর স্পষ্ট করিবার প্রয়োজন আছে? জীবনের আকর্ষণে যৌবন বিপদের মুখে স্বতঃই অগ্রসর হইয়া চলে। তবে বার্ধক্য কোথায়?

"ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।"

আবার—

"বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।"

তবে বুড়ো কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুহা হইতে সদ্যবাহির্গত জীবন সর্দার বলিল— 'কোথাও তো নেই।' 'তবে সে কি?' 'সে স্বপ্ন।'

শীতের অন্তে বসন্ত; যৌবনের অন্তে প্রৌঢ়দের নূতনতর যৌবন; আর বার্ধক্য— সে স্বপ্নমাত্র। ইহাই ফাল্গুনীর প্রতিপাদ্য ও সমাধান।

অপসরণশীল যৌবন ও প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য কবির মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলাকা ও ফাল্গুনীতে এই ভাবে তাহাদের সমাধান তিনি করিলেন। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব— এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।"

অন্তরের সাধনায় স্পর্শমণির দ্বারা কবি সমস্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন— অস্বাভাবিকতার বিভীষিকা-জাল ছিন্ন হইয়া গেল, কবি আবার স্বীয় প্রতিভার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। বলাকা-ফাল্গুনীর পর্বে কবির মানসিক স্বাভাবিকতার পুনঃ সূত্রপাত। ডাকঘর নাটক এই স্বভাববিরুদ্ধ পর্বের বিশিষ্ট একটি রচনা।

এই সময়ের প্রধান তিনটি যে লক্ষণ, মৃত্যুর উৎকট আকাঙ্ক্ষা, অনির্দিষ্ট সুদূরের জন্য আগ্রহ আর প্রবাস-বেদনার কাতরতা— ডাকঘর নাটক এই তিনটি মনোভাবের সম্মিলিত সৃষ্টি। অমল-চরিত্র এই তিনটি উপাদানে গঠিত— এতদধিক চতুর্থ কোনো উপাদান তাহাতে নাই।

এখন, এই নাটকে উল্লিখিত চিঠি ও ডাকঘর কি? বলা বাহুল্য চিঠি ও ডাকঘর প্রতীক। কিসের প্রতীক? প্রতীক হিসাবে চিঠির উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল নয়। তাঁহার মতে চিঠির মধ্যে দুটি ভাব আছে, একটি রহস্য আর দ্বিতীয়টি হইতেছে ওই ক্ষুদ্র পত্রপুটকে অবলম্বন করিয়া সুদূরের নিকট-আগমন। যে চিঠি প্রতীক নয়, নিতান্ত লৌকিক, তাহার মধ্যেও এ দুটি ভাব নিহিত। অথবা লৌকিক চিঠিতে এ দুটি ভাব আছে বলিয়াই প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

চিঠির এই মোহ-রহস্যের উল্লেখ কবির পত্রে কোনো কোনো স্থানে আছে—

"পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখ্‌বার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।...আমার বোধহয় ওই লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে— লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ— ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।"—ছিন্নপত্র, ৮ই মার্চ, ১৮৯৫

আবার—

"দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি— দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে।…বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র— তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে।…"— চিঠিপত্র ১

এ দুটিই লৌকিক চিঠি সম্বন্ধে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পত্র ক্রমে প্রতীক হইয়া উঠিতেছে, এবং প্রতীক হইয়া লৌকিক রস হারায় নাই, বরঞ্চ সে রস আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।"—জীবনস্মৃতি, "বাহিরে যাত্রা"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতীক-চিঠির উল্লেখ বহুত্র আছে—তন্মধ্যে উৎসর্গের ১১শ সংখ্যক কবিতা এবং পূরবীর 'হে ধরণী কেন প্রতিদিন' বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অমলের রাজার চিঠির সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ নাই— একই ডাকহরকরা তাহাদের বহন করিয়া আনিয়াছে; রহস্য ও সুদূরময়তা ইহাদের প্রধান অঙ্গ। যে-সুদূরের জন্য অমলের মন লালায়িত, সেই সুদূরই যেন ওই পত্রপুটের শিশির-কণায় প্রতিবিম্বিত নীলিমা রূপে তাহার হাতে ধরা দিবার জন্য আসিয়াছে। অমলের কাছ হইতে সুদূর, এ যেমন রহস্যের একটা দিক, তেমনি আবার সুদূরের কাছ হইতে অমল, আর-একটা দিক; সেই দিকের বাণীবহ প্রতীক ওই চিঠি।

আর চিঠির প্রতীকটিকে একটি বাস্তব-পারিপার্শ্বিক দিয়া সজীব করিয়া তুলিবার জন্য ডাকঘরটির অবতারণা। ইহারই আনুষঙ্গিকভাবে ডাকহরকরাকে দেখিতে হইবে। অমলের মতে তাহার প্রধান রহস্য ও সুখ এই যে, সে সুদূর ও নিকটের মধ্যে নিরন্তর দৌত্য করিতেছে; অমল যে-সুখ হইতে বঞ্চিত, তাহা ওই লোকটির নিত্যকার পেশা। অমল যেন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ওই লোকটির মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দেখিতে পায়।

এখন আর একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, রাজ-কবিরাজের আগমনে অমলের ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়াটা কি? মৃত্যু? না কোনো রকমের প্রতীক-নিদ্রা? রাজা আসিয়া ডাকিলেই অমল জাগিয়া উঠিবে এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় Resurrection জাতীয় কিছু মনে করিয়াছেন।

ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কারণ মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসাবে কোন তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এরকম মতবাদ তাঁহার তত্ত্বের বিরোধী। বিশেষ সে তা মরে নাই, স্পষ্টই উল্লিখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করার চেয়ে এক রকমের প্রতীক-নিদ্রা মনে করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ কবির কাব্যে বহুস্থানে এই নিদ্রা-প্রতীকের ব্যবহার আছে। আকাঙ্ক্ষিতের জন্য রাত্রি জাগিয়া বিরহিণী যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেই নিদ্রাকে সার্থক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—এরূপ ভাব রবীন্দ্রকাব্যে অবিরল।

খেয়ার 'মুক্তিপাশ' কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিরহিণী বলিতেছে—

"ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।"

তাঁহার আসিবার আগে অমলের ঘরটির মতই বিরহিণীর

"রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ,"

অমলও তাহার মতো জাগিয়া উঠিলে বলিতে পারিত, কিম্বা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিবে—

"আজ　নয়ন মেলিয়া এ কি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি　বাঁধা নাই।...
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া"

অমলের মতোই তাহার—

"রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার—"

সত্যই তো রাজ-কবিরাজ আসিয়া ক্ষুদ্রতর কবিরাজের আদেশে বন্ধ অমলের ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়াছেন— এখন স্বয়ং রাজা আসিয়া ডাকিলে তাহার শেষ বন্ধনও খসিয়া পড়িবে। তিনি অমলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইবেন।

অমলের নিদ্রা ও এইসব নিদ্রা মূলতঃ এক ; তবে গীতিকবিতায় যাহা একতন্ত্রী, নাটকের ঘটনার দাবিতে তাহাকে বিচিত্রতর, পূর্ণতর করিয়া দেখানো হইয়াছে, প্রভেদ মাত্র ইহাই।

এই নিদ্রা বা মৃত্যু খ্রীষ্টীয় Resurrection কি না ? Resurrection যদি একমাত্র মৃত্যুর পরেই সম্ভব হয়, তবে ইহা নিশ্চয় Resurrection নয় ; কিন্তু পুনর্জীবন যদি এ জীবনেই লভ্য হয়, জীবনের হীনতর অংশ ভস্মীভূত হইয়া মহত্তর অংশ উদ্ভূত হয়—তবে ইহাকে Resurrection মনে করিতে আপত্তি নাই, কারণ তখন Resurrection ও পূর্বোক্ত প্রতীক-নিদ্রায় আর কোনো ভেদ থাকে না।

The Post Officeএর ভূমিকায় কবি ইয়েটস্ তাঁহার মত লিখিয়াছেন—

> The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said, when once in the early dawn he heard, amid the noise of a crowd returning from some festival, this line out of an old village song, "Ferryman, take me to the other shore of the river." It may come at any moment of life, though the child discovers it in death, for it always comes at the moment when the 'I,' seeking no longer for gains that cannot be 'assimilated with its spirit' is able to say, "All my work is thine" (Sadhana pp. 162, 163).

ইয়েটস্ যাহা বুঝিতেছেন তাহা মৃত্যু নয়, জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তি মৃত্যুর মুহূর্তেও লাভ করা যায়

বটে, কিন্তু তখন তাহা তো আর লৌকিক অর্থে মৃত্যু নয়; অমলের মৃত্যু যদি জীবন্মুক্তিই হয় তবে তাহা জীবনেরই অঙ্গ; জীবনের অবসান নয়। মনে রাখিতে হইবে কবি শিল্প সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন। শিল্পের দাবি মিটাইতে গিয়া তত্ত্বের যৌক্তিক অলজ্ঘ্য পরিণামকে অনেক সময়ে সংকুচিত করিতে হয়; তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া কবি যে পর্যন্ত যাইতে রাজি ছিলেন, শিল্প, বিশেষ নাট্যশিল্প, তাহার বিরোধী; সেইজন্য তিনি রাজাকে রঙ্গমঞ্চে আনিতে পারেন নাই, অমলকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তত্ত্বের স্বরূপ বিকৃত হয় নাই। নাট্যরচনার বেলায় কবি শিল্পের অনুরোধে যেখানে থামিয়াছেন নাট্যসমালোচনার বেলায় সমালোচক সেখানে থামিতে বাধ্য নয়; শিল্পের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াও সমালোচক তত্ত্বের যৌক্তিক সীমানা নির্দেশ করিতে বাধ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের এই পর্বটাতে কবি ও অমল একই আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন— অথবা কবি নিজেকেই অমলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও সাধনার বলে কবি এই অস্বাভাবিকতা কাটাইয়া উঠিয়াছেন; তাহার কতক চিহ্ন বলাকাতে, কতক ফাল্গুনীতে। ডাকঘরের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। অমলের জাগরণ নাটকের অন্তে নাই বটে, কিন্তু তাহা কবির জীবনে ঘটিয়াছে। অমল কবির জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কবিই রাজকবিরাজের দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, স্বয়ং রাজার দ্বারা মহত্তর জীবনে উদ্বুদ্ধ অমল; যে-সুধার ফুলের আকাঙ্ক্ষা লইয়া অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুধার ফুল নবোদ্বোধিত কবির করতলগত হইয়াছে; সুধার ফুল আর কিছুই নয়, প্রেম, মানুষের ভালবাসা। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব— এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।...মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব। কোনো সন্দেহ নেই।"— এই বেদনা অমলও নিশ্চয় প্রকাশ করিতে পারিত, অন্ততঃ অনুভব যে করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাকঘরের উপসংহার লিখিত হয় নাই বটে, তাহা কবির জীবনে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। "আমি কিছুদিন স্কুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই।" অমলেরও এই একই আকাঙ্ক্ষা, রুগ্নতাকে কাটাইয়া চিরন্তন স্বভাবকে ফিরিয়া পাইবার। নাটকের শেষে তাহার অর্ধসমাপ্ত সাধনা ও অর্ধলব্ধ আকাঙ্ক্ষার উপরে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যবনিকা উঠিয়া গেলে শান্ত সমাহিত কবিকে সুস্থতর অবস্থায় ও মহত্তর জীবনে আবার ফিরিয়া পাওয়া গেল। কবি আপনাকে ও জীবনকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, কারণ ইহার ঔষধ তাঁহার অন্তরেই ছিল।

এই নাটকে অন্যান্য যে-সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের বুঝিতে হইলে অমলের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা বুঝিতে হইবে। অমলের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুযায়ী ইহাদের তিন ভাগে ভাগ করা চলে। একদল অমলকে ভালোবাসে না, তাহারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, যেমন কবিরাজ ও মোড়ল; আর একদল তাহাকে ভালোবাসে, কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইতে দিতে নারাজ, যেমন মাধব দত্ত, দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ, সুধা; তৃতীয় দল তাহাকে ভালোবাসে এবং ঘর হইতে মুক্তি দিতে উৎসুক, যথা ঠাকুর্দা, রাজকবিরাজ।

কবিরাজ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছে; দেহের অতিরিক্ত আর কিছু আছে বলিয়া সে জানে না; সে জানে, অমলকে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সে নিরাময় হইবে।

মোড়ল নিজের উচ্চতাকেই জগতের মাপকাঠি বলিয়া জানে। তাহার চেয়ে বড়ো, চোখে-দেখার চেয়ে বেশি তাহার জগতে কিছু নাই। শিশুর সরলতা তাহার কাছে হয় উপহাসের, নয় উষ্মার। অমলের মতো গরিবঘরের ছেলে রাজার চিঠির আশায় বসিয়া আছে— ইহা তাহার কাছে অসহ্য। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাহার পরিহাসের চেয়েও কৌতূহলকর। তাহার বিদ্রূপই শেষে সত্যে পরিণত হইল ; অমলকে যাহারা ভালোবাসিত তাহারা রাজার চিঠির সংবাদ দিতে পারিল না, আর মোড়লের বিদ্রূপকে সত্য করিয়া তুলিয়া রাজার চিঠি আসিয়া পৌঁছিল।

কবিরাজ ও মোড়ল দুজনেই ফিলিস্টাইন।

মাধবদত্ত সংসারী লোক। তাহার জীবনের মধ্যে অমলের মত আকাশবিলাসী বিহঙ্গশিশু আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে কেমন করিয়া সে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। সে অমলকে ভালোবাসে বটে তবে সে ভালোবাসা অমল-কেন্দ্রী নয়, আত্মকেন্দ্রী ; অমলের মৃত্যুতে নিজের ঘর যে শূন্য হইবে, ইহাই যেন তাহাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিতেছে। তাহার সাংসারিকতা এতই প্রবল যে রাজা আসিয়া পৌঁছিলে অমলকে ভালোমত কিছু প্রার্থনা করিতে সে শিখাইয় দিতেছে। সে অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা জীবনের বেদনা হইতে উদ্ভূত নয় ; সমাজের দাবি, সংসারের দাবি যেন সেই ভালোবাসা তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়াছে ; সেইজন্য অমলকে কবি তাহার পুত্র না করিয়া পোষ্যপুত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ভালোবাসার সাংসারিক রূপের সঙ্গেই মাত্র পরিচিত, তাহার বেশি কিছুতে সে বিশ্বাস করে না ; সে অবিশ্বাসী। সেইজন্য শেষ মুহূর্তে ঠাকুর্দা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—'চুপ করো অবিশ্বাসী।'

দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু কবিরাজের অনুশাসনকেই তাহারা বালকের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে। অমলের মনোভাবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু বাহ্যশাসনকে লঙ্ঘন করিবার সাহস তাহাদের নাই।

এমন কি সুধা, যে-সুধা অমলকে ভালোবাসে, অন্য সকলের চেয়ে বেশি করিয়া, সে-ও অমলের আধখানা খোলা দরজা, রুগ্ন অমলের একমাত্র সান্ত্বনা, বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

ঠাকুর্দা একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। অমল যাহা হইলে-হইতে-পারিত ঠাকুর্দা তাহাই ; সেইজন্য তাহার প্রতি বালকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নাই, আবার মৃত্যুকে সে ভয়ও করে না। নিরুদ্দেশ সুদূরকে সে দেখিয়া আসিয়াছে তাই ঘরের কোণটিও তাহার কাছে কম মনোরম নয় ; আর প্রবাসের বেদনা! সমস্ত জগৎটাই যাহার গৃহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে প্রবাস কোথায়? ঠাকুর্দা এই গৃহ-কারাগারের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়। সে যেন অমলের দূরবীক্ষণযন্ত্র। অমল তাহার মধ্য দিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষিত লোককে যেন দেখিতে পায়।

রাজকবিরাজের তুলনায় মাধবদত্তর গৃহচিকিৎসকের কত প্রভেদ! রাজকবিরাজ আসিয়া রুদ্ধ দরজা জানালা খুলিয়া দিল ; বাতির আলো নিভাইয়া ঘরে তারার আলো প্রবেশের পথ করিয়া দিল তাপিত বালকের দেহ নিদ্রার অমৃত-প্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। রাজকবিরাজ আসন্নপ্রায় মুক্তির আভাস— আভাসে মুক্তি যদি এত মধুর, স্বয়ং মুক্তির না জানি কি স্বাদ!

ডাকঘরের সমস্ত চরিত্রই ক্ষীণতম রেখায় অঙ্কিত ; ন্যূনতম অপরিহার্যকে রাখিয়া সমস্ত অবান্তর বিষয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাসংস্থানে 'human habitation' ও 'name'-এর ভার চাপাইয়া দিলে নাটকটির রহস্যলোক পীড়িত হইয়া ভাঙিয়া পড়িত। যে সুদূরের জন্য সর্বদা অমলের চিত্ত উৎসুক তাহার দিকে যাত্রার উপযোগী ইহার সজ্জা ; ইহা সর্বভারবর্জিত ক্ষিপ্রগামী ছিপ-নৌকা ; অবান্তরপীড়িত, উদ্দিষ্টলক্ষ্য, মন্থরগামী বজরা নহে।

রবীন্দ্রনাথের অল্প নাটকই আছে যাহাকে লইয়া তিনি ভাঙাগড়া করেন নাই, এই বারম্বার ভাঙাগড়া ও সংযোজনা শিল্পগত অস্বস্তির পরিচয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ডাকঘরকে তিনি স্পর্শ করেন নাই। ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে, কিন্তু রবীন্দ্রনাট্য-বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ ইহাতে যথেষ্ট আছে ; আকৃতির অনতিদীর্ঘতা, অবান্তরবর্জিত অপরিহার্য রেখায় চরিত্রসৃষ্টি, climax-হীন শান্তিময় পরিণাম, অস্ফুট ছায়ালোকের মোহময় রহস্য, পাত্রপাত্রীর নির্দিষ্টজাতিহীনতা এবং ইতিহাস-ও ভূগোল-বিবর্জিত কালে ও দেশে ঘটনার সংস্থান।

দুএকখানা নাটক বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই গান আছে। গানের বহুলতায় রবীন্দ্রনাটকের গতির স্বাভাবিক মন্থরতাকে মন্থরতর করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নাটকে একটিও গান না থাকাতে ইহার ক্ষীণ ঘটনাস্রোত অপ্রতিহত গতিতে শান্তিপারাবারের দিকে প্রবাহিত হইতে পারিয়াছে। কিম্বা স্বভাবতই ইহার আবহাওয়া এমন রহস্যময় যে গানের দ্বারা তাহা বাড়াইয়া তুলিবার আর আবশ্যক হয় নাই।[১]

১ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর অভিনয়-প্রস্তাব উপলক্ষ্যে নাটকটির স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, এইরূপ শুনিয়াছি। ঐ সময়ে ডাকঘর নাটকের জন্য তিনি কয়েকটি গানও লিখিয়াছিলেন। কলিকাতায় অভিনয়কালেও ডাকঘর নাটকে তিনি কয়েকটি গান জুড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডাকঘরের কোনো সংস্করণেই তিনি সে গানগুলি গ্রন্থভুক্ত করেন নাই— সুতরাং উল্লিখিত তথ্যদ্বারা আমার বক্তব্য খণ্ডিত হয় না।

অমলের 'মৃত্যু'প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখণ্ড উদ্ধারযোগ্য—"ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।...১৭।২।৩৯"
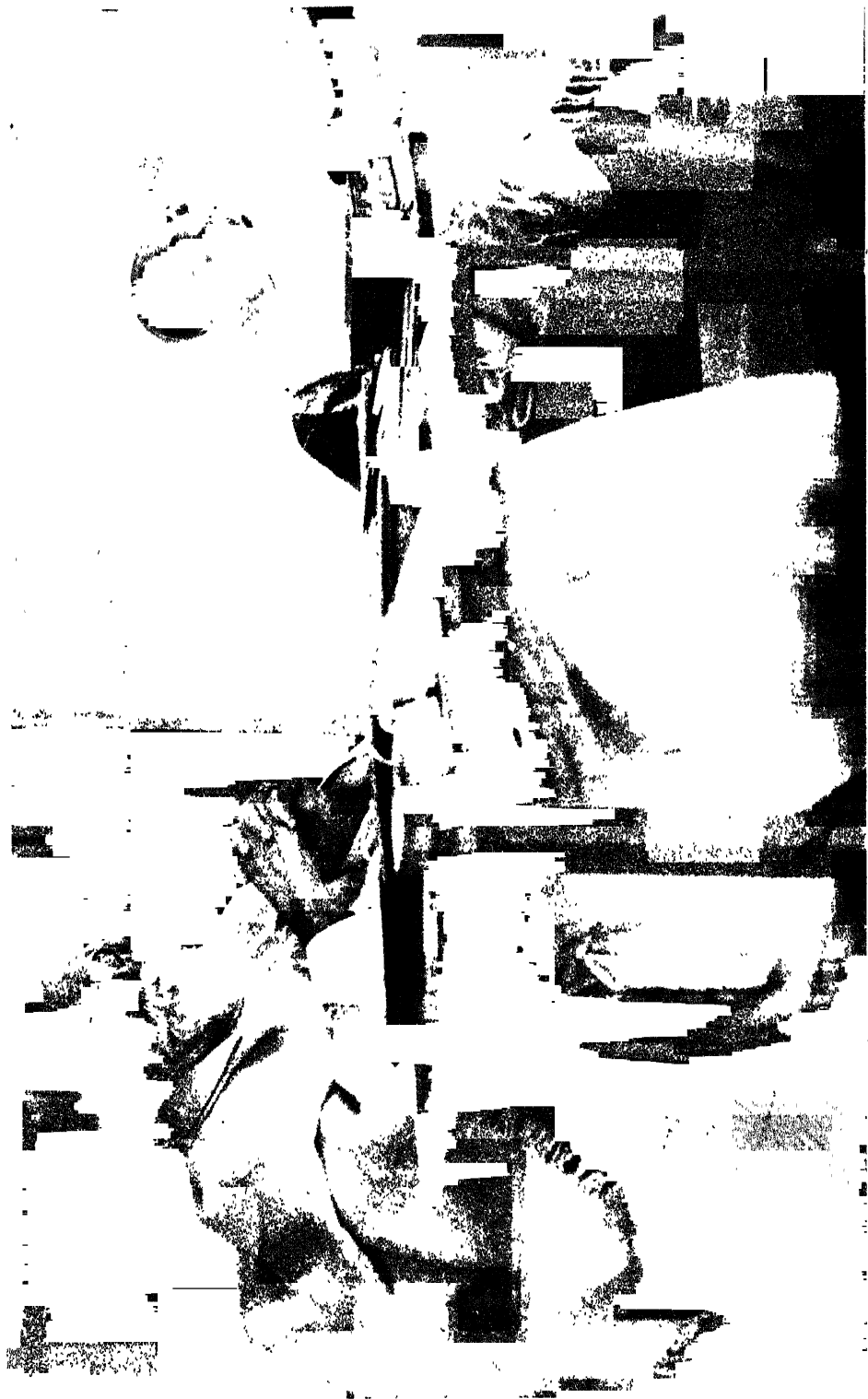
রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজী

শান্তিনিকেতন, ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় গৃহীত চিত্র

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

মহৎ শোকের মধ্যে একটি সার্থকতার সম্ভাবনা আছে। সেই সার্থকতার উপলব্ধিতেই মহৎ শোকের সান্ত্বনা। মহাত্মাজীর অকালমৃত্যু আমাদিগকে বিচলিত করিয়াছে— এই বিক্ষোভই সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহাত্মাজী কত গভীরভাবে আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। অধীর শোকাবেগ ক্রোধ বা বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ পাইলে মহাত্মাজীর স্মৃতির অসম্মান হইবে। শোকের এই আবেগ যদি দেশের মঙ্গলকামনায় রূপ লাভ করে, যে পথে লোকোত্তর পুরুষ বিচরণ করিতেছিলেন, যে পথে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে তিনি আমাদিগকে নিত্য ইঙ্গিত করিতেছিলেন, সেই পথে যদি আমরা চলিতে উৎসাহিত হই, তবেই তাঁহার যথার্থ স্মৃতিরক্ষা হইবে, তাহাতেই এই নিদারুণ বিয়োগব্যথার কিঞ্চিৎ উপশম, তাহাতেই এই মহৎ শোকের আংশিক সান্ত্বনা। তাঁহার জীবনকালে তাঁহার যে বাণী আমাদের অসাড় হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, তাঁহার মৃত্যুর পাশুপত-আঘাতে সেই বাণী আমাদের জীবনে সফল হইয়া উঠিবে— ইহাই এখন আমাদের পরম আশা ও আশ্বাস।

মহাত্মাজীর সহিত শান্তিনিকেতনের যোগ দীর্ঘকালের। দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে তাঁহার ফিনিক্স আশ্রমের ছাত্রগণ ভারতবর্ষে আসিলে, শান্তিনিকেতনে তাহারা কিছুকাল বাস করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন তিনি সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চালাইতেছিলেন তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদ্বয় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও পিয়র্সন কবিগুরুর ইচ্ছায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার আশায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগের সূত্রপাত। ভারতবর্ষে এত স্থান থাকিতে তাঁহার ছাত্রগণকে যে তিনি শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, শান্তিনিকেতনের আদর্শ তাঁহার মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। ১৯১৫ সালে মহাত্মাজী ও কস্তুরবাঈ প্রথম শান্তি-নিকেতনে পদার্পণ করেন। সেবার শান্তিনিকেতনে তিনি কিছুদিন মাত্র ছিলেন, মহামতি গোখ্‌লের পরলোকগমনের সংবাদে তাঁহাকে সহসা বোম্বাই চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এই অল্প কয়েক দিনেই তাঁহার অগ্নিময় স্পর্শে এই আশ্রমটি উজ্জ্বলতর পবিত্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া তাঁহার কর্মক্ষেত্র ভারতব্যাপী হইয়া পড়িল, ইতিহাসের স্রোত তাঁহার সাধনবেগে প্রবলতর হইয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে টানিয়া লইয়া বেড়াইল এ সব বিষয় আজ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও, এই সব ক্লান্তিপাতকারী কর্মের মধ্যেও যখনই তিনি সময় করিতে পারিতেন,

শান্তিনিকেতনে আসিয়া দু'চার দিনের জন্য বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। সম্প্রতি তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন-না কেন শান্তিনিকেতন সর্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান। গান্ধীজী কর্মীপুরুষ হইলেও তাঁহার অনাসক্ত অন্তরে যে শান্তি নিত্য বিরাজিত ছিল, এখানকার মুক্ত প্রকৃতিতে ও উদার আকাশে সেই শান্তির পরিপোষক হয়তো কিছু তিনি পাইতেন। কিন্তু, আরও কারণ আছে।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমেই ভারতের অধ্যাত্মজীবনের গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মিলন ঘটিয়াছিল, আবার প্রচ্ছন্নগতি সরস্বতীপ্রবাহের ন্যায় আত্মবিলোপশীল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও এখানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এইখানেই ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহাদের তিনজনের শিরে অক্ষয়বটের স্নেহচ্ছায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের মিলনে শান্তিনিকেতন এক মহাতীর্থে পরিণত। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা তাঁহাদের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যময় হইয়াছে। তাই আজ এই একটি শোকের প্রভঞ্জনেই বহু পূর্বস্মৃতির বাতায়ন উন্মুক্ত হইয়া গেল। কী নিদারুণ শোক, আর কী দুরূহ সৌভাগ্য! এ কথা বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হইবে না যে, মহাত্মাজীর অভাবে শান্তিনিকেতন দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল। কবিগুরুর সহিত তাঁহার শেষবার সাক্ষাৎকালে বিশ্বভারতীকে তিনি মহাত্মাজীর হাতেই তুলিয়া দিয়াছিলেন।

এ সব আমাদের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত, তবু ব্যক্তিগত নয়, কারণ মহাপুরুষগণ সমস্ত মানবসমাজের সম্পদ। কিন্তু, শোকের দিনে অবোধ মন স্বভাবতঃই বিশ্বগতকে ব্যক্তিগত করিয়া তোলে, হয়তো তাহাতেই সে কোনো এক প্রকারে সান্ত্বনা পায়।

মহাত্মাজীর আত্মার শান্তিকামনা করা বাহুল্য। জীবনে যাঁহার শান্তি কদাপি বিচলিত হয় নাই, এমন কোন্ মূঢ় আছে যে জীবনাতীত সেই পুরুষের শান্তিকামনা করিবে। বরং তিনিই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মতো ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর শান্তিকামনা লইয়া নিত্যনিয়ত জাগ্রত আছেন— এই বিশ্বাস লইয়া থাকিব, এবং এই বিশ্বাসই তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চলিতে আমাদিগকে বল দান করিবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫৪

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমলতা দেবীকে লিখিত। পূর্বানুবৃত্তি

ওঁ

508 W. High Street
Urbana
Illinois
২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমাদের কাছে স্কুলের বাড়ির বর্ণনা শুনে বোঝা গেল আমার ভাগ্যের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি। কেনা বেচার বাজারে আমাকে চিরদিন ঠকতেই হবে— ঠকার সীমা যদি ঐ টাকার থলির মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহলেও তেমন ক্ষতি নেই, ফাঁড়া তা হলে ঐখানেই কেটে যায়। যা হোক্ কাজ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে তখন লোকসানের দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে পরিতাপ করে কোনো ফল নেই— ওর মধ্যে যতটুকু লাভ আছে, তা যত সামান্যই হোক্ সেইটেকেই প্রচুর জ্ঞান করে তাকে যথাসাধ্য ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য— ওর দেয়াল ফাটা, ওর গাছগুলো বুড়ো, ওর চারদিকে জঙ্গল এ বলে মন ভারি করে বসে থাকলে ঠকাটাকে কেবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে— যে আট হাজার টাকা আমার গেছে সে ত গেছেই কিন্তু তার বদলে যেটুকু পেয়েছি তাকে পেয়েছি বলেই গণ্য করতে হবে। আমরা ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত ওটাকে কি রকমে কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে তা এতদূর থেকে বলা এবং ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে শক্ত— তোমরা সকলে পরামর্শ করে যে রকম ভাল বোধ কর তাই কোরো। আর কিছু না হোক্ জমি অনেকটা আছে ওর মধ্যে কিছু কিছু চাষ হতে পারে না কি? সন্তোষের গোয়ালঘরের কল্যাণে গোবরের সারের ত অভাব হবে না। এখন থেকে ফলগাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে ওতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দিতে পারলে হয়ত আমের সময় ছেলেদের জন্যে কিছু কিছু আম পাওয়া যেতে পারে। এতদিনে তোমাদের ৭ই পৌষের উৎসব চুকে বুকে গিয়ে এগারই মাঘের আয়োজন চল্‌চে। আমাদের এখানকার দিনগুলি শান্তভাবে চলে যাচ্চে— বাড়িঘর লোকজন জল বাতাস আলাপ আলোচনা চালচলন চিন্তা চেষ্টা সমস্তই অন্য রকমের— ডাঙার

মানুষের জলের মধ্যে অবগাহন স্নান যেমন, আমাদের জীবনের পক্ষেও সম্পূর্ণ বিদেশের মধ্যে এই আপাদমস্তক ডুব দিয়ে যাওয়া ঠিক সেই রকম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আগামী শনিবারে শিকাগো সহরে যাবার কথা আছে। সেখান থেকে হয়ত কিছুদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে— দূরে দূরে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এই সমস্ত শেষ করে এখানে আমার ফিরতে হয়ত ফেব্রুয়ারি কেটে যাবে। এই ঘুরে বেড়াবার মুখে এবং লোকালয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে তোমাদের চিঠিপত্র লেখবারও হয়ত সময় পাব না। এখন থেকে কিছুদিন আমাকে অত্যন্ত অনবকাশের মধ্যে থাকতে হবে।

স্কুলের বাড়িটা বিদ্যালয়ের কোনো কাজে যদি লাগতে পারে তাহলে নিশ্চিন্ত হই। আমার মনের ইচ্ছা রথীর জীবনকে আমি বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত করি— বিষয়কর্ম্মের ব্যর্থতার মধ্যে ওর শক্তির অপব্যয় আমি অত্যন্ত ক্ষতি বলে গণ্য করি। আমাদের যা কিছু আছে তা যে আমাদের নিজের নয় এবং যা কিছুকে আমাদের নিজের বলে গ্রহণ করি তা যে চুরি করে করি এটা আমাদের খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। তা বুঝতে গেলে সেই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করা চাই— বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হলে সম্পূর্ণ উল্টো বোঝার চর্চ্চা হয়। বিদ্যালয়ের কাজে রথী যদি ওর তপস্যার আসন পাততে পারে তাহলে ক্রমে ক্রমে ওর দেওয়া এবং নেওয়া সমান হয়ে আসতে পারবে। হৃদয়ের গ্রন্থি ত এখনো ছিন্ন হয়নি— কিন্তু কোনোদিনই কি হবে না? একদিন কি আসবে না যখন নিজের হাতে কোনো জিনিষই গ্রহণ করব না, যখন নিজের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি সমস্তকেই খুব বড় করে বড়র কাছে নিবেদন করে পাব! আমি ত একান্ত মনে সেই দিনের জন্য তাকিয়ে আছি।— বাধা কাটেনি, দরজা খোলেনি কিন্তু এখনো একমুহূর্ত্তের জন্যে আমি আশা ছাড়িনি। রথীর স্কুলের বাড়ি বিদ্যালয়েরই অঙ্গ হবে। শুধু স্কুলের বাড়ি কেন, ওর যা কিছু আছে সমস্তই বা কেন না হবে? আমরা সব জিনিষকে মিথ্যা দাম দিয়ে নিজের লোভকে ভয়ানক বাড়িয়ে তুলেছি— নিজের চারিদিকে মায়ার হাট সাজিয়ে বসে আছি— সমস্ত জিনিষকে নিজের কামনার রঙে রঙিন করে তুলে শেষকালে সেইগুলোকে চুরি করবার জন্যে সিঁধ হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াই— এতে ফল হয় এই যে সত্য জিনিষকে ত পাইই নে, কেবল হাতে পায়ে বেড়ি পড়ে। রঙের হাটে ত আমার ঘোরা হয়ে গেছে এবারে ঈশ্বরকে ডাকচি একেবারে শুভ্রতার মধ্যে তিনি আমাকে টেনে নিন্— কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি সুন্দর সেই শুভ্রতা— কি সরল, কি চিরনবীন! আপনাকে কিম্বা পরকে বঞ্চনা তার কোনখানে কিছুমাত্র নেই— সমস্ত একেবারে খোলা, একেবারে ঢালা— শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্!

আমার এখানকার কাজ নিশ্চয়ই আছে— নইলে আমাকে এখানে এমন করে ঘুরতে হবে কেন? আমি যা মনে করে আসি তা ত আমার ঘটে না— ভেবেছিলুম কিছুদিন আড়ালে বসে ফাঁকি দেব। কিন্তু

আমি যে ক্রীতদাস, এমন করে তলব পড়ে যে বসে থাকতে পারিনে— আবার এমন সব কাজের ফরমাস যা আমার সাধ্য বলে কোনোদিন মনেও করিনি!

তোমরা কি ঠাউরেছ আমি বিদ্যালয়ের জন্যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে ফিরব? টাকা আমি কবে কোথায় পেয়েছি বল? ও সব কল্পনা মনেও এনো না। লোভ করবার দরকার নেই। বিনা টাকায় কাজ চলে কিনা দেখা যাক্— সে পরীক্ষা ত এখনো ঠিকমত করে করা হয়নি— কেবল টাকার মুখ চেয়ে বসে আছি— আমাদের জীবনের দাম কি টাকার চেয়ে কম? ইতি ১লা পৌষ ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street
Urbana. Illinois

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আজ খৃষ্টমাস্। এই মাত্র ভোরের বেলা আমরা আমাদের খৃষ্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি। রথী বৌমা শিকাগোতে গেছেন— কেবল বঙ্কিম সোমেন্দ্র এবং আমি এইখানে আছি। আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম—কিছু অভাব বোধ হল না— উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তাহলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ আমরা প্রণাম করেছি তাঁর আশীর্ব্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্তমনে প্রার্থনা করেছি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। আমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে নিঃশেষে পরাস্ত করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে জয়ী করুন, জীবন একেবারে পরিপূর্ণরূপে সত্য হোক্। সেজন্য যত ত্যাগ যত দুঃখদাহ সমস্তই যেন মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে পারি। এই ইচ্ছা তাঁকে জানিয়েছি— এই ইচ্ছার মধ্যে কিছুমাত্র মিথ্যা যেন না থাকে এই কামনা করচি— যদি মিথ্যা থাকে তবে তা চূর্ণবিচূর্ণ হোক্, বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাক্! এই সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়,— সেই মানুষটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন— নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে, একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে। মনুষ্যত্বের পরম অধিকার লাভ করবার প্রার্থনা অনেকদিন জানিয়েছি— দুর্য্যোগের মুখে, বিঘ্নের মুখে, মোহান্ধতার মুখে এই আমার প্রার্থনা— এ প্রার্থনা ব্যর্থ হতেই পারে না। বিপুল ইন্ধনের তলায় যখন আগুন ধরে তখন সে কি চোখে পড়ে? সে নিতান্তই ছোট কিন্তু তার শক্তি কি কম? আজ সকালে তাঁর দরবারে আর একবার দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড় ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন—Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও সেই কথাই আর এক ভাষায় বলেছেন—"আবিরাবীর্ম্ম এধি"। সমস্ত মানুষের সেই অন্তরতম প্রার্থনাকে নিজের জীবনের মধ্যে সত্য করে তোলবার চেষ্টায় যদি বিরত হই তাহলে আমাদের প্রতিদিনের অন্ন চুরি করে খাওয়া হবে— তাহলে আমাদের মানবজন্মটা একটা অপরিশোধিত ঋণের স্বরূপ হয়ে আমাদের চিরদায়িক করে রেখে দেবে।

বঙ্কিম এখানে ক্রমে একটু গুছিয়ে নিতে পারচেন। তিনি ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে লেগেছেন। কারখানাঘরের হাতের কাজ এবং ড্রয়িং নিয়েই তাঁকে সবচেয়ে ভুগতে হচ্চে ও দুটো ত আর বই পড়ে সারবার জো নেই। আমাদের দেশের লোক কেবল পড়া মুখস্থ করে স্মরণশক্তি পাকিয়ে তোলে, তাদের হাত পা পঙ্গু হয়ে থাকে— এ সম্বন্ধে এখানকার ছাত্রদের সঙ্গে তাদের আকাশপাতাল তফাৎ। হাত পা চোখ কান বলে একটা যে পরম দান আমরা বিনাপয়সায় পেয়েছি সেটা আমরা একেবারেই ভুলে বসে আছি— সেটা আমাদের না পাওয়ারই সামিল হয়েছে— এখানকার শিশুরা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে ওস্তাদ। আমদের সঙ্গে একত্রে থাকাতে বঙ্কিমের আর্থিক সুবিধা অনেকটা হয়েছে। তার উপরে তাঁর একজন মাড়োয়ারি মুরুব্বি তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে পত্র লিখেছে। শুধু এখন সাহায্য করবে তা নয়— উনি কাজ শিখে গেলে বিদ্যাটাকে ব্যবহারে লাগবার ব্যবস্থা করে দেবে। সুতরাং ওঁর সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। সুরুলের বাড়িটার দখল এতদিনে নিশ্চয় পেয়েছ। সেটাকে কোনোরকমে বিদ্যালয়ের কোনো কাজে লাগিয়ে কোনোদিক থেকে যদি একটু সুবিধা করতে পারা যায় তা হলেই আমি খুসি হই। নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে ওর থেকে কিছু না কিছু উপায় হতে পারে। বরাবর বিদ্যালয়ের সকলেই ঐ বাগান ও বাড়িটার প্রতি লোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু যখনি ওটা অধিকারের মধ্যে এল তখনি কি ওটার সমস্ত প্রয়োজন লোপ হয়ে গেল? ওটা নিশ্চয়ই বিশেষ কাজে লাগবে আমার মনে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। ইতি ১০ই পৌষ ১৩১৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street
Urbna, Ill,
U. S. A.
২০শে পৌষ, ১৩১৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার ওখানে আবার ছেলেদের খাওয়া আরম্ভ হয়েছে এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করচি। বিদ্যালয়ের ভোজনশালার চেয়ে তোমার ওখানে খাওয়া ভাল হবে বলেই যে খুসি হচ্চি তা নয়। একজন কেউ মনের সঙ্গে যত্ন করে ওদের খাইয়ে দিচ্চে— এইটেই ওদের পক্ষে সবচেয়ে উপাদেয়। মানুষ ত শুধু কেবল রসনা দিয়ে খায় না সে হৃদয় দিয়ে খায়। সেই সর্ব্বাঙ্গীণ খাওয়াটি সবচেয়ে দরকার শিশুদের— সেইটে ছেলেরা তোমার ওখানে পাবে এইটে বিদ্যালয়ের পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর। জগৎসংসারে সকল কাজের মধ্যেই মেয়েদেরও একটি বিশেষ কাজ আছে কেবলমাত্র ঘরসংসারের মধ্যে নয়। পৃথিবার কোথাও একথাটা আজও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি— কিন্তু না হয়ে থাকবার জো নেই— জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের এই যে অসম্পূর্ণতা মানবপ্রকৃতি কোনো মতেই চিরদিন বহন করবে না। আমাদের হতভাগ্য দেশে নারীশক্তিকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঘরের কোণে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে, আমাদের সমাজকে যে কি রকম পঙ্গু করে দিয়েছে— তা বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই। আমার

বিদ্যালয়ে সেই অভাবটি যথার্থভাবে যদি দূর হতে পারে তাহলে আমি খুব খুসি হই। এটাকে সম্ভবপর করে তুলতে গেলে এজন্য আমাদের কঠিনরূপে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের অনেকদিনের সংস্কার ও অনভ্যাস বড় ভয়ানক বাধা— তার দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই পরস্পরের সম্বন্ধ সহজ হতে পারে না— সর্ব্বদাই সেটা সম্বন্ধে চেতনার অতিশয়তা ঘটে। ধীরে ধীরে এই গ্রন্থি মোচন হয়ে গেলে সংসার কি সুন্দর কি পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। আমাদের অনভ্যাসের ব্যবধানের গা ঘেঁসে কলুষ জমে জমে উঠে এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে আমাদের জীবনক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান থেকেই আমরা জননীকে একেবারে বিদায় করে দিয়েছি— আমাদের সমাজের পনেরো আনা অংশ মাতৃহীন— তেমন দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? পাপের দ্বারাই আমরা মাকে বিদায় করি, আবার মায়ের চোখের উপর থাকিনে বলেই পাপ বেড়ে ওঠে। এমন করে কখনই মঙ্গল হতে পারে না। আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র জননীর সাধনা করা আমাদের বাকী আছে। শিবের সঙ্গে সতীর মিলনের অপেক্ষা রয়েছে নইলে দেবতার স্বর্গচ্যুতি ঘুচবে না— শিবের ক্রোধ মদনকে ভস্ম করে দিক্ এবং সতী তপস্যা করুন তবেই মঙ্গল জন্মগ্রহণ করবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানে রাস্তা এমন বরফে আচ্ছন্ন হয়ে পিছল হয়ে আছে যে দুদিন আমি ঘর থেকে বেরতে পারিনি। আজ সূর্য্যের আলোতে আকাশ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল ভেবেছিলুম আজ যেমন করে হোক বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে বেলা শেষ হয়ে এল, সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে— দেখতে দেখতে আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে তখন আমার মত অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে বরফের উপর দিয়ে পিছলে চলা ঠিক নিরাপদ না হতেও পারে। তাই এখনো এ সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারিনি। কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে আর পেরে উঠছিনে— অতএব অন্ধকার হোক্ আর পিছল হোক্ আজ একবার বেরব— নইলে মাথার মধ্যে বুদ্ধিশুদ্ধি যেন রাত্রিবেলার পথের মত মুদে রয়েছে। এবারে শুনচি তোমাদের ওখানে বেশ একটু শীত পড়েছে— ছেলেদের শরীরের পক্ষে তাতে বোধ হয় ভালই হবে। এখানে বাইরে থেকে শীতের মূর্ত্তিটা যে রকম ভয়াবহ এবং চারিদিকে তার পাত্রমিত্র সভাসদের যে রকম আড়ম্বর, আসলে কিন্তু উপদ্রবটা তেমন দুঃসহ নয়। এমন কি, আমার মনে হয় বোলপুরে থাকতে সেখানকার শীত এক একদিন এখানকার চেয়ে অনেক বেশী অভিভূত করত। বোধ হয় তার একটা কারণ এখানে শীতের জন্যে মানুষে নানা রকম করে প্রস্তুত হয়ে থাকে। বিলাতে ঘরে আগুন জ্বালায়। কিন্তু এখানে অন্য রকম ব্যবস্থা। সব নীচের তলায় একটা অগ্নিকুণ্ড আছে— সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে অনেকগুলো পাইপ উঠে প্রত্যেক ঘরের এক একটি ছিদ্রপথে তপ্তবায়ু নিঃশ্বাসিত করে দিচ্চে। পাইপের ভিতরকার বাতাস আগুনের তাপে গরম হয়ে বেরিয়ে আসে, আর কিছু না, এতে সমস্ত ঘরটি সমান

রকমে গরম হয়ে থাকে—কেবলমাত্র আগুনের কাছটা নয় সমস্ত বাড়িটা তাত পায়। কোনো কোনো বাড়িতে পাইপের ভিতর দিয়ে গরম জল প্রবাহিত হয়ে ঘরকে গরম করে রাখে— সেটা এ ব্যবস্থার চেয়ে আরো ভাল। এ ছাড়া এখানে অহোরাত্র গরম কাপড়ের বোঝা বয়ে বয়ে সেটা যেন শরীরের চামড়ার মতই অভ্যাস হয়ে গেছে। ওভারকোট প্রভৃতি সুদ্ধ যখন রাস্তায় বেরনো যায় সে একেবারে মুটের বোঝা— অথচ এখানে সেটা বিশেষ কিছুই মনে হয়না। মনে ভয় ছিল শীতটা বুঝি বা আমাকে কিছু কাবু করবে কিন্তু দিব্যি চলে যাচ্চে। আমি আবার রাত্রে একেবারে ঘর বন্ধ করে থাকতে পারিনে— বাইরের দিকের একটা দরজা সম্পূর্ণ খুলে রেখে দি। যেদিন বরফ জমা রাত হয় সেদিন কান নাক, মাথা বেশ একটু ঠাণ্ডা হয়ে থাকে সকাল বেলায় লেপ কাঁথা কম্বলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যের দরকার হয়। প্রতিদিন আবহাওয়ার সঙ্গে এই রকম লড়াই করে চলতে হচ্চে। প্রকৃতিই এখানকার মানুষদের অহোরাত্র নাড়া দিয়ে রাখে— বেঁচে থাকতে হবে এ কথাটা ভুলে থাকবার জো নেই— আমরা ত সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়েই বেঁচে থাকি—গাছের তলায় পড়ে থাকি ভাবনা নেই, পথ দিয়ে চলি ভাবনা নেই, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরি ভাবনা নেই, আধপেটা খাই ভাবনা নেই— এখানে তা হবার জো নাই। এইজন্যে সব তাতে লড়াই করা এদের গোড়া থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে— কোনো অসুবিধাকেই এরা কিছুতে মেনে নিতে চায় না— তাই এরা কেবলই অসাধ্য সাধন করেই চলেছে— আর আমরা কেবল সাধ্যকে সকলে মিলে অসাধ্য করে তুলছি— পনেরো আনা শক্তিকে চিরজীবন শিকেয় তুলে রেখে দিয়েছি। ইতি ২৪শে পৌষ ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংখ্যার কয়েকটি চিঠিতে সুরুলের যে-বাড়ির উল্লেখ আছে তাহা পরে শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা-অনুষ্ঠানের কর্মকেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া, ঐ বাড়ি "নিশ্চয়ই বিশেষ কাজে লাগবে আমার মনে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহমাত্র নেই" কবির এই আশা পূর্ণ করিয়াছে।

বধূ

শিল্পী শ্রীসুনয়নী দেবী

চিত্রাধিকারী শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বাংলা বানানে অ এবং অকার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বাংলা বানানের আলোচনা অ নিয়েই সুরু হওয়া উচিত। প্রথমতঃ অ আমাদের বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, দ্বিতীয়তঃ অ এবং অকারের ব্যবহার বাংলায় যত বেশী এত আর কিছুর নয়, তার উপর বানানের গোলযোগও এই দুটিকে নিয়েই সবচেয়ে বেশী।

অ-আ

নরদমা-নরদামা, নয়নজুলি-নয়ানজুলি, মোহনা-মোহানা, ফষ্টিনষ্টি-ফষ্টিনাষ্টি, দুটি ক'রে বানান অভিধানে রয়েছে, একপ্রস্থ বানানই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কথা হচ্ছে কোন্‌টিকে ফে'লে কোন্‌টিকে রাখব? শব্দগুলি দেশজ অথবা অজ্ঞাতমূল, সুতরাং ব্যুৎপত্তির প্রশ্ন উঠছে না। আমার মনে হয় এরকম সব ক্ষেত্রে যে বানানটি বহুপ্রচলিত সেইটি রক্ষিত হয়ে অপরটি পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। সহচর যুগ্ম শব্দ ব'লে ধ্বনিসাদৃশ্য বজায় রেখে ফষ্টিনষ্টি লিখতে চাই, সেই বানানটাই চলেও বোধহয় বেশী। অন্য তিনটি শব্দেও অকার বানানটাই বেশী চলে, সেইটেকেই চলতে দেওয়া ভাল।

দ্বিতল-দুতলা, ত্রিতল-তিনতলা; বিকৃতির আরো একধাপ নীচে নেমে গিয়ে দুতালা, তিনতালা লেখবার কি দরকার? বাড়ী একতলা, তাল একতালা, মানের এই তফাৎটাও তাহলে রাখতে পারা যাবে। 'গাল থেকে পায়ের পিণ্ড বা গোড়ালি অবধি' এই যদি বাস্তবিক গণ্ডেপিণ্ডে কথাটার মানে হয়, তাহলে গাণ্ডেপিণ্ডে লেখা কিছুতেই চলতে পারে না। মহন্তই ত যথেষ্ট, সেটাকে বিকৃত ক'রে মহান্ত লিখে কার কি লাভ? অ-ও প্রসঙ্গে মোহন্ত-মোহান্ত বানানও যে অবিধেয় তা দেখতে পাব। সুতিক্ত-সুক্ত, একটা আকার যোগ নিতান্তই অকারণ, সুক্তই যখন বেশী চলেও তা ছাড়া।

কিরাততিক্ত-চিরাতা, কিন্তু চিরতা, চিরেতা বানানও অভিধানে রয়েছে। হসন্ত, হসন্তবৎ ব্যঞ্জন (যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর হসন্ত), বা স্বরবর্ণ পরে না থাকলে পদমধ্যবর্ত্তী অযুক্তাক্ষরের অকার বাংলায় সাধারণতঃ হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় বা অন্যস্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এদিক্ থেকে দেখলেও চিরতা বানান অবিধেয় ব'লে মনে হয়। চিরেতা বানান চলা উচিত কিনা, সে বিচার পোষাকী-বনাম-চলতি বাংলা নিয়ে বিতর্কের এলাকায় গিয়ে পড়ছে।

কথা উঠতে পারে, মহন্ত-মহান্ত-মোহন্ত-মোহান্ত, সব ক'টিকে চলতে দিতে ক্ষতি কি? একই শব্দের কোথাও তৎসম, কোথাও বা তদ্ভব-রূপের ব্যবহার বাংলার একটি মস্ত বিশেষত্ব, এ বিশেষত্বকে সর্ব্বত্রই ত আমরা স্বীকার ক'রে চলেছি? তা চলেছি বটে, কিন্তু এই বিশেষত্বের প্রয়োজন এবং সার্থকতা কেবল সেইখানেই, যেখানে দুটি রূপের মধ্যে ধ্বনির তফাৎ বেশ খানিকটা রয়েছে। অন্ধকারের পাশে আঁধার, সন্ধ্যার পাশে সাঁঝ, পক্ষীর পাশে পাখী বাংলায় চিরকাল চলবে, কিন্তু পূযের পাশে পুঁজ, মহন্তর

পাশে মোহন্ত একেবারে অকারণ। পূয়, মহন্ত কখনোও লিখব না স্থির ক'রে পুঁজ মোহন্ত লেখা চলতে পারে। আটপৌরে যে ভাষা সাহিত্যে ক্রমেই বেশী ক'রে চলছে, তারও ভিতরে অকারণ-গ্রাম্যতাকে যত কম প্রশ্রয় দেওয়া যায় ততই ভাল। একই শব্দের খুব কাছাকাছি উচ্চারণের একাধিক অপভ্রংশকে নির্ব্বিচারে চলতে না দিয়ে, যেটি বেশী চলে সেইটিকে রেখে অন্যগুলিকে এই কারণে বর্জ্জন করা ভাল।

অষ্টাশি-আটাশি দুটি বানানই অভিধানে পাচ্ছি। সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গে অষ্টাশি চলে, পূর্ব্ববঙ্গে আটাশি। যেহেতু পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষার চালটাই বাংলায় মুখ্যতঃ গ্রাহ্য, এবং অষ্টাশি উচ্চতর স্তরের অপভ্রংশ, আটাশি আমার বিবেচনায় পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু উচ্চতর স্তরের হওয়া সত্ত্বেও অষ্টেপৃষ্ঠে নয়, আষ্টেপৃষ্ঠে; কেননা গোটাটাই একটা বিশিষ্টার্থক বাংলা যৌগিক শব্দ। বিশিষ্টার্থক না হলেও এই ধরণের বহুপ্রচলিত যৌগিক শব্দ ব'লে গুটি-আষ্টেক চলবে।

বিদেশাগত শব্দের মধ্যে আরবী ফারসীর শেষের অহ্ বাংলায় প্রায় সর্ব্বত্রই আ। সেগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। গোড়ার অ এবং অকারও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আ এবং আকার। মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত অ-র চাইতে আরবী-ফারসীর অ যে উচ্চারণে বেশী আ-ঘেঁষা তা নয়।*

অইশ-আয়েস, অক্‌ল্-আক্কেল, অখজ-আখেজ, অজান-আজান, অদব-আদব, অন্দাজ-আন্দাজ, অর্ক্-আরক, অলবত্তাহ্-আলবৎ বা আলবাৎ, অলাহিদহ্-আলাহিদা বা আলাদা, অল্‌খালিক-আলখাল্লা, অল্‌গ্-আল্‌গা, অল্লাহ্-আল্লা (সংস্কৃতে পাই অল্লোপনিষদ্), অস্‌ল্-আসল, অহিস্তহ্-আস্তে, কতার-কাতার, কমান-কামান, কমী-কামাই, কমীস-কামিজ, খজানহ্-খাজানা বা খাজনা, খমীর-খামিরা বা খাম্বিরা, খরাপ-খারাপ, খস্ত-খাস্তা, গলিচহ্-গালিচা, জহাজ-জাহাজ, জহান্নম-জাহান্নম বা জাহান্নাম, জহান্‌পনাহ্-জাহাঁপনা, তমাসা-তামাসা, তমাদী-তামাদী, তলাক-তালাক বা তাল্লাক, দগা-দাগা, দমামহ্-দামামা, দরা-দাওয়াই, দস্ত্-দাস্ত, নজহাল-নাজেহাল, নফ্অ-নাফা, পঞ্জাবহ্-পাঁজা, পঞ্জহ্-পাঞ্জা, বলা-বালাই, বহানহ্-বাহানা বা বায়না, বহার-বাহার, মঅ-মায়, রস্তহ্-রাস্তা, সইস্তহ্-সায়েস্তা, সজা-সাজা, হম্‌অহাল-হামেহাল, হমেশহ্-হামেশা, হয়রাণ-হায়রাণ, হরাম-হারাম, হলাল-হালাল, হল্‌ৱা-হালুই, হৱা-হাওয়া, হৱাই-হাউই, হৱালত-হাওলাত, হবশী-হাবশী, হৱলাহ্‌দার-হাওলাদার।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বিদেশী শব্দের আ-ঘেঁষা অ-কে আ দিয়ে বানান করাই বাংলার ধাত, সুতরাং নর্স্, বস্, ক্লব লিখব না; নার্স্, বাস্, ক্লাবই হবে বিহিত বানান। মনীব্যাগ লিখব না, লিখব মানীব্যাগ। জষ্টিস বা জস্টিস চলবে না, লিখব জাষ্টিস বা জাস্টিস¶ কিন্তু জাজ নয়, জজ, কেননা জজ জাতে-ওঠা বাংলা শব্দ। বড় ইংরেজী-নবিশরাও যখন বলেন জজ-সাহেব, তখন Judge ভেবে কথাটার উচ্চারণ করেন না। জজিয়তি, জাজিয়তি নয়।

উচ্চারণে বাংলা অ-র ধরণের পূরোপূরি অকারও কয়েকটি শব্দে আ হয়, অর্ডার্‌লি-আর্দালী, ডক্টার-ডাক্তার, পলিশ-পালিশ, বক্স্-বাক্স, অফিস-আফিস বা আপিস। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হলে ডক্টার (কেউ কেউ ডক্টর বানান ক'রে থাকেন, সেটা আমার বিবেচনায় ভুল), ডাক্তার নয়।

* আরবী ফারসী ভাষা আমার সম্পূর্ণ অজানা। উচ্চারণগুলি নির্ভরযোগ্য বাংলা অভিধানে যেরকম পেয়েছি, লিখেছি।

¶ ষ্ট এবং স্ট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শ-ষ-স সম্বন্ধীয় আলোচনায় পরে বলব।

থিয়েটার বা সার্কাসের বক্স্, বাক্স নয়। আফিসার বা আপিসার বলতে নেই, বলতে হবে অফিসার। এর কারণ, ডাক্তার জাতে-ওঠা বাংলা শব্দ কেবলমাত্র চিকিৎসক অর্থে, বাক্স পেটিকা অর্থে, এবং জাতে-ওঠা বাংলা শব্দ ব'লেই আফিসের সঙ্গে বিদেশী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে আফিসার নিষ্পন্ন হ'তে পারে না।

বহাল থেকে বহাল-বাহাল, দরৱান থেকে দরোয়ান-দারোয়ান, তন্বূরহ্ থেকে তম্বূরা-তানপূরা, ফলাহ্ থেকে ফলাও-ফালাও, ফয়সলাহ্ থেকে ফয়সলা-ফয়সালা, খুলসাহ্ থেকে খোলসা-খোলাসা, দুটিদুটি বানানই চলেছে, একপ্রস্থ বানান অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

মানের তফাৎ বোঝাবার জন্যে আলাদা বানান গ্রহণ করাই বিধেয়। যেমন: ফটক-দরজা, ফাটক-জেলখানা; মহল-বাড়ীর অংশ, মহাল-জমিদারী; হকিম-ইউনানী বৈদ্য, হাকিম-বিচারক। কিন্তু একই শব্দের একই অর্থে একাধিক বানান থাকা উচিত নয়, ওতে ভাষায় শৈথিল্য এনে দেয়, এবং নিয়মানুবর্তিতা ভাষার একটা বড় গুণ। অনেক প্রয়োজনীয় মনোভাব বাংলায় প্রকাশ করতে এখনও আমাদের গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যেতে হয়, সেই ভাবের উপযুক্ত বাহন অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অদরকারী কয়েক শ কথার দুটো, তিনটে, এমনকি চারটে ক'রে বানানও অভিধানে রয়েছে! এই ধরণের নিরর্থক বৈকল্পিক বানানে বাংলা অভিধান ভারাক্রান্ত।

বহার থেকে যেমন বাহার, বহাল থেকে তেমনি বাহালই হওয়া উচিত। দরোয়ানের চাইতে দারোয়ান ভাল, ওতে বেশ একটু দেশী ভাবেরও আমেজ আছে, মনে হয় যেন কথাটা দ্বারবান থেকে এসেছে। ওই একই কারণে আমি, ফালাওয়ের চাইতে ফলাওয়ের পক্ষপাতী, যদিও ফলের সঙ্গে কথাটার কোনও সম্পর্ক নেই। সলাহ্ বাংলায় সলাপরামর্শে চলছে, সুতরাং ফয়সলা বিহিত বানান, ফয়সালা নয়। তানপূরা শুনতে ষোল আনা বাংলা এবং চলেও সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে, অতএব তম্বূরা তাকে তোলা থাকাই ভাল। হসন্ত, হসন্তবৎ ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণ পরে না থাকলে পদমধ্যবর্তী অযুক্ত ব্যঞ্জনের অকার সাধারণতঃ হসন্তবৎ উচ্চারিত হয়, অথবা অন্য স্বরে রূপান্তরিত হয়, এ আমরা দেখেছি; এইদিক্ দিয়ে বিচার করলে খোলসা বানান অবিধেয় ব'লে মনে হয়, খোলাসাই ঠিক।

কাইদহ্ থেকে যেমন কায়দা, ফাইদহ্ থেকে তেমনি ফায়দা, ফয়দা নয়। আলবৎ, জাহান্নমের চাইতে আলবাৎ, জাহান্নাম ভাল, আকার বানানে জোরালো কথাদুটোর জোরও বাঁধে বেশী। কিন্তু খাজানা ছেড়ে খাজনা রাখা ভাল, কারণ খাজনা বেশী চলে এবং ওটা জোর দিয়ে বলবার কথা নয়।

খুব অল্প কয়েকটি জায়গাতে আ অ হয়। যেমন: হরকারহ্-হরকরা, তালাব্-তলাও, গুমান-গুমর, নাম্বার-নম্বর; আ এবং আকার প্রসঙ্গে এদের নিয়ে ভাল ক'রে আলোচনা করব।

অ-ই

কয়েকটি বিদেশাগত শব্দের গোড়ার অ বাংলায় ই হয়। কম্‌খোয়াব-কিংখাব, কনারহ্-কিনারা, কল্অ-কিল্লা, খড়কী-খিড়কি, জনজীর-জিঞ্জির, দস্তহ্-দিস্তা, নমক-নিমক, নমকীন-

নিমকি, মহীন-মিহি (পূর্ব্ববঙ্গে মিহিন), রফু-রিফু, সরনামহ্-শিরনামা বা শিরোনামা, সরুপেচ-শিরপেচ, সরেশ-শিরিশ। কয়েকটিতে মাঝের অ ই হয়, যেমন, জাজম-জাজিম, জিগর-জিগির। যাঁরা পোষ্টাফিসকে পোস্ট্অফিস, আপোষকে আপস করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা এই শব্দগুলির ইকার বদ্লে অকার করতে পরামর্শ দেবেন কি? বিদেশাগত শব্দের ই আবার কোথাও কোথাও অ হয়, যেমন, আশিক-আশক, নাকিস্-নাকচ, নাবালিগ-নাবালক, ইর্শ্-অর্শানো, সাজিশ-সাজশ, সিনাখ্ৎ-সনাক্ত। নূতন ক'রে আবার ই চালানো কি চলবে?

কতকগুলি দেশী শব্দের শেষের অ আটপৌরে ভাষায় ই হয়। যেমন, অবশ্য-অবিশ্যি, অমান্য-অমান্যি, আত্ম-আত্তি, দিব্য-দিব্যি, ধন্য-ধন্যি, নৈবেদ্য-নৈবিদ্যি, নস্য-নস্যি, নিত্য-নিত্যি, পথ্য-পথ্যি, পিণ্ড-পিণ্ডি, পিত্ত-পিত্তি, পুণ্য-পুণ্যি, বৈদ্য-বদ্যি, ভাগ্য-ভাগ্যি, মিষ্ট-মিষ্টি, সত্য-সত্যি, সাধ্য-সাধ্যি, যক্ষ-যক্ষি, হবিষ্য-হবিষ্যি।

'আত্তি জানাতে এসো না', 'তোমার দিব্যি', 'পিণ্ডি চটকে দিয়েছে', 'পুণ্যিপুকুর ব্রত', 'মিষ্টি খেতে দিল (মিষ্টান্ন অর্থে)', 'সত্যি ক'রে বল (শপথ অর্থে)', 'হবিষ্যি করা (হবিষ্যান্ন খাওয়া অর্থে)', ইকার-যুক্ত এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুলোর স্থান ভাষাতে থাকবেই। দস্যু থেকে নিষ্পন্ন দস্যিকেও এই কারণেই ছাড়া চলবে না, বাকীগুলোকে অকারণ বিকৃতি ব'লে বাদ দেওয়া ভাল। একটি অভিধানে পথ্য অর্থে পত্যি-পত্তি পাচ্ছি! দেশের বিশেষ একটি অঞ্চলের গ্রাম্যতা মাত্রকেই কি ভাষায় স্থান দিতে হবে?

মনে রাখতে হবে, যখন বলি, 'সে তো সেখানে দিব্যি আছে,' কিম্বা 'সত্যি, তোমার যাওয়া উচিত,' তখনও বিশিষ্টার্থে ই ও কথাদুটোর প্রয়োগ আমরা ক'রে থাকি। সত্য = true, truth; সত্যি = truly। যখন বলি 'মিষ্টি ক'রে হাসল' তখন বহুপ্রচলিত একটা ইডিয়মের প্রয়োগ করি, 'মিষ্ট ক'রে হাসল' বললে বা লিখলে লোকে হাসবে। আমার মনে হয়, নানা ভাবে মিষ্টি কথাটা বাংলায় এতই বেশী চলে যে সোজাসুজি মিষ্ট অর্থেও তাকে চলতে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তাচ্ছল্য-তাচ্ছিল্য। যদি তুচ্ছ কথাটার সহচর শব্দ মাত্র হয় তাহলে ধ্বনিসাদৃশ্য হেতু তাচ্ছল্যই ঠিক বানান। কিন্তু তাচ্ছিল্য এত বেশী চ'লে গিয়েছে যে অবিধেয় হলেও তাচ্ছল্য ছেড়ে তাকেই ভাষায় রাখতে হবে।

অ-উ

উচ্চারণ-সৌকর্য্য, ধ্বনিসঙ্কোচ বা অক্ষর-সাশ্রয় না হলে অপভ্রংশের বহুপ্রচলিত একটি স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে নেমে যাওয়ার সাধারণতঃ মানে হয় না কিছু। যদি নিম্নতর স্তরের শব্দটি চলে বেশী এমন হয়, তাহলে সেইটিকে রেখে অন্যটিকে বর্জ্জন করা উচিত। দুটি স্তরের অপভ্রংশের মধ্যে ধ্বনি-বৈসাদৃশ্য যদি বেশী হয়, এবং দুটিই যদি বহুপ্রচলিত হয়, তাহলেই দুটি বানানকে রেখে দেওয়া চলে। যেমন, কাঁপন-কাঁপুনি, বাঁধন-বাঁধুনি, মানুষ-মনিষ্যি-মিনষে। মিনষের কথাতে মনে পড়ল, বিভিন্ন স্তরের অপভ্রংশের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অর্থ-বৈষম্য দাঁড়িয়ে গেছে দেখা যাবে সেসব জায়গায় আলাদা বানান অবশ্যই রাখতে হবে।

অপভ্রংশের নিম্নতর স্তরে কতকগুলি গোড়ার অ উ হয়। যেমন: গণিয়া-গুণিয়া, খন্তি-খুন্তি, সমুখ-সুমুখ, ফর্শ্ থেকে ফরসি (ফরাসের হুঁকা), তার থেকে ফুরসি। "ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া," কিন্তু মালবিকার যুগের মত গণিয়ার যুগও বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। অগণতি নয়, অগুণতি; গণাগণতি নয়, গোণাগুণতি। সুতরাং গণিয়া ছেড়ে গুণিয়া নিতে বলব। খন্তি দিয়ে মাটি খুঁড়ব, খুন্তি দিয়ে মাছ উল্টে ভাজব, এই ব্যবস্থাই ভাল মনে হয়। সমুখ যখন অভিধান-বিহিত এবং বহুপ্রচলিত বানান, তখন সুমুখ আর কেন? ফরাস যখন বলছি তখন ফরসি বলতে কোথায় আটকাচ্ছে, ফুরসি কেন অকারণ?

অকারান্ত যুক্তব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন বর্জ্জিত হলে অকার অনেক ক্ষেত্রেই অন্য স্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায় বা হসন্তবৎ হয়। যেমন: চক্র>চাকা-চাক, গুচ্ছ>গোছা-গুছি, উচ্চ>উঁচা-উঁচু, পিচ্চট>পিচুটি, পিপ্পলী>পিপুল। এদিক্ থেকে দেখলেও বর্বরী>বাবুই, দ্বিপ্রহর>দুপুর, উগ্র>আগুরী, বেল্লন>বেলুন ইত্যাদি শব্দের উকার বানানই বিহিত ব'লে মনে হয়। বাবই, দুপর, আগরী, বেলন অভিধানে রয়েছে, না থাকাই উচিত। অখট্টি>আখুটি এই পর্যায়ে পড়ে বলা যায়। এই সূত্র অনুসারেই পুষ্কর>পুকুর, ব্রাহ্মণ>বামুন। বামনের (খর্ব্বকায় ব্যক্তির) স্ত্রীরূপ বামনী, ম অকারান্ত। ব্রাহ্মণী-বামনী, ম হসন্তবৎ। একই সূত্রে শুদ্ধ (অমিশ্রিত) পূর্ব্ববঙ্গে শুধা হুদা, পশ্চিম বঙ্গের শুধু। সুদ্ধ (সহিত) একটা আলাদা কথা, বোধহয় সার্দ্ধম্ থেকে এসেছে; পূর্ব্ববঙ্গে এবং হিন্দিতে কথাটা সুদ্ধা, তার থেকে সুদ্ধ। যুক্তব্যঞ্জন রক্ষিত হচ্ছে ব'লে সুদ্ধু বানান অবিধেয়।

চাকরে-চাকুরে, চাকরি-চাকুরি, ধুতরা-ধুতুরা, পাটনী-পাটুনী, কাগজী-কাগুজী, বেগনী-বেগুনী, ধুচনি-ধুচুনি, খিচড়ি-খিচুড়ি, ছাঁকনি-ছাঁকুনি, আঙটি-আঙুটি প্রভৃতি কতগুলি বানানের আলোচনা "উকার হসন্তবৎ" প্রসঙ্গে পরে বিশদভাবে করব।

তামিল সুরুট্টু থেকে চুরুট, চুরট নয়। অব্যূঢ় থেকে আইবুড়ো, আইবড় নয়। কঞ্চুলি-কাঁচুলি, কাঁচলি নয়। অঙ্কুশ-আঁকুশি, কিন্তু আকর্ষিকা-আকষী, ক হসন্তবৎ। অর্জ্জুন-আঞ্জুনি, আঞ্জনি নয়, অঞ্জনের সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক নেই কথাটার। সম্ভবতঃ তুম্ব-লাউ থেকে কথাটার উৎপত্তি, সুতরাং টই-টুম্বুর, টইটম্বুর নয়।

মিথ্যুক, মিশুক, হিংসুক। হিংসক ও হিংসুকে অর্থ-বৈষম্য একটু আছে। ভীত-ভীতু, নীচ-নীচু ঠিক সমার্থক নয় ব'লে দুটো ক'রে বানানই চলবে।

আদরিয়া-আদুরে, উত্তরিয়া-উত্তুরে, তেমনি কাঁদুনে, কুঁদুলে, কাঁকুরে, কাপুড়ে, চটুকে, জঙ্গুলে, পাথুরে, বাঁদুরে, বাদুলে, বাহাত্তুরে, ভাদুরে, ভাবুনে, রাক্ষুসে, সহুরে প্রভৃতি আটপৌরে ভাষার ব্যাকরণ-বিহিত বানান।* পোষাকী বাংলাতেও ক্রমে এই বানানগুলিই বেশী ক'রে চলছে, আদরিয়া, উত্তরিয়া, কোন্দলিয়া লিখবার উৎসাহ মহাপণ্ডিতদেরও আজকাল আর বড় একটা দেখা যায় না।

রাক্ষুসে ব্যাকরণ-বিহিত বানান, কিন্তু রাক্ষুসী গ্রাম্যতা। কঙ্কতিকা-কাঁকই, কাশমর্দ-কাশন্দ,

* চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে "পোষাকী বনাম আটপৌরে বাংলা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্ষারক-খালই,. গলবাহিকা-গলই, বর্দ্ধকী-বাড়ই, হরীতকী-হর্তকী। কাঁকুই, কাগুন্দি, খালুই, গলুই বাড়ুই, হত্তুকি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। রুক্ষু, নব্বুই নিছক গ্রাম্যতা।

বিননি-বিনুনি, আঁটনি-আঁটুনি, চিরণী-চিরুণী, বাঁধনি-বাঁধুনি, কাঁদনি-কাঁদুনি, ধুঁচনি-ধুঁচুনি, নাচনি-নাচুনি, টিপনি-টিপুনি, রাঁধনী-রাঁধুনী, ফুলরি-ফুলুরি, মুখটী-মুখুটী, দুটি ক'রে বানানই অভিধানে আছে। বকুনি অভিধান-সম্মত একমাত্র বানান, বকনি ব'লে কোনো কথা হয় না। জ্বলুনি, ঠুকুনি, ঢুলুনি, কাঁপুনি অভিধানে আছে ; জ্বলনি, ঠুকনি, ঢুলনি, কাঁপনি নাই। বাংলা উচ্চারণের নিয়মে অকার হসন্তবৎ হয়ে যাবার কথা, তাছাড়া চালনি, চিরণী, বাঁধনি, টিপনি রাঢ়-বঙ্গ-গৌড়-সমতটে কেউ বলেও না বড় আজকাল, এইসব কারণে কথাগুলোকে উকার দিয়ে বানান করার আমি পক্ষপাতী। নাচুনি শোনায় না ভাল, চলেও না বেশী, নাচন-ই যথেষ্ট মনে করি।

একটা কথা মনে রাখতে বলি ; বানানে অকারণ-বিকৃতি যেমন পরিহার করা উচিত, ব্যুৎপত্তির বিচারে অকারণ সংস্কারেরও তেমনি কোনোও অর্থ হয় না। বৈকল্পিক বানানের ক্ষেত্রে যে বানানটি বহুপ্রচলিত, সাধারণতঃ সেইটিকে রক্ষা করা উচিত। নিছক গ্রাম্যতা, বা দুর্ব্বল উচ্চারণ বা শ্রুতিকটু উচ্চারণ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে এই নিয়মটি মেনে চলার চেষ্টা করাই সংস্কারকের কর্ত্তব্য। যেখানে বৈকল্পিক একাধিক বানান সমান চালে চলে, ব্যুৎপত্তির বিচার কেবল সেইখানেই করব। কিন্তু সেই বিচারও উচ্চারণসৌকর্য্য, বাংলা উচ্চারণের ধাত, এই-সমস্ত দিক্ যথাসাধ্য ভেবে করতে হবে।

এখনই, তখনই ; এখুনি-তখুনি নয়। কিন্তু এখখুনি, তখখুনি হবে বিহিত বানান। ন-এ ইকার হবে কেননা এখখুন, তখখুন ব'লে কোনো কথা নেই, যে তার সঙ্গে ই জুড়ব।

ববর্চী থেকে বাবর্চী-বাবুর্চী, বেশী চলে ব'লে বাবুর্চী বিহিত বানান। মুরব্বির চেয়ে মুরুব্বি, আজগবির চেয়ে আজগুবি, সেমইয়ের চেয়ে সেমুই বেশী চলে এবং চলতে কোনো বাধা নেই ব'লে উকারের বানানটাই রাখতে চাই। অম্বর-অম্বুরি, জহর-জহুরী, ফক্কড়-ফক্কুড়ি, অকার দিয়ে বানান জোর ক'রে চালাবার চেষ্টাকে অপচেষ্টাই বলব।

চটক পূর্ব্ববঙ্গে চরই, পশ্চিমে চড়াই-চড়ুই, চড়ুই চলে বেশী। কফোনী পূর্ব্ববঙ্গে কনই, ভাষায় অচল ; সুতরাং কনুই। পঞ্জড়ি-পঞ্জুড়ি, গোঁয়ারতমি-গোঁয়ারতুমি, জলই-জলুই, পাঁকই-পাঁকুই, পালই-পালুই, পাঁচট-পাঁচুট, বোধহয় উকারের বানানটাই বেশী চলে। যে-কোনো একটা বানান রেখে অন্যটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কতগুলি শব্দের আ প্রথমতঃ উচ্চারণ-সৌকর্য্যের জন্য অ হয়। পদমধ্যবর্ত্তী অকারের রূপান্তর সম্বন্ধীয় যে সূত্রের সঙ্গে একটু আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে, সেই সূত্র অনুসারে এই অ আবার উ-তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন : চুলকানি-চুলকনি-চুলকুনি, ধুনাচি-ধুনচি-ধুনুচি, উড়ানি-উড়নি-উড়ুনি, কুড়ানী-কুড়নী-কুড়ুনী, কুরাণি-কুরণি-কুরুণি, ধুনারী-ধুনরী-ধুনুরী। "আ-উ" প্রসঙ্গে এদের নিয়ে ভাল ক'রে আলোচনা করব। আগানো-এগনো-এগুনো, পিছানো-পিছনো-পেছুনো প্রভৃতি রূপান্তরের আলোচনাও তখনই করা যাবে।

পাঁচই-পাঁচুই, ছয়ই-ছউই, সাতই-সাতুই, আটই-আটুই, নয়ই-নউই, চোদ্দই-চোদ্দুই, দুটি ক'রে বানান অভিধানে পাচ্ছি। কিন্তু দশই, এগারই, বারই, তেরই, পনেরই, যোলই, সতেরই,

আঠারই, এদের বৈকল্পিক দশুই, এগারুই, বারুই ইত্যাদি পাচ্ছি না। একদিকে চোদ্দুই পাচ্ছি, অন্যদিকে দশুই পাচ্ছি না, নয়ত সূত্র করা চলত : সংখ্যাবাচক শব্দের শেষের অকার হসন্তবৎ হলে প্রত্যয়ের ই-র পূর্ব্বে উকারের আগম হয়। আমার বিবেচনায় পাঁচুই, ছউই, সাতুই ইত্যাদি নিছক গ্রাম্যতা। সূত্র হওয়া উচিত : ই-প্রত্যয় যোগ হলে সংখ্যাবাচক শব্দের শেষের হসন্তবৎ অকার আর হসন্তবৎ থাকে না।

তালই-তালুই. তাঅই-তাউই, মাঅই-মাউই-মাঁবুই, সব-ক'টিই অতিশয় উৎকট শুনতে। সম্পর্কদুটো এমনকিছু গুরুতর নয় যে নাম একটা ক'রে থাকতেই হবে। তাঅই মাঅই রেখে অন্য-গুলোকে অন্ততঃ বর্জ্জন করা যেতে পারে। কবোষ্ণ অর্থে—কুসম-কুসম ; কুসুম-কুসুম গ্রাম্যতা।

কাঁদকাঁদ, ঢলঢল, ধরধর, পড়পড়, মরমর, হবহবর মত নিবনিব, ডুবডুব বানান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আটপৌরে ভাষার উচ্চারণ-বিকৃতির নিয়মে পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার এবং উকারের টানে অ সঙ্কুচিত হয়ে উ হয়ে যায়, সেই সূত্রে নিবুনিবু, ডুবুডুবু। বহুপ্রচলিত ব'লে এই বিকৃতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তাহলে ডুবডুব, নিবনিব সম্পূর্ণ বজ্জিত হওয়া উচিত।

হবু-জামাইয়ের উকার নিয়ে কোনো তর্ক উঠতে পারে না।

বিদেশাগত শব্দের অ উ হবার দৃষ্টান্ত : ৱজীর-উজীর, ৱসুল-উসুল (পূর্ব্ববঙ্গে বলা হয় উসল) মহকমহ্-মহকুমা, মুহর্রির-মুহুরী, মুলতবি-মুলতুবি, মুৎসদ্দি-মুচ্ছুদ্দি। কতগুলি শব্দে উ অ হয়, যেমন : ৱুজুহাত-অজুহাত, কুসূর-কসূর, গুম্বদ-গুম্বজ-গম্বুজ, জুলুস-জলুস, দুরুস্ত্-দুরস্ত, তঅজ্জুব-তাজ্জব, দুরূণ-দরুণ, তরজুমৎ-তরজমা, তদারূক-তদারক, ফুতুর-ফতুর, বুনিয়াদ-বনিয়াদ, মুফস্বল-মফস্বল, মুহর্রম-মহরম, মুহম্মদ-মহম্মদ, মৌরূসী-মৌরসী, সুআল-সওয়াল, সুহবৎ-সহবৎ। জাতে-ওঠা বাংলা শব্দগুলোর নূতন ক'রে জাত মেরে আবার আরবী-ফারসী চেহারা বানিয়ে দেবার পক্ষপাতী আমি নই। সেইজন্য প্রপিতামহদের আমলের পোর্তূগীজ থেকে আগত ক্রুশই আমার ভাল, দুপাতা ইংরেজী পড়েছি ব'লে হঠাৎ ক্রস লিখতে সুরু করতে আমি প্রস্তুত নই।

যাঁরা বুরুশকে ব্রাশ, বেঞ্চিকে বেঞ্চ করবার পক্ষপাতী কথাটা তাঁদের একটু ভেবে দেখতে বলি।

অ-এ

কতগুলি বিদেশাগত শব্দের গোড়ায় অ এ হয়, যেমন নখ্রহ্-নেকরা, নশা-নেশা, ফরেব-ফেরেব, ফসাদ-ফেসাদ, বরাদর-বেরাদর, রজাই-রেজাই, সর্-সেরা, সর্রিশ্তহ্-সেরেস্তা, সলাম-সেলাম। কোথাও কোথাও শেষের অ এ হয়, যেমন, ফতহ্-ফতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকারগুলো উচ্চারণে আকার-ঘেঁষা ব'লে আ এ হবার দৃষ্টান্ত ব'লেও এগুলোকে ধরা যেতে পারে।

জমাঅৎ থেকে জমায়ত-জমায়েত। আমার মনে হয় য়-এ একার দেওয়া অকারণ, কেননা, বাংলাতে য়-এর উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে এমনিতেই যথেষ্ট একার-ঘেঁসা। প্রাচীন বাংলায় ত প্রায়শঃ য়-এর বদলে সোজাসুজি এ দিয়ে বানানই করা হত। পঞ্চায়ত-পঞ্চায়েত, রামায়ত-রামায়েত,

লিঙ্গায়ত-লিঙ্গায়েত, সেবায়ত-সেবায়েত, দুটো ক'রে বানানই অভিধানে আছে। আমার বিবেচনায় একার না দিয়েই কথাগুলোকে বানান করা উচিত। বয়ঃক্রম, বয়স্ক, বয়স্থ, বয়সী, বয়স্য এত বেশী আমাদের ব্যবহার করতে হয়, যে আটপৌরে ভাষাতেও বয়েস লিখে শিক্ষার্থীর ধোঁকা লাগানো উচিত নয়। বয়স, পায়স লেখা হবে, তারপর যাঁদের অভিরুচি বয়েস, পায়েস উচ্চারণ করবেন।

অকারান্ত যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি পরিত্যক্ত হলে অকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য স্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অন্যথা হসন্তবৎ হয়। এই সূত্র অনুসারে প্রাচীন বাংলার একল থেকে একেলা এবং একলা (ক হসন্তবৎ) দুইই পাচ্ছি। একেলা পদ্যে ছাড়া বড় একটা চলে না, সুতরাং একলা বিহিত বানান।

পঞ্চদশ, সপ্তদশ প্রাকৃতে পন্নরহ, সত্তরহ, যুক্তাক্ষরের একাক্ষর লোপের নিয়মে হয় পনর, সত্‌র (পূর্ব্ববঙ্গীয় চল্‌তি উচ্চারণ, যা ভাষায় অচল), নয়ত পনের, সতের, যা আমার বিবেচনায় বিহিত বানান।

সরেস, নিরেস কথাদুটো সরস, নীরস থেকে এসেছে ব'লে অনেক মনে করেন; পূর্ব্ববঙ্গে সরস নীরসই চলে ঐ অর্থে। বিশিষ্টার্থক এবং বহুপ্রচলিত ব'লে সরেস-নিরেস বিহিত বানান।

অ-ও

অ-ও, অকার-ওকার নিয়ে বাংলায় মহামারী গোলযোগ। তার একটা কারণ, বাংলার অসংখ্য শব্দের অ এবং অকার উচ্চারণে অল্পবিস্তর ও এবং ওকার-ঘেঁষা। তাই বানানেও ও এবং ওকার ক্রমশঃ চ'লে যাচ্ছে। দুই, বাংলায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জন কোথাও অকারান্ত, আর কোথাও বা হসন্তবৎ হয় ব'লে অকারান্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে কতকটা বাধ্য হয়েই অনেকে ওকার প্রয়োগ ক'রে থাকেন। এই দ্বিতীয় কারণে ওকারের ব্যবহার বাংলায় যে কি ব্যাপক আকার আজ ধারণ করেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সম্ভবতঃ কোনোও স্পষ্ট ধারণা নেই।

ভাষা-প্রকাশ ব্যাকরণে অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় বলছেন, "চ বর্গের······পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত উচ্চারণ, বাংলা ভাষার পক্ষে ভদ্র ও শিক্ষিত উচ্চারণ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় এ বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়া আবশ্যক।" কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। আংশিক ভাবে কেন, আজান, আন্দাজ, আমেজ, আরজি, ইজার, ইজ্জৎ, ওজর, কাগজ, কাজী, কারসাজী, কুঁজা, গাজী, গুজরান, গুলজার, জহর, জানানা, জিলা, জেয়াদা, জের, জেরবার, দরাজ, নজীর, তাজা, তাজিয়া, নমাজ, বাজার, নজর, তছনছ, মিছিল ইত্যাদি বহু শব্দের পশ্চিমবঙ্গীয় এবং সর্ব্বভারতীয় উচ্চারণ তুলনা করলেই বোঝা যাবে। সে যাক, এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, অ এবং অকারের পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণও বাংলাভাষার পক্ষে হয়ত ভদ্র ও শিক্ষিত উচ্চারণ, যদিও সর্ব্বভারতীয় উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি নয়। কিন্তু, সকলকে অন্ততঃ সে বিষয়ে অবহিত হতে ব'লে কিছু লাভ নেই, কারণ, পশ্চিমবঙ্গের লোক নয়, অথবা পশ্চিমবঙ্গে মানুষ হয়নি এমন মানুষের পক্ষে সে উচ্চারণ আয়ত্ত করা প্রায় অসাধ্য বললেই হয়।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান থেকে অ এবং অকারের ও এবং ওকার উচ্চারণের গুটি-কয়েক নমুনা মাত্র দিচ্ছি। গোড়ার অ এবং অকারের অবস্থা কিরূপ, তাতে কতকটা বোঝা যাবে।

উচ্চারণে অ	উচ্চারণে ও
সমুখ	অমুক
থলি, কষ (ষ অকারান্ত)	কলি, বস (স অকারান্ত)
অঙ্গন, দঙ্গল, বঙ্গজ	মঙ্গল
কলশী, কর্চ্চুর	কলমী, কর্পূর
কণ্ডূয়ন, কপিধ্বজ, কক্ষণো	কণ্ডু, কপিত্থ, তক্ষণ
মনস্তাপ, মনস্থ, মনোজগৎ,	মনস্কাম, মনস্বী, মনোজ, মনোনীত,
মনোনয়ন, মনোজ্ঞ, মনোভব,	মনোযোগ, মনোরঞ্জন,
মনশ্চক্ষু, মনোবিকার, মনসিজ	মনোবৃত্তি, মনোবেদনা, মনোরথ
বহা, দহা, কহা	মহা, মহাফেজ, মহাল
যক্ষ্মা, মহীশ, শর্য্যাতি	রক্ষা, মহিষ, চর্য্যা
যন্ত্র, বৎস	মন্ত্র, মৎস্য
সমুখ, সম্মুখ, সমূল	সমূহ, সমুদয়, সমুদ্র
ভ্রম, ভ্রমণ	ভ্রষ্ট, ভ্রমর

পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় অকারের পরবর্ত্তী ই বা উ-র বিলোপ ঘটলে অ উচ্চারণে ও হয়ে যায়, কিন্তু তাও সর্ব্বত্র হয় না। (হইল-) হল, (হইতে-) হতে-র হ উচ্চারণ ওকার ঘেঁসা, কিন্তু (হইব-) হব, (হইবে-) হবে-র হ তা নয়।

মাঝের অকার, শেষের অকার, সব নিয়েই এই ধরণের গোলযোগ। পশ্চিমবঙ্গীয় ঠিক উচ্চারণটিতে জন্মাবধি যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা এ গোলযোগের পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারবেন না। সূত্র রচনা ক'রে এই উচ্চারণকে নিয়মিত করবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। ক্ষ-এর আগেকার অ ও হয় না? অভিধানে পাচ্ছি, অক্ষদণ্ড = ওক্‌খোদন্‌ড, অক্ষরেখা = ওক্‌খোরেখা। ন-জাত অ ও হয় না? দেখতে পাচ্ছি খুব হয়। অক্ষর = অক্‌খর, কিন্তু সমাসে সর্ব্বত্র ওক্‌খোর, যেমন, ওক্‌খোর-পরিচয়, ওক্‌খোর-নিবদ্ধ। তা ছাড়া, অসুর = ওশুর, অখিল = ওখিল, অতুর = ওতুর। অচ্যুত = ওচ্চুত, কিন্তু অচ্যুতাগ্রজ = অচ্চুতাগ্রজ। অজ্ঞ = ওগ্‌গঁ, অজ্ঞতা = ওগ্‌গঁতা; কিন্তু অজ্ঞাত = অগ্‌গ্যাঁত। অতুল কারও নাম হলে ওতুল, কিন্তু অজিত কারও নাম হলেও অজিত! অব্যাহত-র অ উচ্চারণেও তাই, অব্যাহতির বেলায় ও।

কেবল দেখতে পাচ্ছি, শব্দের গোড়ায় প্র সর্ব্বদাই প্রো। গোড়ার ব্র সর্ব্বদাই ব্রো। ক্রয় আর ক্রস বাদে গোড়ার ক্র সর্ব্বদাই ক্রো। সৎ-এর স সমাসে সন্ধিতে কোথাও সো হয় না। কিন্তু বাংলার বহু সহস্র অকারান্ত বর্ণের নিয়মহীন উচ্চারণের মহাসমুদ্রে এই ধরণের মুষ্টিমেয় কয়েকটি সূত্রের সাঁকো বেঁধে আমরা কতদূর এগোতে পারি? কয়েক শত সূত্র রচনা করলে হয়ত বা কাজ চলতে পারে, কিন্তু সেগুলি আয়ত্ত করা খুব মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষেও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের কাজ হবে।

উচ্চারণের ও কেমন ক'রে ক্রমে বানানে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে এবার তার কয়েকটি নমুনা দিই।

ফারসী লঙ্গর থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার নোঙর, বহুপ্রচলিত ব'লে নোঙরই বিহিত বানান। গণিয়া লিখব, না গুণিয়া লিখব সেইটে ঠিক হয়ে গেলে, গণা এবং গোণা এ-দুইটির কোন্‌টি বিহিত বানান তা বলতে পারা যাবে। আমার মনে হয়, গুণিয়া অর্থ হওয়া উচিত গুণ করিয়া, গণিয়া অর্থ সংখ্যা করিয়া। কিন্তু গুণ করিয়া, গুণ করা অর্থে গুণিয়া গোণা চলবে ব'লে আর মনে হয় না, গণনা করা, গণনা করিয়া অর্থে এতই বেশী কথাদুটো এখন চলে গিয়েছে। সুতরাং গণিয়া গণা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। নখ, মহন্ত, এই ধরণের সংস্কৃত শব্দগুলিকে ওকার দিয়ে বানান করা নিরর্থক, অকার বানানের এমন অসংখ্য শব্দে ওকার উচ্চারণ এমনিতেই আমরা ক'রে থাকি, এবং অবিকৃত সংস্কৃত শব্দগুলি অন্ততঃ সন্ধি-সমাসেও বাধ্য হয়েই আমাদের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু জাতে-ওঠা বিদেশাগত বাংলা শব্দগুলির কথা আলাদা। আলবলা-আলবোলা, মকাম-মোকাম, মহকম-মোক্ষম, কমর-কোমর, ওকার বানানটাই চলবে। উতর-উতোর, ছাপর-ছাপোর, তুলট-তুলোট, পটল-পটোল, অঝর-অঝোর, তুখড়-তুখোড়, অকার বানানে এতকাল বেশ কাজ চলছিল, হঠাৎ ওকার ব্যবহারের সার্থকতা কিছু বুঝতে পারি না। ঝরকা-ঝরোকা ;—স্বরবর্ণ, হসন্ত বা হসন্তবৎ ব্যঞ্জন পরে না থাকলে মাঝের অকার সাধারণতঃ হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় ব'লে ঝরোকা চলতে পারে।

উয়া-জাত ও এবং ইয়া-জাত এ-র আগেকার অ-কে অনেকে ও ক'রে দেন। ঠিক উচ্চারণটি বোঝাবার জন্যে এ কর্ম্ম করা হয় বলবার কোনো সার্থকতা নেই, কেননা, ঝড়ুয়ার ঝ, জলুয়ার জ, করিয়ার ক, চরিয়ার চ উচ্চারণে যতটা ওকার-ঘেঁষা, ঝ'ড়ো, জ'লো, ক'রে, চ'রে-র বেলায় তার চেয়ে এমন কিছু বেশী নয়। তা ছাড়া চরিয়া-চোরে, দলিয়া-দোলে, ঝলিয়া-ঝোলে, অ-কে ও করার ফলে কথাগুলোর কেমন যেন জাতের ঠিক থাকে না। পূজনীয় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বানান করতে চান কর্য়ে, বল্যে, কিন্তু যফলা বাংলা উচ্চারণে দ্বিত্বের মত, বল্যে লিখলে লোকে পড়বে বল্লে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে যথাস্থানে করব।

আমার মনে হয়, পূর্ব্বস্বর অবিকৃত থাকলে উচ্চারণে উয়া সোজাসুজি ও হয়না, হয় য়ো; এবং ইয়া হয় য়ে। একটু অবহিত হয়ে শুনলে য়-এর একটু অন্ততঃ আমেজ অনেকেরই উচ্চারণে ধরা পড়বে। সুতরাং বাস্তবিক কথাগুলোর বানান হওয়া উচিত, ঝড়্‌য়ো, জল্‌য়ো, কর্‌য়ে, ধর্‌য়ো, বল্‌য়ে, কিন্‌য়ো। কিন্তু এরকম বানান যে কেউ করবেন সে দুরাশা আমার নেই, কর্য়ে বল্যেও সহজে কেউ লিখতে রাজি হবেন ব'লে মনে হয় না। সুতরাং য়-এর লোপ নির্দ্দেশ করবার জন্যে apostrophe ব্যবহার ক'রে ঝ'ড়ো, ক'রে, ব'লে লিখবার আমি পক্ষপাতী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, করিয়া-কোরে যদি লিখি, ত করিয়াছে-কোরেছে লিখতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য।

এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর গোলযোগের দৃষ্টান্ত কয়েকটি দিই।

একই শব্দের অকারান্ত এবং হসন্তবৎ উচ্চারণে অর্থ একেবারে আলাদা হয়ে যায় ব'লে, অকার-উচ্চারণ ওকার জুড়ে বোঝাবার অপচেষ্টা এই শতাব্দীর আরম্ভের দিকে সুরু হয়। বাংলায় অসংখ্য শব্দের অকার অল্প-বিস্তর ওকার-ঘেঁষা ব'লে অনেকেরই কাজটাকে সে-সময় অপকাজ ব'লে মনে হয়নি। যেমন: কাল (সময়), কাল-কালো (কৃষ্ণবর্ণ) ; মত (সম্মতি, অভিপ্রায়), মত-মতো (মতন) ;

ভাল (কপাল), ভাল-ভালো (উত্তম) ; হল (লাঙল), হল-হলো (হইল) ; ভাঙ (সিদ্ধি), ভাঙ-ভাঙো (ভগ্ন কর) ; কর (হাত, রশ্মি, খাজনা), কর-করো (করহ) ; পর (অনাত্মীয়, after), পর-পরো (পরিধান কর) ; খাট (পালঙ্ক), খাট-খাটো (বেঁটে, শ্রম কর) ; দল (যূথ, পাপড়ি), দল-দলো (দলন কর) ; চল (চলন, চলিত), চল-চলো (চলহ) ; ঢাল (বর্ম্ম, গড়ান), ঢাল-ঢালো (বর্ষণ কর) ; পল (সময়ের অংশ), পল-পলো (মাছ ধরার খাঁচা) ; পাড় (কাপড়ের রঙীন প্রান্ত), পাড়-পাড়ো (নামাও) ; বাড় (বৃদ্ধি), বাড়-বাড়ো (খাবার সাজাও) ; পাত (পাতা), পাত-পাতো (বিছাও) ; কষ (কষায় রস), কষ-কষো (গুণিয়া দেখ, আঁটো) ; সর (দুধের উপরে যা জমে), সর-সরো (দূরে যাও) ; বানান (শব্দের বিশ্লেষণ), বানান-বানানো (তৈরি করা) ; পাঠান (সীমান্তের জাতি, প্রেরণ করুন), পাঠান-পাঠানো (প্রেরণ করা) ; উঠান (অঙ্গন, উত্তোলন করুন), উঠান-উঠানো (উত্তোলন করা) ; গড়ান (ঢাল, গড়াইয়া নিন), গড়ান-গড়ানো (গঠন করানো, বহিয়া যাওয়া, শোওয়া) ; জানান (মাথাচাড়া, জ্ঞাপন করুন), জানান-জানানো (জ্ঞাপন করা) ; এরকম আরও অনেক আছে। ওকার বানানে অর্থগ্রহণের সুবিধা কিছু যে বাড়ে, তাতে ভুল নেই ; কিন্তু সে সুবিধার লোভে এ কাজে প্রথম যাঁরা হাত দিয়েছিলেন তাঁরা জানতেন না, কি ভীমরুলের চাকে ঘা দিচ্ছেন। করো, সরো লিখব, মরো, ধরো লিখব না, কষো লিখব কিন্তু ঘষো, চষো লিখতে দ্বিধা বোধ করব, এতটা আশা করা তাঁদের উচিত হয়নি। টানো-র সঙ্গে সঙ্গে আনো-তে টান পড়বেই, এবং তারপর আছো, কাঁদো, জাগোর দল ভিড় ক'রে এলে কিছুতেই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, এ তাঁদের বোঝা উচিত ছিল। আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে যুক্তাক্ষরান্ত শব্দগুলি এবং কুলীনশ্রেণীস্থ কয়েকটি তৎসম শব্দ ভিন্ন বাংলায় অকারান্ত শব্দ ব'লে কোনোও জিনিষের অস্তিত্ব বেশীদিন আর থাকবে ব'লেই মনে হয় না।

উচ্চারণের তফাৎ বোঝাবার জন্যে যে মূলতঃ ওকার ব্যবহার সুরু হয়েছিল তাও আমরা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি।

একাক্ষর অকারান্ত ব্যঞ্জন কখনোও হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় না, হতে পারে না, তা সত্ত্বেও আমরা লিখছি, দেখুন তো, কয়েক শো। ক্রিয়াপদে উত্তমপুরুষ ভবিষ্যৎ, মধ্যমপুরুষ-সামান্য বর্ত্তমান, প্রথমপুরুষ-সামান্য অতীত কালের সব-কটি রূপ নিত্য-অকারান্ত, কখনোও কোনোও অবস্থায় এদের হসন্তবৎ উচ্চারণ হয় না, একমাত্র এদেরই অকারান্ত উচ্চারণকে নিয়মের সূত্রে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা যায়, অথচ এদের এলাকাতেই ওকার-বিলাসীদের উপদ্রব সবচেয়ে আজ বেশী। 'আমি বলবো,' ('বোলবো'ও কেউ কেউ লিখছেন, কে বাধা দেবে ?) 'তুমি বলো, বলেছো-বলেচো, বলছো-বলচো,' 'সে বললো, বলতো, বলছিলো, বলেছিলো।'

কেন এই ওকার ? ওকারান্ত ক'রে বলছি, তাই ? ওতিশয়, সোত্তো (সত্য), কোক্ষো, বোক্ষো, রোক্ষো, কোবিতা, কমোনীয়তা, রাক্ষোস, কচ্ছোপ, কোতিপয়, সোমোয় লিখবার মত সৎ-সাহস আছে আমাদের ? তৎসম শব্দগুলোর কথা যদি ছেড়েও দিই, কোইমাছ, কোচুশাক, কদোম ফুল, খড়োম-জোড়া, খবোরদার ক'জন লিখতে পারেন ? যদি বলেন, আটপৌরে-ভাষার ক্রিয়াপদগুলি এখনও বয়সে কাঁচা, হাড় তাদের এখনও শক্ত হয়নি, তাদের নিয়ে কিছুদিন এখনও নানারকম নাড়াচাড়া করা, পরীক্ষা করা চলে। পরীক্ষাটা একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা কিছু

নিয়মের পথ ধ'রে ত হবে? তা কি হচ্ছে? আমি মোরবো, তুমি ধোরবে, সে কোরবে, মাখন গোললো, আলো জ্বোলচে, ওর্শেচে (অর্শেছে), জোন্মেচে, আমার কথা ফোললো, নিন্দে রোটবে যদি না লেখা চলে ত বোলবো বা বলবো-ও কিছুতেই চলতে পারে না। সুতরাং আমাদের দুটো মাত্র রাস্তা খোলা আছে; এক, অ এবং অকারের পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণকে আভিধানিক (সুনীতিবাবুর ভাষায় "ভদ্র ও শিক্ষিত") উচ্চারণ ব'লে মান্য না করা; দুই, এই সূত্র রচনা ক'রে কাজ চালানো, যে, বাংলায় অনেক স্থলে অ এবং অকারের অল্পবিস্তর ও এবং ওকার উচ্চারণ হয়ে থাকে।

ইংরেজীতে প্রতিবর্ণীকরণ প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু বলেন, "দুই একটি প্রাকৃতজ শব্দে অকার স্থলে o লেখা চলতে পারে, কিন্তু অন্যত্র······অকার স্থলে a-ই ব্যবহার করা উচিত।" শুদ্ধ মাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণের খাতিরে অ বদলে ও, এবং অকার বদলে ওকার করার চেষ্টাটা যে বাস্তবিকই অপচেষ্টা, তাঁর উদ্ধৃত মন্তব্য নিঃসন্দেহ সে-কথার সমর্থন করে।

পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষাকে যাঁরা ভালবাসেন, ভবিষ্যতে সেই ভাষাটাই বাংলাদেশে একমাত্র ভাষারূপে চলবে ব'লে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এমন কি যাঁরা পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ, তাঁদেরও পক্ষে অ এবং অকারের অবিকৃত উচ্চারণ কিছুমাত্র দোষাবহ হয় ব'লে মনে করি না।

অকারের ও-ঘেঁষা বা সোজাসুজি ও উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে ওকারের ব্যবহার ২৫০০০ জায়গায় যখন কিছুতেই করা চলছে না, তখন ২৫০টি জায়গায় করতে যাবার অর্থ শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া, যে-ধরণের শৈথিল্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ। চলিয়া যদি চোলে ত থলিয়া নিশ্চয়ই থোলে হওয়া উচিত, কলিকা হওয়া উচিত কোলকে, সলিতা হওয়া উচিত সোলতে। কিন্তু আমার হাতের গোড়ায় কয়েকটি বাংলা অভিধান রয়েছে, থোলে, কোলকে, সোলতে কোথাও পাচ্ছি না। বাংলা পরীক্ষার্থী চলিয়া-র আটপৌরে বানান চোলে লিখলে নম্বর দেব, আর থোলে লিখলে ভুল ব'লে কাটব, সেটা কি সুবিচার হবে?

এই ত গেল উচ্চারণের খাতিরে ওকারের কথা। অকারান্ত এবং হসন্তবৎ উচ্চারণের তফাৎ বোঝাবার জন্যে যে ওকার ব্যবহার আজকাল চলছে, তার মূলে রয়েছে বাংলায় একটি অকার-চিহ্নের অভাব। অর্থাৎ আমরা দুধের সাধ কোথাও কোথাও ঘোল দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করছি। এ অপচেষ্টা আরোও বেশী উৎকট, কেননা, কেবল তৎসম শব্দে নয়, তদ্ভব দেশজ এবং বিদেশাগত শব্দে লক্ষাধিক চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের অকারান্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে ওকার ব্যবহার করবার মত সাহস আমাদের নেই, মুষ্টিমেয় কয়েকটি শব্দে নিজেদের খেয়াল মত ওকার যোগ ক'রে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে যাঁরা যত্রতত্র হস্ চিহ্ন ব্যবহার ক'রে থাকেন তাঁদেরও উদ্যম যে এর চেয়ে কিছু বেশী প্রশংসনীয় তা নয়।

অকারান্ত-হসন্ত-হসন্তবৎ-ওকারান্ত

এটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, যে, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলিকে নিয়ে বাংলা-শিক্ষার্থীর যে দুর্ভোগ, পৃথিবীর কোনোও আধুনিক ভাষায় তার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। একই শব্দের চিহ্নহীন ব্যঞ্জন কখনোও অকারান্ত, কখনোও বা হসন্তবৎ উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন নীলধ্বজ-এর ল অকারান্ত, কিন্তু নীলকর,

নীলকুঠী-র ল হসন্তবৎ। সে থরথর ক'রে কাঁপছিল, র হসন্তবৎ, কিন্তু কাঁপিছে দেহলতা থরথর, র অকারান্ত। ভাল মানুষ, ল অকারান্ত, কিন্তু ভালমানষী, ল হসন্তবৎ। অথচ বাংলা বানানে অ-ও, অকার-ওকার, য-জ, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা আজ যথারীতি বিপ্লব বাধিয়ে তুলেছেন, তাঁদের একটি অকার-চিহ্ন গ্রহণ করতে বললে, তাঁরা বলেন, অকারের ক্ষেত্রে চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের ব্যবহার ভারতীয় আর্য্যদের প্রতিভা-প্রসূত একটি অপূর্ব্ব রীতি, অকার-চিহ্ন গ্রহণ করলে ভারতীয় আর্য্যসংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের একটা বড় যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে!

চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের অকারান্ত উচ্চারণ অতীত যুগের মুনিঋষিরা করতেন, সেটা ঠিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে, তাঁরা চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের হসন্তবৎ উচ্চারণ করতেন না, আর অকারের হসন্তবৎ উচ্চারণ ত করতেনই না। তাঁদের বুদ্ধিসুদ্ধি আমাদের চেয়ে বাস্তবিকই যে অনেক বেশী ছিল, এরই থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হস্‌চিহ্ন ব্যবহার না করলে বানান ভুল হয় এমন শব্দ বাংলায় খুব বেশী নয়। ঋক্‌, দিক্‌, ধিক্‌, বাক্‌, ত্বক্‌, প্রাক্‌, সম্যক্‌, তির্য্যক্‌, পৃথক্‌, বণিক্‌, ভিষক্‌, ঋত্বিক্‌, সম্রাট্‌, স্বরাট্‌, বিরাট্‌; খণ্ড ত হসন্ত ত ছাড়া আর-কিছু নয়, তাই, সৎ, কৃৎ, হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ, পশ্চাৎ, যোষিৎ, জগৎ, হরিৎ, সরিৎ, তড়িৎ, বিদ্যুৎ, বৃহৎ, মহৎ, মরুৎ, ভবিষ্যৎ, সম্বিৎ, শরৎ, যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ, চিৎকার, ফুৎকার, শীৎকার, মৎকুণ, বৎস, বৎসর, মৎস্য, মৎসর, উৎস, কুৎসা, দিৎসা, চিকিৎসা, অনুসন্ধিৎসা; ককুদ্‌, আপদ্‌, বিপদ্‌, সম্পদ্‌, সভাসদ্‌, পরিষদ্‌, সংসদ্‌, উপনিষদ্‌, ব্রহ্মবিদ্‌, শাস্ত্রবিদ্‌, উদ্ভিদ্‌; বিদ্বান্‌, মহান্‌। এছাড়া, মতুপ্‌ বতুপ্‌ এবং ইয়সুন্‌ প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি শব্দ, যেমন, মতিমান্‌, বুদ্ধিমান্‌, শ্রীমান্‌, ধীমান্‌, হনুমান্‌, বলবান্‌, ধনবান্‌, মূল্যবান্‌, জ্ঞানবান্‌, লাভবান্‌, চরিত্রবান্‌, ভগবান্‌, গরীয়ান্‌, বর্ষীয়ান্‌, বলীয়ান্‌, মহীয়ান্‌। হস্‌, আশিস্‌, (যার থেকে তদ্ভব আশিষ)। সমাসান্তর্গত হৃৎ (হৃদ্‌), জিৎ, ভৃৎ, যৎ, তৎ, এতৎ, মৎ, ত্বৎ, চমৎ, ষট্‌। উৎ, সম্‌, নির্‌, দুর্‌, এই ক'টি উপসর্গ। বাকী থাকছে বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের উদ্ধৃতি।

এই শব্দগুলির কয়েকটিতে হস্‌চিহ্ন না দিলে অর্থবিপর্য্যয় হয়। যেমন, আপদ্‌ (উৎপাত) —আপদ (পা পর্য্যন্ত), পরভৃৎ (কাক)—পরভৃত (কোকিল), বিরাট্‌ (সর্ব্বব্যাপী)—বিরাট (মৎস্যদেশ)। অনেকগুলিতে সংস্কৃত-হসন্তবর্ণের বিশিষ্ট নিয়মে প্রত্যয়াদি আমরা যোগ করি, এবং সন্ধি-সমাসে সংস্কৃত হসন্তবর্ণের বিশিষ্ট নিয়ম মেনে চলি, সুতরাং সেগুলিতে হস্‌চিহ্ন না দিলে চলে না। ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে বাকী থাকবে ত্বক্‌, সম্যক্‌, সংসদ্‌, লাভবান্‌, হনুমান্‌, এবং এমনিধারা আরও গোটা-পাঁচছয় শব্দ যাদের হসন্ত যোগে না লিখলে ক্ষতি কিছু হয় না। কিন্তু আটটি বা দশটি শব্দে হস্‌-চিহ্নের বিলোপ সাধন ক'রে আমরা কি এমন লাভবান্‌ হব? তাছাড়া, আজ সন্ধি করছি না, প্রত্যয় যোগ করছি না, ভাষার শব্দসম্পদ্‌ বাড়াবার জন্যে, পরিভাষা রচনার খাতিরে কাল তা করতে পারি। সুতরাং শব্দগুলিতে হস্‌ চিহ্ন রেখে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

দেশজ শব্দের মধ্যে কয়েকটিতে গতিবেগ বোঝাবার জন্যে হস্‌চিহ্ন দিয়ে দ্রুত উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হয়, যেমন, চট্‌, চট্‌পট্‌, ঠক্‌, তড়াক্‌, সট্‌, সড়াক্‌, সড়াৎ, হন্‌হন্‌, হট্‌, হুট্‌। এগুলিতে হস্‌ চিহ্ন দেওয়াই উচিত।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে অনেকে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার ক'রে থাকেন, করাই বিধেয় মনে করি, কেননা ঠিক এদেরই মত দেখতে অথচ ধ্বন্যাত্মক নয় এমন আর-এক জাতীয় শব্দ আছে যাদের সঙ্গে চেহারার একটু তফাৎ রেখে চলা এদের পক্ষে সুবিধাজনক। যেমন, টস্‌টস্‌ ক'রে জল পড়ছে, কিন্তু রসে টসটস; বিজ্‌বিজ্‌ ক'রে বকছে, কিন্তু পোকা বিজবিজ; টক্‌টক্‌ টোকার শব্দ, কিন্তু লাল টকটক; খট্‌খট্‌ খড়মের আওয়াজ, কিন্তু শুকনো খটখট; ধুক্‌ধুক্‌ হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ, কিন্তু গলার গহনা ধুকধুক; খস্‌খস্‌ শব্দ, কিন্তু বেণার মূল খসখস।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোকে চেনা অত্যন্তই সহজ, তাই সেগুলোর নমুনা দেবার দরকার কিছু নেই। ধ্বন্যাত্মক নয়, অথচ দেখতে কতকটা সেই ধরণের আরও কয়েকটি শব্দের নমুনা: আনচান, কটমট, কনকন, কুচকুচ, খিটখিট, খিটমিট, গনগন, গিজগিজ, চকমক, চনচন, চনমন, চিকচিক, চিকমিক, চুলবুল, ঝলমল, ঝিকমিক, টলমল, টমটম, টিমটিম, তকতক, থমথম, থরথর, থুড়থুড়, ধবধব, নিশপিশ, নিড়বিড়, পিটপিট, পিলপিল, ফুটফুট, ভরভর, ভুরভুর, মিটমিট, লিকলিক, হড়হড়, হাঁকপাঁক, হাঁসফাঁস, হিমশিম।

চিড়বিড়, চিড়িক, জবজব, ঝিমঝিম, তলতল, তড়বড়, থকথক, থলথল, থসথস, দরদর, ধড়ফড়, ধড়মড়, মিনমিন, লকলক, সুড়সুড়, হড়বড়, এগুলি আমার মনে হয় প্রত্যন্ত-প্রদেশের শব্দ, হয়ত মূলে ধ্বন্যাত্মক ছিল, এখন আর তা নেই। চিড়িক্‌, তড়্‌তড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌, ধড়্‌মড়্‌, এবং হড়্‌হড়্‌ দ্রুততার ভাব প্রকাশ করে ব'লে হস্‌ চিহ্ন দিয়ে লেখা হবে, অন্যগুলোতে হস্‌চিহ্ন চলবে না।

উপরে যে-ক'টি ক্ষেত্রের কথা বলা হ'ল তাছাড়া অন্যত্র হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করা অবিধেয়। বিদেশাগত শব্দগুলিকে বাদ দিলে বাংলার আর অধিকাংশ শব্দের শেষের চিহ্নহীন ব্যঞ্জন উচ্চারণে হসন্তবৎ হলেও মূলতঃ অকারান্ত। আমার ধারণা, অকারান্ত শব্দ উচ্চারণে যখন হসন্তবৎ হয় তখনও অধিকাংশ স্থলেই পূরোপূরি হসন্ত হয়ে যায় না; নীপবন এবং বন্‌বন্‌-এর ন ঠিক একভাবে উচ্চারিত হয় না। এই কারণেও পাগ্‌লা, ভুম্‌ড়ে, বাঁদ্‌রামো লিখবার আমি বিরোধী, কথাগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ তাতে বোঝা যায় না ব'লে আমি মনে করি। বিদেশাগত শব্দগুলোর অধিকাংশকেই নিজেদের মত ক'রে আমরা উচ্চারণ করি, সুতরাং হসন্ত যুক্তাক্ষর ভিন্ন অন্যত্র তাদের বানানেও হস্‌চিহ্ন স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। নিহাৎ-নেহাত, তফাওউৎ-তফাত। কিন্তু দ্রুত উচ্চারণ বোঝাতে হলে হস্‌ চিহ্ন দিতে বাধা নেই যেমন, 'বাস্‌, আর নয়।'

বারবার বলছি, আবারও বলি, বাংলায় যদি একটি অকার-চিহ্ন গৃহীত হয় তাহলে অনেক গোল মেটে। কিন্তু অকার-চিহ্ন গৃহীত হলে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে আগে দেখা যাক।

অকার উচ্চারণ বোঝাতে অকার দেব; অকার দিয়ে লেখা হওয়া উচিত কিন্তু অঞ্চল-বিশেষে উচ্চারণ অল্পবিস্তর ওকার ঘেঁষা এমন-সমস্ত স্থলেও অকার দেব; উপরে, যে-শব্দগুলি হস্‌চিহ্ন দিয়ে বানান করা উচিত বলেছি, সেগুলিতে হস্‌ চিহ্ন দেব; বাকী সর্ব্বত্র হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহার করব; এই হবে বিধি। যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর উচ্চারণে ত বটেই, বাস্তবিকও হসন্ত। অকার গৃহীত হলে, অধিকাংশ যুক্তাক্ষর যখন বর্জ্জিত হবে তখন বিযুক্ত প্রথম অক্ষরকে হস্‌-চিহ্ন দিয়ে বানান করাই হবে সেদিক্‌ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু লিপিকারের পরিশ্রম বাঁচাতে চাই ব'লে

তা আমরা করব না। যে হসন্ত শব্দগুলিকে এমনিতে হস্‌চিহ্ন দিয়ে বানান করব, সেগুলিও অন্য শব্দের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলে আর হস্‌-চিহ্নিত হবে না, এই রকম নিয়ম করব ; যেমন, ঋক্‌-ঋগবেদ, প্রাক্‌-প্রাককাল। হসন্ত তৎসম শব্দগুলি অসন্ধিবদ্ধ অবস্থায় হস্‌-চিহ্নিত না হলে, দিক্‌ এবং এক এক হয়ে গেলে, দিগদেশা-গ (অ) ত (অ) লিখে এগদেশবাসী লিখতে ছেলেদের হাত নিশপিশ করতে থাকবে।

এবারে উচ্চারণে অকারান্ত এবং উচ্চারণে হসন্তবৎ এই দুই রকম অকারের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

অনেকে হয়ত বলবেন, 'নাই বা হল বানান ধ্বনি-অনুসারী, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনকে আমরা চিরকাল কোথাও অকারান্ত, কোথাও ওকারান্ত এবং কোথাও বা হসন্তবৎ ক'রেই প'ড়ে এসেছি। খুব বেশী অসুবিধা বোধ করিনি।' প্রাণবান্‌, গতিশীল ভাষার বানান কোনোও অবস্থাতেই সম্পূর্ণ ধ্বনি-অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও আমাদের প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে আমাদের লিপির ঠাটটা ধ্বনি-অনুসারী, কিন্তু অ এবং অকারের ব্যবহার অন্য সমস্ত ধ্বনির চেয়ে বাংলায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও কেবল তাদেরই বানান ধ্বনি-অনুসারী হবে না, এ বড় অদ্ভুত কথা। পৃথিবীর লোকের কাছে এই নিয়ে আমরা উপহাসাস্পদ হব। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য কোনো একদিন পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকের আদর লাভ করবে, এ আমরা আশা করি। সুতরাং অবাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। বাংলা শব্দের সংখ্যা যদি ন্যূনাধিক ৬০,০০০ হয়, ত তার মধ্যে অন্ততঃ ৮০,০০০ চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের ব্যবহার আছে। এদের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে আলাদা ক'রে পরিচয় না হলে বিদেশীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে তাদের যথাযথ উচ্চারণ অসম্ভব। অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকেও অকারান্তের হসন্তবৎ এবং হসন্তবৎএর অকারান্ত উচ্চারণ করতে আমি শুনেছি। অসুবিধা আমাদের নিজেদেরও যে আছে তার প্রমাণ আজকের দিনের বাংলা লিখিয়েদের স্থানে-অস্থানে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগ এবং ওকার-প্রীতির উপদ্রব।

চিহ্নহীন অনির্দ্দিষ্ট উচ্চারণের ব্যঞ্জন আমাদের ভাষায় এমন মারাত্মক রকম বেশী হওয়া সত্ত্বেও অসুবিধা এত বেশী হত না, যদি কয়েকটি নিয়মের সূত্র দিয়ে এদের উচ্চারণকে বাঁধা যেত। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটিকে ছাড়া অন্যগুলিকে কোনোও নিয়মে বাঁধা যায় না। যে ক'টি নিয়ম রচনা করা যায় তাদেরও অধিকাংশের ব্যতিক্রম এত বেশী, যে তাদের নিয়ম ব'লে মানাই শক্ত। তবু তাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে রাখা মন্দ নয়।

শব্দের গোড়াকার চিহ্নহীন ব্যঞ্জন

শব্দের আদিতে হসন্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয়, কিন্তু লেখা হয় না, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তাক্ষর হয়ে যায়। স্‌টেশন কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে কেউ কেউ লিখতেন, এখন যুক্তবর্ণ স্ট চলিত হওয়ায় আর লেখেন না। চিহ্নহীন ব্যঞ্জন শব্দের আদিতে থাকলে তাকে সহজেই আমরা অকারান্ত ব'লে চিনতে পারি। যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হলে এ নিয়ম অবশ্য আর খাটবে না, তবে তখন আদিতে, মধ্যে বা শেষে, চিহ্নহীন ব্যঞ্জন সর্ব্বত্রই হসন্তবৎ উচ্চারিত হবে।

গোড়ার অ এবং অকারের উচ্চারণ কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় ওকার-ঘেঁসা হয়ে যায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি কাজচলা গোছের সূত্র রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষীকে এই সূত্রগুলি মান্য ক'রে সর্ব্বত্রই

যে ওকার ঘেঁসা উচ্চারণ করতেই হবে তা আমি মনে করি না ব'লে সূত্রগুলিকে বর্ত্তমান আলোচনার থেকে বাদ দিয়ে রাখলাম।

পদান্তের চিহ্নহীন ব্যঞ্জন

পদান্তস্থিত চিহ্নহীন ব্যঞ্জন হসন্তবৎ উচ্চারিত হয়, এই একটা সাধারণ নিয়ম তৈরি ক'রে নিয়ে তার ব্যতিক্রমগুলিকে সূত্রাকারে লেখা ভাল। এই ব্যতিক্রমের সূত্রগুলিরও আবার ব্যতিক্রম অনেক দেখতে পাওয়া যাবে।

(১) পদান্তস্থিত যুক্তাক্ষরের হসন্তবৎ উচ্চারণ হয় না। রেফ এবং শেষাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার খণ্ডত, অনুস্বার ও বিসর্গকেও যুক্তাক্ষরের এক অক্ষর ব'লে ধরতে হবে।

যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হলে এই নিয়মটিকেই একটু অন্য রকম ক'রে আমাদের বলতে হবে; তখন বলব, পদান্তে এক সঙ্গে দুইটি বর্ণের হসন্তবৎ উচ্চারণ হয় না।

উচ্চারণের এই নিয়মটি বাংলার এত বেশী মজ্জাগত যে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বিদেশী শব্দ এই নিয়মদ্বারা শাসিত হয়ে তবে আমাদের ভাষার আসরে ঢুকতে পেত, এবং অবলীলায় ঢুকত। যেমন, অক্‌ল্—আক্কেল, অর্জ্—আর্জি, অস্‌ল্—আসল, আর্ক্—আরক, ইল্‌ম্—এলেম, ইত্‌র্—আতর, উর্ফ্—ওরফ, কর্জ্—কর্জ, কৎল্—কতল, কদ্‌র্—কদর, কব্‌র্—কবর, কমবখ্‌ৎ—কমবক্ত, কিস্ত্—কিস্তি, গর্ম্—গরম বা গর্মি, গশ্‌ৎ—গস্ত, গোশ্‌ৎ—গোস্ত, চশ্‌ম্—চশম, জুল্‌ফ্—জুল্‌ফি, দুরুস্ত্—দুরুস্ত, দখ্‌ল্—দখল, দর্‌খোআস্ত্—দরখাস্ত, দস্ত্—দাস্ত, ফর্দ্—ফর্দ, ফর্শ্—ফরাশ, ফস্‌খ্—ফস্কা, ফিক্‌র্—ফিকির, ফিহ্‌রিস্ত্—ফিরিস্তি, বন্দোবস্ত্—বন্দোবস্ত, বর্‌দাশ্‌ৎ—বর্‌দাস্ত, বর্ফ্—বরফ, বরাবর্দ্দ্—বরাদ্দ, বাজ্‌য়াফ্‌ৎ—বাজেয়াপ্ত, বুর্জ্—বুরুজ, বিহিশ্‌ৎ—ভিস্তি, মগ্‌জ্—মগজ, মর্দ্—মরদ, মিস্‌ল্—মিছিল, মুর্গ্—মোরগ অথবা মুর্গি, মুল্‌ক্—মুলুক অথবা মুল্লুক, রক্‌ম্—রকম, শত্‌রন্‌জ্—শতরঞ্জি, শর্ম্—সরম, শাগির্দ্—শাগ্‌রেদ, শিনাখ্‌ৎ—সনাক্ত, সব্‌জ্—সবুজ অথবা সব্‌জি, সব্‌র্—সবুর, সিফ্—সেরেফ, স্বুল্‌হ্—সোলে, হজ্‌ম্—হজম, হর্ফ্—হরফ, হল্‌ফ্—হলফ, হদ্দ্—হদ্দ, হুক্‌ম্—হুকুম। আরবী-ফারসী শব্দের মধ্যে এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম যা মনে আনতে পারছি তা হচ্ছে খোদাবন্দ্, সম্ভবতঃ হালের বাংলা নাটক-নভেলে এর প্রথম ব্যবহার সুরু হয়েছে ব'লে।

ইংরেজী থেকে নেওয়া শব্দে এই নিয়মানুবর্ত্তিতার দৃষ্টান্ত: ইঞ্চ্—ইঞ্চি, ইংল্যাণ্ড—ইংলণ্ড, কর্ক্—কাক, টেব্‌ল্—টেবিল, ডেস্ক্—ডেস্কো, বেঞ্চ্—বেঞ্চি, বোণ্ট্—বোণ্টু, য়্যাপ্‌ল্—আপেল, মার্ক্—মার্কা, মার্ব্‌ল্—মারবেল, বক্স্—বাক্স, সাইক্‌ল্—সাইকেল, ফর্ম্—ফারম এবং ফর্মা, লর্ড্—লাট, লিস্‌ট্—লিষ্টি, গিল্‌ট্—গিল্টি। কিন্তু বিদেশী, বিশেষতঃ ইউরোপীয়, ভাষার শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা বানান করার রেওয়াজ সুরু হয়েছে। আমরা এতকাল খুসী লিখে খুসী ছিলাম, আজকাল খুশী না লিখলে নম্বর কাটা যায়, যদিও ওতে উচ্চারণেরও কোনো তফাৎ হয় না! নূতন কোনো বিদেশী শব্দের জাতে-ওঠা বাংলা শব্দ হয়ে যাবার পথে আজ নানা ভাষাবিৎ পণ্ডিতদের কড়া পাহারা। কিন্তু যারা জাতে উঠে গিয়েছে তাদেরও হেনস্তা কম নয়। জোড়াজোড়া হসন্ত চিহ্ন যোগ ক'রে টেব্‌ল্, সাইক্‌ল্ আজকাল অনেকেই লিখছেন।
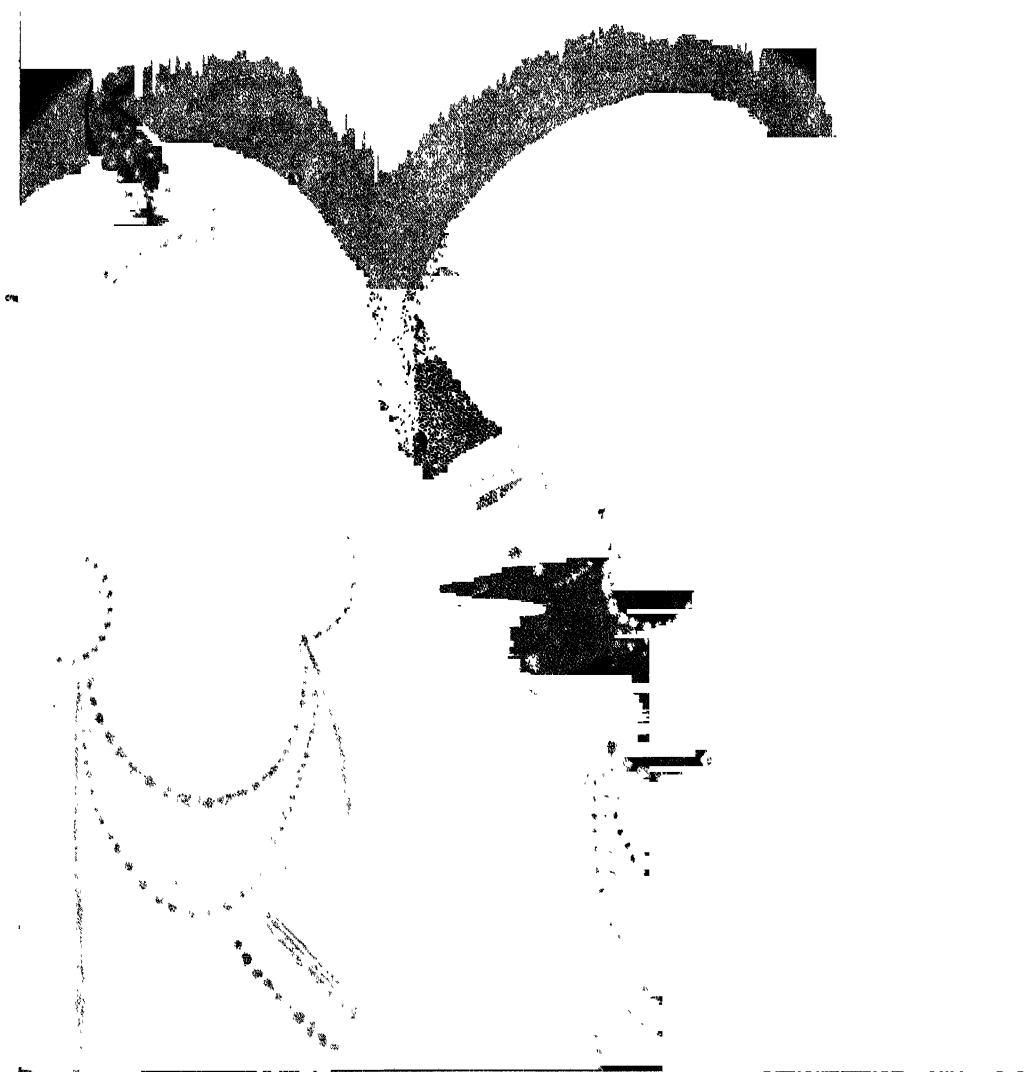
কৃষ্ণ-রাধিকা

শিল্পী শ্রীসুনয়নী দেবী

চিত্রাধিকারী শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

জাতে-ওঠা ইংরেজী শব্দগুলিকে আবার পূরোপুরি ইংরেজী ক'রে দেবার সপক্ষে যুক্তি তবু কিছু আছে। আমরা আজকাল যখন নিজের ভাষায় কথা কই, দশটা কথার মধ্যে একটা বলি ইংরেজী; কয়েক হাজার ইংরেজী শব্দকে রূপান্তরিত ক'রে আত্মসাৎ ক'রে ফেলা চারটিখানি কথা নয়। আবার দশটা খাঁটি ইংরেজী শব্দের পাশে একটার বিকৃত বাংলা উচ্চারণ খাপ খায় না ব'লে সেটাকেও এখন পূরোপুরি ইংরেজী ক'রে বলতেই আরম্ভ করেছি। একসঙ্গে টেব্‌ল্‌-কভার এবং টেবিল, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড বলা চলে না। জাতে-ওঠা আরবী-ফারসীর এ সমস্যা নেই।

(২) ঐকার এবং ঔকারের পরবর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন পদান্তে থাকলে হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় না। চৈন, দৈব, দ্বৈত, নৈশ, বৈধ, বৈর, শৈব, শৈল, স্ত্রৈণ, হৈম, গৌণ, চৌর, ধৌম, পৌর, ভৌম, মৌন, যৌথ, যৌন। অসংস্কৃত শব্দের বেলায় নিয়মটি খাটে না, যথা চৈত, খৈল, চৌক, চৌথ, ঢৌল, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় আগে পারদর্শী হয়ে না নিলে সূত্রটিকে বাংলা-শিক্ষার্থী কাজে লাগাতে পারবেন না। তৎসম তৈল, গৌড় ও গৌর, এই তিনটি শব্দের অকারান্ত এবং হসন্তবৎ দু রকম উচ্চারণই আমি শুনেছি।

এই নিয়মটিকে এক হিসাবে প্রথম নিয়মটিরই প্রসার বলা যেতে পারে। ঐ ঔ এই দুটি যুগ্মধ্বনিতে ই এবং উ-র অর্দ্ধমাত্রিক ধ্বনিকে হসন্তবৎ বলা চলে। একটি হসন্তবৎ স্বরের পরে একটি হসন্তবৎ ব্যঞ্জন, দুটিকে একসঙ্গে শব্দের শেষে উচ্চারণ করতে আমরা অসুবিধা বোধ করি।

(৩) ঋফলার পরের চিহ্নহীন ব্যঞ্জন পদান্তে হসন্তবৎ হয় না। কৃপ, কৃশ, ঘৃত, তৃণ, নৃপ, মৃগ, বৃক, বৃষ, নির্ঘৃণ, ঈদৃশ, কীদৃশ, ইত্যাদি।

ঋফলা মূলতঃ একটি যুগ্মস্বরধ্বনি ছিল এবং বর্ত্তমানে সে-উচ্চারণ আমরা বিস্মৃত হয়েছি ব'লে অনেকে মনে করেন। নিয়মটি তাঁদের সেই মতবাদকে সমর্থন করে ব'লে মনে হয়।

এ নিয়মের ব্যতিক্রম, ঋণ, নৈর্ঋত। নদীমাতৃক, দেবমাতৃক কথা দুটির অকারান্ত এবং হসন্তবৎ দু রকম উচ্চারণ অভিধানে রয়েছে। এমনও হতে পারে, যে, ধ্বনি-সঞ্চালনে ঘৃত, মৃগ, কতকটা ঘিরৃত, মিরৃগের মত এক সময়ে এ দেশে ব্যাপক ভাবে উচ্চারিত হ'ত। তাই একটি হসন্তবৎ ধ্বনি আগে আছে ব'লে শেষের ধ্বনিটি হসন্তবৎ হতে পারেনি। ধ্বনি-সঞ্চালনের ক্ষেত্র নেই, কাজেই ঋণের ণ হসন্তবৎ।

(৪) রফলার পরের চিহ্নহীন ব্যঞ্জন পদান্তে থাকলে হসন্তবৎ হয় না। দ্রব, দ্রুত, দ্রুম, ধ্রুব, জয়দ্রথ, ব্রজ, ব্রণ, ব্রত, স্রব, হয়গ্রীব। কিন্তু ব্যতিক্রমগুলি বোধহয় সংখ্যায় বেশী, যথা, ক্রম, আক্রম, বিক্রম, পরাক্রম, ক্রূর, ক্রোর, ক্রোড়, ক্রোধ, গ্রাম, ঘ্রাণ, ত্রাণ, ত্রাস, দ্রোণ, প্রাণ, প্রেত, প্রীত, প্রেম, কৃত্রিম, বিদ্রূপ, ভ্রম, ভ্রূণ, হ্রাস, উপদ্রব, সংশ্রব।

হতে পারে ব্রজ, ব্রত ধ্বনিসঞ্চালনে হ'ত বরজ, বরত, সুতরাং পদান্তধ্বনি অকারান্ত। গ্রাম হত গেরাম, ঘ্রাণ ঘেরাণ, ত্রাস তরাস, প্রাণ পরাণ, প্রেত পেরেত, প্রীত পিরীত, সুতরাং সেগুলিতে পদান্তধ্বনি হসন্তবৎ হতে বাধেনি।

(৫) শেষের হ হসন্তবৎ হয় না। অবলেহ, অসহ, দুঃসহ, দুর্ব্বিষহ, ইহ, কেহ, গৃহ, দহ, দাহ, গ্রহ, দুরূহ, নিরীহ, প্রত্যহ, বিদ্রোহ, মহীরুহ, সমূহ, স্নেহ। বিদেশাগত শব্দ যথাযথ বানান করার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা আজকাল আল্লাহ তালাহ, দরগাহ্‌, শাহ্‌ লিখেছেন। আমাদের নিয়মটার পক্ষে এগুলিকে ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করতে হবে এবং হস্‌ চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে।

(৬) বিশেষণপদের শেষের ঢ় হসন্তবৎ হয় না। অনূঢ়, গাঢ়, দৃঢ়, গূঢ়, ব্যূঢ়, লীঢ়। বিশেষ্যপদে হসন্তবৎ। আজমীঢ়, আষাঢ়, রাঢ়।

(৭) অ আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী য় পদান্তে হসন্তবৎ হয় না। ক্ষত্রিয়, নারকীয়, রাজসূয়, অপরিমেয়, তোয়। *অ আ-র পরে হসন্তবৎ—প্রণয়, অন্যায়। ক্রিয়াপদে প্রথমোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম, দেয়, শোয়।

একটি বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যাকরণের বইয়ে দেখছি, "বিশেষণ পদের শেষের য় অকারান্ত উচ্চারিত হয়।" কতিপয়, অসহায়, কৃপাময়, সদয়, নির্দ্দয়, মহাশয়, মৃতপ্রায়, ক্ষীণকায় এ নিয়ম মানছে কই? আসলে অ এবং আ-র পরবর্ত্তী য় হসন্তবৎ উচ্চারিত হয়, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্ব্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া নির্ব্বিশেষে।

(৮) সমাসে পর-শব্দ প্রত্যয়যুক্ত হয়ে একটি মাত্র অকারান্ত বর্ণে রূপান্তরিত হলে হসন্তবৎ হয় না। অজ, অন্ত্যজ, আত্মজ, উরুজ, কামজ, খনিজ, জরায়ুজ, দ্বিজ, মনুজ, স্বেদজ, অতিগ, অনুগ, কামগ, দূরগ, পন্নগ, পয়োদ, বারিদ, ফলদ, তাম্রাভ, নীলাভ, নিভ, সন্নিভ, নিষ্প্রভ। এর ব্যতিক্রমও অনেক: অগ্রজ, অনুজ, পঙ্কজ, বঙ্গজ, মনোজ, সরোজ, সহজ, তুরগ, পারগ, বিহগ, ভুজগ, পাদপ, মধুপ, জলদ, নীরদ, করভ। জলজ, মনসিজ, খগ, ভূপ, ক্ষত্রপ, এই কথা কয়টির অকারান্ত হসন্তবৎ দু রকম উচ্চারণই অভিধানে পাচ্ছি।

(৯) বিসর্গ লোপ হলেও অসুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ হসন্তবৎ হয় না। ওজ, নভ, পয়। ব্যতিক্রম: যশ, শির, তেজ, স্রোত।

(১০) অঠচ্ প্রত্যয়ের ঠ হসন্তবৎ হয় না: কর্ম্মঠ।

(১১) ক্ত প্রত্যয়ের ত হসন্তবৎ হয় না। এ নিয়মের প্রয়োগের ক্ষেত্র এতই বহুবিস্তৃত এবং সুপরিচিত যে এর আর দৃষ্টান্ত কি দেব? ব্যতিক্রমগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। অতীত (কিন্তু সমাসে অকারান্ত: দেহাতীত), পতিত (অনাবাদী অর্থে; অকারান্ত হলে অর্থ হবে চ্যুত)। চলিত, রহিত, নিশ্চিত, গর্হিত, গচ্ছিত এই কথাগুলির অকারান্ত ও হসন্তবৎ দু রকম উচ্চারণই চলে, কিন্তু উপসর্গ যোগে এবং সমাসে পরপদে হসন্তবৎ হয় না, যেমন: প্রচলিত, চেতনারহিত, সুনিশ্চিত, বিগর্হিত। ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যপদ হসন্তবৎ হয়,: দূত, হিত। কতগুলি ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদও হসন্তবৎ হয়ে বিশেষ্য রূপে চলে, যেমন: গণিত, জিত, প্রেত, ভূত, মত, গীত, সঙ্গীত, প্রীত, সম্প্রীত, জাত, বিহিত। 'সংস্কৃত' কথাটা বিশেষ্য-বিশেষণ উভয় রূপেই অকারান্ত, 'প্রাকৃত' কথাটা বিশেষ্য রূপে অকারান্ত-হসন্তবৎ দু রকমই হয়ে থাকে, বিশেষণ রূপে কেবল অকারান্ত। অজিত, সুজিত, অমিত, অসিত, মহিত, মোহিত, ললিত কারও নাম হলে, এবং পালিত, রক্ষিত, দীক্ষিত পদবী হলে হসন্তবৎ হয়। তদ্রূপ পড়িত-এর সঙ্গে লিখিত যুক্ত হয়ে লিখিত্-পড়িত্ (in black and white) উচ্চারিত হয়ে থাকে।

(১২) ইতচ্ প্রত্যয়ের ত হসন্তবৎ হয় না। তারকিত, পুষ্পিত, সুরভিত, পুলকিত, কলঙ্কিত, মূর্চ্ছিত, গর্ব্বিত, রোমাঞ্চিত, লজ্জিত। ব্যতিক্রম পণ্ডিত।

(১৩) তরট্, তরপ্, তমট্, তমপ্, ইত্যাদির তর তম হসন্তবৎ হয় না। অশ্বতর, বিংশতিতম, একতর, একতম, দূরতর, দূরতম, নিকটতর, নিকটতম। ব্যতিক্রম, উত্তর, উত্তম, গুরুতর, প্রিয়তম।

(১৪) সমাসবদ্ধ টচ্ প্রত্যয়ান্ত প্রিয়সখ, বসন্তসখ অকারান্ত, কিন্তু মহারাজ হসন্তবৎ।

(১৫) বিধল্ প্রত্যয়ের ধ হসন্তবৎ হয় না। নানাবিধ, বিবিধ, দ্বিবিধ।

(১৬) যেসমস্ত অকারান্ত তৎসম শব্দ বাংলায় কম চলে তারা হসন্তবৎ হয় না।

এই শেষ সূত্রটিকে কাজে লাগিয়ে বাংলা উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় যথারীতি পণ্ডিত হয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচয় ক'রে এবং বাঙ্গালীদের সঙ্গে নানাবিষয়ে বাক্যবিনিময় ক'রে বুঝে নিতে হবে কোন্ তৎসম শব্দগুলি বাংলায় কম চলে। তারও পরে প্রশ্ন বাকী থাকবে, কতটা কম চললে হসন্তবৎ উচ্চারণ বিহিত ব'লে গণ্য হবে না।

এছাড়া কতগুলি অনিয়মের নিয়ম আছে, যাদের নিয়ে সূত্র রচনা করা চলে না। যেমন, সাধারণ্যে যার হসন্তবৎ উচ্চারণ এমন অনেক তৎসম শব্দ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অকারান্ত উচ্চারণ ক'রে থাকেন। কতগুলি তৎসম, তদ্ভব, এমন কি দেশজ শব্দও গদ্যে হসন্তবৎ, কিন্তু পদ্যে কবির প্রয়োজন এবং খুসি মতন অকারান্ত উচ্চারিত হয়।

এ-পর্য্যন্ত যে-সমস্ত অকারান্ত শব্দের কথা বলা হ'ল, বাংলা ষষ্ঠী বিভক্তির র এবং সপ্তমী বিভক্তির এ বা তে গ্রহণের বেলায় তাদের সকলেরই হসন্তবৎ আচরণ। অর্থাৎ উচ্চারণ অকারান্ত বা হসন্তবৎ যাই হোক, ষষ্ঠীতে পদান্তবর্ণ হসন্তবৎ হয়ে তারপর 'এর' যুক্ত হয়, সপ্তমীতেও হসন্তবৎ হয়ে তারপর 'এ' অথবা 'এতে' যুক্ত হয়। বালকের, দূরে, দরখাস্তের, ফর্দ্দে, নীলকণ্ঠের, অন্তে, স্নেহের, বিবাহে, নৃপের, তৃণে, অনাগতের, সঙ্গীতে। অল্প কয়েকটি শব্দ, বিশেষতঃ যদি যুক্তাক্ষরান্ত হয়, অকারান্ত ও হসন্তবৎ দুরকম আচরণই ক'রে থাকে। যেমন : মন্দয়, মন্দে, বৃদ্ধর, বৃদ্ধের। নামের উচ্চারণ অকারান্ত হলে তারও দুরকম আচরণ, যেমন : মন্মথর, মন্মথের, শৈলর, শৈলের। কিন্তু এগুলি ছাড়া আরও কতগুলি এমন শব্দ আমরা পাচ্ছি যাদের বলা যায় নিত্য-অকারান্ত, অর্থাৎ বিভক্তি গ্রহণের বেলায় যারা হসন্তবৎ আচরণ করে না, অকারান্তই থাকে। এবারে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলির উচ্চারণের সূত্র কি কি আছে তা দেখা যাক।

(১৭) একাক্ষর শব্দের অকার হসন্তবৎ হয় না। চ-এর পিঠে ছ, এক-শর চেয়ে বেশী।

(১৮) তসিল্ প্রত্যয়ের ত বিসর্গহীন হ'লেও হসন্তবৎ হয় না। ইতস্ততয় লাভ নেই, প্রধানতর কথা হচ্ছে। অন্তত, সর্ব্বত, মুখ্যত।

(১৯) আরবী তরহ্ থেকে নেওয়া বাংলা তর প্রত্যয় হসন্তবৎ হয় না। এমনতরয় কাজ কি? বহুতর।

(২০) বাংলা অকারান্ত সবক'টি প্রত্যয় উচ্চারণেও অকারান্ত।

(ক) সম্পর্কবাচক প্রত্যয় ত, তুত। মামাতর চেয়ে মাসতুত আপনার। সতাত, জাঠতুত, খুড়াত-খুড়তুত, জেঠাত-জাঠতুত, পিসাত-পিসতুত।

(খ) যুক্তার্থক প্রত্যয় ল, আল। ঝাঁঝালর সঙ্গে রসাল (রসযুক্ত) মিশিয়ে। আঠাল, চাটাল, ছুঁচাল, জমকাল, জাঁকাল, জোরাল, ঝাঁপাল, টিকাল-টিকল, ধারাল, মাথাল।

প্রত্যয় দুটি যে লো এবং আলো নয়, অকারান্ত উচ্চারণের ব্যতিক্রমগুলিই তার প্রমাণ। এঠেল, দাঁতাল (বিকল্পে অকারান্ত উচ্চারণ), মাতাল, বাঙাল, ভাটিয়াল, ঘাটাল, পাঁকাল, পাইকাল, লাঠিয়াল। বাংলা উচ্চারণ-বিকৃতির নিয়মে অ হসন্তবৎ হয়, ও কখনোও হসন্তবৎ হয় না।

(গ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য-বিশেষণের অন প্রত্যয়। ফুল-ঝরানর খেলা। লাফান, চটকান, উল্টান, করান, লোক-দেখান। ব্যতিক্রমগুলি প্রমাণ করে, প্রত্যয়টা অনো নয়। ভাসান, ঠেসান, জানান। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্রই প্রত্যয়টির হসন্ত উচ্চারণ এবং আমার ধারণা, প্রাদেশিক উচ্চারণ-বিকৃতিতে ও কদাপি হসন্তবৎ হয় না।

(২১) ক্রিয়াপদের শেষে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন উচ্চারণে এই জায়গাগুলিতে অকারান্ত:

(ক) উত্তমপুরুষ ভবিষ্যৎ: করিব-করব, দেখিব-দেখব।

(খ) মধ্যমপুরুষ (সামান্য) বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত বা অনুজ্ঞা: কর, দেখ।

(গ) মধ্যমপুরুষ (সামান্য) বর্ত্তমান ঘটমান ও পুরাঘটিত: করিতেছ-করছ, করিয়াছ-করেছ।

(ঘ) প্রথমপুরুষ (সামান্য) অতীতের সবক'টি রূপ: করিত-করত, করিল-করল, করিতেছিল-করছিল, করিয়াছিল-করেছিল।

এই জায়গাগুলিতে হসন্তবৎ:

(ক) উত্তমপুরুষ অতীতের সবক'টি রূপ: করিলাম-করলাম, করিতাম-করতাম, করিতেছিলাম-করছিলাম, করিয়াছিলাম-করেছিলাম।

(খ) অতীত সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত এবং ভবিষ্যৎ সাধারণ ভিন্ন মধ্যমপুরুষ তুচ্ছের সবক'টি রূপ: করিস, করছিস, করেছিস, করতিস।

(গ) মধ্যম ও প্রথমপুরুষ গুরুর সবক'টি রূপ: করেন, করিতেছেন-করছেন, করিয়াছেন-করেছেন, করিলেন-করলেন, করিতেছিলেন-করছিলেন, করিয়াছিলেন-করেছিলেন, করিতেন-করতেন, করিবেন-করবেন, করুন। প্রথমপুরুষ (তুচ্ছ- মধ্যম) অনুজ্ঞা: করুক।

উপরোক্ত তিনটি সূত্রের চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলির কোনোটাই মূলতঃ এবং বাস্তবিক অকারান্ত নয়, কিন্তু করলাম, করেন লিখতে ম ও ন-কে হস্‌চিহ্নিত না ক'রে যদি চলে ত করিস, করুক লিখতে স ও ক-কে হস্‌চিহ্নিত কেন করতে হবে তার কিছু মানে নেই।

(২২) কতগুলি শব্দ স্বভাবতই অকারান্ত উচ্চারিত হয় এবং বিভক্তি গ্রহণের বেলায়ও হসন্তবৎ আচরণ করে না। যেমন, অত, এত, কত, তত, যত, কেন, যেন, হেন, বড়, কাল, ভাল, মত, ছোট, জড়, দড়, ডাঁট, খাট, এগার, বার, তের, চোদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার, আধআধ, এবং বাধবাধ, হুবহুব, পড়পড়, মরমর, ইত্যাদি।

বাংলার অসংখ্য অকারান্ত-উচ্চারণের শব্দের মধ্যে ১৭ থেকে ২২ পর্য্যন্ত সূত্র-ছয়টির অন্তর্গত মুষ্টিমেয় এই ক'টি শব্দের আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের অর্থ কি? বিভক্তি গ্রহণের বেলায় হসন্তবৎ হতে কোথায় এবং কেন এদের বাধে? ওকারান্ত শব্দ কোনো অবস্থাতেই হসন্তবৎ হয় না, সেজন্যে এদের ধরণ দেখলে মনে হয়, হয়ত বা এরা বাস্তবিকই ওকারান্ত। কিন্তু ওকার-বিলাসীরাও, অন্ততো, কেনো, যেনো, হেনো লেখেন না; বাকীগুলিকেও ওকারান্ত ব'লে চলতে দেবার আগে একটু বাজিয়ে দেখা আবশ্যক মনে করি।

১৭-র সূত্রে একাক্ষর শব্দগুলো যে বিভক্তিগ্রহণের বেলায় হসন্তবৎ হয়ে যায় না সেটা ভালই

করে, কেননা তা করলে তাদের চেহারার কিছুই আর বাকী থাকত না। একশ-র বেশী না ব'লে একশের বেশী, কিম্বা ঢ-এর পিঠে ণ না ব'লে ঢের পিঠে ণ বললে কিছুমাত্র অর্থগ্রহণ না হবারই সম্ভাবনা। তবু দেখতে হবে, এদের মধ্যে এমন একটিও কেউ আছে কিনা যার ওকারান্তই হওয়া উচিত কিন্তু আমরা অভ্যাসবশে অকারান্ত ক'রে লিখছি।

ক (কয়-এর সংক্ষেপ, কও-এর তুচ্ছ), খ (আকাশ), চ (চল্-এর সংক্ষেপ), ছ (ছয়-এর সংক্ষেপ), থ (স্তম্ভিত), দ (দহ-র সংক্ষেপ), ন (নয়-এর সংক্ষেপ) ব, র, ল, হ, স (বও, রও, লও, হ্ও, সও-এর তুচ্ছ), এগুলিকে নিয়ে তর্ক নেই কারণ এগুলিকে ওকারান্ত ক'রে কেউ লেখেন না। বাকী রইল ক (নিষেধার্থক শব্দের মাত্রা), ত এবং শ (শত থেকে তদ্ভব)।

ভাষার প্রাচীনতর রূপে সএ, সও পাচ্ছি, ওকার কোথাও পাচ্ছি না। নব-নঅ-নও-ন, শত-শঅ-শও-শ। অকার বানানটা চলেও বেশী, অকারই বানান হওয়া উচিত।

বাংলায় কয়েক রকম ত-এর ব্যবহার। এক, সংস্কৃত ততঃ জাত : সে যদি আসে ত আমি যাব, কাছে যাও ত শুনতে পাবে ; এই ত-কে তবে-তে অনুবাদ করা চলে : সে যদি আসে তবে আমি যাব, কাছে যাও তবে শুনতে পাবে। পূর্ব্ববঙ্গে তবে অর্থে 'তয়' চলে (তবে-তএ-তয়) ; কয়-ক, ছয়-ছ, নয়-ন, তেমনি তয়-ত। এ অর্থে ত অকারান্তই হওয়া উচিত। কিন্তু সে যদি আসে তবে তো আমি যাব, কাছে যাও তবে তো শুনতে পাবে, এই 'তো' সংস্কৃত তু-জাত, সুতরাং অকারের চেয়ে ওকারটাই এক্ষেত্রে বেশী সমীচীন। উ উচ্চারণ-সৌকর্য্যের জন্যে ও হচ্ছে। এছাড়া কথার মাত্রা, অলঙ্কার বা জোরের জন্যে ত-এর আর যে-সমস্ত ব্যবহার আমাদের ভাষায় আছে, সেগুলিকে অকারান্ত ক'রে লিখলে ক্ষতি কিছু নেই। ওকারান্ত ক'রেও লেখা চলে। ততঃজাত (অর্থাৎ 'তবে' দ্বারা অনুবাদ করা চলে এমনতর) ত ছাড়া অন্যত্র ওকার, এ নিয়ম চলতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীর মেহনত বাড়িয়ে কি লাভ ? সর্ব্বত্র ত কিম্বা তো, যে-কোনও একটা লিখলেই আপদ্ চুকে যায়। নিষেধার্থক শব্দের মাত্রা হিসাবে যে ক-এর ব্যবহার, তাতে ওকারই চলা উচিত কারণ, কথাটা পশ্চিমবঙ্গের নিতান্তই নিজস্ব এবং সে-অঞ্চলে ওকারান্ত ক'রেই সর্ব্বত্র এটার উচ্চারণ।

১৮-১৯ সূত্রের তসিল্ প্রত্যয়ের বিসর্গহীন ত, এবং আরবী তরহ্ থেকে নেওয়া 'তর'। এরা অকারান্ত সেজে বেড়ায়, কিন্তু বিভক্তি গ্রহণের বেলায় বোধহয় নিজেদের কৌলিক মর্য্যাদা মনে প'ড়ে যায় এবং সেই রকম আচরণ করে। ত ভুলতে পারে না যে সে আসলে তঃ, তর ভুলতে পারে না যে আসলে সে তরহ্। হসন্তবৎ হ'তে তাদের বাধে।

২০-ক সূত্রের ত ও তুত। অভিধানে ত-র পোষাকী রূপ 'তুয়া' এবং তুত-র পোষাকী রূপ 'তুতা' পাচ্ছি। কিন্তু সন্দেহ হয়, তুয়া এবং তুতা কেতাবী বাংলার জন্যে তৈরি করা দুটি কৃত্রিম শব্দ। যেটাকে ত প্রত্যয় বলছি, সেটা যে আসলে 'আত', তার প্রমাণ সৎ+আত=সতাত।

বিবর্ত্তনের ধারায় পূর্ব্ববঙ্গীয় উপভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই দু-এক ধাপ পিছিয়ে আছে, তাই অনেক শব্দের প্রাচীনতর রূপ সে-উপভাষায় অপরিবর্ত্তিত থেকে গিয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তি নিয়ে যেখানে সংশয়, সে-উপভাষার শরণাপন্ন হলে সেখানে সমাধানের ইঙ্গিত হয়ত আমরা পেয়েও যেতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গে সম্পর্কবাচক প্রত্যয় কেবল একটাই চলে এবং সেটা হচ্ছে 'আত্ত'। মামাত্ত, পিসাত্ত, খুড়াত্ত,

জেঠাত্ত। অকারান্ত যুক্তাক্ষরের সমীকরণে একটি ব্যঞ্জন যেখানে বাদ যায়, সেখানে অবশিষ্ট ব্যঞ্জনটি আর অকারান্ত থাকে না, অন্য কোনো স্বরান্ত বা হসন্তবৎ হয়ে যায়, যেমন, গুচ্ছ-গোছা-গুছি, চক্র-চাকা-চাক। পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত মামাত্ত, খুড়াত্ত ইত্যাদির আত্ত যদি প্রত্যয়টির আদি-রূপ হয়, তাহলে 'ত'-ও নয় 'আত'-ও নয়, বানান হওয়া উচিত 'আতো'। তুত-প্রত্যয়টির ব্যবহার যে-অঞ্চলে আছে, সে-অঞ্চলে পাগল-পাগলামি, বাঁদর-বাঁদরামি, কিন্তু গোঁয়ার-গোঁয়ারতুমি। 'আমি' প্রত্যয় যে-রাস্তা ধ'রে গিয়ে 'তুমি' হয়, 'আতো' সেই রাস্তা ধ'রে গিয়েই 'তুতো' হয় কিনা ভাষাবিৎরা বলতে পারবেন। ওটা পশ্চিমাঞ্চলের উপভাষার নিজস্ব প্রত্যয় এবং সে-অঞ্চলে উচ্চারণ হয় ওকারান্ত, সুতরাং ওকার বানানটা বিহিত মনে হয়।

২০-খ স্থত্রের ল এবং আল, লো এবং আলো যে নয় তা আগেই দেখিয়েছি। বিভক্তি-গ্রহণের বেলায় এরা অনেক ক্ষেত্রেই হসন্তবৎ আচরণ করে, কয়েকটি জায়গায় করে না। আমার মনে হয়, এরা সংস্কৃত 'লচ্' প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ অপত্য এবং সেই হেতুও খাঁটি অকারান্ত। দংষ্ট্রাল—দাঁতাল। তেমনি ২০ গ স্থত্রের 'অন' সংস্কৃত অনট্ প্রত্যয়ের অপত্য এবং খাঁটি অকারান্ত। লাফান-র 'অন' এবং করানর 'আন' জাতে এক, একটি আর-একটির ণিজন্ত সংস্করণ। তৎসম শব্দে 'অনট্' প্রত্যয়ের 'অন' বাংলা উচ্চারণে সর্ব্বদাই হসন্তবৎ: বন্ধন, আগমন, বিধান, প্রমাণ। বাংলা 'অন'-র ন অকারের পর উচ্চারণে হসন্তবৎ, আকারের পর অকারান্ত। যেমন, চলন-বলন, দেখনহাসি, ঝুলনযাত্রা, লোটন পায়রা, নড়নচড়ন, ছাঁদনদড়ি, মাগন, তুর্কি-নাচন, সুরের মাতন, জীয়ন-কাঠি। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় সমস্ত ধাতুরই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য-বিশেষণ অন প্রত্যয় (ন হসন্তবৎ) দিয়ে নিষ্পন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ, সে-জায়গায় আ প্রত্যয় বেশী চলে। আকারের পর অন অকারান্ত, যেমন, আঁচান, এড়ান, ককান, খতান, গজান, দমান, চেঁচান, বেড়ান। 'অন'-র ণিজন্ত 'আন'-র ন আকারের পরে আসছে বলেই উচ্চারণে অকারান্ত, অন্য কোনো কারণে নয়। যেমন, করান, দেখান, শোওয়ান। ব্যতিক্রম যে-ক'টি আছে, যেমন, ব্যথাটা আবার জানান দিচ্ছে, ভাসান দেখতে যাচ্ছি, ছাড়ান পাবে না, মানান-সই, সেগুলিই আরো নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে প্রত্যয়গুলি ওকারান্ত নয়।

২১ স্থত্রের অকারান্ত ক্রিয়াপদগুলির অবস্থা কিরূপ এবারে দেখা যাক। কৃদন্ত অবস্থায় ভিন্ন ষষ্ঠী-সপ্তমী বিভক্তি গ্রহণের কথা এদের বেলায় ওঠে না, তবু এগুলিকে বিশিষ্ট অকারান্তের পর্য্যায়ে যে ফেলছি তার কারণ, এরা নিত্য-অকারান্ত।

বাংলা গোষ্ঠীর ভাষার একটা স্বভাব হচ্ছে এই, যে, ধ্বনিপরিবর্ত্তনে, ধ্বনিবিকারে অকার হসন্তবৎ এবং হসন্তবৎ অকার হয়, কিন্তু ওকার কখনোও হসন্তবৎ বা হসন্তবৎ কখনোও ওকার হয় না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র যা মনে আসছে তা হচ্ছে মেজো-মেজদা-মেজদি, কিন্তু কথাটা আদপে মেজো কিনা সে-বিষয়ে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অভিধানে পাচ্ছি, মাঝুয়া-মেঝো-মেজো। পূর্ব্বেই বলেছি, পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষায় বাংলার প্রাচীনতর রূপ অদ্যাপি অনেকটা বিধৃত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ইয়া জাত এ পূর্ব্ববঙ্গে ইয়া, এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি উয়া-জাত ও পূর্ব্ববঙ্গে উয়া, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে মাঝুয়া নেই, কখনো ছিলও না ; আছে মাইঝম (মধ্যম) এবং মাইঝা। আমার মনে হয়, তার থেকে মাইঝ (অকারান্ত), মেঝ এবং সর্ব্বশেষে মেজ। সেজো একটি অনুকার শব্দ, তার সেজ হতেও বাধা নেই।

করিল-কর্‌ল, বাংলায় নিত্য অকারান্ত, বাংলা গোষ্ঠীর ভাষা অসমীয়াতে কথাটা করিল্‌। গেল পূর্ব্ববঙ্গে গেল্‌, অসমীয়াতে গল্‌। গিয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গে গেছিল্‌, আসামে গৈছিল্‌। হইত-হ'ত-র মৈথিল রূপ হোত্‌। হসন্তবৎ এবং ওকারের মধ্যে এধরণের লেনদেন নেই, সুতরাং বিভক্তি দুটো লো, তো নয়, ল এবং ত।

করিব-র প্রাচীন বাংলা রূপ করিবোঁ পাচ্ছি। বাংলার উত্তম পুরুষ অতীতের সবকটি রূপেই বিভক্তিতে আমিবাচক অনুনাসিক যোগ হয়। করিলাম-করলাম-করলেম-করলুম, করিতেছিলাম-কর্‌ছিলাম-করছিলেম-করছিলুম, করিতাম-করতাম-করতেম-করতুম, করিয়াছিলাম-করেছিলাম-করেছিলেম-করেছিলুম। পূর্ব্ববঙ্গে উত্তমপুরুষ ভবিষ্যতেও আমি-বাচক অনুনাসিকের প্রচলন, যেমন, করবাম, করমু, কইরুম, করুম, করতাম না। ময়মনসিংহ অঞ্চলে অসমাপিকাতেও এই আমিবাচক অনুনাসিকের দেখা মেলে, যেমন, আমি খেতে চাই = আমি খাইতাম চাই ; আমি যেতে পারব না = আমি যাইতাম পারতাম না। অসমীয়াতে কেবল অতীত এবং ভবিষ্যতে নয়, বর্ত্তমান কালের বিভক্তিতেও আমিবাচক অনুনাসিক, যেমন, করি = করোঁ, করছি = করি আছোঁ, করেছি = করিছোঁ। প্রাচীন বাংলায় করিবোঁ রয়েছে, সেই নজীরে অনুনাসিক বাদ দিয়ে কথাটা কেতাবী বাংলায় করিবো হতেও পারত, কিন্তু হয়েছে করিব। কেতাবী বাংলার সঙ্গে যোগ রক্ষার খাতিরে আমি চল্‌তি বাংলাতেও এই অকারান্ত বানান রক্ষা করারই পক্ষপাতী।

ভাষার প্রাচীনতর স্তরে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তিতে প্রায় সর্ব্বত্রই হ। যেমন, নিত্যবৃত্ত বর্ত্তমান—জানহ, অনুজ্ঞা—সুমরহ, অতীত—লেখলহ, ভবিষ্যৎ—ঐবহ। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক স্তরে বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত ও অনুজ্ঞায় হ। দেখহ, করহ, যাহ। মধ্যম পুরুষের এই হ, প্রথম পুরুষের ক (কহলক) এবং উত্তম পুরুষের অনুনাসিক (কহিবোঁ), এদের স্বগোষ্ঠী। প্রথম পুরুষের ক এবং উত্তম পুরুষের অতীত-কালে ভিন্ন অন্যত্র অনুনাসিক যেমন অধুনা নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়েছে, মধ্যমপুরুষ ক্রিয়াপদে বিভক্তির অকারের পরবর্ত্তী হ-ও তেমনি কোনোও চিহ্নাবশেষ না রেখেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এই আমার ধারণা। কেবল দেখতে পাই, আসামে হ-এর হ্‌ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে অ অবশিষ্ট থাকছে এবং দুটি অ মিলে আ হচ্ছে ; করহ-করঅ-করা। জএবহ পূর্ব্ববঙ্গে যাইবা, আসামে যাবা। লেখলহ পূর্ব্ববঙ্গে লেখ্‌লা, অসামে লিখিলা। বর্ত্তমানের কয়েকটি রূপ এবং অনুজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র এই আ পরে পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় উচ্চারণ সৌকর্য্যের খাতিরে এ হয়ে গিয়েছে : তুমি কর, কিন্তু তুমি যাবে, লিখলে। করহর হ লুপ্ত হয়ে কর হয়েছে বুঝতে পারি, কিন্তু ওকার আগম কোন্‌দিক্‌ দিয়ে হতে পারে কিছুই ধারণা করতে পারছি না। বিভক্তির অকারের পর হ লুপ্ত না হয়ে অ বা ও হচ্ছে ব'লে লাভ নেই, কেননা অ + অ, অ + ও কোনোওটাই ও হয় না।

কহ-কও, বহ-বও, লহ-লও, সহ-সও, গাহ-গাও, চাহ-চাও এগুলিতে হ্‌ ধ্বনি মূল ধাতুরই অন্তর্গত ; করহ, আছহ-র হ-এর মত বিভক্তি বা তারও বাইরের জিনিষ নয়। তাছাড়া মহাপ্রাণ হ এগুলিতে প্রথমতঃ অল্পপ্রাণ অ হয়ে পরে ও হয়েছে, পদমধ্যবর্ত্তী একটি স্বরধ্বনির অব্যবহিত পরে আবার পদান্তে অ উচ্চারণ বাংলার ধাত নয় ব'লে। পূর্ব্ববঙ্গে এই উচ্চারণ অদ্যাপি হয়, যেমন, মৈথিল আবিঅ এস, ময়মনসিংহে আইঅ। দুটি স্বরধ্বনির স্বতন্ত্র উচ্চারণ যেখানে নেই, সেখানে অ ও হবার প্রয়োজনও

কিছু নেই। আরও মনে রাখতে হবে, যে, হ প্রথমে অ হয়ে পরে ও হচ্ছে, ওকার হচ্ছে না। (নহলা-নওলা ; নোলা নয়। নহয়—নয়, নহও-নও যদি হতে পারে, ত নহস নোস হবার প্রয়োজন কিছু নেই, নস বিহিত বানান।)

বিভক্তির অকার নয় এমনতর অকারের পরবর্ত্তী, অর্থাৎ অকারান্ত ধাতুর অকারের পরবর্ত্তী, এবং অকার ভিন্ন অন্য সমস্ত স্বরধ্বনির পরবর্ত্তী হ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না, উচ্চারণের উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে প্রথমে অ এবং পরে ও হয়। হঅ-হও, আনাঅ-আনাও, বসাঅ-বসাও, দেখাঅ-দেখাও, দেঅ-দেও-দাও, শুঅ-শোঅ-শোও (ময়মনসিংহে কথাটা এখনও শুঅ)।

বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত মধ্যমপুরুষে ক্রিয়া-বিভক্তির অকার বানান রক্ষা করতে যাঁদের আপত্তি নেই, তাঁদেরও মধ্যে কেউ কেউ অনুজ্ঞাতে ওকার ব্যবহারের পক্ষপাতী। বর্ত্তমান নিত্যবৃত্তের সঙ্গে সর্ব্বত্র যদি এই ওকার যোগ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হতে পারত ত কথা ছিল না, কিন্তু স্বরান্ত এবং অন্তে হ্ আছে এমনতর ধাতুগুলির বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত এবং অনুজ্ঞা দুয়েরই অন্তে ও : কও, খাও, লাফাও, চটকাও। বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩৫০, স্বরান্ত এবং অন্তে হ্ আছে এমনতর ধাতুর সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩০০, কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত সমস্ত ধাতুরই ণিজন্ত রূপ স্বরান্ত ; সমস্ত নিয়ে হিসাব করলে মধ্যমপুরুষ বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত ও অনুজ্ঞায় অন্তে ও হয় এমন ক্রিয়াপদের সংখ্যাই বাংলায় বেশী দাঁড়িয়ে যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য যখন কিছুতেই রক্ষিত হতে পারছে না তখন অল্প কয়েকটি জায়গায় এজন্যে বানানের বিপর্য্যয় ঘটিয়ে কি লাভ ? মধ্যমপুরুষ বর্ত্তমান নিত্যবৃত্ত এবং অনুজ্ঞার রূপ অনেক ভাষাতেই অভিন্ন।

২২ সূত্রের অন্তর্গত যে শব্দগুলো বিভক্তি গ্রহণের বেলাতেও অকারান্তই থাকে, তাদের রহস্য ভেদ করা যায় কিনা এবারে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

দড় কথাটার উৎপত্তি দৃঢ় থেকে। দৃঢ় সম্ভবতঃ দড়্হ, ধ্বনি সঞ্চালনে দড়হ্। হ্ লোপ পায়, কিন্তু বিভক্তি গ্রহণের বেলায় তার ভূতটাকে সমীহ ক'রে চলতে হয় ব'লে দড় হসন্তবৎ হতে পায় না।

চোদ্দর দ বাস্তবিক দহ্ দশ থেকে, এবং এখানেও সেই হ্-এর ভূত। খড়দহ—খড়দহ্ খড়দ, হ্-এর ভূতটাকে মানি ব'লেই বলি "খড়দয় থাকে," বলি না "খড়দে থাকে।" একই কারণে চোদ্দয়, চোদ্দর ; চোদ্দে, চোদ্দের নয়। তেমনি, একাদশ-একাড়হ-এগারহ-এগার, দ্বাদশ-বাড়হ-বারহ-বার, তেরহ-তের, পন্নরহ-পনের, সোলহ-ষোল, সত্তরহ-সতের, আঠারহ-আঠার। খড়দ-র মত এরা সবাই নিত্য অকারান্ত। অন্ত্য র বা অন্ত্য ল বিভক্তিদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করতে গেলেই হ-এর ভূত আঙুল উঁচিয়ে এদের শাসন করছে, পাচ্ছি এগারর পরিচ্ছেদ, পনের ছেড়ে ষোলয় পা দিয়েছে।

মত প্রাচীন বাংলায় মন্ত, ধ্বনিসঞ্চালনে মতন। তারপর একদিকে ত ছেড়ে মন—এমন, কেমন, তেমন, যেমন ; অন্যদিকে ন ছেড়ে মত (শুধু মতই চলে, এমত, যেমত পদ্যে ছাড়া চলে না।) সুতরাং মতর পেছনেও একটি লুপ্তবর্ণের ভূত। কথাটার ব্যুৎপত্তির ইতিবৃত্তে ওকার কোথাও নেই। পদ্যে কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত মতি চলত : যেমতি, তেমতি। মতি-মত-র মত, কত-র প্রাচীন রূপ কতি, যত-র প্রাচীন রূপ জতি-যতি পাচ্ছি।

কত, যত-র সঙ্গে তাল রেখে অত, এত, তত। এ-সবগুলোই যে অকারান্ত, ওকারান্ত কোনোও জন্মে নয়, তার আরও একটা প্রমাণ, প্রাদেশিক উচ্চারণ-বিকৃতিতে, সন্ধির ক্ষেত্রে, ভূতের ভয়টা কাটিয়ে এরা কদাচিৎ হসন্তবৎ হচ্ছে, যার ফলে পাচ্ছি : এ্যাদ্দিন, কদ্দিন, যদ্দিন, কদ্দূর।

কৈহ্ন-কেহেন-কেহ্ন কেন ; যেহ্ন যেন। যুক্ত ব্যঞ্জন একটি মাত্র ব্যঞ্জনে পর্য্যবসিত হলে অকার অন্য কেনোও স্বর বা হসন্তবৎ হয়ে যায়, সে-সূত্র এখানে খাটে না, কারণ হ্ ঠিক পুরোপুরি ব্যঞ্জন ধ্বনি নয়, এবং বাংলায় প্রায়শঃই নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পায়। প্রাচীন বাংলায় কেনি, কেনে, যেনে পাচ্ছি ; কাঁঞ্ছি (কারনি) থেকে কেনি এসে থাকতে পারে, তার থেকে কেনে, যা রাঢ় অঞ্চলের উপভাষায় এখনও চলে। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষায় কথাদুটো কেন্, যেন্। পশ্চিমাঞ্চলেও কোথাও কোথাও আমি 'হেন্ তেন্' বলতে শুনেছি। ওকার উচ্চারণবিকৃতিতে হসন্তবৎ হয় না।

আগে ই, উ অথবা এ-র টান নেই এমন ক্ষেত্রে ধ্বনিপরিবর্ত্তনে আ সাধারণতঃ অ-ই হয়ে থাকে, ও হয় না। যেমন বাঁটলাই-বাঁটলই, পান্তা-পান্ত, পূর্ব্ববঙ্গের আস্তা পশ্চিমবঙ্গে আস্ত, বললাম রাঢ় অঞ্চলে বললম। সেই সূত্রে প্রাচীন বাংলার ভলা-ভালা থেকে ভাল। অথবা ভদ্র+আক থেকে ভালা, ভদ্রক থেকে (ভদ্‌লক-ভল্লঅ-ভালঅ) ভাল। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষায় কথাটা ভালা, পশ্চিমাঞ্চলে হসন্তবৎ ভাল্মানষী পাচ্ছি। কোনোওদিক্‌কার বিচারেই ওকার আগম বিহিত হতে পারে না। ধবল-ধওলা, পূর্ব্ববঙ্গে ধলা, তার থেকে ধল যদি নাও হয়, তাহলেও ওকার দিয়ে বানান করার সপক্ষে যুক্তি কিছু নেই।

অকারান্ত যুক্তব্যঞ্জন একটিমাত্র ব্যঞ্জনে এসে দাঁড়ালে অকার, হয় অন্যস্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায় নয়ত হসন্তবৎ হয়। ধ্বনিপরিবর্ত্তনের এই সূত্র অনুসারে ক্ষুদ্র-ছুদ্দ (ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে ছুড়ু) —ছোটো, ওকার বানানটাই বিধিসম্মত। বড্র-বড়ো, যদি না বৃহৎ-বব্‌হৎ-বব্‌হ-বড় এইভাবে কথাটার উৎপত্তি হয়ে থাকে। তবে ছোট-বড় কথাদুটোই অকারান্ত ব'লে বাংলায় বহুকাল গৃহীত হয়ে গিয়েছে, সেজন্যে এদের হসন্তবৎ আচরণ ছোড়দা, বট্‌ঠাকুর, বড়মানষী ইত্যাদি কথায় পাচ্ছি। আসামে এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বড় (বর) কথাটা উচ্চারণে সব অবস্থাতেই হসন্তবৎ। অকারান্ত বানানটাই রক্ষা করা উচিত।

ডাঁট (ডাঁটো) কথাটার উৎপত্তি জানি না। ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে শক্ত অর্থে ডাট্ চলে। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার নিজস্ব শব্দ ব'লে ওকার ব্যবহার চলতে পারে।

কৃষ্ণবর্ণ অর্থে কাল কথাটা খাঁটি তৎসম, সুতরাং তাতে ওকার ব্যবহারের পক্ষে কোনোও যুক্তিই থাকতে পারে না। ভাল এবং ভালার মত, কাল এবং কালা কথা-দুটিরও স্বতন্ত্র ব্যুৎপত্তিতে ভাষাবিৎরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি তাঁদের দলের যাঁরা বলেন বাংলা কাল (কৃষ্ণবর্ণ) সংস্কৃত কাল থেকে সোজাসুজি আসেনি, মাঝে কোনো সময় একবার কালা হয়ে এসেছে, যেজন্যে তার পেছনে আকারের ভূতটা এখনো ঘুরছে। পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ অর্থে কালাই চলে, পশ্চিমবঙ্গেও কালামুখ, কালাপাড় অদ্যাপি চলছে। কথাটার হসন্তবৎ আচরণও কালেভদ্রে চোখে পড়ে, যেমন, কোকিল বোঝাতে কাল, কালনাগিনী, কালচিটে, কালবোস, কালশিরা। ওকার বানান কোনোও ক্রমেই চলতে পারে না।

জড় যদি জট থেকে এসে থাকে, একত্রীকৃত অর্থে, ত সে যে নিত্য-অকারান্ত কেন তা বোঝা যায়

না, বিশেষ যখন জট বাংলা উচ্চারণে নিজে হসন্তবৎ। আমার মনে হয়, জটার থেকে জড়া (পূর্ব্ববঙ্গে কথাটা আকারান্ত), তার থেকে জড়, তাই পেছনে আকারের ভূত। খাট (খর্ব্ব) কথাটার উৎপত্তি জানি না (খট্টিক ?), এবং বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে বা বাংলা ভিন্ন অন্যত্র কথাটার চলন নেই ব'লে মনে হয় ওটা পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার নিজস্ব শব্দ। উচ্চারণে এবং আচরণে ওকারান্ত, সুতরাং খাটো বিহিত বানান।

আধা-র থেকে আধ-আধ, বাধার থেকে বাধবাধ। আগেই দেখেছি, ই, উ বা এ ধ্বনির টান পেছনে না থাকলে আ ধ্বনিপরিবর্ত্তনে সাধারণতঃ অ হয়, ও হয় না।

তেমনি, কাঁদার থেকে কাঁদকাঁদ, ঢলার থেকে ঢলঢল, ধরার থেকে ধরধর, পড়ার থেকে পড়পড়, ভরার থেকে ভরভর, মরার থেকে মরমর, ক্রিয়াগুলির একটা নৈর্ব্যক্তিক রূপ নিয়ে তৈরি। আমি কাঁদিকাঁদি হয়েছি, তুমি কাঁদকাঁদ হয়েছ, সে কাঁদে কাঁদে হয়েছে, তিনি এবং আপনি কাঁদেন কাঁদেন হয়েছেন, তুই কাঁদিস কাঁদিস হয়েছিস, সবগুলির জন্যে এক কাঁদকাঁদ, প্রথম-মধ্যম-উত্তম পুরুষ বা লঘু-গুরু নির্ব্বিচারে। মধ্যমপুরুষের রূপ এগুলি নয়, তার প্রমাণ হওয়া-র থেকে হবহব। আকার থেকে অকার, তাই হসন্তবৎ আচরণ করে না। ওকার দিয়ে কথাগুলোর বানান করার মানে হয় না কিছু।

জবস্থব, সড়গড়, ডগমগ, থতমত, এই ধরণের কয়েকটি শব্দ বাকী রইল। এদের সম্বন্ধে আমার যা বলবার কথা, এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্য সমস্ত শব্দের সম্বন্ধেও তাই আমার একমাত্র বক্তব্য। কথাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস বিচার ক'রে ওকার আগম স্পষ্টতঃ যদি বিহিত না হয়, ত ওকার বানান অবিহিত, কেননা অকারান্ত বানানটাই বরাবর চ'লে আসছে। উচ্চারণে ওকারান্ত পশ্চিমবঙ্গের নিতান্ত নিজস্ব দেশজ শব্দগুলির আচরণও যদি ওকারান্তবৎ হয়, অর্থাৎ কদাচ কোনোও অবস্থায় তারা যদি হসন্তবৎ আচরণ না করে, তাহলে অবশ্য ওকার বানানই চালু হওয়া উচিত। বিনা-প্রয়োজনে এবং বিনা যুক্তিতে প্রচলিত বানানের পরিবর্ত্তনকে অত্যন্ত অমার্জ্জনীয় যথেচ্ছাচার ব'লে আমি মনে করি।

বাংলা উচ্চারণে হসন্তবৎ অকারান্ত তৎসম শব্দ সমাসে কখনো অকারান্ত, কখনো হসন্তবৎ : বনতল., বনমানুষ। দুটিমাত্র নিয়ম যা রচনা করা যায় তা হচ্ছে এই :

(১) অসংস্কৃত শব্দ পরে থাকলে, উচ্চারণে হসন্তবৎ অকারান্ত তৎসম শব্দ হসন্তবৎই থাকে। যেমন, পরকাল, পরদার, পরবশের পর উচ্চারণে অকারান্ত, কিন্তু পরগাছা, পরচুলায় হসন্তবৎ।

(২) পরপদের প্রথম অক্ষর যুক্তাক্ষর হলে বা ঋফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে হসন্তবৎ অকারান্ত তৎসম শব্দ সমাসে প্রায়শঃই অকারান্ত। যেমন, কালকেতু, কালপুরুষ, কালযাপন, এগুলিতে ল হসন্তবৎ, কিন্তু কালক্রম, কালক্ষেপ, কালজ্ঞ, কালত্রয়, এগুলিতে অকারান্ত। জয়জয়ন্তী, জয়দেব, জয়পতাকায় য় হসন্তবৎ, কিন্তু জয়ধ্বনি, জয়শ্রী, জয়স্তম্ভে অকারান্ত।

কিন্তু নিয়ম রচনা ক'রে কিইবা লাভ ? প্রথমতঃ এই দুটি নিয়মের বাইরে অনিয়মের দিগন্ত-প্রসারী রাজত্ব, তারপর নিয়ম দুটিরই ব্যতিক্রম যে কত তার সংখ্যা নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই অবস্থাটা আশা করি সকলের বোধগম্য হবে।

উচ্চারণে অকারান্ত	উচ্চারণে হসন্তবৎ
কামগিরি, কামচারী, কামজ,	কামদেব, কামধেনু, কামরূপ,
কামজিৎ, কামবান্,	কামবাণ

উচ্চারণে অকারান্ত	উচ্চারণে হসন্তবৎ
একদা, একচর্য্যা, একছত্র, একতম, একবিংশ, একলিঙ্গ, একতানতা	এককালীন, একজাতীয়, একদৃষ্টি, একপুরুষ, একবচন, একবাক্য, একরূপ*
জলকষ্ট, জলগণ্ডূষ, জলচর, জলজন্তু, জলদেবতা, জলধর, জলপথ, জলবিম্ব, জলমগ্ন, জলময়, জলযন্ত্র, জলযান	জলকর, জলকাক, জলকুক্কুটী, জল-নকুল, জলতরঙ্গ, জলপান, জলপারাবত, জলচল, জলপিপাসা, জলযাত্রা, জলবায়ু

যে কথাগুলি বাংলায় বেশী চলে সেগুলি হসন্তবৎ, যেগুলি তত চলে না সেগুলি অকারান্ত, এরকম সূত্র কেউ কেউ করেছেন। প্রথমতঃ, এ সূত্রের প্রয়োগ এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র আয়তনে প্রায় সমান। দ্বিতীয়তঃ এরকম সূত্র ভাষাবিৎ পণ্ডিতের কাজে লাগতে পারে, শিক্ষার্থীর কাছে এর মূল্য এক কাণাকড়িও নয়, তা পূর্ব্বেই বলেছি।

এর থেকে এবারে আমরা সহজেই মাঝের অকারের আলোচনায় চ'লে আসতে পারি। পদ্মা-নদীতে দৈর্ঘ্যে এবং পরিসরে দুই হস্ত পরিমিত বালির বাঁধের পরিবর্ত্তে সার্দ্ধদ্বিহস্ত পরিমিত বাঁধ এদিক্‌টায় বাঁধা যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে।

পদমধ্যবর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন

সমাসবদ্ধ পদের জন্যে যে নিয়মদুটি আমরা রচনা করেছি তার একটি, পদমধ্যবর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও আমাদের কাজে লাগছে দেখতে পাই। সেটিকে নিয়ে সুরু ক'রে, আরও যে ক'টি সূত্র রচনা করা চলে করা যাক।

(১) যুক্তাক্ষর বা ঋফলাযুক্ত অক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন অকারান্ত উচ্চারিত হয়। দু-একটি জায়গায় ছাড়া, তাও কেবল সমাসবদ্ধ পদে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

(২) পদমধ্যবর্ত্তী চিহ্নহীন যুক্তাক্ষর অকারান্ত উচ্চারিত হয়। বাংলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু বিদেশীয় ভাষার অনুলিখনে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। ষ্টুডেণ্টস্ বা স্টুডেণ্টস্ না লিখে, সেইজন্যে আমার মতে লেখা উচিত ষ্টুডেণ্ট্‌স্ বা স্টূডেণ্ট্‌স্।

(৩) পদান্তবর্ণ হসন্ত বা হসন্তবৎ হলে তার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন অকারান্ত উচ্চারিত হয়। বাংলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। ইংরেজীর অনুলিখনে তাই হেলথ না লিখে লেখা উচিত হেল্‌থ্।

(৪) পদমধ্যবর্ত্তী চিহ্নহীন হ সর্ব্বদাই অকারান্ত উচ্চারিত হয়। গহনা, তহবিল, তহসিল, থরহরি, দহরম, মহরম, সহজিয়া, দেহলী, নহলা, নহবৎ, বাহবা, মহড়া মহলা, সহবৎ। বাংলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম কদাপি ছিল না, তাই শাহজাদা লিখে কেউ যদি আশা করেন যে হ হসন্তবৎ

* ক হসন্তবৎ হলে এ-র উচ্চারণ ব্যাবৃত হয়, নচেৎ হয় না।

উচ্চারিত হবে তবে ভুল করবেন। লেখা উচিত হবে শাহ্‌জাদা। কিন্তু বাদ্‌শাহ, শাহজাদা ইত্যাদি কথার হ্ বাংলায় বহুকাল ধ'রে এবং বহু ব্যাপক ভাবে অকারান্তই উচ্চারিত হচ্ছে।

(৫) স্বরবর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জন অকারান্ত উচ্চারিত হয়। এর ব্যতিক্রম হয় কেবল্ ই এবং ও এই দুটি প্রত্যয়ের বেলায়। যেমন, জলই (গজাল), ল অকারান্ত; কিন্তু কি জলই না হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রত্যয়ের ই সম্পর্কেও এ ব্যতিক্রমটি নেই; আইজ (আজ), জ হসন্তবৎ ; কিন্তু আইজই (আজই) জ অকারান্ত। প্রয়োগ এবং ব্যতিক্রমের এ গোলযোগ এড়াবার জন্যেই বোধহয় কেউ কেউ আজকাল এখনও, তখনও, এখনই, তখনই না লিখে এখনো, তখনো এখনি, তখনি লিখে থাকেন। হসন্তবৎ সমস্ত শব্দের সঙ্গে যদি এই রকম ক'রে ইকার এবং ওকার দিয়ে প্রত্যয়ের ই এবং ও জোড়া চলত ত কিছু কথা ছিল না। তা যখন চলে না, 'কত মাস্টারই দেখলাম' অর্থে 'কত মাস্টারি দেখলাম' বা 'এত কালই ত মাখলাম' অর্থে 'এত কালি ত মাখলাম' কেউ লিখবেন ব'লে যখন মনে হয় না, তখন গুটি পাঁচ-ছয় শব্দের জন্যে সৃষ্টিছাড়া একটা সন্ধির নিয়ম খাড়া করবার কি দরকার ?

এমনি, অমনি, যেমনি, তেমনি (ম হসন্তবৎ)—এদের কথা কিন্তু আলাদা। এদের উৎপত্তি যাই হোক, এখন এরা বিশিষ্টার্থক শব্দ। এমনইর সঙ্গে এমনিকে, যেমনই-র সঙ্গে যেমনিকে, অমনই তেমনই-র সঙ্গে অমনি তেমনিকেও চলতে দিতে হবে। কি কারণে হবে তা বলছি।

এমনি (ম হসন্তবৎ)=এমনই নয়, এমনি (ম হসন্তবৎ)=এমন। এর প্রমাণ, 'এমন' অর্থে কথাটার যখন প্রয়োগ হয়, তার সঙ্গে প্রত্যয়ের ই যুক্ত হতে পারে। সে এমন দুর্ব্বল যে কথা সুদ্ধু বলতে পারছে না=সে এমনি দুর্ব্বল যে কথা সুদ্ধ বলতে পারছে না। আবার, সে এমনই দুর্ব্বল যে কথা সুদ্ধু বলতে পারছে না=সে এমনিই দুর্ব্বল যে কথা সুদ্ধু বলতে পারছে না। এ ছাড়া আরও একটা অর্থে এমনি (ম হসন্তবৎ) কথাটার প্রয়োগ হয় যেটা কোনোও দিক্ দিয়েই 'এমনই' নয়। সে এমনি এসেছিল, কি না, বিনা কারণে এসেছিল। আবার জোর দেবার জন্যে বলা যায়, সে এমনিই এসেছিল, কি না, বিনা কারণেই এসেছিল। হস্‌চিহ্ন দিয়েই অতঃপর কথাগুলোর বানান করছি। অম্‌নি অমনই-র নয়, অমন-এর সমার্থক। তুমি অমন করছ কেন ?=তুমি অম্‌নি করছ কেন ? আবার সে অমনই ত করে=সে অম্‌নিই ত করে। এ ছাড়া অমন-এর সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক নেই এমন আরও কতগুলি অর্থে অম্‌নি চলে। সে অম্‌নি (অকারণে) বা অমনিই (অকারণেই) হাসছে; সে যেই কাছে এল আমি অম্‌নি (তৎক্ষণাৎ) বা অম্‌নিই (তৎক্ষণাৎই) তাকে বললাম; আমগুলো তোমাকে অম্‌নি (বিনামূল্যে, বিনাসর্ত্তে) বা অম্‌নিই (বিনামূল্যেই, বিনা সর্ত্তেই) দিলাম। যেম্‌নি যেমন-এর সমার্থক। সে যেমন ছেলে হোক, সে যেম্‌নি ছেলে হোক ; সে যেমন ছেলেই হোক, সে যেম্‌নি ছেলেই হোক। বিশিষ্টার্থক যেম্‌নি=যেইমাত্র : সে যেম্‌নি এল=সে যেইমাত্র এল। এই অর্থে 'যেমনি'-র সঙ্গে আর ই যুক্ত হয় না। যেমন তেমন-এর সমার্থক। সে কি তেমন ছেলে=সে কি তেমনি ছেলে ; সে তেমন ছেলেই বটে=সে তেমনি ছেলেই বটে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, এমনই, অমনই, যেমনই, তেমনই বোঝাতে এমনি, অমনি, যেমনি, তেমনি লেখা এবং ম-কে হসন্তবৎ ক'রে বলা ভুল।

কোনো এবং কখনো, এদের কথাও স্বতন্ত্র। কেন, তা বলছি।

এখন্=এই সময়ে, এখন্ও=এই সময়েও; তখন্=সেই সময়ে, তখন্ও=সেই সময়েও; কোনোও গোলমাল নেই। কিন্তু কখন্=কোন্ সময়, কখন্ও=কোন্ সময়েও কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কখন্ ইংরেজী অনুবাদে when; আর কখনো (কেউ কেউ কথাটার অকারান্ত উচ্চারণ মনে রেখে কখন লেখেন) ইংরেজী at some time-এর সমার্থক সম্পূর্ণ একটা আলাদা কথা। তার সঙ্গে ও যোগ করলে কথাটার মানে হয় at any time। কখন (ন হসন্তবৎ) when, কখনো sometimes, এবং কখনোও at any time, এই বানানগুলোর আমি পক্ষপাতী। সে কখন হাসে কে জানে; সে কখনো হাসে কখনো কাঁদে; সে কখনোও হাসে না। কখনো হয়ত দেখে থাকব কিন্তু কথা কখনোও বলিনি। 'কোন্' ইংরেজী অনুবাদে প্রশ্নসূচক which, তার সঙ্গে ও যুক্ত হলে মানে হয় না কিছু, সুতরাং 'কোনো' ='কোন্ও' যে নয় সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ইংরেজী some-এর সমার্থক 'কোনো' (কেউ কেউ অকারান্ত উচ্চারণ হবে মনে করে 'কোন' লেখেন) একটা আলাদা কথা, হসন্তবৎ কোন-এর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ও যুক্ত হলে কথাটার মানে হয় any। কোন (ন হসন্তবৎ)=which? কোনো= some, কোনোও=any, এই বানানগুলোই আমার বিবেচনায় ভাল। কোনদিকে মেঘ করেছে জানি না, কোনোদিকে নিশ্চয় মেঘ করেছে, কোনোও দিকে মেঘ করেনি।

মোট কথা any অর্থে কোনো এবং at any time অর্থে কখনো লেখা (এবং বলা) ভুল। লেখা উচিত কোনোও, কখনোও, আর নয় ত ন-কে অকারান্ত উচ্চারণ করব ঠিক ক'রে কোনও, কখনও।

'আর' কথাটার অনেক অর্থ সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করছি।

(ক) যে-সমস্ত অর্থে আর-এর সঙ্গে ও যুক্ত হতে পারে না। রাম আর (এবং) লক্ষ্মণ; প্রাণ থাকে আর (অথবা) যায়; শুধু কথায় কি আর (কদাচ) চিঁড়ে ভেজে; সে আজকাল আর (any more) আসে না; এমন শত্রু আর (দ্বিতীয়) নেই; আর (বিগত) বৎসর ঠিক এই সময়। এ ছাড়া কথার মাত্রা; আমি কি আর জানি না; সে কি আর এতক্ষণ বেঁচে আছে; আর ভাই, সবই ত শুনলে।

(খ) যে সমস্ত অর্থে আর-এর সঙ্গে ও যুক্ত হতে পারে। আর (অপর) কে এসেছে, আরও অনেকে এসেছে। আর (যতটা হয়েছে তার চেয়ে বেশী) এগিও না, আরও একটু এগোও। আর দেব? আরও দেব?

আলাদা ক'রে 'আরো' ব'লে একটা কথা দাঁড় করাবার পক্ষে যুক্তি কিছু নেই। 'আরোও' লেখা ত একেবারেই ভুল।

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, নিয়মের গাঁথুনি মোটামুটি বেশ পোক্ত। এইবার গোলযোগের সুরু।

(৬) তৎসম শব্দের মাঝের অকার অর্থাৎ চিহ্নহীন ব্যঞ্জন সাধারণতঃ অকারান্ত উচ্চারিত হয়। কিন্তু তৎসম শব্দ কোন্‌গুলো সেটা শিক্ষার্থীকে আগে ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে, আর সেজন্যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যথারীতি পণ্ডিত হওয়া দরকার, নয়ত উচ্চারণের এ নিয়মকে তিনি কাজে লাগাতে পারবেন না। তারপর, এই নিয়মের ব্যতিক্রমও কতগুলি আছে, যেমন, অপরাজিতা উচ্চারণে প্রায়শঃ অপ্‌রাজিতা,

তা ছাড়া আছে আমলকী, কলশী, বেদনা, ভাবনা, যজমান, সাবধান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে আচ্‌মন, আগ্‌মনী, কন্‌খল পাচ্ছি, যদিও এই হসন্তবৎ উচ্চারণগুলি আমি নিজে বিশেষ শুনিনি।

(৭) হসন্ত বা হসন্তবৎ উচ্চারণের ব্যঞ্জন (যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর হসন্ত), ঋফলাযুক্ত ব্যঞ্জন, বা স্বরবর্ণ পরে না থাকলে অ-সংস্কৃত (তদ্ভব, দেশজ এবং বিদেশাগত) শব্দের মধ্যবর্ত্তী একমাত্র চিহ্নহীন ব্যঞ্জন হসন্তবৎ উচ্চারিত হয়। কেবল হ হসন্তবৎ হয় না। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা উঠছে; সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত শব্দগুলোর পরিচয় ত তাদের গায়ে লেখা থাকে না, শিক্ষার্থী প্রচণ্ড রকম ভাষাবিৎ না হলে সেগুলিকে চিনবেন কি রকম ক'রে? এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম বেশ কতকগুলি আছে: ঘরণী, সজনী, দিগকে, ভরসা (কদাপি হসন্তবৎ), তমস্থক, তা ছাড়া পদ্যে তিরপিত, বাছনি, বারতা, মূরতি।

জটলা আসলে জটল্লা, বিজলী আসলে বিজুলী (বিদ্যুৎ—বিজ্জুলি) বা বিজ্‌লী, চিরতা আসলে চিরাতা (কিরাতক) বা চিরেতা, দরজা আসলে দরোজা (দর্‌ওয়াজা), উড়নি, ঘুঁটেকুড়নী, চুনট, ধুনচি, ধুনরী, ডুবরীর মাঝের অকার বাস্তবিক আকার, স্থতরাং এগুলিকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত ব'লে ধরছি না।

এতগুলি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, উচ্চারণের এই নিয়মটি বাংলার বড় বেশী মজ্জাগত। অন্ত্যবর্ণ হসন্তবৎ হলে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের হসন্তবৎ হওয়া চলে না, কিন্তু সে বাঁধন একটু আলগা হলেই অমনি সে হসন্তবৎ হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আদম—আদমী, আদল—আদরা, আপন—আপনি, আরব—আরবী, আলগ (পূর্ব্ববঙ্গে চলে) —আলগা, আলস—আলসে, ইতর—ইতরামো, উছল—উছলান, উথল—উথলান, উপর—উপরি (অতিরিক্ত), উলট—উলটা, কটক—কটকী, কদম—কদমা, কমল—কমলালেবু, কলশ—কলশী, কাতর—কাতরান, কামড়—কামড়ান, কুমড় (পূর্ব্ববঙ্গে চলে)—কুমড়া, খরচ—খরচে, খাবল—খাবলা, গাঁথন—গাঁথনি, গরম—গরমি, গোবর—গুবরে, ঘটক—ঘটকালি, চমক—চমকানো বা আচমকা, চাকর—চাকরি, চাপড়—চাপড়ান, চামচ—চামচে, চিকন—চিকনাই, চুগল—চুকলি, চোকল—চোকলা, ছোবল—ছোবলান, জঙ্গল—জংলী, জমক—জমকাল, জরদ—জরদা, ঝলক—ঝলকান, ঝাঁঝর—ঝাঁঝরা, ঢাকন—ঢাকনা, তরফ—তরফা, দমক—দমকা, নজর—নজরানা, পাথর—পাথরী, বদল—বদলি, বাকল—বাকলা, বাজন—বাজনা, বাদল—বাদলা, ভোমর—ভোমরা, মেথর—মেথরাণী, মোগল—মোগলাই, মোচড়—মোচড়ান, সানক—সানকি, হজম—হজমী।

খুব অল্প জায়গাতেই হসন্তবৎ হবার বাধা না থাকা সত্ত্বেও হসন্তবৎ হয় না। যেমন, গরবিনী, নাগরালি, রকমারি, দরদী, পূরবী, মরমী।

পদের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সম্বন্ধে এই যে কটি নিয়মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, আমার মনে হয় এরাই প্রায় সব। এদেরও মধ্যে অনেকগুলিকে যে নিয়ম ব'লে গণ্যই করা শক্ত তা আমরা দেখেছি; এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে এদের অধিকাংশগুলিকে আয়ত্ত ক'রে কাজে লাগান যে কি কঠিন তাও দেখতে পেয়েছি। তাঁকে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত হয়ে স্থরু করতে

হবে, নিয়মের অসংখ্য ব্যতিক্রমগুলি তাঁর নখাগ্রে থাক্‌তে হবে, কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটবে না কারণ নিয়মগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রটাই অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সে ক্ষেত্রের বাইরে অনিয়মের চরাচর জোড়া রাজত্ব। দেশজ, তদ্ভব এবং বিদেশাগত শব্দগুলির সঙ্গে বাংলা-ভাষী বাঙ্গালী সমাজে মিশে কথাবার্ত্তার সূত্রে, ভাল ক'রে পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত এসপার, এসরাজ, কতবেল, ব'রমচাকে এসোরাজ, কতো বেল, কর্ম্মচা পড়তে তাঁর আটকাবে না। আজগবি আলটপকা, আশরফি, ইসবগুল, উড়নচড়ে, ওজনদর, কসরত, সরবত, প্রভৃতি শব্দের জোড়া জোড়া চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের কোন্‌টি অকারান্ত এবং কোন্‌টি হসন্তবৎ কিছুই বোঝা যাবে না। সব কটি ভাষায় মহাপণ্ডিত হবার পরেও গোল থেকে যাবে, কমল, সরল, সরব, পরব, বসত, ধরণের কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কেউ তাঁকে পড়তে দিলে শেষের দুটি দুটি চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের কোন্‌টিকে অকারান্ত কোন্‌টিকে হসন্তবৎ ক'রে পড়বেন, কেননা যে কোনোও একটিকে অকারান্ত করলেই মানে একটা পাওয়া যায়। বলতে পারবেন না করাত কাঠ কাঠবার হাতিয়ার না কর্ ধাতুর ণিজন্ত প্রথমপুরুষ অতীত নিত্যবৃত্ত; কামান যুদ্ধের অস্ত্র, না ক্ষৌরকর্ম্ম, না কামা ধাতুর মধ্যমপুরুষের সসম্মান অনুজ্ঞা; পরত কি বিসর্গহীন তসিল প্রত্যায়ান্ত পর, না পর্ ধাতুর প্রথমপুরুষ অতীত নিত্যবৃত্ত, না কাপড়ের ভাঁজ। বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে ধ'রে না দেখলে অনেক শব্দের অর্থগ্রহ হয় না, এটা কোনোও ভাষারই পক্ষে শ্লাঘার কথা নয়।

আমার মনে হয়, একটি অকারচিহ্ন গ্রহণ করা ছাড়া এ-সমস্ত মসস্যার আর কোনোও সমাধান নেই। অক্ষরের উপর লাইন টেনে, যেখানে আমরা অক্ষরান্তরে চ'লে যাই সেইখানে ছোট একটি v চিহ্নকে অকাররূপে ব্যবহার করলে দিব্যি কাজ চ'লে যেতে পারে, একথা পূর্ব্বে অন্যত্র একবার বলেছি। পুনরুক্তি ক'রে বলছি, এতে অসুবিধা কারও কিছু হবে না। টানালেখায় লাইনটাকে অল্প একটু কাঁপিয়ে দিলে অকার হয়ে যাবে। নূতন একটি ধ্বনিচিহ্ন যে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও কিছুদিন পরে আর কারও মনে থাকবে না, আর যা হসন্ত নয় তাকে হসন্ত ক'রে এবং যা ওকারান্ত নয় তাকে ওকারান্ত ক'রে লিখবার মত মিথ্যাচারের দায় থেকেও চিরকালের মত আমরা অব্যাহতি পাব।

কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা যা আমাদের জন্যে ক'রে রেখে যাননি আজ যদি আমরা তা করতে যাই ত বাংলাদেশের আকাশটা সশব্দে ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা।

সুনয়নী দেবী

স্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। পাখি জানে না কখন দস্তুরমতো তার গান গাওয়া চাই। সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। সুনয়নী দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন। কী করে আঁকতে হয় তিনি কখনো শেখেন নি, তাই তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং রেখায় রেখায় গান করে উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই, তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেছে। তাতে রেখাগুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্যে কোনো দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তারা প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা আকৃতি-সমবায়কে বেষ্টন করে ধরে; তারা একই কালে বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ তেমনি আত্মসংবরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মতো তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতোই যেন এই রেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চার দিকে পূর্ণ-পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির মধ্যে এমনি একটি ব্যঞ্জনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরি নয়, যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই সাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন করে রক্ষা করছে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই সাড়িগুলি যেন বড়ো আদরের দোলায় দোলাচ্ছে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী, যে লোক লাল এবং সবুজ সাড়ির বিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখির মতো উদ্যত চোখদুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে তুলেছে।

এমনি করে ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে, শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ুমূর্ছনার মতো শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্ভীর্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেছে। আর-একটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত; সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, লঘু; সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে দ্রুত ধেয়ে চলে। এমনি করে চোখ, ঠোঁট এবং হাত দুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখির ওড়ার মতো ত্বরিত বেগে রচনাটির সুসংযত প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একই কালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই তো সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্র-

দান

শিল্পী শ্রীসুনয়নী দেবী

কলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ত্রুটি বিস্মৃত এবং মার্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চনভঙ্গি (curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেছে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিস তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকালকার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম চেতনা, এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গূঢ় জাতীয় জীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। সেই জন্যেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম-বধূরা তাদের আল্পনায় যে-সব মোলায়েম গোল রেখার ধারা আঁকে তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা-প্রচলিত প্রাণের গতিরেখা দেখতে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এই-সব ভাইদের মধ্যে কেউ কারও অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে চলে তখন দেশকাল নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই তো সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য আছে। সোনালি আর কালো রঙ পরিমিত ভাবে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার কোমল ধূসর (grey) এবং পিঙ্গল (brown) রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে সে নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেন না শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে— মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে থাকে— সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি-চেষ্টায় খাটাতে হয় তা হলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এই-সব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে; তা হলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্রতাই প্রবল হয়ে উঠবে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের সমস্ত ঐশ্বর্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সংগীতে কান পেতে থাকেন, তা হলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

* বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুনয়নী দেবীর চিত্রাবলীর ভূমিকাস্বরূপ এই প্রবন্ধ প্রবাসী (১৩২৯ শ্রাবণ) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

আন্তর্জাতিক

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

"জয় পশুপতিনাথ !"

হাই তুলতে তুলতে সূর্যসমশের রাণা বিছানা ছেড়ে ওঠে। "ওঃ! ভোর চারটে হয়ে গিয়েছে।"

সে বাবা পশুপতিনাথের দেশের লোক। সে-দেশের সরকার পশুপতিনাথের নামের আড়াল থেকেই ফরমান জারি করে; সেপাই 'জয় পশুপতিনাথ' বলে গুলি ছোঁড়ে; দেশের কর্মী 'জয় পশুপতিনাথ' বলেই বুক পেতে দেয় বুলেট আটকানোর জন্য; রাণা-পরিবারের লোকেরা জুয়োর ঘুঁটির সাফল্য কামনায়, আর হাকিমরা সিদ্ধির সরবতে চুমুক দেবার আগেও ঐ নামই নেয়।

সেই দেশের ছেলে সূর্যসমশের। তৃতীয় শ্রেণীর রাণা-পরিবারের লোক সে। তৃতীয় শ্রেণী বলতে বোঝায়, যাদের পরিবারে রাজবংশের সঙ্গে অন্য বর্ণের রক্ত মিশেছে। তবুও তারা কেউকেটা নয়। শাসক-গোষ্ঠীর লোক তারা।

নেপালীদের চোখ ফুটেছে। তারা নাকি দেশে আন্দোলন আরম্ভ করেছে।

তা হ'লে কি হয়, সূর্যসমশেরের আইনের পরীক্ষা আর দিন কয়েক পরে। আলো জেলে সে টেবিলের ধারে বই নিয়ে বসে, ইম্পরট্যাণ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর নোট থেকে মুখস্থ করতে। আন্তর্জাতিক আইনের বই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রতিবছরেই থাকে—"International law is the vanishing point of Jurisprudence"—Explain। এবারেও নিশ্চয়ই আসবে। সে ঐ পাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করে।......

আইন পড়তে আসবার আগে সরকারের অনুমতি নিয়ে আসতে হয়েছিল। খাটমাণ্ডু কলেজের নামকরা বাঙালী প্রোফেসরের সঙ্গে 'তিনসরকারের[১]' হজুরিয়ার[২] খুব অন্তরঙ্গতা। তাঁরই তদ্বিরে সে আইন পড়ার অনুমতি পেয়েছিল। কত বাধা কত কথা এর বিরুদ্ধে। তিনসরকারের সম্মুখে কুর্ণিশ করে দাঁড়ানোর পর সেদিন মাস্টার সাহেব পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন।

বাঘের নির্ঘোষের মতো কণ্ঠস্বর— "কি করবে ইংরাজের আইন পড়ে? গোরুখোর ব্যারিস্টার হতে যাবে নাকি বিলাতে? কত ন্যায় দর্শন সংহিতা দণ্ডনীতি পুরাণ রয়েছে দেশে, পড়লেই হয়। রাণা-পরিবারের ছেলে লেখাপড়া শিখেছ, ভাল জাগীর[৩] নাও, লকড়ীমহলে না-হয় সড়কমহলে, শাঁসালো ঠিকেদার আছে এবার, বেশ আয় হবে। তা নয়, যত বদখেয়াল। হিন্দুস্থানের যত নেতা আইনের বিরুদ্ধে কাজ করে জেল যায়, দেখতে পাও-না তাদের সবাই আইন-পাস। আজকালকার ছেলেদের সবই আজগুবি। একটা ছোকরাকে দিয়েছিলাম সেবার আইন পড়ার অনুমতি। পড়তে পড়তেই সেটার প্রথম কাজই হল, আমাদের অনুমতি না নিয়ে চুনাঢেরীতে এক লাইব্রেরি খোলা। চেনেনই তো তাকে মাস্টার সাহেব; আপনাদেরই তো ছাত্র— চুনাঢেরীর ইন্দর বাহাদুরের ছেলে।"

১ প্রধান মন্ত্রী   ২ প্রাইভেট সেক্রেটারি   ৩ চাকরি

যাক্, তবু শেষকালে অনেক কষ্টে সম্মতি পাওয়া যায়।···

"বাণারসে, মালবীয়জীর গুরুকুল ছাড়া অন্য কোথাও নয়, সেখানের সংস্কার তবু ভালো।··· আর স্বপ্নের রাস্তায় যেয়ো না। তুমি রাণা-পরিবারের ছেলে। তোমাদেরই উপর রাজ্যের ভার। পশুপতিনাথের দেখানো পথ, বাপঠাকুর্দার দেখানো পথ, সেই পথেই থেকো। যা রয়-সয় তাই কোরো। কুকরী-চাবুকের পরিবর্তে রাণার ছেলে বন্দুক-রাইফেল চায়, সে-কথা বুঝতে পারি, কিন্তু সংহিতা-পুরাণের পরিবর্তে ইংরাজের আইন— এ আমার বুদ্ধিতে ঢোকে না।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছিন্ন কথার টুকরোগুলো, এখনো সূর্যসমশেরের মনে আছে।

"আর জলপানির কথা তুলবেন না, মাস্টারমশাই। আইন পড়ার জন্য জলপানি! হাওয়া কেনবার জন্য পয়সা খরচ!"

সারারাত গরমে ভালো করে ঘুম হয়নি। তার উপর ভোর রাত্রে উঠেই আবার পড়তে বসো। বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে তার এই কাশীর হোস্টেল-জীবনের উপর, হোস্টেলের এই ঘরটার উপর, পরীক্ষার উপর, পড়ার বইগুলির উপর। নিজে জিদ করে আইন পড়তে এসেছিল, এখন কিছু দিন ধরেই তার মনে হচ্ছে যে বৃথাই আইন পড়া।

কি দরকার তার যুক্ত-প্রদেশের টেনান্সি আইন পড়ে? নেপালে যদি থাকতে হয় কোনো কাজে লাগবে কি তার ভারতশাসনবিধান সংক্রান্ত আইন?

আইনের চোখে তার দেশ স্বাধীন— অক্ষরে আর বাস্তবে কত প্রভেদ। অদ্ভুত আইনের টেড়া চোখ; কোন্ দিকে তাকায় বুঝবার উপায় নেই; মনে হবে তাকিয়ে আছে 'পাঁচ সরকারের' দিকে, অথচ আসলে তার নজর 'তিনসরকারের' উপর।···ভালো লাগে না আর আইন পড়তে। ইচ্ছে করে ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই। রোজ কাগজ খুললেই চোখে পড়ে নেপাল কংগ্রেসের সত্যাগ্রহের কথা— 'ভীমভার মিলগুলিতে আজ ধর্মঘট উনত্রিশ দিন হইল; নেপাল কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে গ্রেফ্তার করিয়া কোন্ অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; বিরাটনগর, জয়নগর, রক্সৌল, জনকপুর, দার্জিলিং, ডেরাডুনে সত্যাগ্রহী ভর্তি করিবার শিবির খোলা হইয়াছে।'······আরও কত কি।

নিজের উপর অকারণ বিরক্তিতে তার মন ভরে যায়। পরীক্ষা, পরীক্ষা, তার কি অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করবার অধিকার নেই।···

বইয়ের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে যে পরীক্ষার বিষয় ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব বিষয়ই এতক্ষণ ধরে ভাবছে সে।···International law is the vanishing point of Jurisprudence··· আইন যেখানে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, অদ্ভুত সে রাজ্য। কত রকমের আজগুবি প্রশ্ন ওঠে সেখানে, কত সূক্ষ্ম আইনের পয়েন্ট।···এবারে পরীক্ষায় ইউ. এন. ও.র বিধানাবলী সম্বন্ধেও প্রশ্ন আসতে পারে— অথচ এমন সেকেলে নোট, এতে সে-যুগের লীগ অব নেশন্স্-এর বিধানটুকু মাত্র দিয়েছে···

খট্ খট্ করে খড়মের শব্দ করে পাশের ঘরের শ্রীবাস্তব বারান্দা দিয়ে চলে গেল।

দূর! জোর করে কি পড়ায় মন বসানো যায়?···সে স্টোভ ধরাতে বসে— চায়ের জল গরম করবার জন্য।···নিজেকে সে খুঁজে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। তার ভাবপ্রবণ মনে

হঠাৎ অবসাদ এসেছে— নিজেকে দোষী মনে করছে সে, কোথায় যেন একটা গ্লানির কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছে।

অদ্ভুত তার দেশের শাসনচক্র। ভীমভার মিলের মজুরের ধর্মঘট, দু আনা ক'রে মজুরি বাড়াবার জন্য। এর মধ্যে তার সরকার কি দেখেছে তা তারাই জানে। এই সামান্য ব্যাপারটিকে তারা বাড়িয়ে সৃষ্টি করেছে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের— কুমোরের চাক যেমন মাটির তালকে ফাঁপিয়ে তোলে…

"গুড মর্নিং ব্যারিস্টার সাহেব! একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।"

চমকে উঠেছে সূর্যসমশের। স্টোভের শব্দে বুঝতে পারেনি কখন এরা ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই রামচন্দ্র উপাধ্যায় তাকে জড়িয়ে ধরে।

"কবে এলে? একেবারে হঠাৎ?"

"কাল রাতে এসেছেন", জবাব দেয় তার ছোটো ভাই ত্র্যম্বকেশ্বর। সে কাশীতে টোলে সংস্কৃত পড়ে।

"গিয়েছিলাম দিল্লীতে। পণ্ডিতজীর কাছে আগেই চিঠিতে আমরা লিখেছিলাম, ভীমভার মিলে মেয়েদের উপর গুলি চালানোর কথা। সেই সম্বন্ধেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, নেপাল-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে; এখন এসিয়া কনফারেন্সের সময়, একটু সুযোগ ভালো কিনা। নেপালের প্রতিনিধির কনফারেন্সে গালভরা কথা বন্ধ করবার জন্যেই এখন যাওয়া।"

"কি হল কি সেখানে?"

"পণ্ডিতজীর কাছে আমাদের সরকারী প্রতিনিধি জবাব দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতির ছেলে ভীমভার মিলের মালিকের কাছ থেকে দশহাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিল। তারা দিতে রাজি না হওয়ায় নেপাল-কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মিলে ধর্মঘট, আর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। মেয়েদের উপর গুলি চালানোর কথা নাকি সম্পূর্ণ মিথ্যে। কাগজে-কলমে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন এসব কথা— বলার কিছুই নেই। রাষ্ট্রপতির একমাত্র ছেলের বয়স কত জান? তিন মাস।"

"জয় পশুপতিনাথ!" ক্ষাত্র রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে এই অন্যায়ে, এই মিথ্যাচারে। জরাগ্রস্ত অন্ধ ত্রিনেত্রের উপর ভক্তি শিথিল হয়ে আসে বুঝি।

"এতদূর যেতে পারে এরা!" আর কথা বেরোয় না সূর্যসমশেরের— প্রতিবাদের তীব্র অনুভূতিতে, না বংশপরম্পরার সহজাত আনুগত্যের সংস্কারে ঠোকর খেয়ে, তা ঠিক বোঝা যায় না।

আইনের ছাত্র সে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সত্যনিষ্ঠা তার কি নেই? তার ভাবুক আদর্শবাদী মনে আঘাত লাগে।

চায়ের ফুটন্ত জল উপচে পড়ে স্টোভ নিভে যায়। ধোঁয়া আর গ্যাসে ঘর ভরে ওঠে। দেশের লোকের তীব্র আকাঙ্ক্ষার আগুন নিবিয়ে দেবে কি পশুপতিনাথের সাপের ফোঁসফোঁসানি আর লেজের দাপটে। পড়ে থাকবে কি কেবল তার দাহাবশেষ, আর দপ্ করে নিবে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া।

ত্র্যম্বকেশ্বর তাকে স্টোভের কাছ থেকে সরিয়ে চা করতে বসে।

সূর্যসমশের চায়ের ধোঁয়ার মধ্য দিয়েও উপাধ্যায়ের উৎসাহদীপ্ত চোখ মুখ দেখতে পায়। কোন প্রেরণায় সে এই আলেয়ার সন্ধানে বেরিয়েছে? কার জন্য তার এই একনিষ্ঠ সাধনা?

কথার স্রোতের বিচ্ছিন্ন ঢেউ কানে আসে—

"নাগরিক হককো মাঙ্গ গর।"

"ভীমভার মাঁ গোলী চল্যো। তিনজনা দিদিবহিনী গোলিকা শিকার ভয়ে…"

"বৃদ্ধ মাতাজী…"

স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এক ঝলক আগুন খেলে যায় সূর্যসমশেরের।

"হামরা নিশস্ত্র দাজুভাই দিদিবহিনী সানা সানা বালক বালিকা হরূ মাথী সঙ্গীন প্রহার মেসিনগান লে বরাবর গোলী-বর্ষাই রাখে কা ছন।"

জানোয়ার নাকি এরা! সূর্যসমশেরের চোখে জল এসে গিয়েছে।

"তসর্থ সহায়তাকো লাগি নিবেদন ছ, যথাশক্তি তথাভক্তি, সামর্থ অনুসার সহায়তা দান গর্নু-হোলা…"

সূর্যবাহাদুরের আর্দ্র মন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। "আমি যাব উপাধ্যায় তোমার সঙ্গে ভীমভারে সত্যাগ্রহ করতে।"

উপাধ্যায় তাকে জড়িয়ে ধরে। কারও মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

এখনই যেতে হবে তাদের। টান মেরে ফেলে দিয়ে আসে বইয়ের আবর্জনার বোঝা, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে। টাকাটা দিয়ে দেয় উপাধ্যায়ের হাতে।

"আর দিন পনেরো পরেই তো পরীক্ষা। সেটা দিয়ে তারপর যা ইচ্ছে করোগে যাও সূর্যসমশের। ঝোঁকের মাথায় কিছু কোরো না।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলেন।

"আর তা হয় না, সার।"

সময় নেই, সময় নেই, এক মুহূর্ত সময় নেই নষ্ট করবার।

ভীমভার।

১৮১৬ সালে সগৌলীর চুক্তির পর মিলিটারী সার্ভে বিভাগের অমৃত শিকদার মেপেছিল দশ গজ জমি। নেপালের বুকে জেনারেল অক্টরলোনী এঁকে দিয়েছিল পরাজয়ের লাঞ্ছনচিহ্ন— নেপাল আর ভারতের মধ্যের দশগজ চওড়া 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড'; সবাই বলে 'দশগজ্জা'। এদিকে পাঁচগজ, ওদিকে পাঁচগজ, মধ্যখানে পাথরের বেদীর উপর খাড়া করে দাঁড়-করানো এক খণ্ড বিরাট পাথরের ফলক। এই দশগজ চওড়া অজগর সেই থেকে পড়ে আছে, রাজ্য খাওয়ার ভূরিভোজনের পর গা এলিয়ে— যোজনের পর যোজন— দার্জিলিং থেকে দেরাদুন পর্যন্ত।

আউধ-তিরহুত রেলওয়ের জিৎপুর-ভীমভার শাখা এরই গায়ে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গিয়েছে, এই প্রস্তরফলকের সম্মুখে। পাথর তো নয়, প্রহরী; দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সওয়া শ' বছর থেকে দাঁড়িয়ে আছে, পাছে পরাধীন ভারতের কলুষের ছোঁয়াচ ঢুকে পড়ে এই স্বাধীন গোব্রাহ্মণের দেশে।

প্রথমে শুকনো শালগাছের গুঁড়ি আর মেদবহুল চোরা-কারবারীতে ভরা ভীমভার রেলওয়ে ইয়ার্ড ; তারপর 'দশগজ্জা' ; তারপর আরম্ভ হয় পশুপতিনাথের রাজ্য। সাতটি মিল এখানে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাতের শিফ্‌টে সাইরেনের শাণিত স্বরে মহাকালকে খণ্ডিত করবার চেষ্টা করছে, আর পনেরো হাজার মজুরের চোখের সম্মুখে তুলে ধরছে, তাঁর অনুচরদের নগ্নরূপ। চোপরা ব্রাদার্স, সারা ভারত জুড়ে যাঁদের কলকারখানা, তাঁরা ফ্যাক্টরি আইন থেকে বাঁচবার জন্য, এই ধর্মরাজ্যের আলগা জমিতেও শিকড় বাড়িয়েছেন এ রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে আধাআধি বখরায়। পুরোদস্তুর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এর ফলে।

সূর্যসমশেরের উপর ভার পড়ল সত্যাগ্রহী ভর্তি করবার, ভীমভার ক্যাম্পে নয়, নেপালের ভিতর। অন্ধকার নিদমহলের শামাবরদার— একটি একটি করে দীপ তাকে জ্বালিয়ে যেতে হবে— যতদূর সে যেতে পারে। ঘুমন্তপুরীকে জাগানোর গুরুদায়িত্ব তার উপর। তবুও একটুও ভয় পায় না সে। বালকের মতো রূপকথার রোমাঞ্চ সম্বল করে সে এগিয়ে যায়। ভীমভার ভারতীয় এলাকায় সত্যাগ্রহ ক্যাম্প লোকে লোকারণ্য। ধর্মবটী মজুরেরা এসেছে চাল নেবার জন্য, অনেকে এসেছে সত্যাগ্রহে নাম লেখানোর জন্য ; কর্মীদের মধ্যে কেউ আসছে নূতন খবর দিতে, কেউবা নূতন আদেশ নিতে, আর বাকি লোকেরা দর্শক, এসেছে তামাসা দেখবে ব'লে। সিগারেট মুখে স্কুলের বিদ্যার্থী। ফুটফুটে রং, দাড়িগোঁফহীন কোমল মুখে শিশুর সারল্য, দেখে মনে হয় উচ্চবর্ণের। এতদূর এসেছে এক দুর্বার আকর্ষণে। এক মিনিট থামেনি পথে, পাছে বাড়ির লোক তাকে ধরে ফেলে। পরশু স্কুল থেকে বেরবার সময় সূর্যসমশের তাদের যে ইস্তাহার দিয়েছিল, তার নিচে লেখা ছিল উপাধ্যায়জীর নাম। এই কি সেই উপাধ্যায়জী সম্মুখে চৌকিতে বসে। কৌতূহল নিরসন হয় মুহূর্তের মধ্যে।

"উপাধ্যায়জী, ছেলেটি এসেছে ঝাপা স্কুল থেকে।"

"বাড়ি থেকে পালিয়ে আসনি তো ?"

উপাধ্যায়জী তার সঙ্গে কথা বলছেন ; সম্ভ্রমে তার মাথা নুয়ে আসে। ভয় হয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে বুঝিবা ভর্তি করার নিয়ম নেই। কোনো উত্তর দেয় না সে।

"আচ্ছা ভাই, মন খারাপ কোরো না। সব হয়ে যাবে। এখন খেয়ে দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও। ও-বেলা প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত কোরো, পরশু কাজ পাবে।" আনন্দে তার মন ভরে ওঠে।

"ডম্বর রাবল, যাও, কয়লা পাহারার জথা বদলের সময় হল। এক বস্তা কয়লাও যেন দশগজ্জা পার না হতে পারে মিলের জন্য। কাল ওরা মিলিটারি ট্রাকে করে এক ট্রাক নিয়ে গিয়েছে মিলে। রেলওয়ে ইয়ার্ডের কয়লা যেন সেখানেই থাকে। তাতেই বোঝা যাবে সত্যাগ্রহীর বাহাদুরি। বেরিয়ে যাবে পাহাড় থেকে নূতন লোক আনা দ্বিগুণ মজুরী দিয়ে। জায়গা থেকে নড়বে না। গুলি করে মেরে ফেললেও কুকরিতে হাত দিয়ো না। যাও।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, ওয়েস্টকোট-পরা একজন 'নেওয়ার', আত্মপ্রত্যয়ভরা অবিচলিত পদক্ষেপে। নেপালের মঙ্গলের চেয়ে 'নেওয়ার' জাতের হৃতগৌরব উদ্ধারের জন্য তার অসহিষ্ণু মন সাড়া দিয়েছে বেশি। তাই তার প্রশস্ত মুখে দৃঢ়সংকল্পের দ্যোতনা। বাঘের গলায় কুকৃরি বসাবার সময়ও তার হাবভাবে থাকে পারিপার্শ্বিকের প্রতি এখনকার মতোই বেপরোয়া তাচ্ছিল্য।

এই উপাধ্যায়জী নাকি!

চিকন চোখের কোণে দুটো-তিনটে করে ক্ষীণ রেখা পড়ে। মুখের কাঠিন্য একটু যেন কমে আসে। মাথার টুপির মধ্যে থেকে বের করে দেয় একখান নেপালী রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের ইস্তাহার।

মহেশগঞ্জে স্থর্যসমশের এই চিঠি দিয়েছেন, আপনাকে দেবার জন্য, আমাকে ভর্তি করবার চিঠি।"

"কবে দিয়েছেন?"

"ছ-সাতদিন হবে।"

"কত লোক ছিল সেখানে।"

"গাঁয়ের অর্ধেক লোক হবে।"

"নোট করে রাখো ভীমরাজ—স্থর্যসমশেরের টুরের রুট, গ্রামের নাম, তারিখ; দাও একখানা প্রতিজ্ঞাপত্র। ···লিখতে পড়তে জানো না তো দাজু ভাই?···নাম?···বাপের নাম?···গ্রাম তো মহেশগঞ্জ বললে না এখনই?···সরকার যদি তোমার হাল বলদ সম্পত্তি জব্দ করে তা হলে?"···

এদিকটা সে ভেবে আসেনি। একটু যেন বিচলিত হয়। তারপর বলে "আচ্ছা তার জন্য পশুপতিনাথ আছেন।"

"হ্যাঁ, ভালো করে ভেবে নাও। বড়ো কঠিন কাজ।·· দেখি এইখানে বুড়ো আঙুলের ছাপ দাও।···ভীমরাজ, চারটি জলপান দিতে বলো দাজুভাইকে। আর এর কাছ থেকে জেনে নাও স্থর্যসমশের কোন্ দিকে গিয়েছে। বরাহক্ষেত্রের দিকে গেলে লরী-ড্রাইভার মারফত চিঠি দিত নিশ্চয়।"

দিগ্বিজয়ীর মতো সে ইঁদারার দিকে যায়, টিপসই দেওয়াতেই যেন নেপাল-সরকারের সিংহাসন টলমল হয়ে পড়েছে। চরম ত্যাগের জন্য সে প্রস্তুত। সত্যাগ্রহীর কিতাবে তার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। তবুও সিংদরবারের ভিত না কাঁপাই আশ্চর্য।

একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে দাঁড়ায় উপাধ্যায়জীর সামনে।

"কি খবর, প্রধান। ডিউটি ছেড়ে যে?"

"সকালের ট্রেনে এস. ডি. ও. আর ডি. এস. পি এসেছেন। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় প্ল্যাটফর্মের উপর। তাঁরা বললেন তাঁরা ক্যাম্পের কোনো বিষয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবেন না; অবশ্য যতক্ষণ শান্তিভঙ্গের অবস্থা না আসে। তারপর তাঁরা চলে গেলেন ওপারে, মিলে।" একটা অর্থপূর্ণ হাসি মুখে এনে বলে, "ফিরে এসে এখন দেখি উলটো গাইছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বোধ হয়।"

"আচ্ছা। কুশীবাঁধ প্রজেক্টের কোনো জিনিস আটকিয়ো না যেন। তাহলেই এস. ডি. ও.-র কিছু বলার স্থযোগ থাকবে না।"

"ভীমরাজ, দুজন স্বেচ্ছাসেবককে চোঙা আর ঘণ্টা নিয়ে বাজারে যেতে বলো। সকলকে খবর

দিক্ আজ বিকেল চারটেয় দশগজ্জার পাথরের কাছে মিটিং হবে ; বাজারে একশ চুয়াল্লিশ জারি আছে। দশগজ্জায় মিটিং হবে।"

আবার ছুটতে ছুটতে আসে প্রধান। হাতে একখানা খবরের কাগজ। সিঁড়ির নিচে থেকেই চীৎকার করে পড়তে পড়তে আসে— "নেপাল-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলার বিশিষ্ট নেতাদের বিবৃতি।"

কর্মব্যস্ততা ভুলে সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রধানের চারদিকে। গুঞ্জনধ্বনি আরো মুখর হয়ে ওঠে। দার্জিলিঙে বাড়ি প্রধানের। কাগজ পড়া শেষ হলে সে বলে ওঠে, "এদের আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি।"

"তা চীৎকার করে কি হবে? দালালদের আবার জাত আছে নাকি? যাও সবাই, নিজের নিজের কাজে যাও।"

উপাধ্যায়জীর কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলকে শুনতে হয়।

"এ কে বীরবাহাদুর।"

"এসেছে নালিশ করতে, আপনার কাছে।"

"হুজুর, আমি নুনের ব্যাপারী, আমার নুনের গাড়ি আটকেছে সত্যাগ্রহীরা।"

"সত্যাগ্রহীরা? কখনই না। নিশ্চয়ই বাইরের লোক। এখনি যাও বীরবাহাদুর; বুঝিয়ে দিয়ে এসো বাজারের জথাকে যে, মিলের কাজে লাগে না এমন কোনো জিনিস যেন আটকানো না হয়।"

একজন প্রৌঢ় গুর্খা উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। নির্বিকার নির্লিপ্ত তার মুখের ভাব। হাত তার কুকৃরিতে।

"সূর্যসমশের রাণা গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। পুরুষের মধ্যে ছিলাম কেবল আমি; যারা লড়াইয়ে মরেনি তারা সবই এখনও ফৌজে। সূর্যসমশের বলেছিল উপাধ্যায়জীর কাছে লড়াইয়ে নাম লেখাতে। আমার বাবা মরেছিল আগের লড়াইয়ে, আমার ভাইও আছে ইংরাজের ফৌজে। আমিও কংগ্রেসের ফৌজে ভর্তি হতে চাই। তবে বন্দুক দিতে হবে। সরকারের যে ফৌজগুলো দিদিবাহিনীর উপর গুলি করেছে, তাদের একবার দেখে নিতে হবে।"

"বন্দুক-টন্দুকের লড়াই এ নয়।"

"তবে কুকৃরির? কুকৃরি দিয়ে কি বন্দুকের সঙ্গে লড়া যায়?"

"নাম···গ্রাম···বাপের নাম।"

"বন্দুক চালাতে যদি না দাও, তবে কলকাতায় দারোয়ানের কাজ করব না কেন?"

"আনো দেখি বুড়ো আঙুল এদিকে।"

"সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ আমি কখনই দেব না।"

"আচ্ছা তাহলে তোমার হবে না এখানে।"

"হবে না তো হবে না। খালি কুকৃরি দিয়ে আমি একা লড়ব। আর এই লড়াই করার চেয়ে ঝরনার ধারে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করোগে যাও।"

অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি হেনে সে এই নির্বীর্যদের খেলাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলছে সূর্যসমশেরের টুর। মহেশগঞ্জ, চাৎরাগদী, চুনাঢেরী, ঝাপা, রণপুরা, কীচকবধ এক নম্বরের পাহাড়, দু নম্বরের পাহাড়। পথের দুধারে লোক জমে যাওয়ার দেশই নয়। পথ মানে পায়ে চলার পথ, বরাত ভালো হলে ঘোড়সওয়ারের পথ ; লোক মানে পাহাড়ে ঝরনার ধারে যে কয়েক ঘর থাকে তারাই। আর যেখানে পথ আছে, লোক আছে, সেখানে দু-চারজন দেখা করতে আসে অন্ধকারে সাঁঝের পরে। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে— "কে! সূর্যসমশের রাণা ? ঐ শালগাছটার নিচে অপেক্ষা করবেন। মা খাবার দিয়ে যাবেন। তাঁর বড়ো ইচ্ছে আপনাকে খাওয়ান। আর এই আংটিটা রাখবেন ; আমার স্ত্রীর দান নেপাল রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসকে।" কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়! গাঁয়ের কে যে সরকারের চর আর কে যে নয় বোঝা দায়। আর খড়গ্‌বাহাদুরের তো কথাই নেই— সে দেশালাই আর চায়ের সরকারী ঠিকেদার। জানতে পারলেই হল। এখনি হয়তো লোক চলে যাবে কর্নেল সাহেবের কাছে। না! যাক !···ওটা একটা গোরু মোষটোষ কিছু হবে······

উদয়-অস্ত চলার আর অন্ত নেই। ইস্তাহারের বোঝা যে এত ভারী লাগতে পারে তা আগে আন্দাজ করতে পারেনি। বিলি করে ফেলতে ইচ্ছে করে একই জায়গায় সবগুলি। পাহাড়ে ওঠার পথ, দুহাতে বিলোলেও বাণ্ডিলটার ভার বেড়েই ওঠে। সময় নেই, যে কদিন কাজ করে নেওয়া যায়। কাটমাণ্ডুতে খবর পৌছতে যে কদিন দেরি, তারপরেই নীলকণ্ঠের গলা নিংড়ে এরা ছড়িয়ে দেবে উগ্র চণ্ডনীতির বিষ। তার আগেই নিরিবিলিতে যতটুকু কাজ করে নেওয়া যায়।

এ শালের জঙ্গল কি আর শেষ হবে না। শুকনো কাঠ কুড়োচ্ছে একটি মেয়ে।

"কি দিদি বহিন, গ্রাম কত দূরে ?"

"দৌড়ে গেলেও না-হাঁপিয়ে পৌছে যাবে। এই কাছেই। চলো আমিও যাচ্ছি।"

"এই কাঠের বোঝা বয়েই তোমাদের দিন গেল।"

"তা কেন হবে, আমি তো মোষও চরাই, জলও আনি, রাঁধিও।"

"তা বলছিলাম না। রাণা-পরিবারের মেয়েদের দেখেছ কখনো ? গায়ে কত গয়না।"

মেয়েটির চাউনিতে একটু সন্দিগ্ধতা আসে। "গেল বছর কার্তিকী পূর্ণিমায় বরাহক্ষেত্রের মেলায় দেখেছি। পশুপতিনাথ যাকে যা দেন।"······গ্রামে পৌছতেই গুর্খা মেয়েরা সূর্যসমশেরকে ঘিরে ধরে।

"কাগজের পুলিন্দায় ও কি ? ইংরাজ-সদরের থেকে কাগজ কিনে এনেছ নাকি ?" যুদ্ধে তার ছেলে মারা গিয়েছে। সে প্রতি বছরে ইংরাজের জেলা-সদরে পেন্সন আনতে যায়। আসবার সময় পুরোণো খবরের কাগজ কিনে আনে, শীতকালে দেওয়ালের কাঠের ফাটলে আঁটবার জন্য।

"আমাকে একখানা, আমাকে একখানা।"

"না, এ উপাধ্যায়জীর চিঠি ; তোমাদের গাঁয়ে তো আর বামুন-ছত্রি নেই। কে আর পড়বে। উপাধ্যায়জী লিখেছে যে তোমাদের গাঁয়ে বেটাছেলে নেই ; এত লোক যে ইংরেজের ফৌজে গিয়ে মরল, তা কিসের জন্য ?"

"পেটের জন্য।"

"এককুড়ি ছু কোম্পানী৪ পেন্সন পাচ্ছি। সে জান্ না দিলে এ আসত কোথা থেকে।"

"বাঘেও তো খায়, বিমারিতেও তো লোক মরে, পয়সা কামাতে হলে লড়েই কামানো উচিত। লড়তে গিয়ে মরলে তবে তো বছরের শেষে আমাদের মাতমগানের পুজো পাবে।" এদের মন যে কোন্ কথায় সাড়া দেয় অভিজাত পরিবারের সূর্যসমশেরের তা জানা নেই। অথচ এদের চোখ জলে ওঠে যখন এরা শোনে যে ব্রাহ্মণের মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে সেপাইরা, ধরে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের রাখা হয়েছে কোথায় কেউ জানে না, বেঁচে আছে কি মরেছে তারও ঠিক নেই।

এ এক নূতন অভিজ্ঞতা সূর্যসমশেরের; সে জেনে এসেছে চিরকাল যে এই পুরুষের অনটনের দেশে মেয়ের কদর নেই বললেই হয়; সে শুনে এসেছে ছোটোবেলা থেকে যে পাহাড়ের গুর্খা মেয়ে জঙ্গলে কুকরি দিয়ে চিতাবাঘ মেরে এসে বাড়িতে এ সংবাদটা দেওয়াও দরকার মনে করে না। ব্রাহ্মণের মেয়ের জন্য তাদের এত দরদ!

পরদিন সকালে তারা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সূর্যবাহাদুরকে— সেই ঝরণার ধারে কমলালেবুর ঝোপ পর্যন্ত।

"ফিরবার পথে এই দিক দিয়েই যেয়ো।"

"সেদিন আমার বাড়িতেই থাকতে হবে কিন্তু।"

"তোমাদের লড়াই-টড়াই শেষ হ'লে, একবার বউকে নিয়ে এসো আমাদের গ্রামে। এখন গাছে সব ফুল ধরেছে, কমলালেবু পাকবার সময় এসো।"

"বউকে চিতাবাঘ মারা শিখিয়ে দেব।" সকলে জোর করে মুখে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে। সূর্যবাহাদুর সকলের হাতে খানকয়েক করে ইস্তাহার দেয়। হোক নষ্ট এগুলো।

সম্মুখে সারির পর সারি নীল পাহাড়ের ঢেউয়ের মধ্যে থেকে, সিন্ধুঘোটকের মতো মাথা তুলে রয়েছে বরফে ঢাকা মাকালুর চূড়া; ভোরের রোদ পোয়ানোর গোলাপী আমেজে ঝিমচ্ছে।

"এই মাকালুর দিকে তাকিয়ে বলছি, কমলালেবু পাকবার সময় আবার আসব।"

এবার খাড়া চড়াই। সূর্যসমশের কোমরের বন্ধনী শক্ত করে পাক দিয়ে বেঁধে আবার এগিয়ে চলে। ঝুঁকে পড়েছে দায়িত্ব আর চিন্তার বোঝায়।

সন্ন্যাসী না! গৈরিকবাস, কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষের মালা……"প্রণাম!"

"বেঁচে থাকো! তুমিই তো সূর্যসমশের রাণা?"

"কোথা থেকে? চাতরাগদি থেকে আসছেন নাকি?

"হাঁ। এই চিঠি দিয়েছে তোমাকে দেওয়ার জন্য ভীমভার ক্যাম্প থেকে। জরুরী চিঠি। বরাহক্ষেত্রের কুশীবাঁধ পার্টির ট্রাক-ড্রাইভার দিয়েছে আমাকে।"

উপাধ্যায়ের মতোই তো লাগছে হাতের লেখাটা।—"আর এক মুহূর্তও দেরি কোরো না।

৪ ভারতের টাকা

চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবে। তোমার মাথার উপর দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তোমাদের আমলকপুরের ঘরবাড়ি সম্পত্তি সরকার জব্দ করেছে। তোমার বাড়ির লোকেরা আগেই ইংরেজ-এলাকায় পালিয়ে এসেছিলেন। ঘুরো পথে তুমি আসবে। কাউকে বিশ্বাস কোরো না। এদিককার ভারতীয় পুলিসকেও কর্নেল সাহেব শুনছি হাত করেছে অনেক টাকা খরচ করে। তুমি ইংরেজ-এলাকায় এসে ঢুকে পোড়ো না যেন। পাথরের বেদীটির থেকে একরশি পূবে দশগজ্জার মধ্যে এসে অপেক্ষা কোরো। শুক্রবারে রাত বারোটার পর তোমাকে নির্বিঘ্ন স্থানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব, উপাধ্যায়।"

"জয় বাবা পশুপতিনাথ!"

লোকালয়ের নিকট দিয়েও যাওয়া হবে না। মিতভাষী সন্ন্যাসী— বন্য পার্বত্য পথে, তাকে নিয়ে চলেন পথ দেখিয়ে।

সূর্যসমশেরেরও কথা বলার মতো মনের অবস্থা নয়।

মোহিনী কি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। শ্বশুরমশাই চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় চুর হয়ে থাকেন। রাজদ্রোহী জামাইয়ের স্ত্রীকে কি আশ্রয় দেবেন? জাগীর জব্দ হয়ে যাবে তা হলে! বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই টৈরহাগছের বাড়িতে এসে উঠেছে।—যাক! এই নির্মানবের রাজ্য দশগজ্জা ছিল বলেই বাঁচোয়া। কোনোরকমে সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়। সেখানে না চলবে নেপালের লালপঞ্জার প্রতাপ, না চলবে ভারতের লালফিতার জারিজুরি। আন্তর্জাতিক আইনের স্বর্গরাজ্য দশগজ্জা— ভবিষ্যতের পৃথিবীর রূপরেখা। যত ইচ্ছে নেপালের সরকারকে গালাগালি দাও সেখান থেকে, মিল গেটের বন্দুকধারী সেপাইদের বলো, তোমাদেরই মাইনে বাড়ানোর জন্য এই আন্দোলন— কেউ কিছু বলতে পারবে না। শিবের ত্রিশূলের উপরের দেশ এটা। এক হাত দূরে সীমানার উপর থেকে সেপাই যদি তাকে ধরবার জন্য হাতও বাড়ায় তাহলেও তাকে ধরতে পারবে না— হাত তার সেখানে অবশ। চুম্বকের মাঝখানটির মত দশগজ্জা শক্তির আওতার বাইরের স্থান; দু দিকে যত যাবে ততই শক্তির আওতায় পড়বে···

"কাল শুক্রবার, না সন্ন্যাসী ঠাকুর?"

দিনকালের হিসাবও না থাকার মধ্যেই। ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে বাইশ দিন আগে— মনে রাখবার মত বাইশ দিন একটানা কাজের। জাগাতে পেরেছে কি এই পাথরের অহল্যাকে?

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় একহাঁটু ধুলোভরা দশগজ্জাকে দূর থেকে ছোটো নদীর মতো দেখায়।

সন্ন্যাসীঠাকুর তাকে নিয়ে নির্মানবের রাজ্যে নামেন।

"ক্ষিধে পেয়েছে নাকি? সেই সকালে খেয়েছ গুটিকয়েক কলা?"

"কই না, তেমন তো ক্ষিধে বুঝছি না।" এতক্ষণ সূর্যসমশের ক্ষিধের কথা ভাববার সময় পায়নি।

"বারোটা বাজল নাকি? ধর্মঘট না থাকলে রাতের শিফ্‌টের ভেঁপুর শব্দেও সময় বোঝা যেত।"

"বারোটা বাজবার দেরি আছে মনে হচ্ছে। আমি কিছু খাবারের জোগাড় করে আনি গ্রাম থেকে। তুমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করো।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাপড়ের রং সাদা হলে আরো কিছু দূর পর্যন্ত তাঁকে দেখা যেত।

ভীমভারের আলোগুলি মিট মিট করে জ্বলছে। দূরে দেখা যায় দশগজ্জার দুদিকেই দিনের মতো উজ্জ্বল আলো— একদিকে মিলগেট, একদিকে রেলওয়ে ইয়ার্ড। দুদিকেই নিশ্চয়ই বন্দুকধারী ফৌজ আছে। জ্যোৎস্না রাত্রে আকাশের তারাগুলির দ্যুতিও ঐ রকম ম্লান। উত্তর-চক্রবালে আঁধার পাহাড়ের উপর ধ্রুবতারা— সপ্তর্ষির হলকর্ষণে প্রাণবন্ত করতে হবে এই পাথরের অহল্যাকে তাই দেখিয়ে দিচ্ছে। দূরে আর একটি তারাপুঞ্জ— অদ্ভুত দেখাচ্ছে এই অদ্ভুত পরিবেশে ; লাইন দিয়ে যোগ করলে ইংরেজি অক্ষরে ইউ. এন. এ.-র মতো দেখাচ্ছে—ইউনাইটেড নেশনস্—ভারী মজার তো—এর আগে কোনো দিন লক্ষ্য করা হয়নি। ···দশগজ্জার একদিকে তার যাওয়া চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর অন্যদিকে গেলেও তাকে ধরে নেপালেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে—তারপর খাটমাণ্ডুর জেলে, শুক্ররাজ শাস্ত্রী আর দশরথচন্দের মতো, কুকুর-বিড়ালের মতো তাকে মরতে হবে। তার চেয়ে সারাজীবন এই দশগজ্জায় থেকে যাওয়া ভালো। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দশগজ্জায় দোকান খোলা যায় নাকি?—পানের দোকান! দূর! যত সব অবান্তর কথা। এখনই উপাধ্যায় হয়ত এসে হাজির হবে।

পিছন থেকে চাঁদের আলোয় মানুষের ছায়া পড়ে···এরই মধ্যে সন্ন্যাসী ঠাকুর ফিরলেন নাকি খাবার নিয়ে?

"কি বেরাদার, এখানে কি হচ্ছে?"

মোটাসোটা লোকটি। চাঁদের আলোয় ঠিক বোঝা না গেলেও, মনে হয় বয়স হয়েছে। হঠাৎ সূর্যসমশেরের মনে পড়ে যায় যে, দশগজ্জা অমানুষদেরও দেশ, চোর ডাকাত খুনেদের শেষ আশ্রয়, আইনের জাল থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ সমাধিস্থ থাকার জায়গা।

"বলি, জবাব দিচ্ছ না যে? নতুন নাকি? কোথায় বাড়ি? পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে নেপালী-নেপালী। ডাকাতি? আচ্ছা নাই বা দিলে জবাব, বিড়ি দাও তো দেখি একটা।"

"বিড়ি নেই।"

"সিগারেটও না? থাকলে জমত। এত মুখ গোমড়া করে আছ কেন? গোরুর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনছ নাকি বসে বসে? সব যাচ্ছে নেপালে। তোমাদের রাজ্যে গোরু চরার খাজনা লাগে না কিনা, সেই জন্যে। কিন্তু তুমিও যেতে পারবে না, আমিও যেতে পারব না, গোরুর চেয়েও অধম আমরা।"

তার অমার্জিত কণ্ঠস্বরও একটু যেন ভারী হয়ে ওঠে। সহানুভূতিশীল কণ্ঠস্বরে সূর্যসমশেরের উদাস মনও আর্দ্র হয়ে আসে। অপরিচিত লোকটিকে একান্ত আপন ব'লে মনে হয়। লোকটির অবিশ্রান্ত কথার স্রোত কানে ভেসে আসে।

"আমার আবার দুদিকেই পুলিশের হুলিয়া। খরচ করতে পারতাম শ-কয়েক টাকা নেপালী পুলিশের রাজধরমে[৫] অমনি ঐ ধর্মরাজ্যে হয়ে যেত সাত খুন মাপ। সাত না হোক, অন্তত যে-তিনটে খুনের চার্জ আছে সে-তিনটে তো বটেই। এখন খাবে কি বলো তো? পদে পদে ঝঞ্ঝাট পয়সা না থাকলে। দলের লোকদের তিন দিন আগে টাকা দিয়ে যাবার কথা ছিল। সব ক'টা গা-ঢাকা দিয়েছে। একবার ফিরতে দাও-না দেশে, মজা টের পাওয়াচ্ছি শালাদের।"

৫ ঘুষ

গল্পের ছলে, অর্বাচীনকে উপদেশের ছলে, আপন মনে কত কি বলে যায়; কবে গোরুর পালের মধ্যে ঢুকে সে ফৌজের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল; ছোটো হাকিমের রাজধরমের রেট দিন দিনই বেড়ে চলেছে; তার ছোটবেলায় ছিল পঞ্চাশ 'কোম্পানী', এখন চারশ'র কমে কথা বলে না; আজ ভারতীয় এলাকায় পুলিস সাহেব ক্যাম্পের সকলকে গ্রেফতার করেছে; রেলওয়ে ইয়ার্ডে মিলিটারি গিজ্ গিজ্ করছে। আরো কত কথা।— সূর্যসমশেরের মনে খটকা লাগে—সন্ন্যাসীটা সরকারের চর নয় তো? ইচ্ছে করে গেল নাকি তাকে এই লোকটির হাতে ছেড়ে?…তবুও তার খারাপ লাগে না এই আইনের বাইরের সাথীকে। কথা বলার লোক না হোক, কথা শোনানোর লোক তো ঠিকই। তার নিঃসঙ্গ জীবনের আশ্রয়; হয়তো এর সঙ্গেই কতদিন কাটাতে হবে।…

চাঁদের আলো পড়েছে সমশের জঙ্গের ফাউণ্টেনপেনের সোনার ক্লিপ্‌টির উপর।

প্রৌঢ় সাথীর চালসেধরা চোখেও সেই ঝলকের ফিনিক খেলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তার স্বাভাবিক লোভাতুর মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শ্মশানবৈরাগ্যের শৈবালের মধ্য থেকে— তাকে বাঁচতে হবে, যেমন করেই হোক। দশগঙ্গার শুকনো বালুরাশির উর্বরতা সে বাড়াতে চায় না তার অস্থিপঞ্জর দিয়ে। এ লোকটিকে দেখে বড়োলোক বলেই মনে হয়— নইলে পকেটে সোনার কলম? পিতলের নয় তো? বাড়ি থেকে হয়তো অনেক টাকাও সঙ্গে এনেছে। দুদিককার পুলিসকেই 'রাজধরম' কিছু খাওয়াতে পারলেই যেদিকে ইচ্ছে যাওয়ার অবাধ অধিকার তার হয়ে যাবে। তারপর গুটিকয়েক এপারের গেরস্তদের গোরু ওপারে রাতারাতি নিয়ে ফড়েদের কাছে ঝেড়ে দিতে পারলেই হল। তার মুখে ফুটে ওঠে স্থির প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, রুক্ষস্বরে বলে, "দাও তোমার কলমটা।"

চমকে ওঠে সূর্যসমশের এই অপ্রত্যাশিত আদেশের রুক্ষতায়। সে এতক্ষণ ভাবছিল, দশগঙ্গার চোখে সব সমান— দেশপ্রেমিক আর ডাকাত এক হয়ে গিয়েছে এখানে। এই কি ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী আইনের রূপরেখা। অপরিচিত সাথীর একটানা গল্প কানে ভেসে আসছিল, কিন্তু তার নিজের চিন্তায় কোনো বাধা পড়ছিল না। কিন্তু এ হুকুমের স্বর ভিন্ন।— সন্ন্যাসী ঠাকুর কি উপাধ্যায় কেউ যদি এসে পড়ত এই মুহূর্তে। সাহসে বুক বেঁধে উত্তর দেয়, "কেন?"

"আমার দরকার। কথা বাড়িয়ো না" —বলতে বলতে সে সূর্যসমশেরের একটি হাত চেপে ধরে; আর এক হাতে পকেট থেকে কলমটি বার করে নেয়। কোনো বাধা দেয় না সূর্যসমশের; ঘটনার আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে পড়েছে সে।

"আর কিছু আছে? টাকাকড়ি? দেখি কোমর। হাত দুখানা তো দেখছি মেয়েমানুষের মতো নরম। বেশি গোলমাল করেছ কি এখানেই শেষ করে দেব।"

ভয়ে কেঁপে ওঠে সূর্যসমশের। তার কাছে আছে চুনাঢেরীর সেই বুড়ির সিঁদুরমাখানো আসরফি; ঝাপ্পার শালগাছের তলায় দেওয়া আংটি; কমলালেবুর ছায়ায় সেই দিদিবহিনীদের দেওয়া তাবিজ আর টিকলী, তরুণী বিধবার অশ্রুপূত মিলিটারী পদক, কত দাজুভাইয়ের জীবনের সঞ্চয়। তারা সকলে দিয়েছে নেপাল-কংগ্রেসের আন্দোলনে উপাধ্যায়জিকে দেওয়ার জন্যে। বুড়িটি বলেছিল, উপাধ্যায়জির দক্ষিণা; একজন তাবিজ দিয়েছিল, কার্তুজের দাম ব'লে; আসরফিটি দেওয়ার সময় বুড়ি বলেছিল

যে যারা গুলিতে মরেছে, তাদের ছেলেমেয়েদের গুড় আর এলাচদানা খাইয়ে দিতে।…এতগুলি মথিত হৃদয়ের সহানুভূতির দান, সে এই লোকটির হাতে ছেড়ে দিতে পারে না—কেবল নিজের প্রাণটুকু বাঁচানোর জন্য। কত সীমন্তিনীর সিঁদুর, কত সোহাগিনীর স্মৃতি, কত অশ্রুবেদনা-মাখানো দান খরচ করবে কিনা এই লোকটি রাজধরমে।…সন্ন্যাসী ঠাকুর নিশ্চয়ই সরকারের চর। আগাগোড়া সবই তাঁর জাল নয় তো? আর ভাববার সময় নেই।…হেঁচকাটান মেরে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। প্রাণের ভয়ে সে দৌড়য় মিলগেট আর রেলওয়ে ইয়ার্ডের আলো লক্ষ্য করে। পতঙ্গকে আকর্ষণ করছে আলোকের শিখা।

…দেখতে এত কাছে…বালির মধ্যে পা বসে যাচ্ছে দৌড়াবার সময়…পিছনের পায়ের শব্দ ক্ষীণতর হয়ে আসছে…মনের ভুল না তো—ঐ দেখা যাচ্ছে দশগজ্জার প্রস্তরফলক— এটুকু পথের কি আর শেষ নেই…মিলগেট, রেলওয়ে ইয়ার্ড, বুকের উত্তাল স্পন্দনের সঙ্গে কাঁপছে— দিনের মতো আলো করে রাখা হয়েছে জায়গাটিকে—দুদিকেই বন্দুকধারী ফৌজ…অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও যেন বুকের স্পন্দন হঠাৎ থেমে যায়।

সূর্যসমশের! সূর্যসমশেরই তো!— দুই দিকেরই রাইফেল একসঙ্গে কর্কশ ধ্বনিতে আন্তর্জাতিক খেলাঘরের কলকাকলিকে উপহাস করে ওঠে।

দুটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী, জেনারেল অক্টারলোনীর দম্ভের ফসিল প্রস্তরফলকটিকে ঢেকে ফেলে।

দুদিককার বুলেট সূর্যসমশেরের দেহের কোন্ vanishing pointএ গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। পরীক্ষায় না বসেও সে আইনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়।

পিছন থেকে আসে সেই প্রৌঢ় মোটা লোকটি সূর্যসমশেরের খানিক আগের সাথী। অবিচলিত হাতে সে কোমরের বন্ধনী খুলে বার করে নেয় গয়নার থলি। তার থেকে আসরফি, তাবিজ বের করতে করতে এগিয়ে যায় নেপালী সেপাইটির দিকে—গুঁজে দেয় তার হাতে কি যেন।

"আর নয়। ওদিককার ওকেও তো দিতে হবে। পাঁচ হাজার তো পাবেই সরকারের কাছ থেকে।"

তারপর আসে এদিকে।—"হল্‌টু! হুকুমদার?"

ভারতের ফৌজের নিয়মের ত্রুটি হওয়ার উপায় নেই।—"ফ্রেণ্ড।"

রূপোর মেডালটি ভারতীয় সেপাইটি উর্দির পকেটে রাখে, আরো গুটিকয়েক কি সব যেন।

"না না, আর নয়। ওদিক থেকে তো খেয়েইছ। আমার এখন ওদিককার সব হাকিমদের রাজধরম করতে হবে। অত টাকা পাব কোথায়। তা ছাড়া জানোই তো ইয়ার, ঐ মুর্দাটাকে শেষ করার উৎসবে, ওদিককার সরকার একদিন নিশ্চয় দেশসুদ্ধ লোককে অবধি জুয়োখেলার অনুমতি দেবে। এ তো জানা কথাই। এই সপ্তাহেই। তখন আবার আমি কার কাছে টাকা চাইতে যাব?"

সে স্থির পদক্ষেপে, যেন পা গুণে গুণে, দশগজ্জা পার হয়ে নেপালে ঢোকে।

এর আগেও লোকে এখানে দশগজ মেপেছে। অমৃত শিকদার মেপেছিল চেন দিয়ে। খানিক আগে নেপাল আর ভারত সরকারের দুটো চাকর মিলে মেপেছে দুটো বুলেট দিয়ে, পাকা দশ গজ। আর সূর্যসমশের মেপেছে মোটে নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত জমি— নিজের দেহ দিয়ে। দশ গজের এখনো অনেক বাকি, অনেক দেরি তাদের এখনো। জয় পশুপতিনাথ!

সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

বর্দ্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত পুরাতন বাদশাহী রাস্তার উপর অবস্থিত গোপালপুর একটি অতিক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। মাত্র দুইঘর চক্রবর্তীদের দ্বারাই গ্রামখানি বর্ত্তমানে বর্দ্ধিষ্ণু। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ি হইতে অযত্ন অবস্থায় রক্ষিত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনাবিষ্কৃত কবি সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি, দ্বিজ রামধন, জয়দেবের মূল রতিমঞ্জরী এবং গাণিতিক বিজয়রাম রচিত পুঁথিগুলি নানাদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির পরিচয়, পুঁথি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, কবির নিবাস ছিল, সমরসাহী[১] পরগণার অন্তর্গত বৈনান গ্রামে। কবির কথায়,—

নিবাস সমরসাই বুইনান[২] গ্রামে, সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর শিরোমনি নামে।

ইনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখুটি। ভণিতায় আছে,—

আমি শিশু অতি দীন ভাবে কবি মেধাহীন যে বলায় বলি সেই বাণী,
বিপ্রবংশ মহীতলে মুখুটি ফুলিয়া কুলে গাইল কিশোর শিরোমণি।

তান্ত্রিক মতে ছিল ইঁহার সাধনা। পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে এক সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধনমার্গে ইঁহার গুরু ছিলেন, কবি তাহা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

পূর্ণানন্দ পরমহংসে[৩] করিয়ে প্রণাম, যার গুণে পথ পরিচয় মোক্ষধাম।

কবির দুই পুত্র ছিল এবং সম্ভবতঃ কন্যাসন্তানও তাঁহার ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালবিয়োগে কনিষ্ঠপুত্র কমলের প্রতি তাঁহার মমত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার কথায়,—

শ্রীরামকিশোর গায় কি দোষ কর্যাছি পায় শেষেতে দারুণ দুস্থ দিলে,
সঙ্গে নিলে জ্যেষ্ঠ সুতে রক্ষা কর কনিষ্ঠ কমলে।

এই কয়টি ছত্রে কবির বিয়োগবিধুর গার্হস্থ্যজীবনের পরিপূর্ণ আলেখ্য আমরা যেন সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। ইহা ছাড়া কবির অধিক কিছু পরিচয় অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নাই।

গ্রন্থারম্ভে রামকিশোর শিরোমণি স্বরচিত ও লিপিকৃত গ্রন্থসমূহের একটি নির্ঘণ্ট দিয়াছেন। তন্মধ্যে গোরক্ষসংহিতানামক সংস্কৃতগ্রন্থের অনুলিপি ও হরিনামতত্ত্বতরঙ্গিণী, কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণী, পাষণ্ডদমনং ও যোগচিন্তামণি নামে চারিখানি স্বরচিত ও স্বলিখিত বাঙ্গালা দার্শনিক গ্রন্থের মায় পত্রাঙ্কসমেত উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া তাঁহার সারাবলীসমুচ্চয় নামে একটি নিজের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থও আছে।

১ পার্শ্ববর্ত্তী হাবেলী পরগণার বৈনান বর্ত্তমানে বড়বৈনান ও সমরসাহীর বৈনান ছোটবৈনান নামে পরিচিত। ছোট বৈনান, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দামিন্যা ও রূপরাম চক্রবর্ত্তীর কাইতি-শ্রীরামপুরের সন্নিহিত এবং বর্দ্ধমান ও হুগলীর সীমান্তবর্ত্তী সুপ্রাচীন বৃহৎ গ্রাম।

২ এখনও প্রাচীন অনেকে 'বৈনান' স্থলে 'বুইনান' ব্যবহার করেন।

৩ বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন, পৃষ্ঠা ৪৬।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধকেন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা চারিখানির পরিচয় দিতেছি। কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথির বিষয়বস্তুর পরিচয় দিবার আগে তাহার প্রচ্ছদ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। তালপত্রের বুনানি প্রচ্ছদের উপর সূক্ষ্ম রঙ্গীন বেতির যে দুর্ল্লভ প্রাচীন সূচীশিল্পের নিদর্শন মিলিয়াছে তাহা যে-কোনও শিল্পপ্রদর্শনীতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আর-এক কথা, বাঙ্গালা পুঁথির প্রাচীন পেশাদার লিপিকরদের বেপরোয়া লেখনী চালনায় ভূরি ভূরি ভ্রমপূর্ণ পুঁথিস্তূপের মধ্যে সুদৃশ্য এবং প্রায় নির্ভুল এই পুঁথির তাড়াটি মনে এক সহজ শ্রদ্ধার আবেদন জাগায়।

(১) হরিনামতত্ত্বতরঙ্গিণী : গ্রন্থখানি হরিতাল দেওয়া তুলোট কাগজে চতুর্দ্দিকে প্রভূত মার্জ্জিনের মধ্যে অতি সুদৃশ্য পাকা ছাঁদে লিখিত। পুঁথির আয়তন ৬"×৮½" ইঞ্চি। ইহা প্রতি পৃষ্ঠায় আট হইতে দশ ও বারো ছত্র করিয়া লিখিত এবং ১১ পত্রাঙ্কে সমাপ্ত।

প্রারম্ভে 'মহামোক্ষ', 'পরপূর্ব্বেগতি' ও 'মন্ত্রপ্রদ' গুরুপদে অসংখ্য প্রণতি জানাইয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থের মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতেছে, হরিনাম ভেলা আশ্রয় করিয়া ভবনদীপারে মোক্ষধামে প্রয়াণ করিবার কামনা জাগানো মোহান্ধদিগের হৃদয়ে। ভাষায় ওজস্বিতা এবং অনুপ্রাসবাহুল্য সবিশেষ লক্ষণীয়,—

ভরমে ভদ্রস্থ নাস্তি ভজনের পথে, ভেকে ভিক কদাচ না মিলে ভবিষ্যতে।

হরিনামের আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্ব-বিশ্লেষণে কবি লিখিতেছেন,—

প্রণবোক্ত হন হরিনাম ব্রহ্মময়, প্রণবের তিনগুণ ত্রিমূর্ত্তি নিশ্চয়।
ত্রিধা ভিন্ন ত্রিগুণাংশে তিনের উৎপত্তি, তখন পুরুষ সংজ্ঞা প্রণব প্রকৃতি।
প্রণব হইতে হরিনামের উদ্ধার, আধার আধেয়রূপে অধ উর্দ্ধে যার।
জ্ঞানাত্মার জ্ঞানোদ্দীপন গমনাৎ, আহরণ করি নাম আনে প্রণবাৎ।
সেই নাম জীবাত্মা করেন উচ্চারণ, নিগম আত্মিকা শক্তি উর্দ্ধগতি হন।
অগ্নিশিখা পশ্চাতে পবন যেন ধায়, দ্রুত পরাক্রমে পরমাত্মা স্থান পায়।

প্রণববর্জ্জিত নাম কবির মতে 'অচেতন শরীর'-এর মতো, অথবা 'বধিরকে প্রবুদ্ধ' করার মতো বৃথা। প্রণবযুক্ত বিশেষ বা বৃহৎ ও প্রণবরহিত সামান্য ভেদে হরিনামকে কবি দুইভাগে ভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বিশেষ নাম ও শূদ্রের পক্ষে সামান্য নাম নিরূপণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-নামতত্ত্ব লইয়া গ্রন্থের কলেবর হইলেও, তান্ত্রিকতা ইহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইয়াছে; গ্রন্থকার নিজে সিদ্ধ তান্ত্রিক হইলেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদরেখাকে তিনি নির্ম্মমভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজ উক্তিসমর্থনজন্য কবি বাসুদেব-রহস্য, সিদ্ধলহরীতন্ত্র, আগমোত্তরবচন, রাধাতন্ত্র, ভাবচূড়ামণিতন্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন।

কৈলাসে দেবসভার যে পরিবেশে নামতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশিত হইয়াছিল কবি প্রারম্ভেই তাহার একটি বর্ণাঢ্য আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। এই সভায় শ্রীকৃষ্ণ বহু স্তুতি করিয়া শিবকে কহিলেন,—

হরিনাম কহ হর হয় অনুকূল, সকলেতে বিজ্ঞ তুমি হয় আত্মমূল।

এবং পার্ব্বতীও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে "শিব কন শুনে কৃষ্ণ লিখে গণপতি।"

মহাবিদ্যা হরিনামের প্রাণবস্তু এবং হরিনামই শক্তি, কাজেই নাম-সাধনা তথা শক্তি-সাধনাই যে জীবের কাম্য ইহা বুঝাইতে কবি লিখিতেছেন,—

বুঝ দেখি শক্তি ছাড়া বস্তু কোথা আর　শক্তি নাঞি মানিলে সাধন করে কার।
সেই সে পরম জ্ঞানী যেবা শক্তি চিনে,　শক্তি বিনা বস্তু নাঞি ইহা যদি জানে।
জ্ঞানমুক্ত পাপে ত্যক্ত হয় সে সর্ব্বথা,　অক্ষরে অক্ষরে মহাবিদ্যা শক্তি গাঁথা।

অতঃপর প্রণবের ব্যাখ্যায় শিব উক্তি,—

অকার ওকার আর মকার সম্ভব,　একযোগে গুণময়ী প্রকৃতি প্রণব।

শিবনামের তত্ত্ব,—

শিবনামে সাক্ষাত কালিকা মূর্ত্তিমান,　শকারে ইকাররূপ কালি অধিষ্ঠান।
ছাড়ি সে ইকার শক্তি শিব হন শব,　মৃত্যুকায়া শব্দহীন রহিলা নীরব।

রামনামের ব্যাখ্যা এইরূপ,—

রামনামে আদিশক্তি ত্রিপুর ভৈরবী,　রেফেতে আকারবৎ হয়্যা সেই দেবী।

কৃষ্ণনামের তত্ত্ব এই,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ যাঁরে তিহোঁ মহাকালী,　ককারেতে রেফযুক্ত তেঞি কৃষ্ণ বলি।
ককারের যুক্তবর্ণ অন্তরীক্ষ্য হল্যে,　কহ দেখি তবে আর কৃষ্ণ কেবা বলে।

অতঃপর শিবশক্তি রামকৃষ্ণ অভিন্ন বুঝাইতে কবি লিখিতেছেন,—

শিবশক্তিযুত সদা হন রামনাম,　অভেদ শরীর হেতু বলে শিবরাম।
কৃষ্ণনামে আছে সব শক্তি অধিষ্ঠান,　জিহোঁ কালী সেই কৃষ্ণ না বুঝে অজ্ঞান।

তবে সকলে অভিন্ন হইলেও শাক্ত কবির মতে—

মূল বস্তু মহাকালী সকলের শ্রেষ্ঠ,　কেহ শাখা কেহ তার পল্লবে নিবিষ্ট।

ভজনের মর্ম্ম এই,—

*　*　*　*　ভজনের মর্ম্ম দেবী ভাবের উপর।
বহু জপ হোম করে শরীর যাতনা,　নিয়ত ফিরায় মালা নামের সাধনা।
ভাবের অভাবে হয় ব্যর্থ সে সকল,　ভাব বিনা মন্ত্রবিদ্যা নাঞি দেন ফল।

ইহার পর "মূল আদ্যা মহাবিদ্যা" হরিনামের অর্থ করিয়া পরে কৃষ্ণনামের অর্থ করিতেছেন,

ককার ঋকার দেবি কামিনীর কলা,　বিষ্ণুর বনিতা অংশে বর্ণময় হল্যা।
যকার চন্দ্রমা দেব সুনহ ভবানী,　নামের নকার দুর্গা নিভৃতিরূপিণী।
যুগ্ম দুই বর্ণে যদি হইল ঐক্যতা,　কৃষ্ণ নামে অধিষ্ঠাত্রী ভৈরবী দেবতা।
যেনাম হইল কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ বিসর্গান্ত,　মহামায়া জগন্ময়ী নামেতে নিতান্ত।

হরেরাম শব্দের অর্থ এই,—

হরে হরে বলে যারে শিবশক্তি তথা,　হরেরাম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি আদিভূতা।
রেফেতে ত্রিপুরা শক্তি হেতু উচ্চারণ,　অমৃত আনন্দে মগ্ন সদা সচেতন।
আদি শক্তি ত্রিপুরতারিণী মোক্ষধাম,　শক্তিময়ী অব্যক্ত যত মন্ত্র হরিনাম।

মকারার্থ বিসর্গার্থ স্থনহ তারিণী, মকারস্ত মহামায়া যোগ প্রকাশিনী।
রুদ্রযোগ দাত্রী নিত্যা সর্ব্বভূতে দয়া, যাহা হত্যে পাশবদ্ধ আকর্ষণ মায়া।
মূর্ত্তিমান বিসর্গ সাক্ষাত কুণ্ডলিনী, কোটি স্ূর্য্যপ্রভা মূলাধার নিবাসিনী।
রাম রাম পদদ্বয় শিবশক্তি যুত, হরে হরে পদদ্বয় শক্তি সমন্বিত।

অতঃপর গ্রন্থের উপসংহার। গ্রন্থসমাপ্তির পর গ্রন্থরচনার কোন তারিখ দেওয়া নাই।

(২) কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণী : আলোচ্য গ্রন্থখানি তিন উল্লাসে বাইশ পত্রাঙ্কে সমাপ্ত। পুঁথির বিবরণ প্রথম গ্রন্থের অনুরূপ। কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণীর সাধক কবি স্বপ্নে দৈববাণী শুনিয়া গ্রন্থ লিখিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে বহু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। কবির কথায়,—

গুরু কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব বন্দনা করিয়া, নানা গ্রন্থমত যত অভিসন্ধি লয়্যা।
পূর্ব্ব ভাগ্য ছিল স্বপ্নে শুনি দৈববাণী, প্রকাশিলা কৃষ্ণলীলা তত্ত্বতরঙ্গিণী।

দৈববাণী শোনার ব্যাপারে কবি সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনার ইতিহাসে দেশীয় প্রাচীন প্রচলিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি হইতে কবি যে বৈষ্ণবতন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাসুদেব-রহস্য, চৈতন্যচিন্তামণিতন্ত্র, কণাদসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, ভাগবত, রুদ্রযামল, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, কামধেনুতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কুমারসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণযামল, ছত্রিশমঞ্জরী, বরাহসংহিতা, বারাহীতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি নিজ রচনার সমর্থন করিয়াছেন। গ্রন্থের লিখনভঙ্গীতে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

গ্রন্থের প্রথম উল্লাসে নিত্যলীলা প্রসঙ্গে প্রকৃতিতত্ত্ব বিবরণ, দ্বিতীয় উল্লাসে স্থাননিরূপণ প্রসঙ্গ, এবং তৃতীয় ও শেষ উল্লাসে কৃষ্ণবিষ্ণুর জন্মাদিলীলার বর্ণনা।

সমাপ্তি এইরূপ,—

তিন উল্লাসের কথা হইল সমাপন, প্রথমেতে নিত্যলীলা প্রসঙ্গবচন।
স্থান নিরূপণ তথা দ্বিতীয় উল্লাসে, ত্রিতিয়েতে কৃষ্ণ বিষ্ণু জনমিলা শেষে।
লীলাদি কহিনু আর স্বধামগমন, সাধনার্থ শুভার্থ এই পয়ার রচন।
এতদূরে সাঙ্গ কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণী, বিরচিল শ্রীরামকিশোর শিরোমণি।

এটিতেও গ্রন্থরচনার তারিখ দেওয়া নাই।

(৩) পাষণ্ড দমনং : কবি কিশোর শিরোমণি গুরুকৃপায় কৌলমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব হিতার্থে নানা গ্রন্থের 'সারোদ্ধার' করিয়া সাধকেন্দ্র শিরোমণি পাষণ্ডদমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি পাঁচটি পরিচ্ছেদে সাতান্ন পত্রাঙ্কে সম্পূর্ণ। পুঁথির পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থের অনুরূপ। এক কথায় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বশাস্ত্রসারসংগ্রহ বলা যায়। পাষণ্ডনিরূপণাদি বিপ্রমাহাত্ম্য কথায় পাঁচটি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। বেদাচার বহির্ভূত এবং ব্রাহ্মণে ভক্তিহীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে কোনও ব্যক্তিই কবির মতে পাষণ্ড। আবার মহাপাষণ্ডের সংজ্ঞা কবির মতে এইরূপ,—

তুলসী কাষ্ঠের মালা করি সুরচন, কর্ণে কণ্ঠে হস্তে হৃদে কর্য্যাছে ধারণ।
নাসাগ্র তিলক হরিমন্দির বিস্তার, সম্বলার্থে সর্ব্বদ্বারি ফিরয়ে সংসার। ইত্যাদি

অতঃপর বৈষ্ণবনির্ণয় ও বৈরাগ্যলক্ষণ বর্ণনা। তাহার পর শিবপূজার ফলশ্রুতি বিবরণ। পরে শ্রীমতী রাধিকার প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের শিবমাহাত্ম্যবর্ণনা; শ্রীকৃষ্ণ শিবপূজার্থে স্বীয় নীলোৎপল নেত্র উৎপাটন করিয়া দেওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবের তৃতীয়নেত্র ধারণ। এইখানে প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেবী তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কলিতে কালী ছাড়া গতি নাই। কবি বলিতেছেন,—

এই যে দারুণ কলি ঘোর অন্ধকার,　অন্যের সাধনে ভবে না হয় নিস্তার।
বিফল সে সব ক্রিয়া সফল না হয়,　কলৌ কালি কলৌ কালি কৃত্তিবাস কয়।

অতঃপর নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কামবীজপ্রসঙ্গ, কৃষ্ণকালীসংবাদে কামবীজকথন, তাহার পর মন্মথবীজের ব্যাখ্যা ও ধ্যান। ইহার পর কৃষ্ণ কামবীজ-সাধনের ফলশ্রুতি জ্ঞাত হইয়া সাধনসঙ্গীর অন্বেষণে ভগবতীর নিকট প্রশ্নে রাধিকার কথা জানিলেন এবং ভগবতীর পরামর্শে দীক্ষিত হইবার জন্য কৈলাসে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের স্তুতিনতি করিতে লাগিলেন। এইখানে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল।

শিবের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে দেবীসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য হঠযোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশেষে দুর্গা আসিয়া কহিলেন,—

শক্তি সহকারে সুত করহ সাধন,　তবে বিদ্যা সিদ্ধ হবে নিশ্চয় কথন।

দুর্গার নিকট কৃষ্ণ শক্তির সন্ধান জানিতে চাহিলে দুর্গা কহিলেন,—

*　　*　　*　মোর সহচরী শক্তি তোর সিদ্ধিদাতা।
পদ্মিনী আমার দূতী নাম তার রাধা,　পুরিব তোমার আশ ইথে নাঞি বাধা।

অতঃপর বিষ্ণু ব্যাকুল হইয়া পদ্মিনী দেখিতে চাহিলে দুর্গা

*　　*　　*　সেইক্ষণে আকর্ষণে আনাল্যা পদ্মিনী।
আবির্ভূতা পদ্মিনী পদ্মমধ্য সংহিতা,　রূপের না-হয় তুলি ত্রিলোকমোহিতা।
পদ্মিনী সহস্রদলে হয়্যা অধিষ্ঠান,　দণ্ডমাত্র উপস্থি[ত] কৃষ্ণ সন্নিধান।
প্রিয়সখি সমূহ বেষ্টিত চারিভিতে,　কামবীজ কালীমন্ত্র জপিতে জপিতে।
মুকুতা রচিত মালা শোভে ডানি করে,　কালি কালি সদা মুখে ধ্যান সমাদরে।
কামবীজ কালীমন্ত্র পরম অক্ষর,　পদ্মিনী পরমানন্দে জপে নিরন্তর।
দৃষ্টিমাত্র বাসুদেব মানিল বিস্ময়,　বাক নাঞি বদনে মগন হয়্যা রয়।

শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বলতা কাটিলে পদ্মিনী তাঁহার সহিত সাধনসিদ্ধির চুক্তি ও স্থাননিরূপণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তাহার পর মায়াডিম্ব হইতে রাধিকার জন্মকথা, বাল্যক্রীড়ায় শিবপূজা, কৃষ্ণকামনায় সহচরীগণ সমেত কাত্যায়নী ব্রত এবং কাত্যায়নীর নিকট রাধিকার বাসুদেবের সিদ্ধি প্রার্থনা অসাধারণ কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

স্বীয় ভবিষ্যৎ কাত্যায়নীর নিকট জ্ঞাত হইয়া কাত্যায়নী অন্তর্হিত হইলে পদ্মিনী
আত্মসম রাধা আর সৃজিল কল্পিত,　না জানিল গোপীগণ ভাবেতে মোহিত।
ছায়া রাধা কর্‍্যা নাম থুয়্যা সেইখানে,　আপনে পদ্মিনী রাধা গেলা পদ্মবনে।

*　　*　　*　　*　　*

মায়ায় কৃতিমা জিহোঁ নাম ছায়ারাধা, বৃকভানু গৃহে তিহোঁ কন্যারূপে সদা।

* * * * *

আত্মাপহরণ করি সেই চন্দ্রমুখী, পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে হইলেক লুকি।

অযোনি সম্ভবা রাধা মহিমা অতুল, পরিচর্য্যা করেক সদা জিহোঁ আদ্যামূল।

এইখানে তৃতীয় পরিচ্ছেদ শেষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই ছায়া রাধার বিবাহব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এবং বর ও কন্যাপক্ষের পৌরাণিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সাধনলীলা প্রসঙ্গ। তাহার পর সাধনে আদ্যাকালী যেদিন রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন তাহা বলা হইতেছে—

কার্ত্তিক মাসের মধ্যে পূর্ণিমা দিবসে, মহানিশা পায়্যা দোঁহে প্রকৃতি পুরুষে।

মহারাসে মগ্ন হয়্যা শ্রীকৃষ্ণরাধিকা, নানাভোগে সহযোগে পূজিল কালিকা।

অতঃপর কৃষ্ণকে কালীর বরদান—

সিদ্ধ হবে কামনা কদাচ নহে আন, কলির প্রথমে হবে কহিল নিদান।

তোমার যে কিছু লীলা কৃষ্ণ নাম আর, কলিযুগে আবশ্যক হইব প্রচার।

এবং মর্ত্ত্যে কৃষ্ণের যতেক লীলা সে সমস্তই, "কালিকা প্রসাদে কৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিজয়"।

ইহার পর কালীবিদ্যায় সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যত জনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন গ্রন্থকার তাঁহাদের নাম করিয়াছেন। ইঁহারা যথাক্রমে : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, চন্দ্র, স্ব্র্য্য, কুবের, বরুণ, সনক, দুর্ব্বাসা, কপিল, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, দাশরথি, কৃতান্ত, যমদগ্ন্য, জয়ন্ত, বসন্ত, বলিরাজা, নারদ, বিভীষণ, বাণরাজা, ভৃগুরাম, কশ্যপ, হনুমান, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, ত্রিপুর, মার্কণ্ড, কৃপাচার্য্য, দ্রোণ, সত্যভামা, ঋষ্যশৃঙ্গ, কর্ণ, ভরদ্বাজ, জহ্নু, কংশরাজা, বসুদেব, বলরাম, বনমালী, অর্জ্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, রুক্মিণী, দ্রৌপদী, দৈবকী।

ব্রহ্মসাধকদের তালিকা এই : শুকদেব, প্রহ্লাদ, শ্রীরাম, রাবণ, কশ্যপ, কুম্ভকর্ণ, যমদগ্ন্য, ভৃগুরাম, বৃহস্পতি, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রোণাচার্য্য, বৃষকেতু, দুর্য্যোধন, কুন্তী, কুরু, সীতা, রুক্মিণী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, পুষ্পদন্ত, বুদ্ধ, কলিকাল, মন্দার, কৈলাস, ক্ষীরোদসমুদ্র, হিমালয়, নারদ।

অতঃপর কলিযুগের সিদ্ধ সাধকদের কথা,—

যবে কলি হব দুই হাজার বৎসর, শঙ্করাক্ষ নামে যোগি সিদ্ধ তারপর।

পুনশ্চ কলির গতে তৃতীয় হাজার, বিরূপাক্ষ নামা এক অবধূত সার।

* * * * *

তদনন্তে সেই কলিযুগের [ভি]তরে, মুকুন্দ জন্মিব নবদ্বীপ মায়াপুরে।

শচীসুত [নি]মাঞি নামেতে অবতরি, প্রিয়ম্বদ সুধীর গউর অঙ্গধারি।

পারিষদে প্রকটরূপ লীলা দর্শাইয়্যা, সিদ্ধ [হ]বে শচীসুত সন্ন্যাস করিয়্যা।

কলিযুগ চতুর্থ হাজার বহির্ভূত, তখন অবশ্য সিদ্ধ হব শচীসুত।

তাহার পর কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া প্রকৃতি হইতে স্বষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে দেবীই একতমা। এবং ইনিই যে জীবের একমাত্র আশ্রয় ইহা বুঝাইতে লিখিতেছেন—

ভুল না ভণ্ডের হাটে নাটমাত্র সার, দেবী দুর্গা নিতান্তে নিষ্কৃতি সবাকার।
ইহা জান্যা যত্নে কর সদগুরু আশ্রয়, দেবী দীক্ষা কর শিক্ষা রক্ষা যাতে হয়।

অতঃপর গুরুর যোগ্যতা, লক্ষণ ও চর্য্যা বর্ণিত হইয়াছে এবং ভগবতীর প্রতি শিব-উক্তিতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ শেষ। পঞ্চম বা শেষ পরিচ্ছেদে বিপ্রমাহাত্ম্য ও গায়ত্রীতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে কলিতে সুগম আগম-মাহাত্ম্য লিখিয়া কবি গ্রন্থ শেষ করিতেছেন এইভাবে,—

সংক্ষেপেতে সর্ব্বসার সমগ্র বর্ণন, পঞ্চ পরিচ্ছেদে পূর্ণ পাষণ্ডদমন।
বৈষ্ণব হিতার্থ সাধকেন্দ্র শিরোমণি, বহুযত্নে গ্রন্থরত্ন প্রকাশিল আনি।

এই গ্রন্থরচনায় কবি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন : উত্তরাগম, ঈশান-সংহিতা, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কুলচূড়ামণি, পদ্মপুরাণ, গায়ত্রীকল্প, বেদান্ত, কালীবিলাসতন্ত্র, তারা-প্রদীপতন্ত্র, বিশ্বসারতন্ত্র, আচারতন্ত্র, দেবীপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, যামলতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, দিব্যাগমবচন, ক্রমতন্ত্র, সিদ্ধলহরীতন্ত্র, গৌতমীতন্ত্র, ভাগবত, কণাদসংহিতা, ভাবচূড়ামণিতন্ত্র, মালিনীবিজয়, চামুণ্ডাতন্ত্র, মুণ্ডমালাতন্ত্র, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, কাশীখণ্ড, কপিলসংহিতা।

(৪) যোগচিন্তামণি : গ্রন্থারম্ভে সাধক কবি যোগিবর শিবকে বন্দনা করিয়া গুরুদত্ত জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে, তিনি অপরাপর সন্ন্যাসী, অবধূত, গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি সাধুসন্ত-দিগকেও স্মরণ করিয়াছেন। কলির কাপট্যে জীবের দুর্দ্দশা দর্শনে কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে ; তিনি লিখিতেছেন,—

মহাঘোর কলিকাল প্রবল তরঙ্গ, তাহে মগ্ন ভক্তবৃন্দ ভজনাদি ভঙ্গ।
ভাবহীন ভ্রান্তসদা কলির কপটে, প্রবন্ধে বান্ধব সব পড়িলে সঙ্কটে।
হারায়্যা হাতের নিধি হতজ্ঞান হয়্যা, বটার্থে বাতুল মরে সমুদ্র সিঁচিয়্যা।

এহেন পরিস্থিতিতে গুরুকৃপাপদরেণু ভরসায় কবি "যোগচিন্তামণি" রচনা করিয়া আধ্যাত্মিক পথনির্দ্দেশে সহায়তা করিতেছেন। এবং ইহা তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধিসম্ভূত সত্য,—

অমৃত হিল্লোলে ভাসি পায়্যা সুধাসিন্ধু, বহু যত্নে আনিল আসার একবিন্দু।

কাজেই উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত পাষণ্ডের হাতে গ্রন্থ দিতে কবির বিষম সঙ্কোচ। মুমুক্ষু ও জিজ্ঞাসু ভক্তি ও জ্ঞানকে বলবত্তর করিয়া পরমপদ লাভ করিতে এই গ্রন্থোত্তম অধ্যয়ন করিবেন। নিজ গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অটল বিশ্বাস। বলিয়াছেন,—

দেবের দুর্লভ এই যোগচিন্তামণি, * * *
যোগচিন্তামণি সিদ্ধ সাধন না কর্যা, সিন্ধু পার হত্যে চায় স্বানপুচ্ছ ধর্যা।

যোগচিন্তামণি পুঁথিখানি একটি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তন্ত্রগ্রন্থ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও কেশবভারতীর কথোপকথনাকারে যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর প্রেমিক শিষ্যের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও নৈষ্ঠিক ব্যাকুলতা দর্শনে গুরু হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া একে একে সন্ন্যাসধর্ম্মের সারতত্ত্ব ও অতিগুহ্য যৌগিক পন্থাসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। কবি ভাবকে যৌগিকমার্গের প্রথম সোপান বলিয়া প্রারম্ভেই উল্লেখ করিতেছেন। তাহার পর ভারতী-চৈতন্য সংবাদে কবি শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব উপাসকদের মতে ভাব হইতে কিরূপে সাধন সিদ্ধ হয়, নিত্যবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের

কোনখানে অবস্থান করেন, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের স্বরূপ কি, ভাব হইতে মোক্ষপথ প্রাপ্তি প্রভৃতির উত্তর ও প্রয়োগপথ লিপিবদ্ধ করিতে তিনি প্রথমেই যাহা বলিলেন তাহা তান্ত্রিক সহজ ও নাথ কায়াসিদ্ধির আদি কথা,—

যত গুণ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে, সে সকল মূর্ত্তিমান আছে কলেবরে।

কাজেই অন্তঃশুদ্ধি হইতেছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির প্রথম স্তর। অন্তঃশুদ্ধ না করিয়া বাহ্যচেষ্টায় বস্তুচেতনা আদৌ সম্ভব নয়। কবি বুঝাইতেছেন,—

বুঝ দেখি বল্মীক বিবর অন্তর্ভূ্ত, যে সর্প শয়নে সুখে আছএ নিয়ত।
বাহ্যের চেষ্টাতে তার না হয় চেতন, অতএব পণ্ড বাহ্য কাণ্ড অকারণ।
অন্তর্বাহ্য ঐক্য যার ভাবের সমতা, সেই সে পরম সাধু জানিবে সর্ব্বথা।
অন্তঃশুদ্ধি না জানিঞা বাহ্য শুদ্ধি করে, প্রলাপী পাষণ্ড পশু পণ্ডশ্রমে মরে।
যেমন জানিবে বাহ্যে দিয়া পুষ্পহার, সাজাইয়্যা রাখে সুরা ভাণ্ডের পসার।
ভাণ্ডের ভিতর সুরা বাহ্যেতে ভূষণ, সেইরূপ আত্মা ধরে বাহ্য পরায়ণ।
অন্তরে রহিল সুরা বাহ্যে কিবা করে, সুরা ভাণ্ড সম আত্মা বাহ্য শুদ্ধে ধরে।

এইবার কবি বলিতেছেন, আত্মপরিচিতিই মোক্ষের কারণ। নির্গুণ ব্রহ্ম জীবগুণস্পর্শে সগুণ প্রকৃতিপুরুষরূপে দেহীর আত্মায় বিহার করেন। সেই গুণাতীত বস্তুকে লাভ করিতে হইলে—

ভাবের উপরে ভজ নিরাময় স্থান, মণিদ্বীপে সুধাসিন্ধু মধ্যে পুরীখান।

কারণ,— পঞ্চভূত পৃথিবীর অপ তেজ বাহ্যাকাশ, চিন্তামণিপুরী বহির্ভূ্ত করে বাস।
তৎপরে, দেহের মধ্যে মূলাধার, সহস্রার প্রভৃতি গূঢ় নবচক্র, সুমেরুদণ্ড, চন্দ্র, সূর্য্য, পঞ্চভূত, উৎপন্ন ও লয়স্থান ক্রমান্বয়ে বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেন,—

শূন্য হইতে হইল আগে মারুত উৎপতি, মারুত উদ্ভব দেব দিবাকর তথি।
দিবাকর কিরণে উৎপন্ন হল্য জল, জলের উৎপন্ন মহী আঁধার মণ্ডল।

অতঃপর যে সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে গভীর প্রণিধানযোগ্য নাড়ীতত্ত্ব, চক্রতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ রহিয়াছে তাহা পদে পদে আমাদিগকে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য, শৈব নাথযোগী ও বাউল সহজিয়াদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রহ্মলোকের কথায় কবি যাহা বলিতেছেন তাহাতে শূন্যবাদের ধ্বনি পাওয়া যাইতেছে,—

পরম গোপন স্থান যত্ন করি রাখে, আনন্দ আমোদে ভজে কেহ নাঞি দেখে।
সর্ব্বশশীকলাপূর্ণ সূক্ষ্মময় স্থান, পরম শিবপদ সেই প্রসিদ্ধ আখ্যান।
শূন্যরূপী সর্ব্ব আত্মা সকলের সার, বিনাশে অজ্ঞান মোহ ঘোর অন্ধকার।
সুধাধার আসার নির্গত হয় তথা, যোগী জানে যোগজ্ঞানে সবিশেষ কথা।

শৈব বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই শূন্যলোকই যে কেবল কাম্য তাহা দেখাইয়াছেন। ঐরূপ শূন্যসিদ্ধের পরমা গতি এই,—

* * * পুনঃপুনঃ জনমিতে না হয় সংসারে।
ত্রিভুবন মধ্যে বদ্ধ কোথাহ না থাকে, সমগ্র অসাধ্য সিদ্ধি লভ্য হয় তাকে।

নিবীভক্ত সাধুপাশ। যোগ[illegible]
প্রগাপ ॥ সাস্ত্র চিন্ত হয়্যা নিত্য নিশী[illegible]দেবা।
স্বভাবে সন্ত করে মোক্ষদ্বারসেবা ॥ নিদান [illegible]
নানিরমন। চিন্তিলে চেতন নক্ষ সুশুদ্ধ সকল ॥ শ্রীগু
রু শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধ শীন জার। সর্ববাঞ্ছিত অভীষ্ট পুরণ
হয় তার ॥ দেবতার পাদে মন নম্রত করিয়া। তেতেনা
চয়েন রস্থান স্থিত হয়্যা। এতদ্বারে সন্যাস সাধন [illegible]
। যোগচিন্তামণি নাম গ্রন্থ সুরচন ॥ অনায়াসে ভব
সমুদ্র হৈতে পার। সাধকে[illegible] শিরোমণি করিল প্রচার ॥
নিবাস সমর সাই বুহনান গ্রামে। সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর
শিরোমণি নামে ॥ সমূহ সাধকগণে প্রণতি প্রার্থনা ॥
ক্ষমিবে আমার দোষ ক [illegible] বিবেমাজ্ঞানা। পূর্ণানন্দ পরমহংসে
করিয়ে প্রণাম। জারগুণে পাখপারি চয় মোক্ষধাম ॥ শকাব্দা

সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির স্বহস্তলিখিত পুথি 'যোগচিন্তামণি'র শেষ পৃষ্ঠা

অতঃপর হুঙ্কারাত্মক বীজ স্মরণ করিয়া কবি 'অগ্নিশিখাপশ্চাৎ পবনের' মতো বেগে সাধককে কুলকুণ্ডলিনী আক্রমণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাহাতে যাহা ঘটিবে, তাহা তিনি গোরক্ষসংহিতার একটি শ্লোকের মর্ম্মাবলম্বনে বলিতেছেন,—

হঠাৎ কুলকুণ্ডলিনী সূক্ষ্ম তাল ক্ষণে, ঘটয়তি মোক্ষানন্দ হরষিত মনে।

উপসংহারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে,—

জীবার্দ্ধাদি নব রস শৃঙ্গারাদি করি, সঙ্গে লয়্যা কুণ্ডলিনী প্রবেশিলা পুরী।
বসিলেন শুদ্ধ পদ্ম মোক্ষধাম গৃহে, পরশে সগুণ ব্রহ্ম ধরে বিন্দু দেহে।
নির্গুণ সগুণ হল্য পরশিতে গুণী, তখন সগুণ ব্রহ্ম ব্যক্ত চিন্তামণি।
স্বামী সহ লীলারস বিপরীত রতা, চেতনরূপিণী দেবী শক্তি আদিভূতা।
তত্ত্বাতীত তত্ত্বে আত্মা করিয়া সংযোগ, প্রকৃতিপুরুষরূপে বিহার সংভোগ।

এবং ইহা যে ভাবযোগারূঢ় ভজনার্জ্জিত পথ ভিন্ন লাভ করা যায় না তাহা পুনঃ পুন কবি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এবং নিমাঞের উদ্দেশে কেশবভারতীর মুখনিঃসৃত চক্রচিন্তার ফলশ্রুতি বিজ্ঞাপিত করিয়া কবি যোগচিন্তামণি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থশেষে রচনাকালের এইরূপ উল্লেখ আছে (পূর্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত নমুনা পৃষ্ঠার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।)—

শকাব্দা শোলশয় পঁচানব্বি শকে, পয়ারে প্রকাশ গ্রন্থ উক্ত ইহলোকে।

১৬৯৫ + ৭৮ = ১৭৭৩-৭৪ খৃঃ। গ্রন্থরচনাকালে কবির অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স ধরিলে তিনি প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রত্নভূমি রাঢ়দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—অনুমান করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কবির স্বগ্রাম ছোট বৈনানের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ি হইতে রামকিশোরের লিপিকৃত দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(১) শ্রীকালীকর্পূরমঞ্জরী টীকা। ইহার শেষ এইরূপ,—ভৈরবৈনৈষা শ্রীশঙ্কর সংহিতায়াং শ্রীকালীকর্পূর মঞ্জরী টীকা—ইয়ং বিদিতা লোকে কাম কৌতুক কামদা॥ লিখিতং শ্রীরামকিশোর দেবশর্ম্মণঃ॥ শকাব্দা ১৬৮০॥ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(২) গুরুপাদুকা পঞ্চকস্তোত্র টীকা। ইহার সমাপ্তি এইরূপ—ইতি শ্রীদুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি মহাচার্য্য বিরচিতা শ্রীমচ্ছিববক্ত্র বিনির্গত শ্রীমদ্‌গুরু পাদুকা পঞ্চকস্তোত্র টীকা সমাপ্তা॥ ওঁ গুরবে নমঃ॥ লিপিরিয়ং শ্রীরামকিশোর দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকঞ্চ॥ শকাব্দা ১৭২২॥

এই দুই পুঁথির লিপিকাল হইতে রামকিশোরের জীবিতকালের জ্ঞাত উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা পাইতেছি—১৭৫৮—১৮০১ খৃষ্টাব্দ।

হুগলি জেলায় দশঘরা গ্রামের সন্নিহিত গুড়েঘর ("গুড্যাঘর") গ্রামে থাকিয়া ১১৯৯ সালে রামকিশোর ভট্ট ভবদেবের দশকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত 'শালাকর্ম্ম' অংশের পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। সম্ভবত কবি শেষ বয়সে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। গুড়েঘরে শিরোমণি-বংশের খ্যাতি এখনও আছে।

রামকিশোরের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি খণ্ডিত পত্রে কালী, মহাকাল শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির বন্দনা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি একাবলী ছন্দে রচিত; অল্প বয়সের হইলেও পূর্ণ পরিণত পাকা হাতের রচনাভঙ্গী। সম্ভবতঃ তিনি কোনও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ইহা তাহারই উপক্রমণিকামাত্র। তবে সে কাব্য এখনও পাওয়া যায় নাই। পাইলে আমরা সবিস্ময়ে দেখিব, সমগ্র রচনাবলী দ্বারা বাঙ্গালার নিজস্ব দার্শনিক সাহিত্যের রুদ্রাক্ষমালে সমন্বয়ধর্ম্মী এই ক্রান্তদর্শী সাধক কবি একটি বিশিষ্ট মণিগুটিকা গাঁথিয়া দিয়াছেন।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪১—১৮৬৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

গণেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮২০-৫৪) জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৪১ সনে।

গণেন্দ্রনাথ শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ছোটকাকার [গিরীন্দ্রনাথের] তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যাশিক্ষার পাছে কিছুমাত্র অযত্ন হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি এক পত্রে বলছেন— 'মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ঘসে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান হয়— মনের উপর শিক্ষার কার্য্যও ঐরূপ।"—'আমার বাল্যকথা', পৃ. ৩৮

গণেন্দ্রনাথ হিন্দু-স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইলে, তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ে হিন্দু-স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিবাহ

১৮৫৮ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি গণেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। পরবর্ত্তী ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখেন—

> মহামান্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা হইতে লাহোরে আসিয়াছেন।…গত শনিবার রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং রবিবার [৭ ফেব্রুয়ারি] রাত্রিতে ভ্রাতৃপুত্রের শুভবিবাহকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণজ্ঞ ধাম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তথা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু এতৎকর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় গণেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল। নাট্যাভিনয়েও তাঁহার উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে 'বড়'র দল কর্ত্তৃক 'নব-নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়। দর্শক ও শ্রোতার অনুরোধে নাটকখানি তথায় উপর্য্যুপরি নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ঠাকুর-বাড়ীর গৃহশিক্ষক রামনারায়ণ তর্করত্ন 'নব-নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি প্রকাশ্য সভায় (৫ মে ১৮৬৬) দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থস্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিয়াছিলেন। 'নব-নাটক' ১৮৬৬ সনের মে মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বেলগাছিয়া উদ্যানে তৃতীয় চৈত্রমেলা অনুষ্ঠিত হইবার অল্প দিন পরেই গণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

রচনাবলী

গণেন্দ্রনাথ শক্তিমান্ লেখক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, দুইটি গ্রন্থ, একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ ও কয়েকটি সঙ্গীত ছাড়া তাঁহার আর কোন রচনার সন্ধান আমরা পাই নাই।

গ্রন্থ।—১২৭৫ সালে (১ জানুয়ারি ১৮৬৯) গণেন্দ্রনাথ 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' (পৃ. ১০৬) প্রকাশ করেন। ইহা মহাকবি কালিদাস-প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গদ্য-পদ্যে অনুবাদ। ১৩০৮ সালে অবনীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠতাতের এই গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করেন।

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে গণেন্দ্রনাথের আর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি; উহা—'জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য' (১২৭৫ সাল, ইং ১৮৬৯, পৃ. ৪৩)। ইহা প্রথমে ১৭৯০ শকের অগ্রহায়ণ ও মাঘ-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। ১১ মাঘ ১৭৯০ শকে অনুষ্ঠিত "উনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক সমাজে বিতরণ জন্য" প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ।—ইতিহাসে গণেন্দ্রনাথের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা'য় (পৃ. ৩৬) বলিয়াছেন—"তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল। আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন— মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে;— আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না— 'কোনখানে লেশ, নাহি অবশেষ, সেদিনের কোন চিহ্ন'।"

আর্য্য জাতির আদি নিবাস বিষয়ে গণেন্দ্রনাথের একটি মাত্র অসমাপ্ত রচনার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। উহা তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৭৯১ শকের চৈত্র-সংখ্যা (ইং ১৮৭০) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়।

ব্রহ্মসঙ্গীত।—গণেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত ছাড়া অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি—

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম; ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপি-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত-হৃদয়ে জাগে।
অন্তহীন, নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে।

মৃত্যু

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬), মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে, গণেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, 'সংবাদ প্রভাকর' এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করেন—

> আমরা অতীব শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র মৃত বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। ইহাঁর বিদ্যানুরাগিতা, দেশহিতৈষিতা ও সামাজিকতা হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইনি যেমন বিদ্বান্ ছিলেন, তদনুরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সম্প্রতি ইনি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আমাদিগের নাট্যোৎসাহী বন্ধুগণের মধ্যে আমরা ইহাঁকে একজন প্রধান উৎসাহদাতা বলিয়া সম্মান প্রদান করিতাম। নবনাটক-রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহাঁর দ্বারা ২০০ টাকায় পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই যত্নে ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানায় উক্ত নবনাটকের অভিনয় হইয়াছিল। নিষ্ঠুর ওলাউঠা গত রবিবার ইহাঁকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। ইহাঁর অকালমৃত্যুতে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

গণেন্দ্রনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি—

> সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্ম্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস চর্চ্চায় গণদাদার অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেক দিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনো ধর্ম্মসংগীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।
>
> গাও হে তাঁহার নাম
> রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
> দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
> ঝরে অবিরত ধারে—
>
> বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কত দিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু

তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন— তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়াচুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশে এক-একজন এইরকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্ব্বজনীন কর্ম্মে সর্ব্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইঁহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক-একটি বড়ো বড়ো পরিবারের মধ্যে অখ্যাতভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়।—পৃ. ৭৫

শুদ্ধিপত্র। "বাংলা বানানে অ এবং অকার"

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫	২৪	তেমনি	তেমনই
৭৮	১৬	এখুনি-তখুনি	এখনি-ত
৮৮	১৭	ফরাশ	ফরাস
৮৮	২০	শাগ্‌রেদ	সাগ্‌রেদ
৯৩	২৩	তর্‌হ্‌	তরহ্‌

অনেক ক্ষেত্রে (পৃ. ৭৮ ছত্র ১৭, ১৯; পৃ. ৭৯ ছত্র ১৩; পৃ. ৮২ ছত্র ১৬; পৃ. ৮৮ ছত্র ২৯, ৩০; পৃ. ৯২ ছত্র ২৯; পৃ. ৯৪ ছত্র ২০; পৃ. ১০১ ছত্র ১১) 'কোনোও' স্থলে 'কোনো' বা 'কোনও'; (পৃ. ৭৩ ছত্র ১১, পৃ. ৮৪ ছত্র ২৪, পৃ. ৯৪ ছত্র ২২) 'আরও' স্থলে 'আরো' বা 'আরোও'; (পৃ. ৭৫ ছত্র ২৫, পৃ. ৮০ ছত্র ৩, পৃ. ৮৪ ছত্র ৬) 'জোরাল', 'লাগান', 'চালান' স্থলে 'জোরালো', 'লাগানো', 'চালানো' ছাপা হইয়াছে।

প্রার্থনারত গান্ধীজি

প্রার্থনারত গান্ধীজি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতন, ১৯৪৫

সতীশচন্দ্র রায়

জন্ম : মাঘ ১২৮৮ ॥ মৃত্যু : মাঘী পূর্ণিমা ১৩১০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508W. High Street
Urbana. Ill.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এবার দেশের থেকে কড়া তাগিদ এসেছে। এ তাগিদ যদি সত্য হয় অর্থাৎ যদি আমার উপরওয়ালার মঞ্জুরী তাগিদ হয় তাহলে আমাকে যেমন করে হোক্ টেনে নিয়ে যাবেই আর তা যদি না হয় তা হলে এ তাগিদ উপলক্ষ্য করে আমার হয়তো অন্য কোনো একটা কাজ হয়ে যাবে। আমি হয়তো এখানে এসে অবধি একান্তভাবে কোণ আশ্রয় করে পড়ে আছি সেটা আমার ঠিক হয়নি— সেইজন্যেই বা দরজায় একটা ঠেলা দেওয়া হল। তা যদি হয় তবে কাজ নেই— এইবার বেরিয়ে পড়চি— ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে পৌঁছই দেখা যাক। আমার কোনো গতিবিধিই ত ঠিক নিজের সংকল্পমত হয়না।

পিয়ার্সন সাহেব আমাদের বিদ্যালয় দেখে এসে খুব আনন্দ জানিয়ে আমাকে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তাঁর মত এমন স্বভাবভক্ত লোক আমি অল্পই দেখেছি। তিনি আমাকে ভক্তি করেন কিন্তু আমি সে ভক্তির উপলক্ষ্যমাত্র— ভক্তির কিরণ তাঁর উজ্জ্বল পবিত্র হৃদয় থেকে আপনিই বিকীর্ণ হচ্ছে আমি ঘটনাক্রমে তার সামনে এসে পড়েছি। আমার সৌভাগ্য যে আমার মধ্যে তিনি কল্যাণকে দেখেছেন— তাঁর সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আমি নিজেও দেখতে পাব— পরস্পরের ভিতরকার সেই গভীরতর ভালটিকেই অবারিত করে দেওয়া যথার্থ সুহৃদের কাজ— এবার বিদেশে এসে সেইরকম সুহৃদ আমি কতকগুলি পেয়েছি— তাতে আমার জীবন অনেক বল লাভ করেছে। আমার আর এক বন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবও বোধ হয় কোনো না কোনো সময়ে আমাদের বিদ্যালয় দেখতে যাবেন— তিনিও তাঁর হৃদয়ের মাধুর্য্যরসে আমাকে অভিষিক্ত করেছেন— এঁরা শ্রদ্ধা দ্বারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন তাতে আমার জীবন পবিত্র হয়। ভারতবর্ষে গিয়ে আমি এঁদের সঙ্গ পাব এ আমার এক পরম আনন্দের বিষয় হয়ে রইল। যাঁরা ভগবানের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা যখন দক্ষিণবাহু বিস্তার করেন তখন জীবনে তাঁর দক্ষিণ মুখ প্রকাশ পায়। যখন বন্ধু পাওয়া যায় তখনই বুঝি বন্ধু সদয় হয়েছেন। বড় রাস্তায় যাঁরা বন্ধু হবেন এতদিন পরে তাঁদের দেখা পাওয়া গেছে—'এঁদের সঙ্গে আমি বরাবর সোজা চলে যাব এই আনন্দ আমার মনে জাগ্‌চে। এই বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ যোগ্য যেন হতে পারি পরম বন্ধুর কাছে এই প্রার্থনা করচি।…

এখন থেকে কিছুকাল আমার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা থাক্‌বেনা এবং অবকাশও পাবনা। ইতি

১লা মাঘ ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমরা আমার চিঠি পাওনি বলে লিখেছ বোধ হয় কোনো কারণে ডাকের বিলম্ব হয়ে থাকবে। কারণ আমি কোনো সপ্তাহে লেখা বন্ধ রাখিনি। এইবার কেবল পথে পথে ঘুরচি বলে বোধ হয় এক আধ সপ্তাহ বাদ পড়চে এবং পড়বে। বিশেষত এখন তোমাদের চিঠিও ঠিক সময়ে পাচ্চিনে, কারণ আমাদের ঠিকানা অনিশ্চিত। চিঠি না পেয়ে চিঠি লেখা বড় শক্ত— বিশেষত তোমরা ত এক আধ জন নও। আবার তোমাদের শান্তিনিকেতনের বাইরেও আমাকে অনেক চিঠি লিখতে হয়— এক এক সময়ে একেবারে অসাধ্য বলে বোধ হয়, কিন্তু আমি জানি আমাদের বিদ্যালয় আমার চিঠির প্রত্যাশা করে থাকে এইজন্যে যেমন করে হোক আমি আমার চিঠি লেখার প্রবাহ বন্ধ হতে দিইনি। অজিত লিখেচেন তত্ত্ববোধিনীতে লেখা জোগানো কঠিন হয়েছে— তোমরা যদি আমাকে চিঠি লেখা থেকে নিষ্কৃতি দিতে তাহলে আমি অনায়াসেই মাসে অন্তত দুটো করে লেখা দিতে পারতুম এবং তাতে আমার চিঠি লেখার চেয়ে অনেক কম সময় লাগত। আমি এখনো বক্তৃতার আবর্ত্তে ঘুরচি। এখানে আর চারদিন পরে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে— তার পরে কোথায় যাব এখনো সম্পূর্ণ স্থির করতে পারিনি। আমার এক একবার মনে লাগ্‌চে বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখান থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়ত আমার কর্ত্তব্য। যদি এ ধারণাটা আমার মনে দৃঢ় হয় তাহলে হয়ত বা এখানকার বড় সহরেই আমাকে ঘুরপাক খেতে হবে। এ সম্বন্ধে ঠিক আমার কর্ত্তব্য কি তা এখনো আমি ভাল করে ধারণা করতে পারচিনে। সুরুলের বাড়ী সম্বন্ধে কেবলি আমার মনে হচ্চে যে যখন ওটা অমন তাড়াতাড়ি কিনে ফেলেছি তখন নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ের জন্যে ওর বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিশ্চয়ই ওখানে একটা কোনো কাজ ফাঁদতে হবে এটা তার পূর্ব্বসূচনা। হয়ত মেয়েদের বিদ্যালয় কিম্বা কিছু একটা হবে। অতএব ওটা ঈশ্বরের হাত থেকে গ্রহণ করাই যাক তিনিই দিয়েছেন, এখন ওকে ত্যাগ না করে ব্যবহারের উদ্যোগ করাই আমার কর্ত্তব্য। ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ— কিন্তু প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া কঠিন হবে। আমাদের বিদ্যালয়কে আরো অনেক প্রশস্ত করতে হবে— কালক্রমে ওখানে আমাদের যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হবে— যেটুকু স্থান আমাদের হাতে আছে তাতে আমাদের ধরবে না সেইজন্যেই মুহূর্ত্তকালের জন্যে বিচার বিতর্ক না করে সুরুলের বাড়ী আমাকে কিনতে হয়েছে। আমি ত এতদিন ধরে এইটেই বারবার দেখে আস্‌চি বিশ্বকর্ম্মা যখন একটা কাজের আরম্ভ করেন তখন তার উদ্দেশ্য জানতে দেন না— আমাকে দিয়ে যখন তিনি মাটি খুঁড়িয়েছেন আমি মনে করেছি বুঝি আমি কুয়ো খুঁড়চি, তারপরে দেখেছি সেখানে ভিৎ গেঁথে ইমারত তৈরি হচ্চে। সেইজন্যে বারবার ঠকে ঠকে এখন আমি তাঁর মেজাজ বুঝে নিয়েছি। আমি বেশ বুঝতে পারচি সুরুলের বাড়ী আমি আমার মৎলবে কিনিনি, ওটা তাঁর মৎলবেই কেনা হয়েছে অতএব খরচের কথা চিন্তা করে ওটা তোমাদের পরামর্শ শুনে আমি ছেড়ে দিতে পারিনে। ওটা যতদিন না কাজে লাগবে ততদিনই আমাকে বহন করতে হবে— তাতে ভয় করলে চলবে না। এখন থেকে তোমরা চেষ্টা কর ওটাকে সম্পূর্ণভাবে এবং প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার জন্যে— তাহলে ওর থেকে মঙ্গল লাভ করবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। আমি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি পুনর্ব্বার সেই আর্ব্বানার কোণের ঘরটিতে গিয়ে স্থির হয়ে বসতে পারলে আরাম পাওয়া যাবে। জনতার মধ্যে ঘুরে বেড়াবার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে আমি হয়ত এ যাত্রায় এখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে ফিরতে পারতুম। কিন্তু যার যেটা প্রকৃতিগত নয় তার কাছ থেকে সে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করা উচিত না— কেননা টাকা করবার জন্যে নিজেকে নষ্ট করতে পারিনে। আমাদের বিদ্যালয়ের থেকে কোনো বক্তা এসে যদি এখানে বিদ্যালয়ের মহিমা ঘোষণা করে বেড়াতে পারত তাহলে অর্থাভাব ঘুচে যেত এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। যদি অজিত এখানে আমার সঙ্গে থাকতে পারত তাহলে হয়ত এ বিষয়ে সুবিধা হত। কিন্তু কোন্‌টা সুবিধা এবং কোন্‌টা সুবিধা নয় সে কথা এখন আন্দাজে বলা চলে না। ভিক্ষার ঝুলি একদিকে ভরে উঠলে আর একদিকে হয়ত ছিঁড়ে যেতেও পারে। যদি এখান থেকে তেমন যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের সম্ভাবনা কোনোদিন ঘটে তাহলে আমার বড় ইচ্ছা আমি মেয়েদের ইস্কুল করি। স্কুলের বাড়ী যখন কিনি তখন সেই আশাটাও আমার মনের তলায় তলিয়ে ছিল। কিন্তু ও জীর্ণ বাড়ী ত বহন করা আমার সাধ্যে কুলবে না অতএব শেষকালে ওটা বিক্রি করবার কথাই সন্তোষকে লিখে দিলুম। যাই হোক্ না কেন আমি তোমাদের বারবার লিখেছি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সাধনের পক্ষে যে অর্থব্যয় আবশ্যক তার জন্যে তোমরা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হোয়োনা— কেননা সে টাকা আমার নয়— সে আমার প্রভুর টাকা। যখনি তিনি তলব করবেন তখনি সে তাঁকে দিতে হবে— এতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় ত সেও ভাল। টাকার ক্ষতির ভয় ঈশ্বর আমার মন থেকে একেবারে ঘুচিয়ে দেবেন বলে ইচ্ছা করেছেন আমি সে কথা বুঝতে পেরেছি।

এখানে রান্নার বন্দোবস্ত এবং শস্তায় অনেক লোকের আহারের ব্যবস্থা খুব ভাল রকম আছে। কেউ এই কাজটা যদি বছর খানেক থেকে শিখে যেতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বিদ্যালয়ের পাকশালার ব্যবস্থা খুব সুন্দর রকমে এবং অল্প খরচে সম্পন্ন হতে পারে। Mrs. Moody বলছিলেন সে রকম নির্ভরযোগ্য ছেলে যদি কেউ থাকে তাহলে তিনি তার শিক্ষার সুযোগ ঘটিয়ে দিতে পারেন। শিকাগো এবং লণ্ডনে তাঁর ভোজনশালা আছে— বিস্তর লোক সেখানে কাজ করে— এই সমস্ত কাজ যদি কেউ শিখে যায় তাহলে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে এদের যে সমস্ত কলবল আছে সে পেলে আমাদের চাকরের দাসত্ব করতে হয় না। এখানে কলে তরকারী কোটা, কলে বাসন ধোওয়া, কলে রুটি তৈরি করা চলে— সেইগুলো শিখে এবং সংগ্রহ করে গেলে অনেক দুঃখ দূর হয়। এক একবার মনে মনে ভাবছিলুম সুধাকান্তর মত কোনো ছেলেকে এই কাজে তৈরি করে নিতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু এখন ত আমার সঙ্গতি নেই। যখন এরা ফিরে যাবে তখন এই কথা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এ জিনিষটা খুব শীঘ্রই দরকার হয়েছে। এই সমস্ত যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে একজন ভদ্রলোককে পাকশালার অধ্যক্ষ করতে পারলে বিদ্যালয়ের একটা কঠিন সমস্যার পূরণ হয়। কি করে যে কাজ চালাতে হয় সে আমাদের এই দেশ থেকেই শিখে যেতে হবে— ঐখানে আমরা বড়ই অক্ষম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই লিখেছি, যে জিনিষটি[১] হঠাৎ আমাদের হাতে এসেছে তাকে তাড়াতাড়ি ফেলে দেবার চেষ্টা কোরোনা। তার ঠিক প্রয়োজনটি কি এখনো যদি না বুঝতে পারি এর পরে হয়ত বুঝতে পারব। আমরা যদি গোড়া থেকেই মনকে বিমুখ করেই রাখি তাহলে কোনো জিনিষের থেকে তার সম্পূর্ণ উপকার আদায় করতে পারিনে। যেমন করে পারি একে কাজে লাগাব এবং লাভে খাটাব এ কথা জোর করে বলতে পারলেই জয়লাভ করা যায়। আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি এ দেশের কেউ যদি এই জিনিষটি হাতে পেত তাহলে কি করলে এর থেকে কিছু পাওয়া যায় এই উপায়ই সে উদ্ভাবন করত কখনো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌তনা। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে ঠকবার জন্যেই অস্থিমজ্জায় প্রস্তুত হয়ে বসে আছি— জোর করে সাহস করে কেউ সংকল্প করতে পারিনে যে সকল যোগকেই সুযোগ করে তুল্‌ব। এ সম্বন্ধে এখানকার মেয়েরাও আমাদের চেয়ে ভাল— নিশ্চয়ই পারব এ কথা এরা এমনি জোরের সঙ্গে বলতে পারে দেখে নিজেদের অদ্ভুত অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার জন্যে মনে মনে লজ্জিত হতে থাকি। হাতে একটা জিনিষ পেয়ে তাকে ব্যবহার করতে না পারা নিতান্ত একটা কুদৃষ্টান্ত, যেমন আমাদের ন্যাশনাল ফণ্ডের টাকা আমাদের স্কন্ধের উপরে ন্যাশনাল লজ্জার বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। অবশ্য সমস্ত সুবিধা যদি শেষ পর্য্যন্ত ষোল আনা প্রস্তুত থাকে, তাহলে তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তাতে পৌরুষটা কি ? যাই হোক, আমাদের ত ফিরতে খুব বেশি দেরি হবে না— অতএব অন্তত সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখ। সকলে মিলে আমরা এটাকে নিয়ে কি করতে পারি সেটা চিন্তা করে দেখা যাবে। ওখানকার গাছপালা থেকে কিছু কি ফল পাওয়া যাবে না ? আমের সময় ছেলেরা ওখান থেকে যদি আম পেতে পারে তাহলে আমি খুব খুসি হব। শুনেছি গাছগুলো বুড়ো হয়ে গেছে এবং অযত্নে আছে— যদি অন্তত ফলের গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে তাতে ভাল করে সার দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই ওর থেকে ফল ফলানো যেতে পারবে। একটু উদ্যোগ করে করানো দরকার হবে। যাই হোক্ এখন ত পড়ে থাক্ আমরা গিয়ে যা করতে পারি করা যাবে। পশু আর্ব্বানায় ফিরে যাব— সেখানে বঙ্কিমে সোমেন্দ্রে মিলে কি রকম ঘরকন্না চালাচ্ছে কি জানি। আমরা ত একমাসের উপর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্চি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ পূর্বোল্লিখিত সুরুলের বাড়ি

মহাত্মাজীর তিরোধান

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমাদের দুঃখের কি আর অন্ত নাই? শত শত বৎসরের পরাধীনতা-অজ্ঞতা-দুঃখ-দারিদ্র্য তো এতকাল আমাদের লাগিয়াই ছিল। তাহার উপরেও ছিল সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও অর্থহীন জাতিকুলাভিমান। এই সব দুঃখই তো যথেষ্ট। এই দুঃখেরও উপরে পর-পর দুই-দুইটা মহাযুদ্ধ সারা দেশটাকে একেবারে ছারখার করিয়া গেল। অন্ন গেল, বস্ত্র গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, সকলের উপরে গেল দেশের নীতি ও মনুষ্যত্ব। যে-কোনো প্রকারে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। লোকের চক্ষুলজ্জা বলিয়াও কোনো বালাই রহিল না। লাখ লাখ গোহত্যার ব্যবসায়ে-পুষ্ট যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টর গোমাতার রক্ষার জন্য হৈ হৈ করিতে লাগিলেন। চালের কালোবাজার করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁহারা মারিয়াছেন এমন কোটিপতি লোকও ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। একটু চক্ষুলজ্জাও হইল না।

১৫ই আগস্ট নাকি স্বাধীনতা পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ মূল্যে? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৈশাচিক হানাহানি, লুঠতরাজ-গুণ্ডামি, নারীদের লাঞ্ছনা, দীন-দরিদ্র-অসহায়ের নিপীড়ন, সবই নাকি ধর্মের জন্য। ধর্মের নাম করিয়া এই ব্যবসায়েও বিচক্ষণ অনেকে বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইল! এই নাকি স্বাধীনতার নমুনা!

এই দারুণ দুর্গতির মধ্যেও একমাত্র ভরসা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। হাতের কাছের সমস্ত সুবিধা তিনি ক্রমাগতই দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, পৈশাচিকতার আগুনের মধ্যে তিনি নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, ধর্মের নামে অধর্মের পাশব লীলাকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বার বার রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দীন-দুঃখী-অসহায় সবাই তাঁহার দিকে চাহিয়া পাইয়াছেন ভরসা, পাইয়াছেন শক্তি। নিঃসহায় নারী তাঁহার দিকে চাহিয়াই চক্ষের জল মুছিয়াছেন, ভিটামাটি-উচ্ছন্ন-যাওয়া হতভাগার দল তাঁহার চরণতলেই আশ্রয় পাইয়াছেন। এইটুকু ভরসাও আমাদের আর রহিল না।

৩০শে জানুয়ারি। সারা দিনের পরে সন্ধ্যাকালে যখন দিবাবসানের শান্ত অন্ধকারে একটু চুপ করিয়া বসিতে যাইব তখন একটি ছাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "আসুন আশ্রমের মধ্যে। রেডিয়োতে এইমাত্র খবর আসিল মহাত্মাজীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। সকলে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে।"— কী ভীষণ সংবাদ! বিশ্বাসই করিলাম না। ছাত্রটি বলিলেন, "শুনিতেছেন না আশ্রমে বিপদের ঘণ্টা বাজিতেছে?" শুনিলাম। তখনই দ্রুত চলিয়া গেলাম, অথচ পা আর চলিতে চাহে না।

যাইতে যাইতে মনে হইল এ কী কাণ্ড। মহাত্মাজীর প্রাণ হনন করিতে পারে এমন লোক কি কোথাও আছে? যিনি অহিংসামন্ত্রের গুরু, তাঁহাকে কে করিতে পারে হিংসা? যিনি অজাতশত্রু, তাহাকে মারিবে কে? এমন অসম্ভব ঘটনা কি কখনো ঘটিয়াছে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপাণ্ডব উভয় কুলের গুরু দ্রোণাচার্য যখন মারা গেলেন তখন সারাটা রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটা দারুণ সংক্ষোভ উঠিল। বেণীসংহার নাটকে দেখি, সেই প্রলয়ংকর সংক্ষোভের মধ্যে

দ্রোণাচার্যের নিধনের সংবাদ অশ্বত্থামা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দ্রোণাচার্য তো কুরুপাণ্ডব উভয় কুলের গুরু। তাঁহার গায়ে হাত তুলিবে কে? অশ্বত্থামা ভাবিতেছেন, পৃথিবীতে তো এখনো তেমন প্রলয়বিপ্লব আসে নাই। 'দহন-কিরণে বিশ্ব দগ্ধ করিতে তো দ্বাদশ সূর্য এখনো একত্র উদিত হয় নাই। প্রলয় প্রভঞ্জনে সকল চরাচর উড়াইয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে তো উনপঞ্চাশ পবন দিকে দিকে এখনো ছুটিয়া চলে নাই। প্রলয় বন্যায় পৃথিবী তলাইয়া দিতে যুগান্তের সকল মেঘ এখনো তো আকাশ ছাইয়া ফেলে নাই। তবে এখনই কেন সর্বজনগুরু শৌর্য্যরাশি পিতৃদেবের নিধনের কথা বল?'

দগ্ধং বিশ্বং দহনকিরণৈর্নোদিতা দ্বাদশার্কা
বাতা বাতা দিশি দিশি ন বা সপ্তধা সপ্তভিন্নাঃ।
ছন্নং মেঘৈর্ন গগনতলং পুষ্করাবর্তকাদ্যৈঃ
পাপং পাপাঃ কথয়ত কথং শৌর্যরাশেঃ পিতুর্মে॥

সেইরূপই আজ এই নিদারুণ সংবাদ। রৌরবের সব দ্বার কি খুলিয়া গেল? প্রাণহীন প্রকৃতিও তো এমন উন্মত্ত প্রলয়ে মত্ত হইয়া ওঠে নাই। মানুষের মধ্যে এমন অধম এমন নিষ্ঠুর লীলা আজ কিসে জাগিল? প্রলয়মত্ততায় মানুষ কি জড়প্রকৃতিকেও আজ ছাড়াইয়া গেল?

হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসী সকলের ধর্মের প্রতিই তো মহাত্মাজী শ্রদ্ধাবান। তাঁহাকে তবে মারিবে কে? নোয়াখালির গ্রামে মুসলমানেরা প্রথমে তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার মূল্য বুঝিয়াছেন।

মৃত্যুর পরে নিশ্চয় পৃথিবীর সর্বত্র সকল ধর্মের লোকই তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিবেন। হয়তো আমরাও করিব কিন্তু মৃত্যুর আগে আমরা কি তাঁহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়াছি? এতদিন আমরা কি পদে পদেই তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্বকে মনে মনে আঘাত করি নাই? আজ তাঁহার এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া এমন চমকিয়া উঠিলে চলিবে কেন? তাঁহার হত্যাকারী বলিয়া ধৃত যে হতভাগ্য, এই পাপ তো একলা তাহার নহে। এই পাপ আমার, এই পাপ তোমার, এই পাপ উহার-তাহার, এই পাপ আমাদের সকলেরই পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতি। একজনের হাতে আজ এই পাপ আপন বীভৎস রূপটি প্রকটিত করিলেও আজিকার এই দুষ্কৃতি আসলে সকলের দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত পাপ। এখন উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আমরা সবাই এই পাপের প্রাণসঞ্চার করিয়াছি, সকলেই কর্মে না হইলেও মনসা-বাচা এই পাপে প্রতিদিন শক্তি ও প্রাণ জোগাইয়াছি। এখন শিহরিয়া উঠিলে চলিবে কেন? এই ব্রহ্মহত্যার তাপসহত্যার পাপ আমাদের সবাকার, যদিও ইহার বীভৎস রূপটি মূর্তিমান হইয়াছে একজনের হাতে।

এতদিন কি ভাবিয়া দেখিয়াছি, যাঁহাকে দণ্ডে দণ্ডে মনে প্রাণে বচনে মারিয়া চলিয়াছি তাঁহার প্রকৃত মূল্য কি? কিসে তাঁহার পরিচয়? কোথায় তাঁহার মহত্ত্ব? বক্তা বলিয়া? লেখক বলিয়া? সমাজ-সংস্কারক বলিয়া? লোকনেতা বলিয়া? ধর্মগুরু বলিয়া? এই রকম খুচরা কোনো হিসাবে কি তাঁহার কোনো পরিচয় দেওয়া চলে?

সর্বনাশের পর মনে হইতেছে, এতদিনে আমরা তাঁহার মাহাত্ম্য যেন কিছু কিছু বুঝিয়াছি। বেদের একটা মহাবাক্য আছে—"অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি।" 'যতদিন হাতের কাছের মহাবস্তুকে না হারাই ততদিন তাহা দেখিতেই পাই না।' যাহাকে হারাই নাই তাহাকে দেখি

নাই। অদ্ভুত কথা। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় সত্য আর নাই। যাহাকে বুঝি, তাহাকে হারাইয়া বুঝি। কাছে থাকিতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। বৃদ্ধকালে যখন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি হারাই তখনই বুঝি তাহাদের মূল্য। জরাজীর্ণ হইয়া স্বাস্থ্য হারাইয়া বুঝিতে পারি স্বাস্থ্যের কদর। পরমায়ু ফুরাইলে বুঝিতে পারি জীবনের ভ্রষ্ট-নষ্ট অবসরগুলির মহত্ত্ব। বিদায় দিবার পূর্বে প্রিয়জনেরও মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। দৈবের এই কি দারুণ বিধান!

মূল্য না বুঝিলেই কি তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে? ইহাই কি আমাদের সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয়? কোন্ অপরাধে আমরা আজ তাঁহাকে হত্যা করিলাম? তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, এই কি তাঁহার অপরাধ? তবে তো ভারতের সকল সাধককেই হত্যা করিতে হয়। তিনি ভারতীয় ছিলেন, তিনি সাধক ছিলেন। ভারতের সাধকদের যে সবারই এই একখানেই ঐকমত্য। তাঁহারা সবাই সর্ববিধ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান।

ভারতের সাধকেরা কেহই পরমতকে বিদ্বেষ করেন নাই। সকলেই অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিয়াছেন। ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত যে সংকীর্ণ 'ইনকুইজিশন'এ য়ুরোপে রক্তের নদী বহিয়া গেল তাহা ভারতের নহে। সেমেটিক ধর্মের পরমতবিদ্বেষ ভারতীয় বস্তু নয়। সেই ইনকুইজিশন ও সেমেটিক সংকীর্ণতাই কি আজ ফোঁটাতিলক কাটিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া সনাতন-হিন্দুয়ানিরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল? আমরা যেন তাহার বাহ্যরূপ দেখিয়াই ভুল না করি তাহার মর্মের পরিচয় না নিতে পারিলেই সর্বনাশ। শাস্ত্রে আছে,

কেচিৎ মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ।
তৎস্বরূপবিপর্যাসাৎ পন্থানো হ্যাপদাং পদম্॥

'কোনো বাঘের মুখ দেখিতে মৃগের মত, কোনো মৃগের মুখ দেখিতে বাঘের মত। ভুল করিলেই সর্বনাশ।'

ভারতের ইতিহাসই স্বতন্ত্র। অন্য দেশের নজীরে পরধর্মবিদ্বেষ করিতে গেলেই ভারত তাহার স্বধর্ম হারাইল।

ভারতে আর্যেরা আর্যপূর্বদের ধ্বংস করে নাই। দ্রাবিড়েরাও তাহাদের পূর্ববর্তীদের মারে নাই। সেখানে যখন যে ধর্ম বিপন্ন তখনই সেই ধর্ম ভারতে আসিয়াছে ও আশ্রয় পাইয়াছে। দেশ জয় করিবার পূর্বেই মুসলমান সাধুরা ভারতে আসিয়া সংকৃত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের মত তাহারাও ভূ-বৃত্তিলাভ করিয়া এখানে সাধনায় রত হইয়াছেন। জৈনগ্রন্থ পুরাতনপ্রবন্ধে পাই, মুসলমান ভক্তদের জন্য অনুপমা দেবী আশিটি মসজিদ তৈয়ারি করাইয়া দেন। পারসীরা পারস্যদেশে নিপীড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় চাহিলে গুজরাটের যদু রাণা তাঁহাদিগকে স্বাগত করিলেন। খ্রীষ্টানেরা প্রথম শতাব্দীতেই আশ্রয়ের জন্য ভারতে আসিলে দক্ষিণের রাজারা ধর্মোত্তর ভূমি দিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহুদীরাও এইভাবে এখানে সংকৃত হন। ধর্মসাধনার জন্য ইহুদিদের একটি ছোট রাজ্যও ভারতে বহুকাল চলিয়াছিল। পর্তুগীজেরা আসিয়া সেই রাজ্য ধ্বংস করেন। পরধর্মবিধ্বংসের পাপ কোনোদিন ভারতবর্ষ করে নাই। এইসব কথায় প্রমাণ ভারতের বহু বহু প্রাচীন লেখে রহিয়া গিয়াছে। আজ যদি আমরা পাশ্চাত্ত্য

অনুদারতাকেই সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া সেইসব প্রমাণ লুপ্ত করিতে যাই তবুও কিছুতেই সে-সকল প্রমাণ লোপ করা সম্ভব হইবে না। সকল প্রমাণ লোপ করা কাহারও সাধ্য নয়।

প্রাচীন যুগে ভাগবতেরা কিরাত-হূণ-অন্ধ্র-যবন-খস প্রভৃতি সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারাও পরম শৈব ও বৈষ্ণব হইয়া আমাদের আপন হইয়া গিয়াছেন। আবার যদি কেহ আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিতে না চাহিয়াও থাকেন তবুও এইদেশে সসম্মানে তাঁহাদিগকে ভূ-বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া আপন আপন সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস এই উদারতারই ইতিহাস। এখানে চির-দিন ধর্মসাধনার সাম্যতন্ত্র (Spiritual Democracy) চলিয়াছে। ধর্মের নামে প্রভুত্ব (Autocracy) ভারতের স্বধর্ম নয়। আমরা যদি সনাতনী বেশ পরাইয়া এইসব পাশ্চাত্ত্য জুলুমের অত্যাচারকে আমাদের দেশে আমদানি করিতে চাই তবে মনে যেন রাখি, আর যাহাই হউক তাহা কোনোমতেই ভারতীয় নহে।

খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম খ্রীষ্টীয়, মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম মহম্মদীয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রবর্তক কে? ভারতে যত মত আসিয়াছে সবারই সমন্বয়ে রূপ লইয়াছে হিন্দের হিন্দুধর্ম। "হিন্দ" অর্থ ভারত। "হিন্দু"-ধর্ম অর্থ ভারতীয় ধর্ম। হিন্দুধর্ম কোনো দল বা সম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ নয়। মধ্যযুগের সাধকেরা ইহাকেই ভারত-পন্থ নাম দিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন,

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ॥ —১, ১৬৪, ৪৬

বলুক নানাজনে নানা কথা। সকলের উপাস্যই সেই এক। তিনি পরমপুরুষ। সকল পুরুষেই তিনি অধিষ্ঠিত।

পুরুষসূক্ত বলিলেন, 'সেই পুরুষই সব। এইখানেই মানবের মহত্ত্ব।'

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥ —ঋগ্‌বেদ, ১০, ৯০, ২

যজুর্বেদও বলিলেন, 'তাই আমার মন সবার কল্যাণে ভরিয়া উঠুক।'

তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ —ক জ, সং, ৩৪, ১

আথর্বণ ঋষি বলিলেন, 'মানুষের মধ্যেই যিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন তিনিই তাঁহার পরম স্থিতির রহস্য বুঝিয়াছেন।'

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥ —অথর্ব, ১০, ৭, ১৭

মানুষের মহত্ত্ব তাহার দৈব মাহাত্ম্যে। ইহার চেয়ে মহত্তর আর কিছুই নাই। তাই ব্রহ্ম স্বয়ং আসিয়া মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্ম আবিবেশাপরাজিতাম্ ॥ —অথর্ব ১০, ২, ৩৩

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিলেন, 'এক সেই পরম দেবতাই সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত।'

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ ॥ —৬, ১১

'সেই দেবতাই সকল দেবতার পরম দেবতা।'

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ॥ —ঐ, ৬, ৭

"যত্র জীব তত্র শিব"— এ তো ভারতের আপামর সকলের মুখের কথা। এই উদারতা ভারতের চিরন্তন ধর্ম। ইহার জন্যই মহাত্মাজীকে যদি মারিতে হয় তবে ভারতের মহাপুরুষদের কাহাকেও বাদ

দেওয়া যায় না। মতভেদের জন্য প্রাণ নেওয়া অন্য দেশে চলিত থাকিলেও তাহা ভারতে চলিত ছিল না। যাগযজ্ঞের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা যজ্ঞস্থলে কর্মকাণ্ডের নিন্দা করা সত্ত্বেও যজমানের আতিথ্য লাভ করিয়াছেন।

অহিংসাব্রত-ভারতের পক্ষে মতভেদবশত মানুষকে হত্যা করা অসম্ভব অপরাধ ছিল। মানুষ হইল চিন্ময় ভাগবতস্বরূপ। সেই মানুষকে হত্যা! মৈত্রেয় উপনিষৎ বলেন, 'দেহমাত্রই দেবালয়। শিবস্বরূপ তাহাতেই সমাসীন।'

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ॥

মৈত্রেয় উপনিষৎ আরও বলেন, 'সকলের সঙ্গে অভেদ দর্শনই হইল জ্ঞান'।

অভেদদর্শনং জ্ঞানম্।

ব্রাহ্মণ-শূদ্র-অস্পৃশ্য সকলের প্রতিই সমান ভদ্র ব্যবহার করিতেন বলিয়াই কি মহাত্মাজী বধ্য হইলেন? তবে তো কপি-রাক্ষস-শবর-চণ্ডালের বন্ধু শ্রীরামচন্দ্রও বধ্য। কিরাত-হূণান্ধ্র-যবন-খসগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণও বধ্য। বুদ্ধ মহাবীর সবাই তবে বধ্য। ভবিষ্যপুরাণ বলেন, 'দ্বিজ-শূদ্রের মধ্যে বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনো ভেদই নাই।'

তস্মাদ্বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো
নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা ॥

'ভগবান যখন সবারই পিতা, তখন এক পিতার সন্তানদের আবার জাতিভেদ কি?'

পিত্রৈকভাবান্ন চ জাতিভেদঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মও বলেন, 'একতা, সমতা ও সত্যতার মত বিত্ত ব্রাহ্মণের আর নাই।'

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ ॥

মহাভারতে দেখি, 'কোনো ধর্ম যদি অপর ধর্মের বিরোধিতা করে, তবে তাহা ধর্মই নহে, তাহা মানুষের উপযুক্ত পথই নয়।'

ধর্মং যো বাধতে ধর্ম ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ ॥ —বনপর্ব, ১৩১, ১১

'বিচার ও ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মই ধর্ম।'

আরম্ভো ন্যায়যুক্তো যঃ স হি ধর্ম ইতি স্মৃতঃ ॥ —বনপর্ব, ২০৬, ৭৭

'অহিংসাই পরম ধর্ম, তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত।'

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ —ঐ, ৭৪

'হয়তো আমরা শাশ্বত ধর্মের সুগভীর রহস্য বুঝি না তবে ইহা বুঝি যে সত্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা।'

দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ —বনপর্ব, ২০৪, ৪১

'অর্থহীন বাহ্যাচার ধর্ম নহে, ধর্ম হইল অন্তরের বস্তু, অন্তরে অন্তরে সবার কল্যাণ-কামনাই ধর্ম।'

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥—শান্তিপর্ব, ১৯৩, ৩১

'ধর্মের সার কথাই হইল; কাহাকেও হিংসা করিও না।'

ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি ॥ —ঐ, ২৭৭, ৫

'সর্বজীবের কল্যাণ-মৈত্রই ধর্ম।'

সর্বভূতহিতং মৈত্রম্ ॥ —ঐ, ২৬১, ৫

'যিনি ধার্মিক তিনি সবারই সুহৃদ্ ও সকলেরই হিতে রত।'

সর্বেষাং চঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ ॥ —ঐ, ২৬১, ৯

এই ধর্মেই তো মহাত্মাজীর সাধনা। তবে কোন্ অপরাধে আমরা ধর্ম রক্ষার নামে তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে পারি? অথচ ধর্মের দোহাই দিয়াই অনেকে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছি।

তাঁহার অপরাধ, তিনি ধর্ম ভাঙাইয়া খান নাই। অর্থাৎ "আমাদের ধর্ম গেল", "ধর্ম বিপন্ন" এই সব ধুয়া তুলিয়া চতুরের মত তিনি সুবিধা আদায় করিতে জানিতেন না। কিন্তু মহাভারতের মতে এই রকম চাতুরী করার নামই ধর্মবাণিজ্য। যাহারা এই হীন বৃত্তি করে তাহারা ধর্মবণিক।

ধর্মবাণিজ্যকা হ্যেতে যে ধর্মমুপভুঞ্জতে ॥

সেই সঙ্গেই মহাভারত বলেন, 'তোমার ধর্ম তোমারই অন্তরের জিনিস। ধ্বজার মত ধর্মকে দেখাইয়া বেড়াইও না। ধর্মের ধ্বজা দেখাইয়া সুবিধা সংগ্রহ করিও না।

এক এব চরেদ্ধর্মং ন ধর্ম-ধ্বজিকো ভবেৎ ॥—অনুশাসন পর্ব, ১৬২,৬২

দ্রৌপদীকে বনবাসক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, 'ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া সুবিধা আদায় করিয়া বেড়াইবার মত জঘন্য হীনতা আর কিছুই নাই।'

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্ ॥—বনপর্ব, ৩১,৫

এইসব দেখিয়া মনে হয় আমরা যখন সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষার নামেই এই সব সুবিধা আদায় করি তখন আমরা নিজের অজ্ঞাতসারেও আমাদের তথাকথিত প্রতিপক্ষেরই সমতুল্য হইয়া পড়ি। মহাত্মাজী এই পথে কখনো চলেন নাই। তাই তাঁহার প্রিয় গান ছিল রবীন্দ্রনাথের

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেদিন বলিয়াছিলেন, 'যে যে-ভাবে ডাকে, সেই ভাবেই ভগবান তাহাকে স্বীকার করেন' (গীতা ৪,১১), সেদিন বোধ হয় আমাদের মত সনাতন স্বধর্মরক্ষকের দল ছিল না। থাকিলে তাঁহাকে আর ব্যাধের শরে মরিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইত না।

ঘরে ঘরে শিবপূজা-প্রসঙ্গে প্রতিদিন আমাদের শিবমহিম্ন স্তব পড়িবার কথা। তাহাতে দেখি—'রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ কাহারও পথ সোজা, কাহারও পথ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া। কিন্তু সকলের একমাত্র লক্ষ্য, হে ভগবান, তুমিই। সকল নদী নানা পথে গিয়াও যেমন পরিশেষে সাগরেই গিয়া পড়ে তেমনি সকলেই সর্বশেষে তোমাতেই গিয়া যুক্ত হইবে।'

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥—পুষ্পদন্তের শিবমহিম্ন স্তোত্র

বুদ্ধদেব বলিলেন, 'মাতার মতো সর্বভাবে জীবমাত্রকে অপরিমাণ মৈত্রী করাই ব্রহ্মবিহার।'

মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকৃখে
এবং পি সব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয় ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥—সুত্ত নিপাত, ১,৮,৭

পরমভক্ত রন্তিদেব বলিলেন, 'মোক্ষ চাহি না, অষ্টসিদ্ধিযুক্তা সমৃদ্ধগতি চাহি না। সকলের দুঃখভার আমাকে দাও, সবাই সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হউক।'

ন কাময়েঽহং গতিরীশ্বরাৎ পরা
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজা
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥—ভাগবত, ৯,২১,১২

ভাগবতে যখন এই সব কথা প্রচারিত হয় তখন নিশ্চয় আমাদের মত স্বধর্মরক্ষকের দল ছিল না। স্বধর্মরক্ষকের দল ছিল না-ই বা বলি কেমন করিয়া? শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়াও একটি দিন সুখে থাকিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যদুবংশের নর ও নারীগণের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মৃত্যুরও অধিক দুঃখপ্রদ হইয়াছে। ব্যাধের বাণ বরং তাঁহাকে অতি দুঃসহ দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধদেবকে চিরদিন তাঁহারই আত্মীয় দেবদত্ত জ্বালাইয়াছেন। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা বুদ্ধদেবের আপন হইবারই কথা। অথচ তাঁহারাই চিরদিন বুদ্ধদেবকে নানাপ্রকারে দুঃখ দিয়াছেন। চণ্ডাল চুংদের বিষাক্ত অন্নে যখন বুদ্ধদেব প্রাণ দিলেন তখন বুদ্ধদেব চুংদের জন্যই ব্যথিত হইলেন। শিষ্যদের বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু সেইজন্য তোমরা কেহ চুংদকে নিন্দা করিও না। চুংদ এত দিনে আমাকে সার্থক করিল। সুজাতার অন্নে আমি আলোক পাইয়াছিলাম, চুংদের অন্নে আমি নির্বাণ লাভ করিলাম। চুংদ আমাকে ধন্য করিয়াছে। আমার মৃত্যুর কথা বলিয়া তাহাকে কেহই দুঃখ দিও না।"

ষড়্‌বর্গীয়েরা ভিক্ষু হইয়াও বুদ্ধকে দুঃখ দিয়াছেন শুনিলে বিস্ময়ের কিছুই নাই। খ্রীষ্টকে যাঁহারা মারিলেন তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকে মর্মান্তিক করিবার জন্য তাঁহাকে দুই চোরের মধ্যে শূলবিদ্ধ করিয়া মারিলেন। কিন্তু ধরিবার পূর্বে তাঁহারা খ্রীষ্টকে চিনিতেন না। দূর হইতে খ্রীষ্টের মতামতের কথা শুনিয়াছেন মাত্র। তখন খ্রীষ্টের এক শিষ্য জুডাস মাত্র ত্রিশটি টাকার লোভে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। খ্রীষ্টকে মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে হয়তো এই দুঃখ অধিক বাজিয়াছিল। তবু তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "ভগবান, ইহাদের তুমি ক্ষমা করিও। ইহারা জানেনা কিরূপ জঘন্য কাজ ইহারা করিয়াছে।"

মহাপুরুষদের দেহ যখন আছে তখন মৃত্যুও আছে। নশ্বর দেহের উপরে যখন আঘাত আসে তখন সে বেদনাও তাঁহাদের বাজে। কিন্তু তাঁহাদের চিন্ময় দেহ আরও সুকুমার। দেহ দিয়া বাহ্য সব আঘাতই তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন, তবু সেজন্য তাঁহারা ক্ষমা করিয়া যান। তবে হীনতার নীচ আঘাত তাঁহাদের হৃদয়ে আরও করুণভাবে বাজে। সে আঘাতকেও তাঁহারা ক্ষমা করিয়াই যান, কিন্তু নীচতার আঘাতের বেদনাই তাঁহাদের মর্মান্তিক। জগতের কোনো মহাপুরুষই এই মর্মান্তিক আঘাত এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। মহামানব খ্রীষ্টের তো নামই ছিল "দুঃখময় মানুষ" বা Man of sorrows। মহত্ত্ব অর্থই মহা দুঃখের ভার।

ভারতের সব দুঃখ-আঘাতই বিগত ও বর্তমান মহাপুরুষদের মনে গিয়া আঘাত করিতেছে। এখন ভারতে প্রধানতঃ হানাহানি চলিয়াছে হিন্দু-মুসলমান-শিখ এই তিনটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে। হিন্দুর কথা তো আগেই হইল। এইসব ব্যাপার কি মুসলমান ধর্মেরই অনুগত ? মুসলমান ধর্মের নামই হইল ইসলাম (কোরাণ, ৫, ৫)— ইসলাম কথাটার মূলগত অর্থই শান্তি-মৈত্রী। ঈশ্বরের ও মানবের সঙ্গে যাহার শান্তিময় যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই তো মুসলিম (ঐ, ২, ১০৬)। সকলের সঙ্গে পরস্পরে দেখা হইলে বলিতে হইবে "সলাম" বা শান্তি। স্বর্গেও এই শান্তিমন্ত্রই ধ্বনিত (ঐ, ১০, ১০)। শান্তি ছাড়া আর কোনো বাক্যই স্বর্গে শোনা যায় না (ঐ, ৫৬, ২৬)।

উদারতার প্রসঙ্গে বলা যায়, কোরাণ সত্যকে সংকীর্ণ করিয়া দেখেন নাই। কোরাণ বলেন, 'আমার মধ্যে আল্লাহ্ যে জ্ঞান প্রেরণ করেন তাহা যেমন মান্য, তোমার মধ্যে প্রেরিত জ্ঞানও তেমনি মান্য। তোমার আমার সকলেরই ঈশ্বর এক। সেই ঈশ্বরের কাছে সকলেই প্রণত হই (ঐ, ২৯, ৪৫)। সকল প্রাণীকে লইয়াই আল্লাহ্‌র বিশাল পরিবার। ভগবানের রচিত প্রকৃতি ও মানবই সত্যধর্ম (ঐ, ৩০, ২৯)। সকল নরনারী তাঁহারই সৃষ্টি। ভগবদ্‌বিশ্বাসী মাত্রেই ভাই-ভাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বেশি ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ তিনিই অধিক ধন্য ও মান্য (ঐ, ৪৯, ১৩)।'

কোরাণ বলেন, 'কেহ যদি অসাধু আচরণ করে তবে প্রত্যুত্তরে সাধু আচরণই ফিরাইয়া দিবে। তবেই যে আজ শত্রু সে কাল বন্ধু বনিয়া যাইবে (ঐ, ৪১, ৩৪)। আত্মীয় স্বজন দীন দরিদ্র অনাথ সকলেরই কল্যাণ করিতে হইবে (ঐ, ৪, ৩৬)।'

হজরত মহম্মদ বলেন, 'যতদিন আমরা সকল মানব-ভ্রাতাকে ভালবাসিতে না পারিব ততদিন আমাদের ভগবদ্ভক্তি ঝুঠা।' তিনি আরও বলেন, 'যে ছোটকে স্নেহ ও বড়কে শ্রদ্ধা না করে সে আমাদের কেহ নহে (মিসকাত অল মসাবী, বাব অসাফকাত, পৃ ৪২৩)।' হজরতের মতে, মিথ্যা বাক্য ও আচরণ ত্যাগ না করিলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই হইতে পারে না।

ভগবানের নামই শান্তিময় কল্যাণময় (কোরাণ, ৫৯, ২৩)। শান্তিধামই ইসলামের লক্ষ্য (ঐ, ১০, ২৫)। বিশ্বমৈত্রীই আসল ধর্ম (ঐ, ২১, ১০৭)।

কোরাণের মতে, হজরতের পূর্বেও নানা ধর্মগুরুর কাছে যে সব সত্য প্রেরিত হইয়াছে তাহাও শ্রদ্ধার যোগ্য (ঐ, ২, ৪)। পূর্ববর্তী সকল সত্যকে সমর্থন করাই হইল কোরাণের কাজ (ঐ, তৃতীয় অধ্যায়। ভগবান নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে যুগে যুগে নানা প্রেরিত পুরুষকে সত্য ঘোষণার জন্য পাঠাইয়াছেন (ঐ, ৩৫, ২৪)। কোরাণে সেইসব মহাপুরুষদের বাণীর সমর্থন পাইবে (ঐ, ৩৫,৩১)।

হজরতকে ভগবান বলিয়াছেন, 'তোমার পূর্বে এমন বহু প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছেন যাঁহাদের নামও তোমার জানা নাই। কয়েকজনের নাম মাত্র তোমাকে বলা হইয়াছে (ঐ, ৪০, ৭৮)। সেইসব প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে কাহাকেও ত্যাজ্য করিয়া বাকিদের মাত্র গ্রাহ্য করা অনুচিত (ঐ, ২,২৮৫)।

হজরতের উপদেশ হইল, 'আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করিতে হইলে প্রতিবেশীকে সম্মান করিতে হইবে (মুসলিম ও বুখারী)। প্রতিবেশীকে যে ভয় ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা না করিল তাহার স্বর্গ নাই (মুসলিম)। পরস্পরে হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করিতে হইবে (মুসলিম ও বুখারী)। দয়া না করিলে দয়া পাওয়া যায় না (ঐ)। সাবধান, কাহাকেও উৎপীড়ন করিও না। যে উৎপীড়িত সে কাফের

হইলেও তাহার প্রার্থনা ভগবানের কাছে পৌঁছিবেই (ঐ)। ক্রোধকে জয় করাই বীরত্ব (ঐ)। সদাচারই শ্রেষ্ঠধর্ম।

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের এইসব সারতত্ত্বই মহাত্মাজীর জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে বিদ্বেষ করা মুসলমান ধর্মের অনুমোদিত হইতে পারে না।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিদ্বেষ ঘুচাইতেই শিখধর্মের উদ্ভব। মহাত্মা নানকের শ্রদ্ধেয় বহু মুসলমান সাধু ছিলেন, এবং তাঁহার অনুবর্তীদের মধ্যেও বহু মুসলমান ছিলেন। গ্রন্থসাহেবে শেখ ফরিদ প্রভৃতি মুসলমান সাধকদের বাণী গৃহীত হইয়াছে। গুরু নানক স্বয়ং মক্কাতে তীর্থযাত্রায় গিয়াছিল। গ্রন্থসাহেবে দেখা যায়, যে আপনাকে মিটাইয়া দিয়া সত্য ও সন্তোষকেই আশ্রয় করিয়াছে সে-ই সাচ্চা মুসলমান। গ্রন্থসাহেবে দেখি, 'প্রতি জীবেই ব্রহ্ম বিরাজিত : প্রতি জীবেই ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্যমান।'

ঘট ঘট অংতরি ব্রহমু লুকাইয়া
ঘটি ঘটি জোতি সমাঈ ॥—বড়হংস রাগ

গুরু অমরদাসকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "মুসলমানদের অত্যাচার আর কতকাল সহ্য করা উচিত?" তিনি উত্তর করিলেন, "যতকাল বাঁচিবে, ততকাল। ধর্মবিশ্বাসীদের পক্ষে প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত নহে।"

গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন, 'ভগবানের কাছে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোনো ভেদ নাই।'

তিহ আগে হিন্দু কিয় তুরকা।

'দেবালয়ও যা, মসজিদও তাই। পূজাও যা, নমাজও তাই।'

দেহরা মজিদ সোই পূজা নিমাজ উ-ই।

'হিন্দু-মুসলমান-ইহুদী-পারসী সবই এক জাতি, এক পরিচয়।'

হিন্দু তুরুক কোউ রাফজী ইরানশাহী
মানুষ কী জাতি সবৈ একৈ পহচান রে ॥

মধ্যযুগের সন্তগণ তো সম্প্রদাগত ভেদদৃষ্টিকে স্বীকারই করেন না। কবীর বলেন, 'হিন্দু মরে রাম কহিয়া, মুসলমান মরে খোদা বলিয়া।' যে এই দুইয়ের অতীত, সে-ই তো জীবন্ত।'

হিন্দু মুয়ে রাম কহি মুসলমান খুদাই।
কহৈ কবীর সো জীবতা দুহমেঁ কদে ন জাঈ ॥

'হিন্দু মুসলমানের ঈশ্বর একই।'

হিন্দু তুরুক কা করতা একৈ।

'দলাদলি করিয়াই জগৎ রহিল ভুলিয়া।'

পখা পখীকে পেখণৈঁ সব জগত ভুলানা।

কবীর বলেন, 'অপার ভগবানেরই অনন্ত নাম।'

অপরংপারকা নাঁউ অনংত।
কহৈঁ কবীর সোঈ ভগবংত ॥

দাদূ আসিয়া বলিলেন, 'হিন্দু মুসলমান ভেদ কিছুই নাই।'

হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহীঁ ॥

'খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রহ্মকে দলে দলে লইল ভাগ করিয়া।'

খংড খংড করি ব্রহ্ম কোঁ
পথি পথি লিয়া বাঁটি ॥

'চাই বল আল্লা, চাই বল রাম, ডাল ছাড়িয়া মূল কর আশ্রয়।'

অলহ কহোঁ ভাবৈঁ রাম কহো
ডাল তজো সাব মূল গহোঁ ॥

মধ্যযুগে বহু মুসলমানের লেখা মনে হয় যেন হিন্দুভক্তদের বাণী। অবদর রহীম খানখাঁনার্ লেখা অনেক বাণীই এইরূপ। তিনি আরবী-পারসী-তুর্কী-সংস্কৃত-হিন্দী পাঁচ ভাষাতেই সমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত মদনাষ্টক এখনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা বসন্ত-উৎসবকালে পাঠ করেন। আর ব্রাহ্মণবংশে জন্ম তুলসীসাহব হথরসীর লেখা মনে হয় যেন মুসলমানের। তুলসী বলেন, 'হৃদয়মন্দির নির্মল কর, প্রিয়তম আসিবেন। সৃষ্টির শাস্ত্রে লেখা আছে মহান প্রভুর জন্যই এই মন্দির রচিত।'

দিলকা হুজরা সাফ কর
জানাঁকে আনে কে লিয়ে।
কুন কুরাঁ মেঁ হৈ লিখা
আল্লাহ অকবর কে লিয়ে ॥

গরীবদাস এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় পৃথিবীর সকল ধর্মের সকল সাধককে প্রণাম করিয়া গিয়াছেন—

আজিজ কী অরদাস হৈ
সকল সংত পরনাম ॥

হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের উদারতার কথাই তো জানা। শিখদের কথাও তাই। মুসলমান সাধনার সার কথাও তাই। তবে মহাত্মাজী কাহার ধর্মে আঘাত করিলেন? আজ যাঁহারা 'ধর্ম বিপন্ন' বলিয়া চীৎকার করিয়া আপন কাজ হাসিল করিতেছেন, তাঁহাদের এই সব নীচতা কি ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষরা স্বীকার করিবেন? ভগবানের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

যুগে যুগে ভগবান এই আঘাত পাইয়াছেন। এক ধর্ম হইলেই কি মানুষ আপন হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করে? ভারতে মুসলমান-পাঠানদের উপরে আসিয়া পড়িলেন মুসলমান-মোগল। পারস্যের মুসলমান-সাম্রাজ্য মুসলমান-তুর্কিরা ছারখার করিয়া দিল। পারস্যের ইতিহাস বাহিরের মুসলমানদের অত্যাচারে ভরা। এক ধর্ম হইলেই যে এক 'নেশন' হয় না তাহা ঐতিহাসিকেরা সবাই জানেন, যদিও স্বার্থান্বেষীরা তাহা চাপিয়া যাইতে চাহিবেন।

চাপিবেনই বা কেমন করিয়া? য়ুরোপের ইতিহাসের পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলাম, এইযুগেই চক্ষুর সম্মুখে যে পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ গেল তাহা তো খ্রীষ্টানে-খ্রীষ্টানে। এক ধর্ম হইয়াও তো কাহারও রক্ষা হইল না। স্বার্থ এমনই জিনিষ। এই স্বার্থের বলে সহোদর ভাই সহোদর ভাইর মুণ্ডপাত করে, এক ধর্মের আর কথা কি? এইজন্যই মহাত্মাজী অহিংসার কথা বলিতে গিয়াই চিরদিন বলিয়াছেন, "স্বার্থ ছাড়, লোভ ছাড়।" এই স্বার্থের বিরুদ্ধতা করাতেই স্বার্থপরায়ণেরা তাঁহাকে মারিল।

মহাত্মাজীর মৃত্যুর আঘাতের জন্যই আমরা বার বার দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই তিনি যে-সব আঘাত ক্রমাগত সহিয়া গিয়াছেন তাহা আরও মর্মান্তিক। বহু লোক তাঁহাকে বিরুদ্ধভাবে আক্রমণ ও নিন্দা করিয়াছেন। যে সব খাঁটি ও সাচ্চা লোক সত্যই মতভেদের জন্য তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের তিনি কখনো বিরুদ্ধভাবে দেখেন নাই। তাঁহাদের খাঁটি বাক্যে ও আচরণেও তিনি মর্মান্তিক ব্যথিত হন নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পাইয়াছেন তিনি তথাকথিত আপন জনেরই কাছে, যাঁহারা তাঁহার কথা ভাঙাইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা আদায় করিয়াছেন, যাঁহারা বড় বড় আদর্শ ও বুলি নিজেদের প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চয় ইহাঁদিগকেও তিনি ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই ক্ষমাই সবচেয়ে মর্মান্তিক ক্ষমা। আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমরাও সেই মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছি কি না।

মহাত্মাজীর দেহ রাখিবার হেতুরূপে আততায়ী যে তাঁহাকে আঘাত করিল তাহার আঘাতকেও তিনি ক্ষমা-করুণ আশীর্বাদই করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন হইতেই মহাত্মাজীর কথায় বার্তায় বুঝা যাইতেছিল, পৃথিবী তাঁহার কাছে বড় দুঃখময় দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। আপন পর সকলেরই স্বার্থ ও নীচতার লীলা দেখিয়া যে আঘাত ক্রমাগতই তিনি মর্মে মর্মে পাইয়াছেন তাহার বেদনা তিনি জানাইবেন কাহার কাছে? তাঁহার অপরূপ-সুকুমার হৃদয়ে সকরুণ ব্যথা কি কেহ বুঝিবে? অশেষ বহ্নিদাহ বক্ষে বহন করিয়াও বাহিরে তিনি হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। তাই যে তাঁহাকে প্রাণে মারিল সে এক হিসাবে তাঁহাকে বড় বেদনাক্রান্ত জীবন হইতে অব্যাহতি দিল।

একটা পুরাতন ঘটনা মনে পড়িতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এক গোরা সৈন্য বিদ্রোহীদের খোঁজে আসিয়া দেখে, এক মন্দিরের পাশে এক ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসিয়া। গোরা সৈন্য তাঁহাকে বিদ্রোহীর খোঁজ জিজ্ঞাসা করিল। ধ্যানসমাহিত সাধু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অসহিষ্ণু সৈন্য তাঁহার বক্ষে বেয়নেট আমূল বসাইয়া দিল। মরিবার সময় চক্ষু খুলিয়া সাধু আততায়ীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "হায় আমার রাম, তুমি এই বেশে আজ দেখা দিলে!" এই বলিয়াই সাধুর প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়িল। মহাত্মাজীও যে শুধু "রাম"ই বলিয়া গেলেন তাহার মধ্যেও কি এইরূপই কিছু গভীর প্রণতি ছিল?

মহাত্মাজীর মনের কথা আমরা বুঝিব কেমন করিয়া? তাঁহাদের জীবনের মর্মকথা বুঝিতে যে মানদণ্ডের প্রয়োজন তাহা আমাদের কই? মহাপুরুষদের পথই ভিন্ন। ভর্তৃহরি বলেন, যাঁহারা মহৎ তাঁহারা নম্রতার দ্বারাই উচ্চ হন। নিঃশব্দ ক্ষমার দ্বারাই তাঁহারা নিন্দুকদের আক্ষেপ-রুক্ষ পরুষ-কঠোর নিন্দার প্রত্যুত্তর দেন, পরার্থে সর্বভাবে সকলের জন্য সর্বত্যাগ করিয়াই তাঁহারা স্বার্থ সম্পাদন করেন। মহাপুরুষেরা এমন অপরূপ সাধনার দীক্ষা কোথায় পাইলেন?

ভর্তৃহরির মত মনীষীও মহাপুরুষদের এই অপূর্ব লীলা দেখিয়া বিস্মিত। আমরা তো কিছুই বুঝি না, জানি শুধু আঘাত দিতে। আজ সেই সব কথা স্মরণ করিয়া মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মহাত্মাজী আত্মরক্ষার জন্য কোনো পন্থাই অবলম্বন করেন নাই, অন্যকেও করিতে দেন নাই। কেন? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, "আমি যখন সকলকেই ভালবাসি, সকলেরই কল্যাণ কামনা করি, তখন আমায় কে মারিতে চাহিবে? আর যদি মারিতেই চাহে তো মারুক-না কেন? আমার

দেহই তো আমার সর্বস্ব নয়। আমার দেহকে কেহ আঘাত করিলেও আমার অন্তরাত্মাকে সে আঘাত করিবে কিসে? আর কোন্ সুখেই বা বাঁচিতে চাহিব?”

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার লীলাও স্মরণীয়। যদুবংশীয় নরনারীর ব্যাপার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছিলেন, পূর্বেই কুরুক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তগঙ্গা বহাইতে দেখিয়াছি। যদুকুলের মদমত্তগণও পরস্পরে হানাহানি করিয়া মরিল, হায় হায় তাহাও কি দেখিতে হইল—

দৃষ্টং ময়েদং নিধনং যদূনাং
রাজ্ঞাং চ পূর্বং কুরুপুংগবানাম্ ॥—মৌষল, ৪. ৯

তাহার পর দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম অনন্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে আপন কুলের নরনারীদের ভবিষ্যৎ সব দুর্গতিও দেখিতে পাইলেন—

ততো গতে ভ্রাতরি বাসুদেবে
জানন্ সর্বা গতয়ো দিব্যদৃষ্টিঃ ॥—মৌষল, ৪, ১৭

দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, দস্যুরা যদুনারীদের হরণ করিতেছে, আবার বহু নারী সকামা স্বেচ্ছাতেই দস্যুদের সঙ্গে চলিয়াছে—

সমন্ততোঽবকৃষ্যন্ত কামাচ্চান্যাঃ প্রবব্রজুঃ—মৌষল, ৭, ৫৯

তখন ভাবিতেছেন, আহা, কেহ কি আমাকে এখন বধ করিয়াও এই সব দুর্গতি দেখিবার দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে পারে না? তখন দৈবক্রমে এক ব্যাধ যোগশয্যায় শয়ান শ্রীকৃষ্ণকে মৃগ মনে করিয়া বাণবিদ্ধ করিল।

স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং
মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ সায়কেন ॥—মৌষল, ৪, ২২

মহাবীর ভীষ্ম পিতার জন্য শপথ করিয়া জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য স্বীকার করিলেন। কুরুকুলের সিংহাসনের কাছে চির-আনুগত্যের শপথ করিলেন। তাই যখন দ্রৌপদীকে কৌরবাধমেরা সভামধ্যে অপমান করিল, তখন একাই কুরুকুল-মথনে সমর্থ হইয়াও আপন শপথে বদ্ধ হইয়া পিতামহ ভীষ্ম মর্মে মরিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই তো তাঁহার আসল শরশয্যা। কুরুকুলের প্রতিদিনের অনাচার-শরে বিদ্ধ হইয়া যে দুঃখ ভীষ্ম নিরন্তর পাইয়াছেন তাহার কাছে তাঁহার অন্তিম শরশয্যা তো আরামের সুখশয্যা। অন্তিম শরশয্যায় ভীষ্ম জানিতেছিলেন, তাঁহার চরম মুক্তিস্বরূপ জীবনাবসান আগতপ্রায়। ধ্যানমগ্ন হইয়া সেই অবসানকে তিনি আহ্বান করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ভীষ্ম পৃথিবীত্যাগের জন্য যোগযুক্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে মুক্তি লইতেছেন। তাঁহার চক্ষু নিমীলিত। যুধিষ্ঠির আসিয়া বিদায়-নমস্কার জানাইলেন। ভীষ্ম চক্ষু বুজিয়া আছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, ‘তোমার কথামত আমরা সকলে সর্ব আয়োজন সহ তোমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছি। শুনিতে কি পাও?’

শৃণোষি চেন্ মহাবাহো?—অনুশাসনপর্ব ১৬৭, ১৯

চক্ষু মেলিয়া ভীষ্ম বলিলেন, ‘এইভাবে এই শরশয্যায় ৫৮টি রাত্রি ব্যতীত হইয়াছে। শুভক্ষণ

আসিতেছে, সর্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এখন তবে যাই। যাইবার সময় কহিয়া যাইতেছি যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।'

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ ॥—ঐ, ৪১

'এত দিন তোমাদের সকলেরই কল্যাণ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। আমার কথা তোমাদের কাহারও মনঃপূত হয় নাই। কাজেই মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গিয়াছে। এখন এই প্রাণ ছাড়িতে চাহি, সকলে অনুমতি দাও। সকলে সত্যকেই চিরদিন আশ্রয় করিয়া থাকিও। কারণ সত্যই পরম বল।'

প্রাণানুৎস্রষ্টুমিচ্ছামি তত্রানুজ্ঞাতুমর্হথ।
সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্ ॥—ঐ, ৪৯

এই কথাই সকল কথার চরম কথা। ইহার পর আর তো বলিবার কিছু নাই। এই কথার পরেই ভীষ্ম চুপ করিলেন—

তূষ্ণীম্বভূব কৌরব্যঃ ॥ ঐ, ১৬৮, ১

তাহার পরে যোগবলে ভীষ্ম সমস্ত প্রাণকে ধারণা করিয়া ঊর্ধ্বগামী করিলেন (ঐ, ২)। ক্রমে প্রাণ যেমন-যেমন দেহ ছাড়িতে লাগিল তেমন-তেমন দেহের সব দুঃখ মিটিয়া যাইতে লাগিল—

যদ্ যন্মুঞ্চতি গাত্রং হি স শান্তনুসুতস্তদা।
তত্তদ্বিশল্যং ভবতি যোগযুক্তস্য তস্য বৈ ॥ ঐ, ১৬৮, ৪

ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া তাঁহার আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করিল। দেব-দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিদ্ধগণ ব্রহ্মর্ষিগণ 'সাধু সাধু' কহিতে লাগিলেন—

জগাম ভিত্ত্বা মূর্ধানং দিবমভ্যুৎপপাত চ।
দেবদুন্দুভিনাদশ্চ পুষ্পবর্ষৈঃ সহাভবৎ ॥
সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সাধু সাধ্বিতি হর্ষিতাঃ ॥—ঐ, ১৬৮, ৭-৮

ভীষ্মের মূর্ধা হইতে মহোল্কার মত জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল—

মহোল্কেব চ ভীষ্মস্য মূর্দ্ধাদেশাজ্জনাধিপ।
নিঃসৃত্যাকাশমাবিশ্য ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥—ঐ, ১৬৮, ৮-৯

চিন্ময় চক্ষু, কর্ণ ও প্রাণ থাকিলে আমরাও মহাত্মাজীর প্রয়াণকালে এইসব লীলাই দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম। দেখিতাম, যেমন-যেমন তাঁহার প্রাণ দেহমুক্ত হইতেছিল তেমন-তেমন শ্রান্ত ক্লান্ত শত-শত-আঘাতজর্জর দেহ সকল দুঃখ-দাহ-ব্যথা হইতে মুক্ত হইতেছিল—"তৎ তদ্ বিশল্যং ভবতি।"

যাইবার পূর্বে সর্বান্তঃকরণে তিনি আপন পর সকল আঘাতকারীকেই নিশ্চয় ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। সেই ক্ষমার বাণী যদিও আমরা কানে শুনিতে পারি নাই, তবু সেই ক্ষমার বাণী ভবিষ্যৎ বহু যুগ ধরিয়া পৃথিবীর বহু দুঃখদাহকে শান্ত করিবে। সেদিন তখন মহাত্মাজী চলিয়াছিলেন প্রার্থনায়। সকল জগদ্বাসীর দুঃখদুর্গতি দূরের জন্য সেই প্রার্থনা। হত্যাকারী তাঁহাকে কি প্রার্থনা হইতে নিরস্ত করিতে পারিল? মহাত্মার প্রার্থনাকে বাধা দিতে পারে এমন সাধ্য আছে কাহার? এতদিন মহাত্মাজী এই

পৃথিবীতে বসিয়া ভগবানের চরণতলে তাঁহার প্রার্থনা প্রেরণ করিতেন, আজ হইতে স্বর্গলোকে বসিয়া ভগবানের পাদমূলে তিনি আপন প্রার্থনা নিবেদন করিবেন। সেই নিবেদন-বাণীও যেন সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া আজ শুনা যাইতেছে—"হে ভগবান, দূর হইতে আমায় ব্যাকুল বাণী এতদিন তোমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছি। আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন লইয়া আমি তোমারই চরণতলে সমাগত। আজ আমার অন্তিম নিবেদন শোনো। যাঁহারা আমাকে আঘাত করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষমা কর। তাঁহারা কি জানেন যে তাঁহাদের জন্যই আমার সব প্রার্থনা? আমার অন্তিম আশীর্বাদ তাঁহাদিগকে নির্মল করুক। তাঁহারা দ্বেষমুক্ত হউন, তাঁহাদের কল্যাণ হউক।"

আমাদের সকলের মনের মধ্যে যে অসত্য, যে নীচ স্বার্থ, যে দারুণ হিংসা তাহা এই আশীর্বাদে এই ক্ষমায় দূর হউক। স্বার্থ বাধাগ্রস্ত হইলেই মন দারুণ ক্রুদ্ধ হয়, অন্তরের সব হিংসা প্রবল হয়। তখনই অসংযত পশুতায় আমরা মারামারি করি, হানাহানি করি। সেই হানাহানির দারুন আঘাত যাঁহাকে নিপাতিত করিল, তাঁহার আশীর্বাদই আমাদের শেষ সম্বল হউক।

কিন্তু একমাত্র তাঁহার ক্ষমা ও আশীর্বাদ সম্বল করিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। এই মহাপাতকের জন্য আমাদেরও সুকঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পিতৃআজ্ঞাক্রমে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। মাতা তো মরিলেন, পরশুরামের হাতের পরশু আর খসিল না। যে পিতার আজ্ঞায় মাতৃহত্যা সেই পিতাও এই পরশু খসাইতে পারিলেন না। পাপের সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তি নরক নহে। পাপটাই যে হস্তলগ্ন কুঠারের মত লাগিয়াই থাকে, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ইহাই পাপের মর্মান্তিক শাস্তি।

গুরুজনের উপদেশে সেই হস্তলগ্ন কুঠার লইয়া পরশুরাম ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সারা দেশ পর্যটন করিলেন। সকলের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইল। তাঁহার বীর্য তাঁহার সাধনা সব যখন ধূলিসাৎ হইল, যখন তিনি মাটির মানুষ বনিলেন, তখনই হয়তো সেই কুঠার খসিয়াছিল। মহাত্মাজীর হত্যার অপরাধ শুধু একজনের নহে। সেই দারুণ কুঠারও কেবল একজনের হাতেই লাগিয়া রহিবে না। আমাদের সকলের সঙ্গেই সেই কুঠার অল্পবিস্তর লাগিয়া থাকিবে। কোন্ সাধনায় কোন্ তপস্যায় এই কুঠার খসিতে পারে? যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের সারা জীবন দিয়া সকলের কাছে সত্যভাবে মহাত্মাজীর মৈত্রী-অহিংসা-সত্য-সেবার সাধনা প্রচারিত করিতে পারি তবেই হয়তো এই কুঠার খসিবে। আর যদি মহাত্মাজীর নামের দোহাই দিয়া তাঁহার বুলি আওড়াইয়া নিজেদেরই হীন সংকীর্ণ সব স্বার্থ সাধন করিতে বসি, তবে এই কুঠার আরও দারুণ হইয়া প্রত্যেকের হাতে লাগিয়া থাকিবে। যদুবংশের মুষলের মত এই কুঠারই ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যেককে ধ্বংস করিবে। তাহার জন্য শত্রুর প্রয়োজন হইবে না, গোলাগুলির প্রয়োজন হইবে না, অ্যাটম বোমারও প্রয়োজন হইবে না। আমরাই আমাদিগকে নিঃশেষ করিতে পারিব। এমন পাতকের অপেক্ষা ভীষণতর মারণাস্ত্র আর কোথায় আছে?

এই প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আজ মহাত্মাজীর আশীর্বাদ বার বার প্রার্থনা করি। তিনি মরেন নাই। মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই। আমাদের কি সাধ্য তাঁহাদের মারিতে পারি। আমরা আমাদের পৈশাচিক স্বরূপটি মাত্র প্রকটিত করিয়া তাঁহাদিগকে মৃন্ময় কায়া হইতে মুক্ত করি, কিছুতেই তাঁহাদের চিন্ময় জীবনের অবসান হয় না। আজ মহাত্মাজীর জীবন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও মহনীয় হইয়াছে, সে জীবনের আর অবসান নাই।

চিরদিন ছোট-বড় সব প্রয়োজনেই বার বার তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করিয়াছি। আজও তাই তাঁহার কাছেই আমাদের প্রার্থনা উপস্থিত করিতে হইবে। অমৃতের যাঁহারা তপস্বী তাঁহাদের মৃত্যু নাই।

ন মৃত্যুনাবসানং তে অমৃতায় তপস্যন্তঃ ॥

ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁহার যোগ ঘটিয়াছে তাঁহার আবার জীবনের কি টানাটানি!

যত্রেদং ব্রহ্ম ক্রিয়তে পরিধির্জীবনায় কম্ ॥

হে মহাত্মন্, আজ আমাদের চিত্তমনের সকল অসংযম, বাক্যকর্মের সকল অসংযম তোমার আশীর্বাদে তুমি দূর করিয়া দাও। যে নীচতার মধ্যে আমরা বাস করি তাহাকে পাশবিকতা বলিলে পশুদের প্রতি অবিচার করা হয়; স্বধর্ম রক্ষার নামে ঘরে ঘরে রক্তের যে নদী বহিয়াছে, যেসব দুষ্কৃতি চলিয়াছে তাহাকে পাশবিকতা বলিলে পশুরাও লজ্জিত হয়। পৈশাচিকতাও ইহাকে বলা অন্যায়, কারণ তাহাতে পিশাচদের প্রতিও অবিচার করা হয়; এইসব কাণ্ড তাহাদেরও কল্পনার অতীত। এই সব কাণ্ড দেখিয়াও কি আমাদের ধর্মপ্রবর্তকগণ লজ্জায় অধোবদন নহেন? এমন করিয়াই যদি ধর্মের রক্ষা হয় তবে আজ ধর্ম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক।

হে ভগবন্, আজ আমরা তোমার দয়ারও অযোগ্য। এই নীচতা হইতে ঊর্ধ্বে না উঠিতে পারিলে কেমন করিয়া তোমার ক্ষমার নাগাল পাইব? ক্ষমা করিয়াছ, ভালোই করিয়াছ, কিন্তু আমাদিগকে তোমার ক্ষমার যোগ্য করিয়া লও। নহিলে আমাদের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকর্ম হইবে নিদারুণ পণ্ডশ্রম, তোমার অস্থিভস্ম ভাসানো হইবে শোকাবহ বিড়ম্বনা। হে মহাতপস্বী, আজ পৃথিবীতে তোমার আশীর্বাদ সর্বত্র অবতীর্ণ হউক, সর্বত্র শান্তি অবতীর্ণ হউক—

তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোহং
যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং
তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥

হালকবি-রচিত "গাহা-সত্তসঈ"

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন ভারতে শুধু যে সংস্কৃতেরই চর্চা হত, তা নয়। সংস্কৃত ছিল সর্বজনীন ভারতীয় ভাষা। তা ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা ছিল, দেশভেদে তারা ছিল ভিন্ন। যেমন, মহারাষ্ট্রী, আবন্তী, লাটীয়া, মাগধী, শৌরসেনী ইত্যাদি। বর্তমানে যেমন বাংলা হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা, ঐ সব প্রাকৃতও ছিল তখনকার দিনের প্রাদেশিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় যেমন গদ্যে পদ্যে নানা ছোটোবড়ো কাব্য রচিত হয়েছে, সেইরকম বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাতেও অনেক কাব্য রচিত হত। এমন কি, 'পৈশাচী' প্রাকৃত, যা নাকি শাস্ত্রকারদের মতে 'ভূতভাষা' ব'লে পরিচিত, তাতেও 'বৃহৎকথা' নামে এক প্রকাণ্ড কথাকাব্য রচিত হয়েছিল, যার থেকে সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' প্রভৃতি সংস্কৃত আখ্যানের উৎপত্তি। সে কাব্যের রচয়িতা ছিলেন গুণাঢ্য।[১] কবির নামই কেবল বেঁচে আছে, কাব্য গেছে কালের গর্ভে তলিয়ে।

প্রাকৃত ভাষায় যাঁরা বৈয়াকরণ, তাঁরা 'মহারাষ্ট্রী'কেই শ্রেষ্ঠ প্রাকৃত ব'লে স্বীকার করেছেন। এর প্রকৃতি হচ্ছে সংস্কৃত। প্রবরসেনের 'সেতুবন্ধ' বা 'দসমুহবহো' কাব্য এই মহারাষ্ট্রীতেই রচিত। প্রাচীন আলংকারিক আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ও 'সেতুবন্ধ' কাব্যের খুব প্রশংসা করেছেন—

> "মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
> সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্ ॥"

'সেতুবন্ধ' কাব্যের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল হালের 'গাহাসত্তসঈ' (সং. গাথাসপ্তশতী)। পণ্ডিতদের মতে 'গাহা-সত্তসঈ'ই নাকি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত কাব্যের সব থেকে প্রাচীন নিদর্শন।

২

কোষকাব্য

'গাহা-সত্তসঈ' একখানি কোষকাব্য। ইংরেজীতে কোষকাব্যকে বলা হয় anthology। যদিও হাল-সাতবাহনের নামে ঐ কাব্যখানি প্রচলিত, তথাপি সবগুলি গাথাই হালের নিজের রচনা নয়। তখনকার দিনে প্রাকৃত ভাষায় রচিত যেসব গাথা প্রচলিত ছিল, হাল তাদের মধ্যে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট সূক্তিগুলি সংগ্রহ করে এই কোষকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু চয়নের এমনই নিপুণতা যে চয়নকর্তার নামেই ঐ কাব্যের প্রসিদ্ধি। অনেকটা পার্সির *Reliques* কিংবা পল্‌গ্রেভের *Golden Treasury*'র মত। তা ছাড়া হাল ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। পরে তাঁর পরিচয় সবিশেষ বলা হবে।

১। দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি, 'গুণাঢ্যের বৃহৎকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৩।

'গাহা-সত্তসঈ' নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সাতশোটি গাথা এতে সংগৃহীত হয়েছে। কোনও কোনও আদর্শ পুস্তকে অধিকাংশ গাথার শেষেই কবির নামের উল্লেখ আছে। যেমন, হাল, বোড্ডিস, চুল্লোহ, মঅরন্দসেন (সং. মকরন্দসেন), ভীমস্সামী (সং. ভীমস্বামী), কুমারিল, সিরিরাঅ (সং. শ্রীরাজ), অমররাঅ (সং. অমররাজ) ইত্যাদি। এই সাতশোটি গাথার কোনটির সঙ্গেই কোনটির সম্পর্ক নেই, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি গাথাই নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর, নিজের মহিমায় সমৃদ্ধ। যেন এক-একটি রত্নখণ্ড। এদের কোনটি হীরক, কোনটি মরকত, কোনটি পদ্মরাগ, কোনটি বা যেন বৈদূর্য।[২]

প্রাচীন আলংকারিকরা কাব্যকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করছেন—(১) মুক্তক, (২) সংঘাত, (৩) মহাকাব্য। 'মুক্তক' বলতে এঁরা এক-একটি স্বতন্ত্র অন্য-নিরপেক্ষ সূক্তিকে বোঝাতে চান। 'সংঘাত' এরকম কতকগুলি সূক্তিরই পরস্পরসাপেক্ষভাবে নাতিদীর্ঘ সংহতি। তৃতীয় 'মহাকাব্য' তো সকলেরই পরিচিত। 'মুক্তক' কাব্যেরই অপর এক সংজ্ঞা 'অনিবদ্ধ'। কাব্যের আর যে দুটি ভেদ 'সংঘাত' এবং 'মহাকাব্য,' এদের 'নিবদ্ধ' শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হয়। আলংকারিকদের দৃষ্টিতে 'মুক্তক' বা 'অনিবদ্ধ' কাব্যের আসন খুব উচ্চে নয়। তাঁদের মতে 'মুক্তক' কাব্যে যতই না কেন কবিত্ব থাকুক,— তা কখনও তার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে রসঘন হয়ে উঠতে পারে না। জোনাকির মতো তার দীপ্তি ক্ষণদৃষ্টনষ্ট। একক তেজঃপরমাণুর উজ্জ্বলতা থাকলেও তা যেমন সংহতির অভাবে ফুটে উঠতে পারে না, স্থায়ী শিখায় পরিণত হতে পারে না, সেইরকম এক-একটি মুক্তকও তার অন্তর্গূঢ় রসবীজকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তার অন্তর্নিহিত কবিত্ব সমুচিত পরিধির অভাবে অনতিব্যক্ত থেকেই যায়। তাই বামনাচার্য তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্র' গ্রন্থে 'অনিবদ্ধ' কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"নানিবদ্ধং চকাস্তি, একতেজঃপরমাণুবৎ" (কা° সূ° ১.৩.৯)। বামনাচার্যের মতে কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে অনিবদ্ধকাব্য রচনা নিবদ্ধকাব্য রচনার প্রথম সোপানস্বরূপ। 'মুক্তক' কাব্যরচনায় যাঁরা দক্ষতা লাভ করতে পেরেছেন, কেবল তাঁরাই খণ্ডকাব্য বা মহাকাব্য রচনা করতে পারেন, যেমন, যে মালাকার প্রথমে মালা গাঁথতে শিখেছে, সেই কেবল পারে উত্তংস বা শেখর রচনা করতে। সুতরাং কাব্যের এ দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্রমসিদ্ধি আছে—"ক্রমসিদ্ধিস্তয়োঃ স্রগুত্তংসবৎ" (কা° সূ° ১.৩.২৮)। যাযাবর কবি রাজশেখরও তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় 'মুক্তক' কবিকে খুব উচ্চস্থান দেন নি। তিনি বলেছেন, 'মুক্তক' রচনা করতে পারেন এমন অনন্ত কবি আছেন ; 'সংঘাত' লেখবার মত সামর্থ্য আছে যাঁদের এমন কবির সংখ্যাও শতাধিক হবে ; কিন্তু 'মহাপ্রবন্ধ'-রচয়িতা শুধু একজন, দুজন, যদি বা তিনজন।"—

"মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ সংঘাতে কবয়ঃ শতম্।
মহাপ্রবন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ যদিবা ত্রয়ঃ ॥"

কিন্তু নবম শতাব্দীতে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন 'মুক্তক' কাব্যকেও শ্রেষ্ঠ কাব্য বলতে কুণ্ঠিত হন নি। 'মুক্তক' কাব্য রচনায় কম মুনশীয়ানার দরকার হয় না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে রস ফুটিয়ে তুলতে হলে কবিকে হতে হবে মিতবাক্, নিষ্প্রয়োজন বস্তু ও আভরণসম্ভার থেকে কবিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে

২। 'অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥'– বাণভট্টঃ' হর্ষচরিত।

হবে, একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ আবদ্ধ করতে হবে। বিশৃঙ্খল-ভাষণ 'মুক্তক' কাব্যের পরিপন্থী। দু-একটি অত্যাবশ্যক রেখায় কবিকে তাঁর বিবক্ষা প্রকাশ করতে হবে সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর মতো। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন অমরুকবির রচিত মুক্তকের উল্লেখ করে বলেছেন যে তাদের প্রত্যেকটি যেন এক-একটি প্রবন্ধ, প্রত্যেকটিই শৃঙ্গাররসের উৎসস্বরূপ।[৩] অমরুক নিজেও বলেছেন, যে তাঁর এক-একটি শ্লোক শত প্রবন্ধের সমান।[৪] অতএব প্রকৃত 'মুক্তক' কাব্য যা, তা এক-একটি রসঘন সূক্তি। নীরস অলংকারবহুল অন্যনিরপেক্ষ শ্লোকমাত্রকেই 'মুক্তক' আখ্যার দ্বারা ভূষিত করা যায় না। এই 'মুক্তক' সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অপভ্রংশে, সব ভাষাতেই রচিত হতে পারে।[৫] অমরু কবির 'অমরুশতক' সংস্কৃত মুক্তক কাব্যের নিদর্শন। হালের 'গাহা-সত্তসঈ' প্রাকৃত মুক্তক কাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

যা হোক, এইরকম এক-একটি মুক্তকের সমষ্টিই হচ্ছে কোষকাব্য। 'গাহা-সত্তসঈ'তে সাতশোটি মুক্তকের সমাবেশ হয়েছে, তাই সাতবাহনের এই সংগ্রহটিও কোষ বলে খ্যাত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ কোষকাব্যের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন, যে স্বতন্ত্র অন্যনিরপেক্ষ শ্লোকগুলিকে যখন তাদের বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ করে 'ব্রজ্যা' (group) রূপে সাজান হয় তখন তার শোভা আরও বৃদ্ধি পায়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ 'মুক্তাবলী' নামে এক কোষ কাব্যের উল্লেখ করেছেন।[৬] প্রকৃত পক্ষে 'মুক্তাবলী' নামে কোনও স্বতন্ত্র কোষ ছিল না। জার্মানীর মহাপণ্ডিত বেবর সাহেব বিলাতের 'ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরী'তে সংরক্ষিত 'মুক্তাবলী' নামে 'গাহা-সত্তসঈ'র একখানা সংস্কৃত টীকার সন্ধান পেয়েছিলেন। টীকাকারের নাম সাধারণদেব।[৭] এতে 'গাহা-সত্তসঈ'র গাথাগুলিকে তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী 'ব্রজ্যা'ক্রমে সাজান হয়েছে। মোটের উপর তাতে ব্রজ্যাসংখ্যা হচ্ছে ৬০টি— যেমন, নমস্কারব্রজ্যা, শরদ্‌ব্রজ্যা, হেমন্তব্রজ্যা, চাটুব্রজ্যা, বিদগ্ধব্রজ্যা, বেশ্যাব্রজ্যা, কুলবধূব্রজ্যা, কৃষ্ণচরিত্রব্রজ্যা, দেবরব্রজ্যা, ইত্যাদি।[৮] সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে

৩। 'মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা হি অমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।'—পৃ ৩২৫. ধ্বন্যালোক ৩.৭ বৃত্তি (কাশী সংস্করণ)।

৪। 'অমরুককবে-রেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধশতায়তে'—অমরুশতক।

৫। 'যতঃ কাব্যস্য প্রভেদাঃ মুক্তকং সংস্কৃত-প্রাকৃতা-পভ্রংশনিবদ্ধম্'—ঐ, ৩.৭ বৃত্তি।

৬। 'কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ॥'
সজাতীয়ানামেকত্র সন্নিবেশো ব্রজ্যা। যথা মুক্তাবল্যাদিঃ।

৭। 'পশ্যত রাণক শ্রীসাধারণদেববিরচিতাং টীকাম্।
গাথাসপ্তশতীনাং রসিকাং মুক্তাবলীনাম্নীম্॥'—(10 L. 175).

৮। 'বজ্জালগ্গ' নামে আর একটি প্রাকৃত কোষকাব্য আছে। Julius Laber কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এখানি 'রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটী অফ্ বেঙ্গল' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর সংগ্রহকর্তা হচ্ছেন জয়বল্লভ— শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। এখানেও গাথাগুলিকে 'ব্রজ্যা' (প্রা. বজ্জা) রূপে সাজান হয়েছে—

"এখখে পথাবে জথ পড়িজ্জন্তি পউরগাহাও।
তং খলু বজ্জালগ্গং বজ্জত্তি য পদ্ধঈ ভণিআ॥"
— বজ্জালগ্গ, গাথা ৪.

বিশ্বনাথ সাধারণদেব-রচিত 'মুক্তাবলী' টীকাকে লক্ষ্য করেই তাঁর উদাহরণ দিয়েছিলেন। এখানি এখনও অমুদ্রিত।

গাহা-সত্তসঈর আরও তিনখানি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটী কুলনাথদেবের রচনা—সেটী অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টী গঙ্গাধর ভট্ট বিরচিত। এখানি মুদ্রিত হয়েছে। তৃতীয়টী পীতাম্বরদেবের। এখানি সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হলেও এর হস্তলিখিত সমস্ত পুঁথিই তেলেগু হরফে লিপিবদ্ধ। ঐ তিনখানি টীকার কোনটীতেই কিন্তু হালের গাথাগুলিকে তাদের বিষয়বস্তু অনুসারে 'ব্রজ্যা'ক্রমে সাজান হয় নি।

৩

সাতবাহন হালের পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

হাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠানপুরের (বর্তমানের 'পৈঠন') অধিপতি। অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশে তাঁর জন্ম। এই বংশের রাজত্বকাল ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত স্থায়ী। হাল খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করেছিলেন। এই হাল-সাতবাহনেরই অপর নাম শালিবাহন, যিনি শকাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন। সাতবাহন, শাল, শালিবাহন প্রভৃতি নামেও পুরাণ ও অভিধানে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাতবাহন সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। কথা-সরিৎসাগরের ষষ্ঠতরঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। 'বৃহৎকথা'-প্রণেতা গুণাঢ্য ও 'কাতন্ত্রব্যাকরণ'-কর্তা শর্ববর্মা তাঁরই সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, রাণী মলয়বতী ও নৃপতি হাল একদিন জলক্রীড়া করেছিলেন। সেই সময়, সংস্কৃতজ্ঞ রাণী মলয়বতীর 'মোদকৈঃ (মা+উদকৈঃ) তাড়য়' এই উক্তির যথার্থ মর্ম প্রাকৃতজ্ঞ মহারাজ সাতবাহনের বোধগম্য না হওয়াতে তাঁকে নিজের মহিষীর কাছে উপহাসাস্পদ হতে হয়েছিল। নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মহারাজ হাল গুণাঢ্যের শরণাপন্ন হলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র সংস্কৃত ভাষা শিখবার আগ্রহ নিয়ে। রাজসভায় শর্ববর্মা ছিলেন গুণাঢ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি বাজি রাখলেন যদি তাঁকে ভার দেওয়া হয় তবে তিনি মাত্র ছ মাসের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত করে তুলতে পারবেন। গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করলেন শর্ববর্মা যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন তবে তিনি আর জীবনে সংস্কৃত উচ্চারণ করবেন না, সংস্কৃতে কোনও রচনা করবেন না। শর্ববর্মা প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, সহজশিক্ষার জন্য 'কাতন্ত্রব্যাকরণ' রচনা করে রাজাকে সংস্কৃত শিখিয়ে। এদিকে গুণাঢ্য তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী রাজসভা ত্যাগ করে বিন্ধ্যাটবীতে ঘুরতে ঘুরতে কি করে পৈশাচী ভাষায় অদ্ভুতার্থা 'বৃহৎকথা' রচনা করে তাঁর থেকে আবৃত্তি করে বনের পশুপক্ষীকে পর্যন্ত মুগ্ধ করে রাখতেন— সে কাহিনী অতি বিস্ময়কর। যা হোক কথাসরিৎসাগরের বর্ণনা থেকে এইটুকু নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে মহারাজ সাতবাহন প্রাকৃতজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তিনি যে প্রাকৃত গাথার অনুরাগী হবেন এ তো অতি স্বাভাবিক। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কোন্ কোন্ রাজা তাঁর শুদ্ধান্তের মধ্যে কি কি ভাষার প্রচলন করতেন তার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন—'কুন্তলের সাতবাহন নরপতি তার অন্তঃপুরে কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষারই প্রবর্তন করেন।'

'স্ব-ভবনে হি ভাষানিয়মং যথা প্রভুর্বিদধাতি তথা ভবতি।······শ্রূয়তে চ কুন্তলেষু সাতবাহনো নাম রাজা ; তেন প্রাকৃতভাষাত্মকমন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্ব্বেণ।'[৯]

ভোজরাজও তাঁর 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে' বলেছেন :

"কেঽভূবন্ নাঢ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ।
কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ॥"[১০]

'আঢ্যরাজের রাজত্বে কোন্ ব্যক্তি না প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত ? আর সাহসাঙ্কের কালে কে না সংস্কৃতভাষী ছিল ?'

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে সাতবাহন নিজেই সমস্ত গাথার রচয়িতা নন। তবে সাতবাহন নিজে একজন কবি ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ। তাঁর নামে কতকগুলি গাথা পাওয়া যায় এই কোষের মধ্যেই। আর কবি ছাড়া কবির মর্যাদা করতে আর কে পারবে ? রাজশেখর বলেছেন যে 'রাজা স্বয়ং কবি হয়ে কিছুকাল অন্তর অন্তর কবিসমাজ আহ্বান করবেন। রাজা যদি নিজে কবি হন তবে সমস্ত লোকই কবিত্বশালী হয়ে ওঠে।'[১১] যেসব নরপতি কবিত্বের মর্যাদা করতে জানতেন, যাঁদের দানের প্রাচুর্যে কবিদের অভাব দূর হত, এমন সব খ্যাতনামা নরপতিদের মধ্যে তিনি সাতবাহনের নাম উল্লেখ করতে ভোলেন নি।[১২]

'গাহাসত্তসঈর' তৃতীয় গাথায় স্পষ্টই বলা হয়েছে— কবিবৎসল হাল প্রায় এক কোটী গাথার মধ্য থেকে সাতশোটী সালংকার গাথা নির্বাচন করে এই সংগ্রহ প্রণয়ন করেছেন—

"সত্তসআইং কইবচ্ছলেন কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেণ বিরইআইং সালংকারাণং গাহাণম্॥"

অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং হাল এ কোষের সংগ্রহকারও ছিলেন না। কিংবদন্তী আছে শ্রীপালিত[১৩] নামে এক কবি হালের অনুগৃহীত ছিলেন। তিনি প্রচলিত উৎকৃষ্ট গাথাগুলি সংগ্রহ করে রাজকবির সম্মানার্থে তাঁরই নামে উৎসর্গ করেন। 'রামচরিত'-রচয়িতা গৌড়-অভিনন্দ, যিনি 'হারবর্ষ' নৃপতির সভাকবি ছিলেন, একটী শ্লোকে বলেছেন :

"হালেনোত্তমপূজয়া কবিবৃষঃ শ্রীপালিতো লালিতঃ
খ্যাতিং কামপি কালিদাসকবয়ো নীতাঃ শকারাতিনা।

৯। কাব্যমীমাংসা—১০ম অধ্যায়, পৃ ৫০।

১০। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ২.১৫। টীকাকার রত্নেশ্বর মিশ্র স্পষ্টই বলেছেন, এখানে শালিবাহন (সাতবাহন)ই 'আঢ্যরাজ'।

১১। 'রাজা কবিঃ কবিসমাজং বিদধীত। রাজনি কবৌ সর্ব্বো লোকঃ কবিঃ স্যাৎ। স কাব্যপরীক্ষায়ৈ সভাং কারয়েৎ।'—কাব্যমীমাংসা, পৃ ৫৪।

১২। 'বাসুদেব-সাতবাহন-শূদ্রক-সাহসাঙ্কাদীন্ সকলান্ সভাপতীন্ দানমানাভ্যামনুকুর্যাৎ।'—কাব্যমীমাংসা, পৃ ৫৫

১৩। অনেকগুলি গাথা পালিতের নামে ['পালিতস্স'] প্রচলিত আছে।
দ্রষ্টব্য : গা° স° ৫.১৭, ১.৬৩, ৩.৪৮, ৩.৫৬, ৪.৯৩, ৩.১৭, ৪.৯৪ ২.৭৬, ৪.৭

শ্রীহর্ষো বিততার গন্থকবয়ে বাণায় বাণীফলম্
সদ্যঃ সৎক্রিয়য়াভিনন্দমপি চ শ্রীহারবর্ষোঽগ্রহীৎ ॥"[১৪]

সুতরাং শ্রীপালিতই যে গাথাকোষের সংগ্রহকর্তা ছিলেন, এ অনুমান নিতান্ত অসমীচীন মনে হয় না। তা ছাড়া সাতবাহন-হালের প্রশস্তিসূচক অনেকগুলি গাথাসপ্তশতীর মধ্যেই পাওয়া যায়।[১৫] হাল যদি নিজেই সংগ্রহকর্তা হতেন তবে নিজের প্রশস্তির জন্যে লালায়িত হতেন না নিশ্চয়।

৪

প্রাকৃতকাব্যের মাধুর্য

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণতঃ কথ্যভাষার প্রতি বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষা ছিল বিদগ্ধসমাজের ভাষা। তাঁরা প্রাকৃতের দিকে বিদ্বেষের চোখে দৃষ্টিপাত করতেন, অশিক্ষিত প্রাকৃতজনের ভাষা বলে। কিন্তু প্রকৃত যাঁরা কাব্যরসজ্ঞ, যাঁরা কেবল বাহ্য আড়ম্বর ও শব্দসাধুত্বের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্তরের ভাবসম্পদের দিকেই নজর দিতেন, তাঁরা প্রাকৃত কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। শব্দোচ্চারণের দিক দিয়েই যদি শুধু বিচার করা হয়, তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে একটা মোটামুটি ভেদ সকলের দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে— সংস্কৃত পরুষ, প্রাকৃত কোমল। সংস্কৃতে উচ্চে নীচে রেফ, মহাপ্রাণঘটিত সংযোগ প্রভৃতির বাহুল্যে উচ্চারণ অনেক সময় শ্রুতিকঠোর হয়ে দাঁড়ায়। "মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে চিবাইল যেন দাঁতে।"[১৬] কিন্তু প্রাকৃতে এই উচ্চারণের কঠোরতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাজশেখর তাঁর 'কর্পূরমঞ্জরী'র প্রস্তাবনায় বলেছেন যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে ব্যবধান ততখানি, যতখানি পুরুষ ও মহিলার মধ্যে—

"পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুষমহিলাণং জেত্তিয়মিহন্তরং তেত্তিয়মিমাণম্ ॥"

এই কারণেই বোধ হয় মহিলাজনের মুখেই প্রাকৃতভাষার প্রয়োগ কবিরা করে আসছেন। তা ছাড়া শৃঙ্গাররসের পুষ্টি প্রাকৃতবন্ধের মধ্যে যেমনভাবে হয়, তেমনভাবে যে সংস্কৃতবন্ধের মধ্য দিয়ে হয় না, এও প্রাচীন আলংকারিকরা মেনে নিয়েছিলেন— তার কারণও হচ্ছে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ-সৌকুমার্য ও বিদগ্ধনারীবদনের থেকে এর উৎপত্তি। 'গাহা-সত্তসঈ'তেই একটী গাথায় সংস্কৃত কাব্য-পাঠকগণের প্রতি কটাক্ষ করে কবি বলছেন—

"অমিঅ পাউঅকব্বং পঢ়িউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্স তত্ত-তন্তিং কুণন্তি তে কহ ণ লজ্জন্তি ॥"

১৪। অভিনন্দ আরও বলেছেন যে হারবর্ষও সাতবাহন হালের মতোই একখানি গাথাকোষ সংগ্রহ করেছিলেন—
"নমঃ শ্রীহারবর্ষায় যেন হালাদনন্তরম্।
স্বকোষঃ কবিকোষাণামাবির্ভাবায় কল্পিতঃ ॥"—রামচরিত, ৬. ৯৩।

১৫। যেমন—৪.৬৪, ৫.৬৭, ৫.৭১, ৬.৮৫।

১৬। রবীন্দ্রনাথ: 'কবির পুরস্কার'।

"অমৃতময় প্রাকৃতকাব্য পড়তে ও শুনতে যাঁরা জানেন না অথচ কামশাস্ত্রের চর্চা করতে চান, তাঁদের লজ্জা হয় না ?"

এরই প্রতিধ্বনি করে 'বজ্জালগ্‌গ' কোষের একটী গাথায় বলা হয়েছে :

'ললিত, মধুরাক্ষর, যুবতিজনবল্লভ, শৃঙ্গারপরিবাহী প্রাকৃতকাব্য থাকতে সংস্কৃতকাব্যপাঠে কার প্রবৃত্তি হয় ?'[১৭]

শৃঙ্গারপ্রধান কাব্যের মধ্যে হালের 'গাহা-সত্তসঈ'র স্থান সর্বাগ্রে। এর প্রত্যেকটী গাথাই রসোচ্ছল, প্রত্যেকটীই 'হৃদয়বতী' প্রাকৃতকবি-গোষ্ঠীতে যাকে বলা হয়, "হি অ অ ল লি আ" (হৃদয় ললিতা)।[১৮] 'অমরুশতকে'র সংস্কৃত শ্লোকগুলিও বহুস্থলে হালের গাথাসমূহের ভাবসম্পদ্ অবলম্বন করেই যে রচিত হয়েছিল, তা সামান্য তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের "পঞ্চরত্নের" অন্যতম গোবর্ধন-কবির সংস্কৃত 'আর্যাসপ্তশতী'ও যে হালের গাথাকোষেরই সংস্কৃত সংস্করণমাত্র, একথা গোবর্ধন স্বয়ং স্বীকার করেছেন, যদিও ভঙ্গীর দ্বারা নিজের কৃতিত্ব ও সংস্কৃতের প্রাধান্য স্থাপন করতে তিনি ভোলেন নি :

"মসৃণপদরীতিগীতাঃ সজ্জনহৃদয়াভিসারিকাঃ সুরসাঃ।
মদনাদ্বয়োপনিষদো বিশদা গোবর্দ্ধনস্যার্য্যাঃ॥"
"বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম্॥"

"গোবর্ধনের আর্যাসমূহ বিশদ—এদের পদ, রীতি ও সংগীত মসৃণ ; এরা সুরসা, সজ্জনহৃদয়ের অভিসারিকা ; (বেদের উপনিষদ্‌ভাগ যেমন ব্রহ্মাদ্বৈতের প্রতিপাদক) এরাও সেই রকম মদনাদ্বৈতের উপনিষৎ স্বরূপ।"

"প্রাকৃতভাষায় সমুচিতরস যে বাণী, এখানে তা বলপূর্বক সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন নিম্নতীরা মর্ত্যবাহিনী কলিন্দকন্যা বলরাম কর্তৃক গগনতলে নীত হয়েছিল।"

শেষের আর্যাটীতে গোবর্ধন ইঙ্গিতে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, হালের প্রাকৃত গাথা ও তাঁর নিজের সংস্কৃত গাথাসমূহের মধ্যে পার্থক্য, মলিনপ্রবাহা কালিন্দীর সঙ্গে গগনতলচারিণী ধবল-প্রবাহা পূততোয়া ভাগীরথীর যতখানি পার্থক্য ঠিক ততখানি।[১৯] এটা ব্যঙ্গ্যার্থ। অথচ বাচ্যার্থ আলোচনা করলে মনে হবে হালের প্রাকৃত কাব্যই ছিল স্বাভাবিক রসসমৃদ্ধ, সংস্কৃতে বলপূর্বক তাকে রূপান্তরিত করে তার স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। গোবর্ধন ইঙ্গিতে যেকথা জানিয়েছেন, তা যতই সত্য হোক না কেন, স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' যতই চাতুর্যপূর্ণ ও

১৭। ললিঅ মহুরক্খরঅ জুবঈজনবল্লহে সসিংগারে।
সন্তে পাইঅকব্বে কো সক্কই সক্কঅং পঢ়িউম্॥

১৮। দ্রষ্টব্য : ধ্বন্যালোক ও লোচন, পৃঃ ৪৯৯ (তৃতীয় উদ্দ্যোত)।

১৯। "এবং চ সংস্কৃত-প্রাকৃতয়োর্ভূতলগগনতলতুল্যতা-প্রতিপাদনেন প্রাকৃতাৎ সংস্কৃতেত্যন্তাধিক্যমাবেদ্যতে।"
—আর্যশপ্তশতী টীকা : অনন্তপণ্ডিত।

কবিত্বময় কোষকাব্য হোক না কেন, একথা প্রত্যেক সহৃদয়ই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, 'গাহা-সত্তসঈ'র কবিত্ব সহজাত, 'আর্যাসপ্তশতী'তে তা কৃত্রিম।

৫

ধ্বনিকাব্য

কবি তাঁর বিবক্ষিত অর্থ প্রধানতঃ ত্বরকম পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারেন— এক স্পষ্টভাবে, শব্দের অভিধাশক্তির সাহায্যে ; আর-এক প্রচ্ছন্নভাবে, ইঙ্গিতে, দ্যোতনায়, শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে। প্রথম উপায়ে যদি অর্থ প্রকাশ করা হয় তবে তা হয়ে দাঁড়ায় 'বাচ্য', আর যদি দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করে কবি তাঁর ঈপ্সিত অর্থ প্রকাশ করেন, তবে তাকে বলা হয় 'ব্যঙ্গ্য'। নবম শতাব্দীর কাশ্মীরক আলংকারিক আনন্দবর্ধনাচার্য বহু যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্ব স্থাপনা করেন, বাচ্যার্থ থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। শব্দের 'অভিধান-নির্দিষ্ট' অর্থের জ্ঞান থাকলেই বাচ্যার্থবোধ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু শব্দার্থশাসনজ্ঞানই কেবলমাত্র ব্যঙ্গ্যার্থবোধের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্যে আবশ্যক সহৃদয়তা, বিদগ্ধ সামাজিক হৃদয়— প্রস্তাব, দেশ, কাল, পাত্র, বক্তা, বোদ্ধা, কাকু বা ধ্বনিবিকার (ইংরেজীতে যাকে বলে intonation)-এ-সমস্তের যথাযথ বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি করবার মতো প্রতিভা বা intuition। বাচ্যার্থ বোধ করবার মতো শক্তি যে কোনও প্রাকৃতজনেরই আছে, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করবার মতো সামর্থ্য থাকে অতি পরিমিত কয়েক ব্যক্তিরই। আর কবি তাঁর কাব্যের যা সারভূত অর্থ, তা কখনও বাচ্যভাবে প্রকাশ করেন না, সর্বদাই সেটা থেকে যায় ব্যঙ্গ্যের আকারে। অতএব প্রাকৃতজনের কাছে তা অজ্ঞাতরহস্যই থেকে যায়। তা শুধু উদ্‌ঘাটিত হয় প্রকৃত মার্মিক কাব্যজ্ঞজনের দৃষ্টিতে। কবি কেন যে তাঁর বিবক্ষিত অর্থকে এরকম গূঢ় ও রহস্যাবৃত করে রাখেন, স্বশব্দের দ্বারা প্রকাশ করেন না, তা বোঝাতে গিয়ে ধ্বনিকার বলেছেন যে, "কাব্যের সারভূত যে অর্থ, তা যদি স্বশব্দের দ্বারা অভিহিত না হয়ে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বোধিত হয়, তবে তার শোভা নিরতিশয় বর্ধিত হয়ে ওঠে। আর একথা তো বিদগ্ধ ও বিদ্বজ্জনের পরিষদে প্রসিদ্ধই যে, যা অভিমততর বস্তু, তাকে সর্বথা ব্যঙ্গ্যরূপেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে, বাচ্যরূপে নয়।"[২০] বিশেষতঃ 'কামিকথা'র স্থলে অর্থের এই গূঢ়তাই অধিকতর ন্যায্য ও শোভাবহ, একথা প্রত্যেক বিদগ্ধজনেরই স্বীকার্য। আর এইভাবে গূঢ়ভাবে দ্যোতনার সাহায্যে যেখানে কবি তাঁর বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করে থাকেন, তাকে বলা হয় 'ধ্বনিকাব্য'। আনন্দবর্ধনাচার্যের মতে তাই উত্তম কাব্যের নিদর্শন।

এতখানি প্রস্তাবনা করবার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বোঝান যে, হালকবি-রচিত 'গাহা-সত্তসঈ' একখানি উৎকৃষ্ট ধ্বনিকাব্য। আনন্দবর্ধন নিজেই এবং তাঁর পরবর্তী ধ্বনিপ্রস্থানের বহু খ্যাতনামা কাব্যমীমাংসক হালের গাথাকোষ থেকেই ধ্বনিকাব্যের বাছা বাছা উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের মূলে ছিল অনেকাংশে

২০। 'সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধবিদ্বৎ-পরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাৎ শব্দবাচ্যত্বেন।'—ধ্বন্যালোক, ৪র্থ উদ্যোত (পৃ ৫৩৩)।

'গাহা-সত্তসঈ' এবং এই জাতীয় স্থক্তিরত্নাবলী, যাদের ধ্বনিসম্পদ্ অতুলনীয়। আনন্দবর্ধন এই রহস্যটুকুই আবিষ্কার করেছিলেন মাত্র, এইটুকুই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব, এবং একথাও তিনি নিজেও বহুবার স্বীকার করেছেন। 'গাহা-সত্তসঈ'র প্রত্যেক গাথার একাধিক ব্যঙ্গ্যার্থ, বাচ্যার্থ যেন তার অবগুণ্ঠনস্বরূপ। সে অবগুণ্ঠন অপসারিত করলেই ব্যঙ্গ্যার্থ— যা কাব্যের সারভূত অর্থ, নব নব ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত গাথার উদ্ভব অনেকস্থলে বিদগ্ধ-নারীমুখে। আমাদের 'গাহা-সত্তসঈ'র অধিকাংশ গাথাই রমণীমুখ থেকে বিনিঃসৃত— কোথাও দূতী, কোথাও বয়স্যা, কোথাও প্রতিবেশিনী, কোথাও মাতুলানী, কোথাও বা শ্বশ্রূ, কোথাও বা আবার সপত্নী এসব গাথার বক্ত্রী। এদের বাচ্যার্থ যেখানে 'হ্যাঁ', ব্যঙ্গ্যার্থ সেখানে 'না' ; বাচ্যার্থ যেখানে বিধি, ব্যঙ্গ্যার্থ সেখানে নিষেধ, কিংবা তার বিপরীত। বোধ হয় এ আকরের গুণেই হয়েছে, কেননা স্ত্রীস্বভাবের মধ্যেই এর বীজ নিহিত রয়েছে। বিদগ্ধ নারীর অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায় ও তার বাহ্যপ্রকাশের মধ্যেই বোধ হয় একটা স্বতঃসিদ্ধ বিরোধ ও দ্বৈধভাব অন্তর্নিহিত আছে, যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে সুলভ নয়। সেইজন্যে স্ত্রীমুখের থেকে যেসব ধ্বনিকাব্যের উদ্ভব তার মধ্যে এতটা স্বাভাবিকতা ও অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়ে থাকে। 'গাহা-সত্তসঈ'র সূক্তিসমূহের উৎকর্ষ ও ধ্বনিসম্পদ্ বোধ হয় বহু পরিমাণে এই কারণ থেকেই উদ্ভূত। এই প্রসঙ্গে 'নৈষধ-চরিত'-রচয়িতা মহাকবি শ্রীহর্ষের একটি শ্লোক স্মরণীয়—

"নিষেধবেষো বিধিরেষ তেঽথবা
তবৈব যুক্তা খলু বাচি বক্রতা।
বিজৃম্ভিতং যস্য কিল ধ্বনেরিদং
বিদগ্ধনারীবদনং তদাকরঃ॥"

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের দূতরূপে রাজা নল যখন দময়ন্তীর সামনে উপস্থিত হয়ে দময়ন্তীকে তাঁদের একজনকে বরণ করবার জন্যে অনুরোধ জানালেন, তখন দময়ন্তী কিছুতেই রাজী হলেন না। দেবতাদের তিনি পতিরূপে বরণ করবেন না, এই তাঁর সংকল্প। তখন নল রহস্য করে বলছেন—

"তুমি কি শুধু নিষেধের ছলে তোমার সম্মতিই প্রকাশ করছ ? তোমার মুখেই এরকম বক্রতা সমীচীন। কেননা, যে ধ্বনিকাব্যের এ উল্লাস, তার উৎস শুধু বিদগ্ধরমণীরই বদন।"

৬

উদাহরণ

'গাহা-সত্তসঈ' থেকে দু-একটি উদাহরণ তুলে আমাদের এ আলোচনার উপসংহার করব। এক-একটি গাথার যে কত অভিনব ব্যঙ্গ্যার্থ উদ্ভাবন করা যেতে পারে, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। আমরা শুধু ইঙ্গিতে যৎসামান্য সূচনা করবার চেষ্টা করব, সম্পূর্ণ চিত্রটি অঙ্কিত করে নেবার ভার রইল বিদগ্ধ সহৃদয় পাঠকের উপর।

"ভম ধম্মিঅ ! বীসখো সো সুণও অজ্জ মারিও দেণ।
গোলাণঈকচ্ছকুডঙ্গবাসিণা দরিঅসীহেণ॥" (গা° স° ২. ৭৫)।

"ওহে ধার্মিক! তুমি বিস্রব্ধভাবে এখন এ প্রদেশে ভ্রমণ করতে পার। কেননা যে কুকুরটির ভয়ে তুমি ভীত ছিলে, সেটি আজই গোদাবরীর কচ্ছকুডঙ্গনিবাসী একটি দৃপ্ত সিংহ কর্তৃক নিহত হয়েছে।"

কোনও এক ধার্ম্মিক তাপস তাঁর নিত্য অর্চনার জন্য পুষ্পপল্লব আহরণ করবার উদ্দেশ্যে গোদাবরী-তীরের একটি লতামণ্ডপে প্রত্যহ যেতেন। সেটি ছিল কোনও প্রণয়িযুগলের সংকেতস্থান (rendezvous)। প্রত্যহ ধার্মিক-সমাগম ও পুষ্পপল্লব-চয়নের ফলে লতামণ্ডপটী ক্রমশঃ বিচ্ছায় হয়ে উঠল, তার নীরবতা ও নির্জনতা হল ভঙ্গ। এ উপদ্রব নিবারণ করবাব জন্যে বিদগ্ধা প্রণয়িণীটি একদিন ধার্মিক তাপসটিকে সম্বোধন ক'রে এ গাথাটি বলেছিলেন। এখানে ধার্মিককে নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু ভ্রমণ নিষেধই প্রকৃত উদ্দেশ্য। কেননা, যে ব্যক্তি কুকুরের ভয়ে ভীত হয়ে পুষ্পাহরণে আসতে পারত না, সে দৃপ্ত সিংহের নবাবির্ভাবের সংবাদে কি করে অগ্রসর হতে সাহসী হবে?

"রন্ধণকম্মনিউণিএ মা ঝূরস্থ রত্তপাডলসুঅন্ধম্।
মুহমারুঅং পিঅন্তো ধূমাই সিহী ন পজ্জলই॥" (গা° ১. ১৪)।

"রন্ধনকর্মনিপুণিকে! ক্রুদ্ধ হ'ও না। রক্তপাটলসুরভি তোমার মুখমারুত পান করে বহ্নি কেবল ধূমায়িতই হচ্ছে, জ্বলে উঠছে না।"

এ উক্তি রন্ধনব্যাপৃতা কোনও এক নায়িকাকে উদ্দেশ করে প্রতীক্ষমাণ নায়কের। ব্যঙ্গ্যার্থ যে কত রকম হতে পারে তার ইয়ত্তা করবে কে?

"অনুহূত্তো করফংসো সঅলঅলাপুন্ন পুন্নদিঅহম্মি।
বীআসঙ্গকিসঙ্গঅ এহ্নিং তুহ বন্দিমো চলণে॥" (গা° ৭.৫৭)

"হে সকলকলাপূর্ণ! পূর্ণ দিবসে তোমার করস্পর্শ অনুভূত হয়েছিল। আর এখন তুমি দ্বিতীয়াসঙ্গবশতঃ কৃশাঙ্গ হয়েছ। তোমার চরণ বন্দনা করি।"

এ উক্তিটি কোনও খণ্ডিতা নায়িকার। 'সকলকলাপূর্ণ', 'পূর্ণদিবস', 'করস্পর্শ', 'দ্বিতীয়াসঙ্গ', 'চরণবন্দনা'—প্রত্যেক পদটিরই কতদূর পর্যন্ত ধ্বননশীলতা!

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। যাঁরা প্রকৃতই হৃদয়বান্ তাঁদের কাছে 'গাহা-সত্তসঈ'র প্রত্যেকটি গাথার কবিকর্মকৌশল অপূর্ব ঠেকবে। এর ধ্বনিসম্ভারের নিঃসীমতা ও চিরনবীনতা তাঁদের চিত্ত চমৎকৃত করবে, কখনও পুনরুক্ত বলে প্রতিভাত হবে না। সহৃদয়মূর্ধন্য-ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তাঁর প্রাকৃতকাব্য 'বিষমবাণলীলা'র একটি গাথায় সত্যই বলেছেন:

"ণ অ তাণ ঘডই ওহী ণ অ তে দীসন্তি কহ বি পুণরুত্তা।
জে বিব্ভমা পিআণং অত্থা বা সুকইবাণীণম্॥"

"সুকবিবাণীর অর্থ ও প্রিয়ার বিভ্রম— এ দুটিই নিরবধি, দুটিই অপুনরুক্ত।"

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

যে কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় প্রতিভার আভাসমাত্র রাখিয়া অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি সতীশচন্দ্র রায় অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের সরস্বতী যদি আজ বর দিতে উদ্যত হন যে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যে-কোনো একজনকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সাহিত্যলীলাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে সতীশচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কামনা করি। প্রবাসী পত্রিকায় তিন বন্ধুর একখানি ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম। এই তিন বন্ধু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি সতীশচন্দ্র রায়। ভাগ্য এই তিন প্রতিভাবান্ যুবককে বন্ধুত্বসূত্রে একত্র করিয়াছিল, আবার তিনজনকেই অকালে হরণ করিয়া লইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরে গেলেন, অজিতকুমার বত্রিশ বৎসরে, আর সতীশচন্দ্রের বয়স বাইশ বৎসরও পূর্ণ হইতে পায় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। কিম্বা বিস্মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয়, তাহাতে মনে হইতে পারে একসময়ে তিনি বিশ্রুত ছিলেন। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে আভাসিত হইয়াই তিনি অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি পড়িবার আগেই তাঁহার নিমজ্জন ঘটিয়াছে। সতীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শুক্লদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা। দু-চারজন সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি ওই ক্ষীণ চন্দ্রকলায় পূর্ণিমার আভাস দেখিয়াছিল। এই দু-চারজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান।

সতীশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে অজিতকুমার 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহ স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র রায় বরিশালে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। জমিদারির ভগ্নদশায় সতীশ সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হন। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ইনি বরাবর অধ্যয়ন করিয়া সেখান হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।··· পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।"

সতীশচন্দ্রের জীবনকালে তাঁহার কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'গুরুদক্ষিণা' নামে একটি ক্ষুদ্র কথা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। আরও কিছুকাল পরে,

১৩১৯ সালে তাঁহার বন্ধু অজিতকুমারের প্রযত্নে ও সম্পাদনায়, তাঁহার কয়েকটি পদ্য ও গদ্য রচনা 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাবলীর নিবেদনে সম্পাদক সতীশচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহার অল্পবয়সের বহু রচনা ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনোটাই তেমন আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতায় থাকিতে এবং বোলপুরে আসিবার পর হইতে তিনি যে-সকল রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহারাই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কয়েকদিনের মাত্র একটি ডায়ারি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারি মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনখানি এবং অন্তরের প্রতিকৃতিটি বড় স্বচ্ছ এবং সুন্দর ভাবে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়ারির মধ্যে ব্যক্তিগত কথা থাকিলেও তাহা সেই কারণে যথাযথ ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইল।"

সতীশচন্দ্রের রচনার পরিমাণ সামান্য— পৌরাণিক উতঙ্কের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গুরুদক্ষিণা নামে একটি কথা, আর রচনাবলীতে সংগৃহীত গদ্য-পদ্য রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭৩, প্রথমোক্ত খানির মাত্র ৫২। গুরুদক্ষিণা এখনও কিনিতে পাওয়া যায়— কিন্তু রচনাবলী সম্পূর্ণ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ শান্তিনিকেতনের পুরাকালের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক-অধ্যাপকের রচনাবলী পুনঃপ্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন— ইহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটি মহদুপকার বিশ্বভারতী করিবেন ; আর প্রসঙ্গতঃ শান্তিনিকেতনের এই নিষ্কাম কর্মীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

২

সতীশচন্দ্র জীবনে খ্যাতিলাভ করিয়া যান নাই, খ্যাতি অর্জন করিবার মতো জীবনের দীর্ঘতা পান নাই, অশরীরী কবিকল্পনাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই— এ সমস্তই নিদারুণ সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি মহৎ সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল— তিনি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— এমন স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা আর কোনো তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের নিকটে পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে "বন্ধুস্মৃতি" অধ্যায়ে সতীশচন্দ্রের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটিই 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকারূপে সংযোজিত। কবিগুরুর শেষ বয়সের 'বনবাণী' গ্রন্থের "শাল" শীর্ষক কবিতায় যে-তরুণ বন্ধুর উল্লেখ আছে তিনি এই সতীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যপ্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহার মুখে সতীশচন্দ্রের অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে 'বনবাণী' প্রকাশের সময় বড় অল্প নহে— রবীন্দ্রনাথের মনে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি এই দীর্ঘকালের উপরে বিতানিত হইয়া আছে। অকালে পরিসমাপ্তজীবন এই তরুণ কবির স্মৃতি কবি-বনস্পতির শাখায় শাখায় এক অলৌকিক আলোকলতার মতো জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তরুণ কবি ও মহাকবির এই ভাবসান্নিধ্য ভবিষ্যতের কবিদের অনুসন্ধিৎসু কল্পনার জন্য এক লোভনীয় উপজীব্য হইয়া রহিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, এমন কর্মী বিরল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম, তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীত স্বরে কহিল আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ? তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।"

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে সংকল্পের শক্তি অনেকটা চলিয়া যায়, কিন্তু সতীশচন্দ্রের কল্পনার সহিত সংকল্পের দৃঢ়তা যুক্ত হইয়াছিল, যে-কল্পনা আপাত-ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনাকে দেখিতে সমর্থ হয়, যে-সংকল্প প্রাত্যহিক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে, সতীশচন্দ্রে তাহার দুইটিই প্রচুর ছিল। সেই জন্য কেবল যে তিনি তৎকালীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন তাহাই নয়, বিদ্যালয়ের মহৎ ভবিষ্যৎকেও অন্তরে লালিত করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের তৎকালীন জীবনচর্যা সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিতেছেন, "এই আশ্রমের একপ্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।"

পূর্বে যে 'বনবাণী'র "শাল"-শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সেই শালতরুশ্রেণীর নিম্নশায়ী কঙ্করখচিত পথের এই স্মৃতিটিই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের আলোচনা করিতে বসিয়া এত বিস্তৃত আকারে তাঁহার আশ্রমবাসের কথা বলিতেছি এই কারণে যে, তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি বুঝিবার পক্ষে আশ্রমবাসের স্মৃতিটি অপরিহার্য। শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তর ও উদারতর আকাশ, এখানকার চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও রবির কিরণ তাঁহার প্রতিভাকে ধীরে ধীরে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্বন্ধ নিবিড়। এই সম্বন্ধটুকু বুঝাইবার জন্যই এত চেষ্টা। সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' কাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মতো রচনা করে নাই— এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো করিয়া ইহাকে

ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।" কেবল 'গুরুদক্ষিণা' মাত্র নয়, এই উক্তি তাঁহার সমস্ত গদ্য পদ্য রচনা সম্বন্ধেই সত্য। প্রতিভাস্ফূর্তির প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে না আসিলে তাঁহার রচনা কি আকার পাইত জানি না—কিন্তু যথাসময়ে আসিয়া পড়াতে বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের রচনার পাঠকদের পরম সৌভাগ্য এই যে, তাঁহার ডায়ারির কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার রচনার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিয়া এই কয়েকটি পত্রখণ্ড বিদ্যমান। ইহার সাহায্যে তাঁহার প্রতিভা হইতে রচনায়, রচনা হইতে প্রতিভায় অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়, এবং সেই কারণে সমালোচকের কাজও অনেকটা সরল হইয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির প্রারম্ভে দেখিতেছি তিনি লিখিতেছেন—"আপনাকে পাইতে হইবে। আপনাকে না পাইলে জীবন মিথ্যা। আমি কুলক্রমাগত সংস্কারের সমাজের দাস হইয়া মূর্খের মত কেন ফিরিব? আমি পরের উপদিষ্ট এক অগম্য অননুভূত কাল্পনিক ঈশ্বরকে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া আত্মার ধার কেন কুণ্ঠিত করিব? আমি আপনাকে জানি।" ইহা লিখিবার সময়ে সতীশচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর। এ বয়সে এ জাতীয় উক্তি আমাদের দেশে বিরল নয়— কলেজের ছাত্রদের অনেকের ডায়ারিতেই এই শ্রেণীর উক্তি লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু বাস্তবের ঘা খাইতেই তাহাদের মাথা হইতে আপনাকে পাওয়ার ভূত নামিয়া গিয়া চাকুরি পাওয়ার ব্রহ্মদৈত্য চাপিয়া বসে। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বেলায় গোড়া হইতেই ব্রহ্মদৈত্য নামিয়া গিয়াছিল— কাজেই তাঁহার ক্ষেত্রে এই উক্তিকে গতানুগতিক ভাবে না দেখাই উচিত। কিন্তু আর-এক আশঙ্কা ছিল— সে হইতেছে morbidityর আশঙ্কা। অল্পবয়সের অত্যধিক অন্তর্মুখিতা মানুষকে অনেক সময়ে বাস্তববোধবিবর্জিত করিয়া morbid করিয়া তোলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অবিরল।

রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের মনের এই গতি যেন টের পাইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের ডায়ারিতে দেখিতেছি— "গুরুদেব বলিয়াছেন আত্মালোচনা করিতে গিয়া morbid হয়ে পোড়ো না। morbid কেন হইব? আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? আমার সহজ আনন্দকে কেন দমাইতে যাইব? কেন morbid হইব? জীবনের রস কি আমি কিছুমাত্র পাই নাই? হায়! প্রতিদিন আমি কি-একটি সৌন্দর্যের কাছে আসিতেছি! ... গুরুদেবের স্নেহই তো আমার জীবনের উপরে সূর্যরশ্মির মতো পড়িয়াছে। তাঁহার সেই অপরাজিতা ফুলের মতো কোমলতাপূর্ণ চক্ষু দুটি আমার হৃদয়ের ভিতরের সহস্রদল পদ্মের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। আমার প্রাণে মনে ভাবে কল্পনায় সংসারে সর্বত্র তাঁহার স্নেহকিরণ পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র বলিতেছেন, তাঁহার morbid হইয়া না পড়িবার কারণ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ। আর একটি কারণও তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন— প্রকৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক, সহজাত প্রীতির আকর্ষণ। এই দুটি কারণকে যথাযথ না বুঝিলে তাঁহার জীবন ও কাব্য বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনের উক্তিই জানিতে পারিলাম। এবার দ্বিতীয় কারণটির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে।

৩

ছেলেবেলাতে বালকদের মনে প্রকৃতি একপ্রকার অন্ধ আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারের সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রনাথ বা ওআর্ডস্‌ওআর্থ হয় না বলিয়া এই আকর্ষণের ব্যাপকতা সকলে জানিতে পায় না। কিন্তু একথা একপ্রকার সত্য যে, ওআর্ডস্‌ওআর্থ বা রবীন্দ্রনাথ যে-আকর্ষণ দুর্নিবার ভাবে অনুভব করেন, অন্য ছেলেমেয়েরাও তাহা নিস্তেজভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আকর্ষণ ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহাদের হৃদয় সংসারের অভিজ্ঞতায় ও আঘাতে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান অধিকবয়সেও বাল্যকালের প্রাকৃতিক প্রীতি হইতে বঞ্চিত হয় না। সতীশচন্দ্রের বাল্যকালের প্রকৃতির অনুরাগ প্রাপ্তবয়সেও ছিল। আর শুধু তাই নয়, এই প্রীতির আলোকেই তিনি বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ লাভ করিতেছিলেন, আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এই আলোর শিখাতেই জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেন। অন্তর্জগতের স্বভাব এই যে, একই আলো এখানে বিভিন্ন ব্যক্তির চোখে বিভিন্ন দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও ওআর্ডস্‌ওআর্থ দুই জনেই একই আলোতে জগৎ দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এক জগৎ-রূপ দেখেন নাই। সতীশচন্দ্রও সেই দীপ হাতেই জীবনতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে জগৎ-রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু সামান্য যে-কয়েকটি রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়, জগৎ-দর্শনের পথেই তিনি চলিয়াছিলেন — সে আভাস তাঁহার কবিতায় আছে। তাঁহার বাল্যের প্রকৃতির আকর্ষণ, যৌবনের প্রকৃতির প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁহাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও ভীতিরসে আপ্লুত করিয়াছিল— প্রকৃতির বৈচিত্র্য যে একটি অখণ্ড সত্যেরই প্রকাশ এ সত্যও তিনি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন— কিন্তু সে বোধ কল্পনাগত হইয়া তাঁহার হাতে যে কাব্যবস্তু হইয়া ওঠে নাই তাহার একমাত্র কারণ, তিনি বয়সের সে ব্যাপ্তি পান নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার অলিখিত কাব্যের আভাস, তাঁহার জীবন তাঁহার অসমাপ্ত জীবনের আভাস। কাজেই তাঁহার জীবন ও কাব্যের আলোচনাও পরিপূর্ণ আলোচনার আভাসমাত্র হইতে বাধ্য।

সতীশচন্দ্র বাল্যকালের প্রসঙ্গে ডায়ারিতে লিখিতেছেন— "ছেলেবেলায় 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত! বর্ষা বিদ্যুতের গর্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল।··· আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই দীঘি, সেই বটগাছ আমার কাছে দেবতার মতো বোধ হয়। স্মরণমাত্রেই হৃদয়ে এমনি একটি অপূর্ব আনন্দ এবং ঔদার্যের সঞ্চার হয় যে তাহা বলিতে পারি না।"

যে দুটি তন্তুর টানাপোড়েনে এই বালক-কবির জীবন বয়ন হইতেছিল তন্মধ্যে একটি প্রকৃতির প্রীতি, অপরটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হইবার পূর্বেই রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে "গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়।··· গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতরে নামিয়া মধু-ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।"

তার পরে সতীশচন্দ্র প্রথম-যৌবনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া পড়িলেন। সেখানকার প্রকৃতিও তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পাইয়া বসিল।

শান্তিনিকেতনের আকাশপ্রসারিত মাঠের উপরে গ্রীষ্মকালের দুপুরে হঠাৎ যে ঝড় দেখা দেয়, ঝড়ের উত্তরপর্বে যে বৃষ্টি নামে, সতীশচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিতেছেন—"কাল আমরা খসখসের পর্দাঢাকা রথীন্দ্রের কক্ষে শুইয়া, বসিয়া, লুটিয়া, গরমে হেলাহেলি করিয়া দুপুর যাপন করিতেছিলাম।··· হঠাৎ মাঠের উপরে ছায়া পড়িতে লাগিল। পশ্চিম-উত্তর কোনা হইতে আকাশের উপরে বড় বড় মেঘ জলে ভারি হইয়া কালো হইয়া টলমল করিয়া আসিতে লাগিল। অল্প একটু একটু হাওয়া। হঠাৎ বাহির হইয়া দেখি দূরে হাওয়া উঠিয়াছে। আমরা মাঠে নামিয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলাম। আঃ এই বিরাট মাঠের মধ্যে ধূলিরাশির হুহু করিয়া দৌড়াইয়া যাওয়ার দৃশ্যটি কি চমৎকার। ভেরীরবে আহূত যুদ্ধযাত্রী হাজার হাজার অশ্বারোহীর মত হোঃ হোঃ করিয়া ধূলিপটল ছুটিয়াছে। ক্রমে মেঘে ধুলায় মিলিয়া একটা ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। একটু দূরেই আর কিছু দেখিতে পাই না। যেদিক হইতে পবনদেব আক্রমণ করিতেছিলেন সেদিকে মুখ ফিরাইবে কাহার সাধ্য। অস্ত্রলেখা পৃষ্ঠেই লইতে হইল। তাও দাঁড়াইয়া থাকা মুস্কিল, এত ছিটাগুলি আসিয়া পিঠের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন কাজেই হাওয়ার সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। ভারি আনন্দের আশায় সকলকে ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। এমন হাওয়ার মধ্যে পড়িলে গম্ভীর লোকদেরো পাগল হইতে হয়।··· যা হোক সেই রুদ্র ঝঞ্ঝার সঙ্গে মিলাইয়া যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে বার বার ওংকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম। ভারি চমৎকার লাগিল।··· ক্রমে ঝড় পড়িয়া আসিল— বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃষ্টিও থামিয়া আসিতে লাগিল। আমি মাঠের বিচিত্র গেরুয়া রঙের জলপ্রবাহের মধ্য দিয়া ফিরিতে লাগিলাম। ভীষণ বেগে গেরুয়া জলে সাদা ফেনা তুলিয়া স্রোত নামিয়া যাইতেছে।··· তখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া সব চুপ, আকাশ মেঘলা কোমল, মাঠ সিক্তচ্ছবি কিন্তু শুষ্কপ্রায়।"

শান্তিনিকেতনের মাঠে ঝড়বৃষ্টির এই অকস্মাৎ তাণ্ডব স্বচক্ষে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহারাই এই বর্ণনার সম্যক রস পাইবেন। এখন সে মাঠ মানবহস্তরোপিত গাছপালায় শ্যামল হইয়া গিয়া ঝড়ের উদার আসরকে অনেকটা সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই ঝড়ের পূর্বরূপ দেখিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতার আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। সতীশচন্দ্রের ডায়ারির পাতায় সে দিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ। তাঁহার রচিত গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের কোনো কোনো স্থলে সে বর্ণনা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছদের প্রারম্ভে যে প্রান্তর ও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের বর্ণনা, তাহা শান্তিনিকেতনের মধ্যাহ্নের অভিজ্ঞতারই রূপান্তর।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মূলে একটি অখণ্ড ঐক্য আছে এই উপলব্ধি ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিতেছিল। গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছদে রসাতলের বর্ণনাটি এই ঐক্যোপলব্ধির চিহ্ন। জগতের বৈচিত্র্যের মূল রসাতলে নিহিত।—"রসাতলই সেই অতল রসের ভাণ্ডার যেখান হইতে রস টানিয়া এই সৌরজগৎ একটি গাছের মত বিকশিত হইয়া আছে।··· এই জগতের উপরে আলোকে বিদ্যুতে বিকীর্ণ যে তেজ দেখিতেছ, সেও রসাতলের গোপন কক্ষে আপনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং পৃথিবীর উপরে যে বৎসরের অংশে অংশে ঋতুর বিচিত্র ছবি দেখিতেছ, ইহাও

সেইখানকার একটি মূল ছবিরই প্রতিবিম্ব, এবং পৃথিবীর নিত্যনূতন দিবা রাত্রিও সেখানকার একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলামাত্র। এই পৃথিবী, এই সূর্যমণ্ডল নানা ক্ষয় সত্ত্বেও যে প্রতিদিন সজীব রহিয়াছে ঋষি-কবিগণ সেই সজীবতার মধ্যে যে ঐশী শক্তি দেখিতে পাইতেন তাহাকেই বলিতেন দেবতা অশ্বিনীকুমার। জগতের স্বাস্থ্যের তরুণ দেবতা যুগল অশ্বিনীকুমারও সেই রসাতলে তাঁহাদের তেজোময় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।"

এই বর্ণনাটিও তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপান্তর। তাঁহার ডায়ারির এক স্থলে আছে— "এই বিরাট বোলপুরের মাঠ, রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয়, সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায়, এবং অন্ধকারে চান্দ্রমসী ভাষা তারকী ভাষা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে।"

এই অনুভূতি, এই কল্পনা কেবল সতীশচন্দ্রের বাল্যকালসুলভ কল্পনা নয়, জগতের বাল্যকালীন কল্পনা, বাল্যকালীন অনুভূতি, যে অনুভূতি ও কল্পনার ফলে প্রাচীন কালের পুরাণ ও উপকথার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। জগৎ হইতে এই রহস্যবোধ অন্তর্হিত হইয়াছে— এখন কেবল সৌভাগ্যবানেরাই মাঝে মাঝে ইহা অনুভব করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালে সমগ্র মানবসমাজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল। গুরুদক্ষিণার সপ্তম পরিচ্ছদের রসাতলের যে বর্ণনা দেখিতে পাই, যে কবিকল্পনার সাক্ষাৎ লাভ করি বাংলা সাহিত্যে তাহা বিরল। কিন্তু তার সঙ্গে যখন মনে পড়ে যে, লেখকের বয়স একুশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখন বিস্ময়ের ও পরিতাপের অন্ত থাকে না— 'কি হইতে পারিত'র বিস্ময় 'কি হারাইলাম'এর পরিতাপকে নিরন্তর আন্দোলিত করিতে থাকে। নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনার বিশিষ্টরূপটি সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র কি সচেতন ছিলেন? তাঁহার ডায়ারিতে দেখিতেছি—"কবিতা রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোনো দিন ধরিতে পারিব না? জানি না— কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া শান্ত সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা সৌন্দর্য এবং বিলাসের আক্রমে একটা বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্তিগুলি কবে বাহির হইবে? আমি essentially Indian— ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।"

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির স্থানে স্থানে যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ আছে তাহা কবিকিশোর কীট্‌সের পত্রাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সতীশচন্দ্র 'essentially Indian' যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রসাতলের বর্ণনাই তাহার প্রমাণ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক রসের জন্মগত অধিকার না লইয়া আসিলে কাহারো পক্ষে এমন রচনা সম্ভবপর হইত না। কীট্‌স-ও essentially গ্রীক ছিলেন, গ্রীকদের সৌন্দর্যদর্শনের তৃতীয় দৃষ্টি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে 'শান্তসুন্দর গদ্যধারা'র উল্লেখ সতীশচন্দ্র করিয়াছেন তাঁহার ডায়ারিতে, গুরুদক্ষিণায় এবং কোনো কোনো গদ্য রচনায় তাহা প্রবাহিত। এই সরস্বতীপ্রবাহ অকালে বালুকান্তরে অন্তর্ধান করিয়াছে বটে, কিন্তু কান পাতিয়া থাকিলে রচনার মধ্যে এখনো তাহার তরল বেণীবিন্যাসের অনির্বচনীয় স্বগত বিলাপ নিঃসন্দেহে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

৪

সতীশচন্দ্র 'আরো একটি কথা' (One Word More by Robert Browning) প্রবন্ধে বলিতেছেন—"যদি পুনর্জন্ম মানিতে হয় এবং বিশ্ব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ যদি বিশ্বাস করি, তবে শেলি ব্রাউনিংরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে পারি না কি?" তিনি বলিতেছেন, শেলির মৃত্যুর এবং ব্রাউনিঙের জন্মের তারিখ দুইটি বিস্মৃত হইতে পারিলে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। যেহেতু ব্রাউনিং ও শেলির কাব্যে গুণগত, মূলগত প্রভেদ— সে প্রভেদ জন্মান্তরেও ঘুচিবে এমন আশা নাই। তবে ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, কিশোরকবির চিত্তে ব্রাউনিং ও শেলি দুইজনেই প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ব্রাউনিঙের কাব্যপাঠে যে তাঁহার নেশা ছিল এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। ব্রাউনিং সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রাউনিঙের গোটা তিনেক কবিতার সুষ্ঠু অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, তাঁহার কাব্যে ব্রাউনিঙের প্রভাব নাই-- যাহা-কিছু প্রভাব দৃষ্ট হয় সে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্ত রচনায়। অর্থাৎ ব্রাউনিঙের প্রভাব তাঁহার সজ্ঞান মনে প্রতিক্রিয়া শুরু করিয়াছিল, কিন্তু যে নিগূঢ় সত্তা হইতে কাব্যসৃষ্টি হয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের অধিপতি শেলি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে সবচেয়ে প্রকট। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহার কাব্য নিগূঢ় দৃষ্টিতে পাঠ করিলে একটা প্রভাবান্তরের আভাস পাওয়া যায়। শেলির প্রভাব হইতে কীট্সের প্রভাবে তাঁহার কাব্যের সংক্রমণ হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার কাব্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলে দাঁড়ায় এইরকম যে, শেলির পূর্ণ প্রভাব তাঁহার কাব্যে বর্তমান, তাঁহার কাব্যের ভবিষ্যৎ কীট্সীয় মনোভাবের অভিমুখে, ব্রাউনিঙের যাহা-কিছু সে প্রভাব তাঁহার সজ্ঞান মনের উপরে মাত্র, কাব্যলোকে তিনি প্রবেশ করেন নাই।

শেলি ও কীট্স দুইটি বিশেষ মনোভাবের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক শেলির প্রতীক, আর কীট্সের নাইটিঙ্গেল কীট্সের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক 'অশরীরী আনন্দ'— পৃথিবীর সংস্পর্শমুক্ত হইয়া আলোকপ্লাবিত অনন্ত আকাশে উঠিয়া তবে যেন সে আত্মস্থ হয়। আর কীট্সের নাইটিঙ্গেল গূঢ়ান্ধকার বনচ্ছায়ায় বসিয়া কূজন করিতে ভালোবাসে। একটি পৃথিবী-বিবিক্ত আত্ম-চেতন, অপরটি পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট জগৎ-চেতন, একটি আত্মকেন্দ্রিক, অপরটি জগৎকেন্দ্রিক, একটি pure intellect অপরটি pure sensation; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, অপরটি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবজীবনের প্রতি আসক্তি, একজন নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিক, আর একজন সোনার তরীর মাঝি। ব্রাউনিং এ-দুইয়ের কোনোটিরই সগোত্র নহেন। শেলি যদি হন দেহবিমুক্ত intellectএর কবি, কীট্স যদি দেহকেন্দ্রিক sensationsএর কবি, ব্রাউনিং তবে মানুষের moral valuesএর কবি। তাঁহার চিত্রিত অধিকাংশ নরনারীর দ্বন্দ্ব আপনার অন্তরের শুভাশুভবুদ্ধির মধ্যে। Intellect বা sensation যতক্ষণ না moral valuesএর কোঠায় আসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ ব্রাউনিঙের

কাছে ও-দুটি বস্তু নিরর্থক। তাঁহার কাব্যজগতের সুমেরু কুমেরু 'Good' ও 'Evil' এবং ইহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলেই জগতে বৈচিত্র্য বিরাজমান— ব্রাউনিং সেই বৈচিত্র্যের কবি। শেলি যে পুনর্জন্মে ব্রাউনিং হইতেন তাহা বিশ্বাস করি কি প্রকারে? বরঞ্চ জন্মান্তরবাদ মানিতে হইলে বলিতে হয়, শেলি পূর্বজন্মে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি Evilএর মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কাছে Evil নাই, কারণ জগৎটার অস্তিত্বের উপরে Evilএর প্রতিষ্ঠা, সেই জগৎটাই যে মায়া। কেবল আছে—

"The one remains, the many change and pass ;
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly."

Hymn to Intellectual Beautyর কবি কোনো বহুপূর্বজন্মে সংস্কৃত কাব্য আনন্দলহরী লিখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু কোনো পরজন্মে ব্রাউনিঙের কাব্য লিখিবেন, এমন বিশ্বাস পোষণ করা কঠিন।[১]

কীট্‌সের কবি-মন এ দুই হইতেই ভিন্ন। তরুণ শেক্সপীয়রের মনের সঙ্গে কীট্‌সের মনের স্বারূপ্য আছে— এ সত্য ইংরাজ সমালোচক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কবিদের মধ্যে কালিদাসের কবি-মন মূলতঃ কীট্‌স-শেক্সপীয়রের কবি-মনের শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা তিনজনেই যে সমান ওজনের কবি এমন কথা বলিতেছি না, কেবল তিনটি মন একই পর্যায়ভুক্ত, ইহাই মাত্র বক্তব্য।

সতীশচন্দ্রের কবি-মন খুব সম্ভবত এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে পর্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইবার পূর্বেই, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিবার পূর্বেই তাঁহার কবিজীবন শেষ হইয়াছে। যে কবি-কৃতি তিনি রাখিয়া দিয়াছেন তাহাতে শেলির প্রভাব জাজ্বল্যমান। কিন্তু মাঝে মাঝে কখনো কখনো শেলির জ্যোতিরুদ্দীপ্ত মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে যে-জগতের দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা কীট্‌সের জগৎ। জীবনের অভিজ্ঞতার ভার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবি মেঘলোক হইতে যে জগতে নামিয়া আসিতেন তাহা কীট্‌সের সুখদুঃখবিরহমিলনবিচিত্র ঐকান্তিক মানব সংসারের জগৎ। এমন আভাস তাঁহার রচনায় আছে বটে কিন্তু তাহা যেমনভাবে অনুভবগম্য তেমনভাবে প্রমাণযোগ্য নহে। যদি কেহ বলেন যে আমি বিশ্বাস করিলাম না, তবে হার মানিতে হইবে, কারণ কাব্যবিচারে অনেক সময়েই 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ'র উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু অপর সত্যটা অনায়াসে বিশ্বাসগম্য করিয়া তোলা যাইতে পারে— সেটা শেলির প্রভাব।

সতীশচন্দ্রের "শেলির প্রতি" কবিতাটি শেলির Alastor ও Epipsychidion ভাঙিয়া এবং নিজের বৈশিষ্ট্য মিশাইয়া প্রস্তুত। কবিতাটিতে শেলি ও সতীশচন্দ্র দুজনেই আছেন। শেলির কাব্যের মর্ম আত্মসাৎ না করিলে সতীশচন্দ্র কখনো "রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এসব তো কেবল বস্তুগত প্রভাব, গৌণ। কিন্তু আর একটি মুখ্য প্রভাব আছে, কিম্বা তাহাকে স্বভাব বলাই উচিত। শেলি ও সতীশচন্দ্রের রচনার আবহাওয়াটির ভাব একই প্রকার— দুই-ই মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ভাস্বর।

শেলির কাব্যলোকের অম্বর ইটালীয় মধ্যাহ্নের কিরণপ্লাবে সর্বদাই যেন দেখা-না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে। একটা প্রখর 'ইন্‌টেলেক্ট'এর ধারায় সমস্ত জগৎ অভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে যেন

---

১ আনন্দলহরীর সহিত Hymn to Intellectual Beautyর তুলনা রবীন্দ্রনাথ-কৃত।

অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই দেখিয়াই শেলির নিগূঢ় কবিমানস যেন তাহার উপরে বিশুদ্ধ চৈতন্য সিঞ্চন করিয়া দিয়া তাহাকে খানিকটা লঘু, খানিকটা অবাস্তব করিয়া লইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর শোধন। শেলির জগৎ বুদ্ধিশোধিত জগৎ। এই শোধন তাঁহার সজ্ঞান মন করিত না। কবি-মন শেলির অগোচরে করিত। তাঁহার কাব্যের অবিরল মধ্যাহ্নের আবহাওয়া এই বিশুদ্ধ 'ইন্‌টেলেক্ট'এর প্রতীক।

"Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon's transparent might"

এই purple noonএর রৌদ্র কেবল পার্থিব নয়, তাহার সহিত কবির আত্মার কিরণ মিশিয়া তাহাকে একপ্রকার অপার্থিবতা দান করিয়াছে। এই অপার্থিবতা শেলির কাব্যের ধর্ম।

শেলির কাব্যের এই ধর্মটি সতীশচন্দ্রের কাব্যেও বিরাজমান।

সতীশচন্দ্রের কাব্য পড়িতে গেলে নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিও অনুভব করিবে, একটা মধ্যাহ্ন-কিরণ-প্লাবিত ভূখণ্ডে যেন সে বিচরণ করিতেছে। এই কিরণধারা কবির মন হইতে উৎসৃষ্ট হইয়া পাঠকের মনে আসিয়া প্রবেশ করে। এই কিরণ কবির আত্মার কিরণ, একপ্রকার অপার্থিব জ্যোতি— ইহা pure intellectএর বাহ্য প্রকাশ।

"রৌদ্রমুগ্ধ কবিব চিঠি", "শেলির প্রতি", এই দুটি কবিতাই মধ্যাহ্ন-রসে নিটোল।

একি এ ভুবনময় মহিমা রবির
কিরণ নীরব একি গগন গভীর। — "মধ্যাহ্নে"

এ স্বপন সারাদিন ধ'রে!
সোনার আলোকময় ঘরে··· —"স্বপ্ন, সম্মুখের"

দুপরের বেলা গালে হাত দিয়ে
জননী একাকী ভাবিছে বসিয়ে!
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ
কি রসের স্রোত··· —"পরীর জন্মকথা"

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর মাঝে পড়ি
ডুবিয়া আছে তরী! —"দিবাভাগে চাঁদ"

"দিবাভাগে চাঁদ" একটি আশ্চর্য রকমের সার্থক কবিতা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার মতো এই যে, চাঁদের মতো অন্ধকারসম্বন্ধ বস্তুকেও দুপুরের রোদে না দেখিয়া কবির তৃপ্তি নাই।

"আগ্রাপ্রান্তরে" আর একটি সার্থক সৃষ্টি। এ কবিতাটির আবহাওয়া দ্বৈপ্রহরিক।

গুরুদক্ষিণা গ্রন্থে ও তাঁহার ডায়ারির পাতা ক'খানিতে যে-কয়েকটি প্রাকৃতিক চিত্র আছে তন্মধ্যে দ্বিপ্রহরের বর্ণনাই বোধ করি সবচেয়ে অধিক এবং সেইগুলিই রচনারসে অনবদ্য।

এ কি কেবলই একটা কাকতালীয় ব্যাপার, না, গূঢ় কারণ কিছু আছে? শেলির কাব্যধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম এক্ষেত্রেও তাহাই বক্তব্য। শেলির কবিধর্ম ও সতীশচন্দ্রের কবিধর্ম মূলতঃ ভিন্ন হইলেও এই সময়টাতে তিনি দূরগগনের একটি গ্রহের মতো শেলির জ্যোতির্লোক অতিক্রম করিতেছিলেন, শেলির জ্যোতির্ময় বাষ্প সতীশচন্দ্রের নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাই তাঁহার কাব্য এমন মধ্যাহ্নকিরণদীপিত, তাই এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা তাহার। কিন্তু সংক্রমণ পরিক্রমণমাত্র, জীবিত থাকিলে শেলির কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইতেন এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সে স্বধর্ম কীট্সীয় ধর্ম। তাই এই জ্যোতির্ময় মেঘলোকের ফাটলপথে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা কীট্সের জগতের। দূরাপহত ক্ষীণ দৃশ্য— কিন্তু সেই দিকেই তাঁহার উদ্দিষ্ট গতি।

সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন
সরস কৈশোরসম। —"আজি"

বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্যের যেন এক দান
বিপুল বটের মতো। —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

ধরণী-গগনে লাগে মধুরস-জোয়ারের টান! —"নিশীথিনী"

দলমল স্বর্ণগাঁদা —"আত্মসমর্পণ"

সৌন্দর্যই শূরত্বের মৃত্যুগীত গায়। —"আগ্রাপ্রান্তরে"

এই কয়টি ছত্রে ভাষার যে প্রৌঢ়তা, যে নিটোল কঠিন মূর্তি, কল্পনার যে ঘনপিনদ্ধ বস্তুগত দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে কীট্সীয়, একান্তভাবে কালিদাসীয়, আর পূর্বেই বলিয়াছি যে কালিদাস ও কীট্সের মন এক পর্যায়ভুক্ত। আমার কেমন যেন বিশ্বাস, সতীশচন্দ্রের মনও সেই পর্যায়ভুক্ত; পূর্বোক্তদের কল্পনার সহিত তাহার কল্পনার মাত্রাগত যতই তারতম্য থাকুক-না কেন, গুণগত ভাবে তাহারা একজাতিক। এই স্বভাবের দিকে তাঁহার কল্পনা চলিতেছিল, এমন সময়ে অকালমৃত্যু আসিয়া ছেদ টানিয়া দিল।

৫

অভিধানে হাজার হাজার শব্দ আছে, ইঁটের পাঁজায় হাজার হাজার ইষ্টকখণ্ডের মতোই সে সমস্তই নির্জীব ও নিরর্থক। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকগণ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদন এমনতর বহু শব্দকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে বহুতর শব্দ প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। শব্দ-ব্যবহারের সহজাত ক্ষমতা লইয়াই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক আসিয়া থাকেন। এই ক্ষমতাতেই সাহিত্যিকের চরম বৈশিষ্ট্য। দময়ন্তী নল-বাহুল্যের মধ্যে আসল মানুষটিকে চিনিতে পারিয়াছিল, কারণ তাহার ছিল প্রেমের দৃষ্টি। সাহিত্যিকদেরও শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টি থাকে, না থাকিলে সে সাহিত্যিকই নয়। শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টির কীট্স বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের এই দৃষ্টি প্রভূত পরিমাণে ছিল।

শিক্ষিত বাঙালী কবির পক্ষে তৎসম শব্দ প্রয়োগ খুব কঠিন নয়, তার চেয়ে অনেক কঠিন দেশী ও তদ্‌ভব শব্দ প্রয়োগ ; এখানেই তাঁহার মুনশীয়ানা বা দুর্বলতা ধরা পড়ে। সতীশচন্দ্রের রচনা হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার এই শ্রেণীর শব্দ-ব্যবহারের কলাকৌশল বুঝিতে পারা যাইবে—

সমুদ্রে নৌকার বর্ণনা—

হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্যমাঝে,
জল উঠি' উচ্ছ্বাসিয়া চারি ধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি', কাৎ করি তরী —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

"ভগ্ন-বাড়ির দেবতা"য়—

চুপ চুপ চুপ, নীরবে নীরবে—
আয় তোরা সরে, যা তোরা সবে—
সোনার ফড়িং সোনা মক্ষিকা ;
উতর দখিন পূবের দালান
এখনও ঘুমে অন্ধ নয়ান
শুধু পশ্চিমে ধব্‌ধবে জ্যোতি
পট তুলি' দিয়া জাগে সম্প্রতি।

ভগ্ন বাড়ির দেবতা বলিতেছেন—

চুপ চুপ চুপ নাহি গোলমাল
বড় সুখে আছি, এ দীর্ঘকাল।
হাতী ধপধপি, ঘোড়া খটমটি'
দরোয়ান যত বকি' কট্‌মটি…
আর উঠে নাকো সকালবেলায়
আছি সুখে আমি আপন খেলায়।

আর একটি কবিতায়—

বিহঙ্গম মুহুঃ উড়ে সীস থামাইয়া।

আবার— শুধু কভু মেঘচ্ছেদে স্ফুট চন্দ্রকর—
মাঝে মাঝে দীপ্ দীপ্ জোনাকিপ্রকর —"স্বপ্ন, পশ্চাতের"

"দুঃখ-দেবতার মূর্তি" নামে কবিতায়—

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চুর চুর।

"জামদগ্ন্য" কবিতায়—

পত্ পত্ চীনাম্বরে রথাগ্রচূড়ায়—
হাজার কপোতী যেন উড়িয়া বেড়ায়!

"আত্মসমর্পণ" কবিতায় গাঁদার বর্ণনা—

দলমল স্বর্ণগাঁদা!

প্রতিভার লক্ষণ এই যে শব্দপ্রয়োগে যুগপৎ সাহস ও সংযম প্রকট হয়। অক্ষমে দুঃসাহস ও বাহবা জুড়াইবার দুর্বুদ্ধি আর যাই হোক প্রতিভার পরিচয় নয়। ইহা কাঁচাবয়সের লক্ষণ। সতীশচন্দ্র কাঁচাবয়সেই এইসব কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার সহজাত সাহস ও সংযম তাঁহাকে শিল্পীর পথে চালিত করিয়াছিল। তিনি নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু কোথায়, কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে সে-সব প্রয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার কোনো মোহ ছিল না।

সতীশচন্দ্রের কবিতার পরিচয়দান বাহুল্য, কারণ তাঁহার রচনার পরিমাণ বহুল নয়। গদ্য পদ্য সমস্তই প্রায় একাসনে পড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু পাঠকসমাজের কাছে তাঁহার রচনা অজ্ঞাত কেন? একটা কারণ এই যে, সতীশচন্দ্রের রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকসমাজ সত্যকার রসপিপাসু হইলে তাহা তো হইবার কথা নয়। আবার যখন শুনি যে বাংলা পাঠকমহলে কবিতার প্রচার বাড়িয়াছে, তখন বিস্মিত হই। রসতৃষ্ণা সত্যই তীব্র হইলে রসিক পাঠক তাঁহার কবিতা আবিষ্কার করিয়া লইত। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবিতা-পত্র সম্পাদিত হইতেছে, তবে সতীশচন্দ্রের কবিতার এই অজ্ঞাতবাস কেন? আসল কথা রাজনীতির মতো বাংলা সাহিত্যের ঘাড়েও দলবুদ্ধির ভূত ভর করিয়াছে। সতীশচন্দ্রের বিস্মৃতির প্রধান কারণ, তিনি কোনো দলভুক্ত হইয়া মারা যান নাই। তবে "Leaving great verses to a little clan" যদি সান্ত্বনার বিষয় হয়, তবে সতীশচন্দ্রের আত্মা কতকটা সান্ত্বনা পাইতে পারেন।

৬

সতীশচন্দ্রের গদ্য রচনা সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করিয়াছি। আর দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখিত 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' ও 'ক্ষণিকা'র আলোচনা অদ্যাবধি এই দুইখানি কাব্যের শ্রেষ্ঠ রসালোচনা হইয়া আছে। আর তাঁহার ডায়ারির একস্থানে তিনি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বে এই দুই মহাকবির মধ্যে আর কেহ তুলনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথের সহিত ভারতীয় কোনো কবির যদি সার্থক তুলনা চলে, তবে নিশ্চয়ই তাহা কালিদাসের। অল্পবয়সে সার্থক কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি একান্ত বিরল। কীট্‌সের চিঠিপত্রে এইরূপ অন্তর্দৃষ্টির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্রের রচনার বিস্তারিত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার রচনার প্রতি বাঙালি পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। বাল্যকালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম তখনও সেখানকার অনেকের মনে পরলোকগত কবির স্মৃতি নবীন ছিল। সেই স্মৃতিকণার অনেক বিষয় আমার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থ আমার বালক-চিত্তে যে মোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। এই প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে শান্তি-নিকেতনের সেই তরুণ অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সন্তোষজনক সুযোগ পাইলাম। পাঠকের কোনো লাভ হইল কিনা জানি না, কিন্তু ঐ সন্তোষটাই আমার লাভ।

পত্রাবলী

সতীশচন্দ্র রায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত[১]

১

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

[১৩০৯]

My dear Satyendra babu,

আপনার একখানা চিঠি আজ পাওয়া গেল। এ পর্য্যন্ত অনেক দিন এই চিঠি খানির আশা করিতে ছিলাম। আপনি বোধহয় দেখিয়াছেন এক-একটা ছোট জিনিষ কেমন মন হইতে সরিয়া যায়, কিছুতেই মনে আনা যায় না— আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা আমার পক্ষে সেই রকমের। ঐ জন্যেই চিঠি আপনাকে এতদিন লেখা হয় নাই।

আপনি যেমন আমাকে কথা বলিবার সাথী হারাইয়াছেন, আমিও তেমনি আপনাকে কথা বলিবার সাথী হারাইয়াছি। এখানে যখন রবিবাবু না থাকেন— আজকাল তাহা প্রায়ই ঘটিতেছে— তখন আমার কথা বলিবার একমাত্র সাথী 'বই' এবং চার দিকের দৃশ্য। অজিত এখানে আসিয়া কথনো কথনো থাকে বটে।

আপনার শরীরটি কেমন আছে? এখানে আমাদের শরীর ভালই থাকে।

আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্ত্তা আছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া চিঠিপত্র চালান ত আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। বিশেষ কথাটা হচ্চে এই—

আজকাল আমাদের সাহিত্যের Prospect অতি শোচনীয়। আমি সাহিত্য proper এর কথাই বলিতেছি। কারণ সাহিত্য আলোচনার জন্য যে পরিমাণ সাধুতা, চরিত্রবল, পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষের দরকার তা' অনেক সাহিত্যযশোলিপ্সু যুবা পুরুষেরই নাই। আপনার সেইটি আছে এইরূপ আমার মনে হইয়াছিল। সেই জন্যই আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্ত্তার দরকার। কারণ সাহিত্যকেই আমি ব্রত স্বরূপ লইয়াছি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে Prophetsদের পরেই সাহিত্য মানুষের জীবনের উন্নতির সহায়। Prophets কিছু রোজ আসে না— interimগুলি আমাদিগকে সাহিত্যের democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে। স্বদেশের ভাবগতি এবং Conditions দেখিয়া তাহার মধ্যে মানবের Highest ideals of beauty জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইতে হইবে। —এ ত গেল পরের কাজ— তার পরে আত্মোৎকর্ষের পক্ষে আমার ত মনে হয় সাহিত্য নিতান্ত দরকার।

---

১ সতীশচন্দ্রের পরলোকগমনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এই সংখ্যার অন্যত্র তাহা মুদ্রিত হইল।

সাহিত্যেই আমাদিগকে আমরা ideally create করি— যেমন progenyতে আমরা আর এক দিকে create করি। মানুষের এই ideal creationএর কি দরকার সেইটি আশ্চর্য্য—কেহ হয়ত বলিবেন সমাজের intercourse বাড়ান'। এক অর্থে তা ত ঠিক্— কিন্তু প্রত্যেক individual soulএর ideally আত্মরচনার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে— উহার হয়ত অন্য কোন আত্মসম্পর্কীয় significance আছে। আমার ত স্পষ্টই মনে হয়— আছে। প্রত্যেক কবি তাঁর creationএর মধ্যে তাঁর individual soulএর একটা বিকাশ দেখেন— একটা স্বস্থ, আর-সব-হ'তে তফাৎ সুদূর অবস্থান উপলব্ধি করেন— ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

কিন্তু যাক্ এসব বকুনি— এ আমার পাগলামি বলিয়া ক্ষমাও করিতে পারিবেন। আমার আশা এই যে একটি নিঃস্বার্থ, বিপুল উৎসাহ-প্রবাহ আসিয়া আমাদের সাহিত্যকে সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়া যাইবে— এবং তারি একটি রুদ্ধ waterhead আপনি। Culture এবং পরিশ্রমের দ্বারা আপনার ভিতর হইতে সেই রুদ্ধ স্রোত বাহির হইবে, এই আশায় আমি বসিয়া আছি। আমি এখন শুধু নিজেকে তৈয়ার করিতেছি এবং আজকালকার আমার লেখা অল্পাধিক experimental জানিবেন। এসব লেখার সমালোচন কিম্বা অনাদর আমার গায়ে এক কণাও বাজিবে না। আমি সেই larger flowর জন্য সঞ্চয় করিতেছি।

আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কিনা জানি না— তবু সাহস করিয়া একটি বিষয়ে অনুরোধ করিব। সে হচ্চে কলিকাতার young literati দলের বাক্যসভা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।

আপনি যদি for the first time কলিকাতা ছাড়িয়া একবার বোলপুর আসিয়া দুদিন থাকিয়া যাইতে পারেন ত বড় সুখী হই।

জল্‌দি উত্তর দিবেন।

Affly yours
Satis

২

বোলপুর
ব্রহ্মবিদ্যালয়
[আশ্বিন ? ১৩১০]

My dear সত্যেন্দ্রবাবু,

অনেকদিন পরে আপনার একখানি পত্র আজ পাইলাম। পত্রটি পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। কুমুদবাবুকে চিঠি লিখিয়াছি আপনাকে লিখি নাই কেন— এরূপ প্রশ্ন করিয়া আপনি কেন আমাকে লজ্জায় ফেলিতে চান? আপনার চিঠি পাই নাই বলিয়াই লিখিতে সাহস করি নাই।

ছেলেদের জন্য গল্প[২] একটি লিখিয়াছি বটে কিন্তু তা' আপনার কতদূর ভাল লাগিবে জানিনা।

---

২ গুরুদক্ষিণা ?

ছেলেদের জন্য আরো গল্প লেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ নাটক[৩] বাড়ীতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া, প্রথম অঙ্কের কতদূর লিখিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছি।

আমাদের অনেকদিন হইল Midsummer Night's Dreamএর অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। অভিনয় একরকম মন্দ হয় নাই। আমাদের সব ছাত্র এক্‌টর। আমরাও দুএকজন ছিলাম বটে।[৪]

আজকাল অনেকদিন নানা কারণে আমার কবিতা কিছু বাহির হয় নাই। 'বাহির' মানে লেখা, কাগজে প্রকাশ নয়। কেবল কতগুলি মনে মনে তা' দিয়া রাখিতেছি। বাংলার Philologyর প্রতি একটু মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিতেছি। সেই জন্য preparation করিতে হইতেছে।

য... বাবুর কবিতা আমার ভাল লাগে নাই। লেখার মধ্যে এমন একটু romance পাওয়া গেল না যাহা echo বা imitationকে কিছুমাত্র leaven করিতে পারে। যদিও সমালোচনা করি আমি হয়ত ওরূপ লিখিতে পারি না? আপনার লেখাটেখা কিছু জমিয়াছে কি? প্রকৃত ভাবে একবার সাহিত্যের আলোচনা করুন না। অবশ্য আমার এ একটা প্রাণের অনুরোধ মাত্র— এ কথাটাকে যেন কোনোমতে interference বলিয়া না লইবেন। আপনি কি হেমবাবুর[৫] একটি study করিবেন —অথবা criticism করিবেন? যদি সযত্নে এই কাজটি করেন ত ভাল হয়। আমি এরূপ একটি study অথবা criticismএর কথা আজকাল দিনরাত ভাবিতেছি।

আমার 'মুস্কিলআসান' মুস্কিলে পড়িয়াছে। তার বড় uncouth বা abrupt expression হইয়া গিয়াছে। বদলাইয়া কোন দিন ভাল ভদ্র Expression দিয়া তাকে বাহির করিবার ইচ্ছা আছে। আপনি কি আমার 'দুয়োরাণী'[৬] প্রভৃতি পড়িয়াছেন? বোধহয় ভাল লাগে নাই। রবীন্দ্রবাবুর নূতন উপন্যাসটি[৭] আপনার কি রকম লাগিতেছে?

আপনার চিঠি পাইবার জন্য আমি নিতান্ত উৎসুক। আশা করি— সর্ব্বদা পত্র লিখিবেন। আমি যে রকম ভাবে নিজেকে জীবনের উপর ভাসাইয়াছি এবং যে রকম দুর্ব্বল তাহাতে আপনাদের বন্ধুত্বের আশ্বাস আমার কাছে যে কত মূল্যবান তা' আপনি কখনই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আপনার সমস্ত খবর বিশেষ করিয়া লিখিলে সুখী হইব।

ইচ্ছা হয় আজ সমস্ত সকাল বেলাটা এই চিঠিটার উপরে কলম চালাইয়া যাই। চুপে চুপে মনের যথেচ্ছ কথাগুলি চিঠির উপর ঝরিয়া পড়িতে থাকে। আমি 'জানি' এ রকম করাতে বিশেষ লাভ আছে। লাভ আর কিছু নয়— এই মাত্র যে আমার নিভৃত মনের অভিলাষ যদি সহজে খুলিয়া বলিতে পারি তবে

---

৩ 'চণ্ডালী' কবিতায় বর্ণিত 'আনন্দ ভিক্ষুর' কাহিনী লইয়া?

৪ "সতীশবাবুর আয়োজনে একবার Midsummer Night's Dream এর যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ইহার রিহার্সাল হইত উত্তরায়ণের পশ্চিমের খোয়াইয়ের ভিতর। রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। আমারো একটি ভূমিকা ছিল।..."—জগদানন্দ রায়, "স্মৃতি", শান্তিনিকেতন পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।— এই প্রবন্ধে সতীশচন্দ্র রায় সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতিও লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৫ কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু, ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ

৬ ১৩১০ জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত।

৭ নৌকাডুবি। বঙ্গদর্শনে প্রকাশ আরম্ভ ১৩১০ বৈশাখ।

আমি যতই ছোট হই, আপনি যতই বড় হোন্, আমার চেষ্টা যতই মূর্খের মত, আপনার কাছে যতই উপহাসজনক হোক— এসব সত্ত্বেও অলক্ষ্যেও আপনি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আমার, আপনার উপরে যে সদিচ্ছা এবং প্রীতি আছে, তা আমার কাছে এত স্পষ্ট যে ইহাকে আমি নিষ্ফল মনে করিতে কখনই সক্ষম নই। আমার প্রতিমুহূর্ত্তে ইচ্ছা হয়, হৃদয়ের মাঝখান হইতে তুলিয়া চুপে চুপে, চোখের জলের সমুদ্রের নিভৃত তলে বসিয়া সূক্ষ্মতম প্রীতি-রত্নগুলি দিয়া হার গাঁথিয়া যাই। সে হার কাকে পরাইব জানি না, কিন্তু অনুভবে বুঝি একদিন এই প্রীতিহার কোন এক জীবনেশ্বরের গলায় পরাইয়া দিয়া অনন্তসুখের আস্বাদন করিব।

আজকাল এখানে পরিণ[ত] শরৎকালের আবির্ভাব। মনে হয় ইহা হইতে কতকটা সুখ আপনাকে পাঠাইতে পারি। "Quiet coves his soul has in autumn When the honied cud of youth he loves to ruminate"—আজকাল এখানে সেই রকম ভাবে [ভাব]। জলস্থলের উপরে আসন্ন শীতের স্পর্শ পড়িয়াছে— সবি ভারি স্থির, আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত হইতে যাইতেছে। একদিন একদিন দুপুরেও এমন একটু শীত অনুভব করি যে মনে হয় আপনাকে সংহৃত করিয়া লইয়া এখন ঘরের মধ্যে বসি অথচ ভরাশীতকালের মত interior কখনো frozen বোধ হয় না। আমাদের দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের মধ্যে এদিকউদিকে কোথাও কোথাও কয়েকখানা ধানের ক্ষেত আছে। আপনি বোধহয় ধানের ক্ষেত দেখেন নাই? তার মধ্যে বাস্তবিক honied cud সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। লঘু মেঘগুলির উপরে রঙের সমাবেশ বড়ই সুন্দর— একেবারে সটান লেপা রঙ্। বর্ষাকালের মত কালো কালো প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাকারের মধ্য দিয়া দুর্গেশনন্দিনীর lurid মশালের আলো এখন আর নাই। বিকালে দেখা গেল ছোট ছোট অসংখ্য মেঘ, (মাঠে চরিত অসংখ্য দূর হইতে লক্ষ্য ছোট ছোট গরুর মত) আকাশের ধারে পশ্চিম দিকে পড়িয়া আছে— সন্ধ্যাবেল[া] সমস্ত পশ্চিমটা ছাপাইয়া একটা রাঙা পালের মত ফুলিয়া উঠিল— এপাশে ওপাশে হয়ত একটা কালো strip পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যাকালে মনোযোগ দিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম। এই সময় নেশায় ধরার মত আমাকে আবিষ্ট করিয়াছিল। দেখিলাম Keats যা বলিয়াছে সত্যই তাই। এই সময়ে একটি মলিন শ্রান্ত শ্রী-তে আকাশ ভরিয়া যায়— সন্ধ্যার মত আঁধার-রাঙা কাপড় পরিয়া গ্রামের গৃহিণী ঘরের দুয়ারে বসিয়া থাকে— ঝিঁঝিঁ মশা প্রভৃতি একটি choir রচনা করিয়া বায়ুপ্রচাররহিতপ্রায় আকাশে একটি স্থির গুঞ্জন তুলিয়া দেয়। দেখুন, ইংরেজ কবি কীটসের দেশের সঙ্গে এবং আমাদের দেশের সঙ্গে একি মিল। কীটস্ আমাকে একটি সন্ধ্যার সুর শিখাইয়া দিয়াছে। এই সৌন্দর্য্যে মিলন, প্রীতিতে মিলন কত দূরব্যাপী! আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করুন।

Yours truly

সতীশ

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত

১

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
বীরভূম।
[বৈশাখ ? ১৩০৯]

এতক্ষণে হয়ত আমার একখানি পত্র পাইয়াছ। তাড়াতাড়ি আসিয়া পোষ্টকার্ডে লিখিয়াছিলাম এখন বিশেষ করিয়া সব লিখিতেছি— শুন। এখানে সবই ভাল তবু আমার মনটা আজকাল ভাল লাগেনা। এখানে কাহারো সঙ্গে ঠিক গভীর প্রাণের মিল হয় নাই তাই— একা একা থাকিতে হয় বোলপুরের মাঠে বেড়াইয়া বেড়াই। এখানকার দৃশ্য ত তুমি দেখিয়াছই আর বেশী কি লিখিব। এই বিরাট মাঠের সৌন্দর্য্য কেবল বৈচিত্র্যবিহীন বিরাটত্বে নয়— ইহার মাঝে মাঝে যে এক একটা খেয়াল আছে সেগুলিই আমার কাছে চমৎকার লাগে। খেয়ালগুলি হচ্চে গহ্বর— আঁকাবাঁকা পাথুরে ঢিপি উপরে নুড়ি ছড়ানো— মাঝ দিয়া শুষ্ক নদীর gravelখানি নানা ভঙ্গে ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে— সরু হইতে আরম্ভ— ক্রমে স্রোতটা প্রশস্ত হইতে ২ চলিয়া গিয়াছে— আমি একা একা এইগুলির মধ্যে নামিয়া অনেক সময়ে ঘুরি— বেশ লাগে।— মাথা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়— বাঁকে বাঁকে ফিরি আর ইংরেজ রমণীর চুলের বর্ণ gravel বিস্তৃত হইতে বিস্তৃত হইয়া দেখা দেয়।— বাস্তবিক এই ভ্রমণটা এবং তার সঙ্গে ২ সূর্য্যাস্তই যা হোক আমার হৃদয় কিছু অধিকার করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বোলপুরে যদি কিছু লাভ করিয়া থাকি ত ওইটুকু।— বাস্তবিক genialityর অভাবে (অবশ্য রবিবাবুর স্নেহ অজস্র— কিন্তু তিনি আজকাল উৎসব নিয়া ব্যস্ত থাকেন)— আজকাল আমার বুকের চারদিকে যেন সব চাপা পড়িয়া আছে— কোন একটা আনন্দ ঠিক উচ্ছ্বাস লাভ করে না। এই দেখনা,— আজ দুপহর বেলায় বসিয়া German ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে কেমন একটা কবিতা লিখিলাম!— ইহাতে যেন উচ্ছ্বাস কোথায় বাধা পাইয়াছে মনে হয়—

—বোলপুর,
আমি ভালবাসি তোর সুবিশাল মাঠ—
— পড়ে আছে খুলে তার হৃদয় কবাট
যে আসো, যে যাও কোন কিছু কথা নাই—
মাঝে মাঝে তাল তরু— সদল সিপাই—
বেহালাআকার ঢাল উঁচু করি আছে—
— (কিন্তু তাহলে জেনো নিশ্চয়ই কাছে
বাঁধ বা খাতের মত আছেও একটি—
হয় তো শুকায়ে গেছে ; —পিঙলিমা রটি'
চলিয়াছে মাঝ দিয়া স্রোতহীন তলা
দুধারে সে তীর ভূমি আছেও অচলা !)

আমি ভালবাসি এই রূঢ় তীরগুলি
অসংখ্য নুড়ি ছড়ানো ;— আমারে আগুলি'
সমস্ত মাঠ হ'তে এরা যে দাঁড়ায়
যখন বেড়াই ঘুরে বিকাল বেলায়
শুকান স্রোতের তলে— কি জানি এ কেন
বন্ধ্যা কঠোর ভূমি ভাল লাগে হেন ?
(হায় কতদিন ধরে স্নেহধারা জল
সেঁচে নাই আমার এ হৃদয়ের তল
তবে কি হৃদয়ও হায় ইহাদেরি মত ?
থাক্—) হের হেথা— সব সলিল বিগত,
— চলিয়াছে তলাখানি, দুধারে প্রাচীর
(কাহার গোলায় যেন ভগন বিদীর)—
চলিয়াছে তলা খানি— রাঙা ও পিঙল
যেন কোন য়ুরোপীয় নারীর কুন্তল
একগোছা জড়াইয়া রয়েছে লুঠিয়া !
এই হের এবে আমি তীরেতে উঠিয়া
নুড়িজাল পরে বসি' হেরিতেছি দূরে
তালদল দাঁড়াইয়া ঝজ্‌জর স্বরে
দগ্ধ মাটির মনোকথা করে গান—
দূরে বাঁধ, থল থল জল শোভমান !
পশ্চিমে দুর্ভর সিঁদুরের ভার !—
ফিরে যাই,— জাগিল না হৃদয় আমার !
— আমারো এ গান বুঝি রাজতালীগীত
কোন পোড়া··· ? যাই হোক— নহে অনুচিৎ।[১]

দেখিয়া লইও আমি কেমন আছি। জীবনটা ঐরূপই dull all along কেবল বিকালে একটু ভাল লাগে।— আর রবি বাবুর সঙ্গে আলাপ হয় তখনো ভাল লাগে কিন্তু আজকাল তাঁহাকে আমি ঠিক গ্রেপ্তার করিতে পারি না।

Affly Yours Satis

প্রিয়, এ নীরস পত্র !— আমাকে মার্জ্জনা করিও ! কি করিব ? যেমন প্রাণ— তেমন গান। ক্রমে ক্রমে সব জানাবো কিন্তু তুমিও ওখানকার কিছু কিছু খবর দিও।

---

১ এই কবিতাটি 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে মুদ্রিত হয় নাই।

২

[শান্তিনিকেতন
পৌষ ? ১৩০৯]

…একঘরে গিয়া কবি (রবীন্দ্রনাথ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে…দেখিতে পাইলাম। দুজনকেই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিলাম।— পরে রবিবাবু আমাকে তাঁহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন 'তাই বটে ? তোমার সমালোচনাটি[২] বড় ঠিক হয়েছে। বড় আশ্চর্য্য ! তুমি কেমন করে আমাকে ঠিক্ ঠাক্ ধর্‌লে ?…তুমি আমার মনের কথাগুলি কেমন করে জান্‌লে হে ?' ইত্যাদি। ক্রমে নানা কথাবার্ত্তায় পরিচয় হইতে লাগিল।

"এখন দ্বিজেনবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় দেখাইতেছি। প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের।

এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত করা খুব কঠিন নয় provided তোমার প্রাণ থাকে। তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে না— এমন কি একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি কি নির্ব্বিশেষেই ভোলানাথের admirer ? আমি ত নই। এক রকম ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র carelessness বা 'হযবরল'ত্ব হইতে জন্মিয়া থাকে—তাহাকে আমি admirable মনে করি না— এই-সব ভোলানাথদের বাহিরও যেমন শিথিল অন্তরও তেমনি শিথিল। হৃদয়ে কোন গভীর স্রোত নাই, এমন কি হৃদয় নিতান্ত মলিন। অবশ্য এদের মধ্যে helplessness-এর একটা সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ কি admirable ! ইহারা-সব ideaর ভোলানাথ। Art বল, Philosophy বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্রবাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে তা নয়। Geniusএর মত আছে, বা Originally আছে। তিনি Modern Literature হয়ত জানেন না (আমি খুব modernএর কথাই বলিতেছি) অথচ তাহার কোন ভাব ইহাঁর অনায়ত্ত নাই, ইনি originally সে সব জানেন। তা ত হইবেই, কবিতা পড়িয়াই বুঝিতে পার। বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি আধুনিক কালে আর কেউ আছে— তোমার মনে হয় ? আমার তো মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন 'তখন (যৌবনে) আমি কবিতা অনেক সময়ে লিখিতেই পারিতাম না, ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতলা কামরায় থাকিতাম, সামনে একটা বাগান, দূরে একটা পুকুর করে আমি মনে কর্ত্তুম এই উপবন এই সরোবর ইত্যাদি। Natureএর sceneryতে বিভোর হয়ে থাকৃতুম। চাঁদকে যে আমি কি ভালবাসতুম সে আর বল্‌তে পারিনে। তোমাদের এই Keats-এর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে— আমারও অনেকটা এই রকম ভাব ছিল।' এই বলিয়া Keats এর St. Agnes' Eve হইতে

"St. Agnes' Eve—Ah ! bitter chill it was !
The owl for all his feathers was a-cold."

এই প্রথম লাইন দুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কবিতার সঙ্গে Keatsএর কবিতার সৌসাদৃশ্য আছে— নয় কি ?

২ "স্বপ্নপ্রয়াণ", বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত।

পোষাকপরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি—শুন! একদিন একটি বিছানায় পাতিবার লাল কম্বল গায়ে দিয়া উপস্থিত— সে আবার ময়লা। ইনি সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। আসিয়া এখানে এ-কথা ও-কথা বলিতে বলিতে যদি একবার ধরিলেন ত Kant, Spinoza, Herbert Spencer, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইঁহার যতগুলি মতামত সমস্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন—দু'একবার হয়ত বলিলেন 'আপনাদের আমি detain কচ্ছি কি?' আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে যাইব এই যোগাড় দেখিয়া 'ও, তবে আপনাদের খাবার এসেছে' বলে— দুতিনবার বলে— ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'তবে এখন পালাই' বলিয়া চলিয়া যান।

হয়ত কিছুদূর আলাপ করিতে করিতেই নিজের খাতাটি বাহির করিয়া 'আপনারা আমার এই সার সত্যের আলোচনাটি শুন্‌বেন কি?' এই বলিয়া আমাদের মত একটু সঙ্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন এবং পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচের সঙ্গে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন হইয়াছে?' 'ভাল হইয়াছে' শুনিলে 'এ, ভাল হইয়াছে?' বলিয়া প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ এত সরল লোক আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই! বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আজ সকালবেলা Maeterlinckএর Wisdom and Destiny অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম— পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা Maeterlinck করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখী শয়ান, অভিভূতব্য চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা Wisdom! সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্র বাবুর আছে।

তিনি বলেন 'কেউ যদি আমার কাছে জান্‌তে চায় philosophy কি করে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌বে তা হ'লে আমি ঠিক পেয়ে উঠিনা তাকে কি উপদেশ দেব! তাকে কি পড়্‌তে বল্‌ব! Philosophy পড়্‌বে? কেন পড়্‌বে? তোমার কি দরকার? এই প্রশ্নটি আগে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়।" ভাবিয়া দেখ কি গভীর! আমরা এই রকম করিয়া যদি জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে যাই তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না কি? একটা জিনিষ কেন পড়ি? টাকা— নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাফলানের জন্য— নয়ত গড্ডালিকা-প্রবাহে চলন! কিন্তু বাস্তবিক আমার Humanity গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া হাঁ করিয়া খাইতে চায়— Spiritual Life ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, তার ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, অঙ্ক— কিছু একটা পড়িব— এভাবে ক'জন পড়ে?

Lifeএর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাঁধে চড়িয়া বসে— আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয়— এ বিদ্যার জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে— অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন দোমেটে জ্ঞান— অর্থাৎ কিনা অসরল জ্ঞান— আমার যাহা common sense আছে তার উপর বিদ্যা লেপিয়া দিলাম। ইহা অজ্ঞান— ইহার উপর যদি আবার তা নিয়ে অহঙ্কার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক) তাহা হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষায়)।

এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্ জায়গাটিতে দাঁড়াইয়াছেন— অর্থাৎ প্রকৃত wisdomএর উপরে। বাস্তবিক একএক সময় ঐ সরল হৃদয়টি ভেদ করিয়া যে গভীর অধ্যাত্ম-ব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয় না স্পর্শ করে সে পাষাণ হইতে পাষাণ। আমার চিরদিন এই দৃশ্যটি মনে থাকিবে— '

রাত্রি প্রায় এগারোটা! শান্তিনিকেতনের নীচের বৈঠকখানায় couchএ শুইয়া সেই বৃদ্ধ কবি— পাশে চেয়ারে বসিয়া আমি। ঐ পাশে চেয়ারে গ্লোবের মধ্যে মোমের বাতি জ্বলিতেছে। বুড়ার মাথাটির দৃঢ় সারল্যব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি— উন্নত কপালের চৌদিকে পিছে উঠান সাদা চুল। নাকের উপর চস্‌মা আলোতে চক্ চক্ করিতেছে— একএক সময়ে চক্ষুটি জ্বলিয়া উঠিতেছে।...

প্রকৃত idealistএর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে ইঁহারা যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন— বাইরের লোক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি— জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্ত্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ স্ফুরিত হইতে বাধ্য। আমরা যাহাকে ভালবাসি তার কথা বলিতে গেলে তার মধ্যে কি একটা মর্ম্মঘাতী স্বর থাকে ভাব দেখি!

দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে এই দু'দিনে কালীবর বেদান্তবাগীশের কথা কয়েকবার শুনা গেল। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। ...কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথা পাড়িয়া বলিলেন 'বাস্তবিক, আমাদের দেশে রাজা রাজ্‌ড়ারা যে কেমন, ওঁকে patronize কর্‌লে না!—আমি যদি পার্ত্তুম তা'হলে কর্ত্তুম। এবার গিয়েই তাঁকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তিনি জীবিত নাই, এতদিনে অন্তর্দ্ধান করেছেন।' এই সব কথায় বৃদ্ধের স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল যে তাহা তুমি নিজে না শুনিলে বুঝিবে না। ঐ সুরেই আমি সশ্রদ্ধ প্রীতির মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাঁহার অন্তরটির ছবি। ঠিক ঐ রকম সরল তেজস্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র।...

দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে (বৃদ্ধের চেহারা অন্তরেই দেখিতে পাইবে, আবার অন্তর তাঁহার কথাবার্ত্তাতেই দেখা যায়) সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্য্যের ভাব আছে। এই-সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।[৩]

৩

বোলপুর
শান্তিনিকেতন
[ফাল্গুন? ১৩০৯]

My Dear Ajit

সুবোধবাবুর[৪] মারফৎ তোমার পত্র পাইলাম। তোমার প্রথম পত্র পড়িয়া বুকে বড়ই বাজিয়াছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষ পত্রগুলি পড়িয়া একটু সুস্থ হইলাম। আমার অলসের মত অভ্যাসগুলা তোমার অজানা নাই তাই পত্র লিখে রাখি ত ডাকে দেওয়া হয় না— এই ভাব। তা আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আমাকে শরীর বিষয়ে উপদেশ করিতেছ কিন্তু আমার শরীর খুব ভাল আছে— আমার মনও বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছে— তবে দু এক সময় দুঃখাচ্ছন্ন হয়। তুমি কেন এত দুঃখ পাও? তোমার শরীরের

৩ এই চিঠিখানি ১৩২১ বৈশাখ, প্রবাসী (পৃ ১১১-১৩) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। চিঠিখানি প্রবাসীতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই; দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গই মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪ সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক।

দিকে বিশেষ যত্ন কর। যাক্ আমাকে ক্ষমা কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন এই আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা। তোমাদের কষ্ট শুনিয়া বড় দুঃখ পাইলাম। আমি আরো কিছু বেশী পাঠাইব। আচ্ছা, বাবা যদি টাকাটা নাই দেন তবে কি তুমি সম্প্রতি আমার টাকাগুলাই সেই বাকীটার শোধ বলিয়া লইতে পার না? তবু মায়ের কাছে একবার লজ্জা হইতে খালাস পাই। কিন্তু আমি সত্যকথা বলিতেছি— উহাতে আমার লজ্জা করে না— কষ্ট হইতে পারে। তোমার মা স্নেহগুণে আমাকে সমস্ত লজ্জা হইতে বাঁচাইয়াছেন।— তা' যাক্ (আমাকে যদি ভালবাস, তবে একথার কিছুমাত্র মাকে জানাইতে পারিবে না)— তা' যাক্— তোমাকে পরামর্শ দিতেছি— এই টাকাগুলিই সম্প্রতি ঋণশোধ বলিয়া গণিও— শেষে বাবা দেন ত দেবেন। যাক্ এসব। তুমি আমার ষ্টাইলের criticism করিয়াছ— আমি উহা স্বীকার করি কিন্তু একথা যদি কেহ মনে করে যে বাঙ্গাল হইলেই literary man হইতে পারা যাইবে না তবে তাকে আমি বলি ঘোর মূর্খ। Language—provincialism নহে— Language বা style, sensbilityর উপরেই নির্ভর করে। আমার সম্বন্ধে কে কি বলে তাহা লইয়া মাথা ব্যথার দরকার কি? যাক্—এখন Maeterlinck? Maeterlinckএর আধুনিক কাব্যগুলি আমি পড়ি নাই— শ্রদ্ধেয় মোহিতবাবু[৫] পড়িয়াছেন কি? জিজ্ঞাসা করিও। Treasure of the Humble ঐ কবির যে periodএর অরুণরেখারূপে আসিয়াছিল— Palleas প্রভৃতি সেই periodএর। তার পর Wisdom and Destiny গ্রন্থে Maeterlinckএর কাব্যজীবনের মহান পরিণতির পূর্ব্বাভাস দেখা গেছে— ঐ periodএর কাব্য আমি এখনো পড়ি নাই। বোধ হয় উহাতে Maeterlinckএর প্রতিভার সূর্য্য পূর্ণোদিত হইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত মোহিতবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু আমার সে সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। একটা genuine আর্টের সৃষ্টির মূল্য কম নয়। পরমেশ্বর করুন আমি যেন Philosopher হইয়া ফুলের বাগানে না যাই— মুক্ত প্রাণ ও প্রচুর অবসর লইয়া কবি হইয়াই যাই। তোমার যদি সময় না থাকে তবে জীবনের তত্ত্বগুলি গুছাইয়া লইয়া ভাগিবার জোগাড় কর,— আমরা দার্শনিককে একথা বলিব— "আমরা রসের যতটুকু পাই তাহার মধ্যে আপনাকে অনেকদূর ছাড়িয়া দিব।" আর একটি কথা দেখো— এই যে— যাহার একটি genuine ফুল ফুটে তাহার মূল্যই প্রচুর— বিশেষতঃ style দ্বারা তাহা যদি আচ্ছন্ন না হয়। আমি স্বীকার করি Maeterlinckএর কাব্যগুলি স্বল্পপরিসর— স্বীকার করি তিনি সমস্ত মানবজীবন ঝঙ্কৃত করিয়া গান করেন না— কিন্তু ইহা লইয়া তিনি কি হইতে পারেন সেটা কল্পনা করিয়া দেখা উচিত। Maeterlinck যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে আর কিছু না হইলেও, অন্ততঃ সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনো দ্রষ্টব্য আছে Maeterlinckএর প্রতিভা কতদূর যায়। Sunlight অতি চমৎকার— এই সূর্য্যালোককে না নিভাইয়া দিয়া ইহারি পথে যিনি আমাদিগকে চিরস্থির সূর্য্যালোকের মধ্যে উপনীত করিয়া দিতে পারিবেন— সেই কবিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার মানুষের চিরদিন আসে এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত কবিরা অপূর্ব্ব রহস্যময় একেকটি শুভ্র ফুল ফুটাইয়া থাকেন— তাহারাও বড়। কিন্তু Maeterlinck যে একটু ছোট, একটু সঙ্কীর্ণ, একটু dreamy এ কথা সত্য। মানুষের পক্ষে Maeterlinck চিরসুহৃদ নয়— তাহা সত্য,

---

৫ মোহিতচন্দ্র সেন।

কিন্তু সন্ধ্যা যতদিন থাকিবে, মানুষ যতদিন সমস্ত রহস্যের পারে না যাইবে, মানুষ যতদিন সন্ধ্যার তারাশিখাময় প্রদীপের নীচে দাঁড়াইয়া চক্ষে ঘোর অনুভব করিবে— ততদিন Maeterlinck মানুষের হৃদয়ে একটি তার বাজাইবেই।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবু আজকাল এখানে নাই— তা হলে তাঁর কথা অনেক লিখিতাম। বোধ হয় এতক্ষণে শ্রীযুক্ত রবিবাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এতদিন কি লিখিতেছি তাহা তোমাকে জানাই নাই বলিয়া তোমার রাগ করা অন্যায়। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি কেন জানাই নাই?— কোনই কারণ নাই! 'যখন জানিবে, তখন জানিবে' এই ভাবিয়াই জানাই নাই— লেখাকে আমি অত প্রাণপণ ভালবাসি না ত— ভালবাসি বটে খুব ভালবাসি কিন্তু উহা লইয়া বাড়াবাড়ির দরকার কি? সুবোধবাবুকে দেখাইয়াছি— কাছে ছিলেন দেখাইয়াছি— এসব কাজগুলা এমন সহজে এবং নিঃসন্দেহে হইয়া গেছে— যে ইহা লইয়া তুমি আবার রাগ করিবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। বোধ করি এ সব বিষয়ে তুমি আমাকে অতিলোভী আগ্রহপূর্ণ বলিয়া জান না— এ সব বিষয়ে আমি কতকটা উদাসীন— প্রিয়, সে সকল ক্ষমা করিও—দোষ ত শত সহস্র আছে— কিন্তু তাহা সহজেই ছাড়িয়া দেওয়া যায়।— সহজে যা আসে যায় তাহাকে ধরিয়া আকাশ ছাইয়া মেঘ জমানো— একি ভালো?— যাক্ আমাকে ক্ষমা করিও— শুন আমি কি কি লিখেছি:— রবিবাবুর অনুদিষ্ট 'আনন্দ ভিক্ষু'র কাহিনীটিকে[৬] ছন্দোবদ্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহাকে ভাল বলিয়াছেন— তবে তাঁহার ইচ্ছা ওটাকে Drama করি।[৭] কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন যেন হইতেছে না।

তারপরে Historical ballad লিখনের পরীক্ষা স্বরূপ (নিজে নিজে অবশ্য পরীক্ষা) শ্রীযুক্ত রবিবাবুর নিকট হইতে 'সংযুক্তার স্বয়ম্বর' বিষয়টি লইয়া একটি ballad লিখিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং মুকুলে প্রকাশের জন্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ (Prof. Bose) বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়া সুখী হইবে— শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুরা— বোধহয় তাঁহার পত্নী ছেলেদের literature ভাল করিবার জন্য মুকুলের ভার লইয়াছেন। ঐ কবিতাটি মুকুলে প্রকাশিত হইবে।

এ ছাড়া একটি গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছি এখনো শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবিবাবুর কবিতা সম্বন্ধে খুব একচোট বকিব[৮]— কল্পনা, এখন বিধাতা যা' করেন।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর lines অনুসারে বাঙ্গলার ছন্দশাস্ত্র লিখিব কল্পনা করিতেছি কিন্তু সেও ভবিষ্যৎ জানে। শ্রীযুক্ত রবিবাবু একটু পরমসুন্দর prose লিখিয়াছেন।[৯] রবিবাবু proseএ কলম ধরিয়াছেন এবার আমরা বাঙ্গলার আর এক চমৎকার কবিত্বমন্দিরের সিংহদ্বার খুলিব। 'গুরুদেবের' রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি— কারণ

৬ "চণ্ডালী", বঙ্গদর্শন ১৩১০ মাঘ। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত।

৭ দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কাহিনী লইয়া 'চণ্ডালিকা' নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

৮ ১৩০৯, ৯ম [আশ্বিন] সংখ্যার 'সমালোচনী' মাসিকপত্রে "ক্ষণিকা" সমালোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

৯ "বসন্তযাপন", বঙ্গদর্শন ১৩০৯ চৈত্র?

কি জান? এই দেখ চারিদিকে দুপুরের রৌদ্রে নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে— এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না— এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ সুদূর আকাশ হইতে আমাদের উপবনে আমাদের প্রাণের উপর চাঁপাফুলের জ্যোতিঃ ফেলিয়াছে— মাঠের একদিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেকদিকে পালাইতেছে— যে এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে— কত শালবন মনে পড়িতেছে— আর মনে পড়িতেছে অন্তর-বাহির-সুন্দর আমার ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেইজন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত করি, তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে 'গুরুদেব' বলিলাম— কিন্তু উচ্ছ্বাস যাউক। তোমার কাছে ছাড়া এ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে অন্য কারো কাছে সাহস করিতাম না— ব্যাপারটা কি জান, প্রিয়? এইমাত্র আমি হাল ছাড়িয়া লিখিতেছিলাম। হৃদয়ের করুণার সঙ্গে বাহিরের পড়ন্ত রৌদ্র গলিয়া আমার দুই চোখ বুজিয়া আসিতেছে— ইচ্ছা হয় এখন দুই চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি— অপরাহ্ণ এবং হৃদয়ের মাধুর্য্য আমাকে ধরিয়া বাজাক্— আমার শিরায় শিরায় গাঁদাফুলের রঙের রস ভরিয়া দিয়া যাক্— এই যে লিখিতেছি আর লেখাও ছাড়িতে ইচ্ছা করে না— রৌদ্র যেমন তিলে তিলে নামিয়া যাইতেছে— ইচ্ছা হয় আমার কলমও তেমনি কাগজের উপর দিয়া সোনার ভাবের স্রোতে নামিয়া যাউক! কতদিনের দুঃখব্যথা আমার প্রাণের মধ্যে মুখ বুজিয়া বসিয়া আছে উহারা যেন ঘোমটার আড়ে আলাপ করিতেছে— আম্রমুকুল কি মৃদু কি সুন্দর! এই বসন্ত অপরাহ্ণের মৃদুতার সঙ্গে ঠিক্ মিলিয়া যায়— আমার হৃদয়টি আম্রমুকুলের মত পৃথিবীর উপরে পড়িয়াছে।— কে একটি সপত্র আম্রশাখা মঞ্জরীসমেত সদ্য ভাঙ্গিয়া আনিয়া বসন্ত বিকালে মা পৃথিবীর বুকে ফেলিয়াছে— আমি তাই?—

আজ বিদ্যাসুন্দর পড়িয়াছিলাম— তাহাও মনে আসিতেছে— ভাষার কৃত্রিমতা, বর্ণনার অশ্লীলতা সমস্ত এড়াইয়া আমি একটি রাজবালিকার বুকের আকাঙ্ক্ষা এবং একটি সুন্দর রাজকুমারের আকাঙ্ক্ষা এবং চাতুরীর— এই অপরাহ্ণের মত মৃদুরস প্রাণে পাইতেছি।— আহা সে ত আর আসিবে না— ঐ একটু দুঃখ! আমাদের ব্যক্তিত্ব নানা সৌন্দর্য্যে জড়িত— তার মধ্যে এই অনস্তিত্বের কারুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। জীবনের sum একি চিরদিন আছে কিন্তু নানা ব্যক্তি যে জন্মিয়া "আমি" ভাবিয়া সুখদুঃখের নাটক করিয়াছিল— তাহারা কোথায়! কত সুন্দর বিলাসী লোক ছিল— তাহাদের চপল লালসা এবং তাহারা দুইই মিলাইয়াছে কি করুণ!— ভারতচন্দ্রের নায়কনায়িকার ইন্দ্রিয়বিকার মধ্যেও আমি নারীর মাধুর্য্য এবং যুবকের মাধুর্য্য পাইলাম— উহাই— ক্ষণস্থায়ী লালসা জড়িত সেই চিরস্থায়ী মাধুর্য্যটিই এই অপরাহ্ণের পড়ন্ত রৌদ্রের সঙ্গে মিশিয়া মৃদু ২ ঘাতে আমার প্রাণকে ব্যথা এবং সুখ দিতেছে।

৪

শান্তিনিকেতন

বোলপুর।

[আষাঢ়, ১৩১০]

অজিত,

তোমার পত্র পাইয়া নিতান্ত সুখী হইলাম। তুমি গিয়াছ পরে হইতে মনে ভারী একটা কষ্ট হইতেছিল, চিঠিটা পাইয়া অনেকটা সুখী হইলাম।

আমার কি রকম দুর্ব্বলতা,— মোহিতবাবুর অল্পমাত্র ক্রিটিসিজ্‌মেই আমি মনে মনে ব্যথা পাইয়াছি। অবশ্য এটা চাপিয়া যাওয়াই ভাল ছিল— এই সব মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করা কখনো উচিৎ নয়— এগুলিকে ফোঃ ফোঃ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সত্য বল দেখি— দুয়োরাণী কি ব্রাউনিংয়ের হনুকরণ ?— অথবা থাক্।— কিছু বলিও না।

আমার উতঙ্ক[১০] নকল করিয়া ত পাঠাইবেই— তা ছাড়া দেখিও তোমার সঙ্গে কোনো গতিকে আমার মুস্কিলআসানের খাতাটি কলিকাতায় গিয়া পড়িয়াছে কিনা। খাতাটি না পাইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি— অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া আসানেরও কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না। Reproduceও করা গেল না। অথচ শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে ওটা যাওয়াই চাই— অবশ্য যদি শৈলেশ বাবু[১১] সুবিধা বোঝেন— হয়তোবা শ্রাবণের সংখ্যা এখনি ভরিয়া গিয়াছে।

যাহোক 'মুস্কিল'টা যদি কলিকাতায় বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাক তবে সেটা কাপি করিয়া শ্রীযুক্ত শৈলেশ বাবুর হাতে দিও— সম্পাদকের অনুমতি তো জানই। আর যদি না গিয়া থাকে ত ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইয়া পড়িলাম— 'মুস্কিলআসান' নক্ষত্রালোকে উড়িয়া গেল, আর তাহাকে পাওয়ার আশা নাই।

তোমাদের সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবুকে[১২] আমার 'রাজকন্যা'[১৩] এবং 'দুয়োরাণী' কেমন লাগিল?

…এখনো কোন চিঠি পাই নাই। পাইলে জানাইতে পারি।

এবার বঙ্গদর্শনে আবার নব 'মেঘোদয়ে'[১৪] কবির চিত্ত-বিদূরভূমিতে রত্নশলাকা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছ কি ? আমাদের চারিদিকে প্রান্তর ঢাকিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ইন্দ্রের হাতী মেঘগুলা বৃংহিতধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছে,— আমাদের প্রান্তরের উপরে আকাশ ভাঙ্গিয়া, রামধনু গুঁড়া হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমাদের প্রান্তরের সুদূর প্রান্তে বায়ুতাড়িত চূর্ণবর্ষার মধ্যে সূর্য্যালোক পড়িয়া অদ্ভুত বৈদ্যুতী ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছে— ইহার মধ্যে, দেখ, আলমোড়ার শৈলশিখর হইতে পরিপূর্ণ গান আসিয়া উপস্থিত। এই বিরাট বর্ষার মধ্যে বসিয়া মেঘ সমারোহের মধ্যে বসিয়া— অনেকদিন সেই হৃদয়টির কথা ভাবিতে হইবে, যে হৃদয়ে,

"রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুন রেখা কেঁপে কেঁপে
যায় গো ঝলকিয়া।"

যে হৃদয়ে—

সজল বায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে।

শৈলেশবাবুকে আমার প্রীতি জানাইও।

---

১০ 'গুরুদক্ষিণা'র কাহিনী।

১১ বঙ্গদর্শনের সহসম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

১২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

১৩ ১৩১০ বৈশাখের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত।

১৪ বঙ্গদর্শন, ১৩১০ আষাঢ়।

৫

বোলপুর

[আশ্বিন ? ১৩১০]

অজিত,

তোমার পত্র পাইলাম— ইতিপূর্ব্বে পোষ্টকার্ডও পাইয়াছি। তুমি যে সব কথা লিখিয়াছ তা আমারো নিত্য চিন্তার বিষয়। আমি যদি নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে আমাকে বোধহয় নিরাশ হইতে হয়। আমার স্বার্থপরতা ভালবাসা অপেক্ষা প্রবল। ভোগী এবং অহংকারী লোকের স্বভাব এই যে তারা কেবলি চায়— দিতে কিছুমাত্র পারে না।— যাক্ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবে। এবার আমার foppery of idealism চলিয়া গিয়াছে, আমি সুখদুঃখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আমার ভীরুতা এবং shyness প্রভৃতি কতগুলি পুরুষের অনুচিত দোষ আছে সেই জন্যই প্রাণের প্রেরণা অনুসারে কাজ করিতে পারি না। কিন্তু কাজ করিতে হইবে। আমি any reverses এর জন্য প্রস্তুত রহিলাম। যিনি আমাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন তিনিই বিধান করিবেন।— কিন্তু যাক্ এ gloomy, analytical, moral, moralising tendency বর্জ্জন করিলাম। তুমি নির্ভয় মনে আমাকে তোমার কথা বলিও কিন্তু মনে রাখিও অনেক জিনিষ আমি এখনো সহিতে পারি না। Goethe যে Three religions এর কথা বলিয়াছেন এখনো আমি তার প্রথম religion পালন করিবার মত অবস্থায় আছি। আমার এখনো "মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা" জন্মে নাই। এখনো bare heart এর ব্যথা জীবন্তভাবে সম্মুখে দেখিতে ভয় পাই— কাব্যে যতই ভাল লাগুক না কেন। Imagination এবং Culture এর যা difference ! Robert Browning এর সেই Medieval Musician এর মত কল্পনার মুহূর্ত্তে Life এর চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়া পড়ি কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার মাটির সঙ্গে সমান হইয়া যাই। জানিনা কোনদিন দৃঢ় হইব কি না! এই দেখ! আবার সে—ই moral, analytical tendency ! Joy for ever joy. আজকাল এখানে শরতের পূর্ণ পরিণতি। আগন্তুক শরতের অনন্দআভাষ তোমাকে দিয়াছিলাম— পরিণত শরতের সুখভাষ এবার লও। বর্ষার মত মোটা কালো মেঘ আর নাই— সমস্ত দিন নীলাকাশের উপর ছোট ছোট পাৎলা সাদা মেঘ পড়িয়া থাকে— বিকালবেলায় পশ্চিম দিকে একখানি প্রকাণ্ড গোলাপীরঙের পাল ফুলিয়া ওঠে। যতই কাজকর্ম্ম করি— একটু আকাশের দিকে চাহিলেই মনে হয় 'বিশ্রাম'। বিকালবেলা যখন নিস্তেজ চাঁদটি আকাশের উপর স্থির থাকে— মাঠে গরুগুলি তাদের সমভাবে নমিত গ্রীবাগুলি লইয়া helpless শান্ত ভাব লইয়া ঘাস খাইতে থাকে তখন বিশ্রামের ভাবটি সম্পূর্ণ হয়— ক্রমে সন্ধ্যার সঙ্গে নিদ্রার ভাব নামিতে থাকে।

শ্রীযুক্ত গুরুদেব এখন ত বেশ আছেন। নিশিবাবুকে[১৫] আমার প্রীতি দিও। আমার Heart's blood দিও, আমার inmost confessions দিও, আমার 'সব কলঙ্ক কালো' দিও— আমি এইসব উপহার দিয়াই তাঁকে বন্ধুত্বে বরণ করিলাম।—

১৫ নিশিকান্ত সেন।

বুড়ো[১৬] বেশ ভাল আছে।

নিশিবাবুকে শ্রীযুক্ত রবিবাবু সাদরে গ্রহণ করিবেন— এবং অন্যের মত তাঁর যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সতীশ

শ্রীযুক্ত মোহিতবাবুকে আমার প্রণাম দিও।

৬

ব্রহ্মবিদ্যালয়
[অগ্রহায়ণ ? ১৩১০]

দিবাভাগে চাঁদ।
(শুক্ল নবমী)

1.

ডুবিয়া আছে তরী।
কিরণময় বিশাল ওই নীলাম্বর পরি
ডুবিয়া আছে তরী!
বাহিরি গেছে সকল লোক অযুতলাখ কাজে,
আলোয় ছায়ে অলসখেলা শূন্যবনমাঝে—
মাঠের শেষে আকাশ ঘেঁসে রৌদ্র বেয়ে পড়ে—
দীপ্তধরা চাহিয়া আছে অনন্ত অম্বরে—
শুক্লপাখা নবমঘাতে চন্দ্রতরীখানি
কতনা দূর সাগরে, পালে নিজেরে টানি আনি'
সহসা আলো ঝঞ্ঝাবাতে মাঝগগনে পড়ি'
ভাঙিয়া হাল ছিঁড়িয়া পাল বিপথে গেছে সরি'
ডুবিয়া গেছে তরী!

2.

উঠিবে জাগি' তরী—
হাজারো দ্বীপ জাগিবে যবে আলোকশিখা ধরি'
উঠিবে জাগি' তরী!
ইন্দ্রজালে গগনভালে আঁধার আসি' যবে
জমিয়া যাবে, ধরার আঁখি অন্ধ হ'য়ে রবে!
তখন তারে স্বপন দিতে জ্যোছনাধারা ঢালি'
জাগাতে ছায়া গাছের পিছে মন্দপ্রভা জ্বালি'
চলিয়া যেতে প্রান্ত হতে প্রান্তে নববলে

১৬ অজিতকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুজিতকুমার চক্রবর্তী।

পরায়ে দিতে পারিজাতেরি মালিকা নদীগলে—
ঘটাতে শত মিলনসুখ ধরার উপবনে—
আকুলধ্বনি জাগাতে বীণে বিরহীবাতায়নে—
নবমীচাঁদ পরীর মত শরীর শোভা ধরি'
টানিয়া হাল, জুড়িয়া পাল উঠিবে নড়িচড়ি'—
— উঠিবে জাগি' তরী।[১৭]

এই একটি কবিতা লেখা গিয়াছে— আজকাল চাঁদ সম্বন্ধে আরো কতগুলি কবিতা লিখেছি। তোমার সমালোচনাকে আমি ভয় করি না— কারণ তুমি এখনও wise নও— তুমি এখনো একটা জিনিষের আগাগোড়া দেখিতে পাও না। Futureএর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটা জিনিষের জীবনক্রিয়ার ছাঁদ আয়ত্ত করিতে পার না। শুধু যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাই সর্ব্বত্র দেখিতে চাও। এইই যৌবনের ধারা— Impatience যৌবনের ধর্ম্ম।

তবে আমাদের এইটুকু সাবধান হওয়া উচিত যে এই Impatience লইয়া আমরা যেন বিচার করিতে না বসি। কারণ তাহা হইলে Invariably একটা জিনিষের উপর আমাদের নিজের idealটা impose করিতে থাকি— সেটা বিচারাধীন বেচারার পক্ষে মারাত্মক হয়। কারণ প্রত্যেক জিনিষেরই একটা স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি আছে। আমাদের অল্পবয়সে এবং অনুদার অশিক্ষিত হইলে বুড়া বয়সেও সেই sympathyটি থাকে না যার বলে প্রত্যেক জিনিষটিকে আমার নিজেরি সমান honour দিয়া চুপ করিয়া watch করিতে পারি। শ্রীযুক্ত রবিবাবুর কাছে থাকিয়া এইটি আমি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছি। এটি শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে। Goethe কিম্বা Emersonএর criticismএ কোথাও imposition নাই— apreciation আছে— দোষকে দেখাইয়া দেওয়া আছে— unsympathetic lashing নাই।

একটা ভাব আসিলেই সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে একটা চেষ্টা জাগে তার জন্য এত কথা বলিলাম।— এ শুধু আপনার মনের ভাবগুলিকে ধরিয়া shape দিয়া রাখিবার জন্য। এটা তোমার প্রতি উপদেশ দিই নাই।

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি কি এখান হইতে as a teacher পরীক্ষা দিতে পারিব? Fees কতদিন পূর্ব্বে পাঠাইতে হয়? আমি Prose বইগুলি পাইব কি প্রকারে? তুমি যদি C[h]ristmasএ এসো তবে বোধহয় ১০।১৫ দিনে দুটা তিনটা বই পড়া যাইতে পারে। Honours না দেওয়াই একরকম সিদ্ধান্ত করিয়াছি তবে যদি Pass বইগুলি সারিয়া সময় পাই ত দেখিব। বি, এ তৈয়ার করিতে আমার কষ্ট হইতেছে— তবু ছাড়িব না।

তুমি কি আমার প্রশ্ন গুলার উত্তর জানিয়া দিতে পারিবে? ওদিককার সব খবর দিও।

Affly yours
Satis,

১৭ এই কবিতাটির সংশোধিত রূপ 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে মুদ্রিত আছে।

৭

রামশিলা
গয়া
[পৌষ, ১৩১০]

অজিত,

দেখ, আমি কোথায় আসিয়াছি। রামশিলার পাহাড়ের পায়ের গোড়ায় শ্রীশবাবুর বাংলায় বসিয়া ফল্গু নদীর বালিপুঞ্জের উপর সকাল বেলার সূর্য্যরশ্মি পড়িতে দেখিতেছি। মাঝখানে আঁকিয়া বাঁকিয়া একটিমাত্র জলের রেখা চলিয়া গেছে। পরপারে পাহাড়গুলি রৌদ্রকিরণে সীসায় গড়ানোর মত বোধ হইতেছে। সম্মুখে চাহিলে ডান দিকে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের মাথা দেখিতে পাওয়া যায়— ঐ খানে বসিয়াই তোমাদের গুরু গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ নির্জ্জনে উপবাসে ধ্যান করিতেন।

স্থানের বর্ণনা করিতে আমি পটু নই কেবল মনে যে একটি ভাব আসিতেছে তাহাই বলিবার জন্য আমার ব্যগ্রতা জন্মিতেছে। ভারি একটি মুক্ত ভাব ভারি একটি শুদ্ধ ভাব ভারি একটি মহৎভাব ভারি একটি মধুর ভাব, ভারি একটি করুণ ভাব। সকালবেলার রৌদ্র, স্তম্ভিতধূসর পাহাড়ের ধ্যানস্তব্ধ স্বাধীন অথচ যেন একটু দুঃখছায়ামলিন মূর্ত্তি,— কাল যে দেখিয়াছিলাম সেই নরনারীর অপরিচ্ছিন্ন মলিন বেশভূষার স্মৃতি এবং টেবেলের উপর আমার সম্মুখে রক্ষিত বুদ্ধগয়া হইতে আনীত গত দিবসের ঈষৎজীর্ণ গোলাপের কোমলমধুর গন্ধ— এই সমস্ত মিলিয়া আমার মনে স্তব্ধতা মাহাত্ম্য দুঃখ ও মাধুর্য্যে মিশ্রিত একটি ভাবের সঞ্চার করিতেছে। ঐ ধূসর সীসায়-গড়া পাহাড়ের মতই একটি স্তব্ধতা দুঃখ এবং মুক্তি আমার চিত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত— অথচ প্রতি রন্ধ্রটি হইতে যেন এই গোলাপের মধুর গন্ধের মত গন্ধ নীরবে নিঃসারিত হইতেছে।

যখন ট্রেনে জাগিয়া উঠি প্রথম পাহাড়গুলি দেখি— তখন জ্যোৎস্নায় সেই স্তম্ভিত পাহাড়গুলি মনের মধ্যে কি একটা কথা কহিতে চাহিয়াছিল— স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই— ক্রমে যখন গয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম দুইদিকেই এই ভস্মবিভূতিমাখা, কঙ্কররুদ্রাক্ষধারী রুদ্রের নিস্তব্ধ অনুচরগুলি উঠিয়া আসিতে লাগিল— মনে হইতে লাগিল কোথায় প্রবেশ করিতেছি— যেন বাস্তবিক ইহারা কোন একটা নিভৃত কক্ষগহ্বরের সংবাদ নীরবে বহন করিতেছে এবং গয়াযাত্রীকে সেইদিক ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে।

শ্রীশবাবুদের বাংলায় দাঁড়াইতে যখন চারিদিকে পাহাড়ের মালা সাজিয়া উঠিল তখনো সেই শুদ্ধ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। বাস্তবিক কোন একটাভাবের মধ্যেই পাহাড়গুলি ধরা দিতেছে না— আমি উহাদের চিনিতে পারিতেছি না— অথচ কি একটা মাহাত্ম্য যেন অনুভব করিতেছি—ইহাতে মনের মধ্যে একটি বেদনা ছিল। কাহাকেও কিছু বলি নাই— হাসিয়াছি, কথা বলিয়াছি অথচ ভিতর হইতে হাসি খুলিয়া যায় নাই— ভিতরে ভিতরে একটি দীনতা একটি নিরানন্দ ছিল। কিন্তু কাল যখন শ্রীশবাবু বুদ্ধগয়া দেখাইয়া আনিলেন তখন সমস্ত অর্থ পরিষ্কার হইল। পাহাড়গুলি একটি হার্ম্মনিতে স্থর দিল— শুষ্ক ফল্গু নৈরঞ্জনা ও মাহীর মিলনে দূরবর্ষের প্রভাত হইতে হৃদয়ের মধ্যে কল্লোলিত হইয়া উঠিল। এই পাহাড় প্রাক্‌বোধি (যেখানে শাক্যরাজপুত্র বোধিসত্ত্ব

হইবার আগে কৃচ্ছ্রতপস্যা করিয়াছিলেন) এই পাহাড় ব্রহ্মযোনি চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া একটি সুমধুর সুমহৎ মহাকাব্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। শুনিয়াছি অমৃতসহরের সোনার মন্দিরে গ্রন্থসাহেব রক্ষিত—আর এখানে গয়ার পাহাড়গুলিও নির্নিমেষে, মুক্ত আকাশের তলে একখানি মহাগ্রন্থসাহেবকে রক্ষা করিতেছে। এই মহাকাব্য পাথরের পৃষ্ঠায় আকৃতিযুক্ত ছবিতে গ্রথিত—শব্দচিত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত নহে। এই মিশ্রিত সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি রাগিণী স্পষ্ট— একটি রাগিণী হচ্চে অশোক-মহারাজার অনুতপ্ত অশ্রুসিক্ত এবং অবশেষে আনন্দোচ্ছ্বসিত—শাক্যরাজকুমারের জীবনলীলার লহরে লহরে বিচিত্র আভোগে স্পন্দমান হৃদয়ের সুমধুর সুবৃহৎ রাগিণী— ইহা পুরাতন, কবিত্বপূর্ণ মাধুর্য্যে প্লাবিত। আর একটি হচ্চে পরবর্তী কোন রাজভ্রাতাদ্বয়ের হৃদয়ের রাগিণী— তাহাতে অত কবিত্ব নাই—তাহা নির্ব্বাণের Philosophyতে গম্ভীর হইয়া স্তূপের উপরে স্তূপে আকাশের দিকে উচ্ছ্বসিত। তাহা আধুনিক,— তাহা মেরামত করা। অন্য সময়ে বিশেষ খবর দিব। দীর্ঘতর চিঠি অসম্ভব। আমি স্বামী বিবেকানন্দের চেহারাবিশিষ্ট একটি ঠাকুর যুবকের[১৮] সহচর— আমারো দাড়ি গোঁফ shaved, মাথায় পাগড়ী— ঠাকুর বলিতেছেন আমাদের Travellingএর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে তাই আমাদের কামানো দরকার হইল। দীনুবাবুর Compliments জানিও।

সতীশ

১

Santiniketan,
Bolpur

My Dear Ajit

Both your letters in lead-dinted writing to hand. How's that? I cannot explain it unless I imagine some sudden storm through the town that in its career has blown away goosequills and peacock quills and all manner of writing gear in an unprecedented, inexplicable fashion. That is not the case I hope. You know imaginings are mostly false.

Will you hear how I have been spoiling one written letter after another in replying to you? Will you like to know how the first four leaves were filled with Bengalee & English of the character of a madman's raving? Will you learn how the next four leaves of a letter-paper were filled with English of no better a character & how at last the writer put them all away and decided upon taking up this poor sheet whereon I now write with no assurance, however, as to its future fate too. But I hope, before I finish this, to have curbed myself somewhat in these extravagant pranks.

I have not written or thought much during these days. Nor have I read much.

The charm of the newcomer Autumn is upon me. Mornings find me a silent gazer on the trees with their deep shady recesses & their shining leafage,—a gazer on the white clouds & a still sitter in languishment of a melody

---

১৮ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

that flies past my ears in silence, winging their way to some land of enchantment where the still highways are planted on both sides with Shefali trees, where spirits of light and shade have their being in their many silent festivities of autumnal celebration and where many a poet may be met with—with traces of their earthly linaments in their so transformed shapes informed with a still new splendour. Shall I ever sing? Shall the Muses ever choose me for their minion? I do not know. But if I were to tell you what I cherish most at heart, you shall hear of a wish to sing with the whole of my heart. I may be a fool, a madman, a child, whatever you like—yet I have got glimpses of the fairyland most assuredly. Nor is it a world of impotent imagining merely, that I have created for me, but the very true depth of beauty has been suggested to my heart; and I can fail only by my own idleness. I am the most wretched sinner, I know it, yet I am the chosen one I am sure of it. Everybody the most wretched Caitiff, I believe feels himself to be the chosen one in some moment or other of his life & (I am sure if I am not echoing Robert Browning and my teachers here). Look at this, even here! See how my philosophing is full of diffidence and no truth may really be said to be clear to me. Yet most assuredly as I told you just now, this one truth of the depth of beauty is made quite clear to me though the manifestation (to curiously selfcontradict) may be never so obscure.

How do you do? May God bless Hemendra. I am ever affly

SATIS

২

ব্রহ্মবিদ্যালয়
বোলপুর।

অজিত,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।— I am really thankful to you that you should be so kind to me. Yet things are not what they seem nor do I wish you to circumscribe yourself in that fashion. You may help me through my life, yea, you will do it—but that can never be your only business in life. You will find it so in time and it were idle arguing the point with you—trying to convince a fond obstinacy at a time when fond things are indeed the very staple whence we nourish our being.

You think I have the writer's gift abundantly. I do not know if it is so. I sometimes feel as if I were indeed gifted that way but the feeling does not last and soon I feel myself as barren and unprofitable as anything.

But even admitting my intellectual gifts (really, I have so long dreamt I was gifted, that something settles in me like a conviction almost)—even admitting these intellectual powers of mine were it not proper that I cultured them thoroughly enough to speak with some authority on literary subjects before I set myself to address the public? You will perhaps cite Rabi babu's

example and plead for natural growth and development. Natural growth is all very well where we find them but when we set ourself deliberately to develop us naturally, the contradiction is at once manifest. It is natural for me to groan under a conciousness of frivolity in life, it is natural for me to grumble over my fanciful apprehension of life—my want of hold on reality—my weakness, my vanity & what not. It may be natural for me to pine away for love strong, sweet, speechless, wise, penetrant & helpful—yet not myself to love others; it may be natural for me to rove in vain imaginings and let myself loose upon a vague metaphysics—it may be natural for me to be painfully artificial—but poetic utterance—utterances of truth steeped in glad music—that why I am not naturally disposed—to be sure. Ravi babu in his poem অসময় (out of season) speaks of the 'stifled barren eventide'—does he not? I can feel what it is like—

"With flowers and unguents are they gone
—they all
The moonlight-revel-day is come this hour"

but on me "descends the stifling barren eventide".—But all this is exactly one of my frivolous or idle freaks. The truth is—that I am most probably a very paltry fellow and I dream of a few high things and am 'unco' vain for that. All I have to be prepared against is punishment for all this frivolity and the only means of calmly bearing it when it comes is to harness me in the meantime to severe work—this I shall try to do, God helping.

I do not know—may be I have lied in every line I have written.

God help you.

Will it be possible for me to go in the B.A.? Rs. 60/- or 70/-?—but that's a big sum. Who will help me through that?—I am so poor. Let me get up my books however and watch the course of things.

I am affly. yours
SATIS

৩

Santiniketan
Bolpur

MY DEAR AJIT,

Having driven through buildings ugly and stately we reached the Rl. Station. The train shot through fields and through villages and by towns. Clouds with fantastic favours were as ever and aye drifted or piled up along the horizon. I have conceived a plan of an essay in a careless style very much in the fashion of Ravi babu's 'Sarojini Prayan' published long ago in Dwijendra Babu's Bharati. The 'horizon bounded plains' with waving cornfields, Tentool groves and kine and cultivators, the recessed villages with dilapitated brickhouses where green tendrils clamber up in prosperous growth, the motley company in the train, idle grotesque fancies & still more fanciful shapes

of clouds—things like these are meant to fill in the sketch—grotesque reflection and satirical philosophizing however, must form a great part.

Did you see Father? Did you see Ravi Babu since I left? I must put you in mind of a few things I said to you concerning Bepin Babu. I do not know if all our teachers are going to be paid a month's salary in advance or no.

I am happy again amidst my still clouds and autumn sunshine, amidst my stellar suggestions and pupils. Only, I have got complaints in the stomach. I hope, however to be whole again by Nagendra babu's ministry. Bipin babu has come round at last and looks even more healthy and cheerful than before. Buro is doing well. Rothi goes on.

Tender my respects to Mohit Babu. My love to Nishi Kanto Babu. How eagerly am I looking forward to the time when he will no longer be distant to me in his residence and his occupations.

Another thing that I had had in my brain when I began this letter but had forgotten since and remember again now is that you will kindly see Nibaron Babu (Sailesh Babu's Manager) now and then and inquire if my "Utanka" came to their hands.

Bring this thing to Robi babu at your earliest convenience.

Wishing to hear from you & Nishi Kanta,

I remain,
affectionately yours
SATIS

8

Brahmavidyalay,
Bolpur
[15 Jan. 1904]

MY DEAR AJIT,

So you see I have come back from my trip westwards—not at all unhurt as you might suppose. I have got a bad cold in my head, my heart is unnerved too. My heart failed me as I saw the ruins of Delhi—and those centres of olden glory, viz., Buddha Gya & Benares—so dim and so august are the monuments—so poor so abject are the men that cling round them in their superstitious resignation. From Tajmahal & from Buddha Gya & from Benares, one can hear in one's mind's ear a bitter cry sent up—a cry of lost greatness—a groan, as if one—a beautious Queen—drowned in folly and abjection. Really strange thunders are heard bellowing from the four-quarters of the globe—will India be crushed for ever? I do not know—only my heart fails me—I feel creepy and grown old.

SATIS

কবিতা

সতীশচন্দ্র রায়

১

কিছু না জানিতে চাই কিছু না বুঝিতে
নানামুনি-মন্ত্রণায় চাহি না খুঁজিতে
ছোট ছোট দীপ লয়ে রত্ন নানা পথে—
তুমি তব মন্দিরের মাঝখান হতে
বাজাও তোমার শঙ্খ সুগভীর রবে
কাঁপায়ে অন্তর মোর—চরণ-পল্লবে
পরশ করহ প্রাণ—নবারুণলেখা
তব পদপল্লবেরি নিরঞ্জনলেখা
নিমেষে পরাণমাঝে আসুক প্রভাত
অশ্রুধৌত নিরমল—হে হৃদয়নাথ
রজনীমন্দিরে তুমি বিহর যখন
কোটি তারাভৃঙ্গ ধায় করি গুঞ্জরণ
কনক-পাখনা নাড়ি' চরণকমলে
মকরন্দ-পানলোভে, আমি বনতলে
দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি "কোথা প্রিয় মোর ?"
রসভরে ত্রিভুবন মুগুধ বিভোর।

২

মোরে না শুধায় কথা, শুধু থাকি থাকি
স্বপ্নসিন্ধু-পরপারে শুনি ডাকাডাকি
দলে দলে চলিয়াছে সব ফেলি দূর
হে নাথ তোমার পদসরোজ-মধুর
সুগন্ধে পাগল হয়ে। যায় রাতি যায়
প্রিয়তম, বাসরের প্রহর পোহায়—
কোথায় ? কভু এ কানে শুনি না ত ধ্বনি
তোমার আহ্বানরব—কাঁপে না রজনী
আমার হৃদয়মাঝে সেই মধুস্বরে
যার লাগি রজনী সে হৃদয় অম্বরে
দিন দিন গাঢ়তর ঘনায়ে আসিছে,
আসিছে তিমিরঢেউ তিমিরের পিছে !
ডাক সখা ডাক
একবার কমলকোমল পাণি রাখ
এ জ্বলন্ত আঁখিপরে—তপ্ত অশ্রুধারা
মুছাও করুণাভরে—হে নয়নতারা
অন্ধ আঁখিতারকার দৃষ্টি দেহ আনি'—
দেখাও দেখাও তব প্রেমমুখখানি !

হাফেজ

অনুবাদ

সতীশচন্দ্র রায়

১

ওহে সাকী—চালাইয়া দাও চারিদিকে সুরাপাত্র—দাও সকলকে।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম প্রেম সহজ—কিন্তু এখন নানা কিছু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে।

তার অলকগুচ্ছ হইতে যে কস্তুরীচূর্ণ সকালবেলার বায়ুতে উড়িয়া পড়িয়াছে—সেই কস্তুরীচূর্ণ উপলক্ষে প্রেমিকদের হৃদয়রক্ত কতই না ক্ষারিত হইল।

সুরাবিক্রেতার পীর যদি বলে ত মৃগচর্ম্মাসন পর্যন্ত সুরা দিয়া রঞ্জিত কর—কারণ সেই সাধুযাত্রী পথ ও আড্ডার খবর যে জানে না তাহা নহে।

প্রিয়তমের এই আড্ডায় থাকিয়াও আমার কতই আনন্দ হয়—যখন একেক সময়ে ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাই :—"বাঁধো, তোমার ইহকালের জিনিষপত্তর বাঁধো।"

অন্ধকার রাত্রি, তরঙ্গের ভয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণা—যাহারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই ভারহীন যাত্রীরা আমাদের অবস্থা কিরূপে জানিতে পারিবে ?

আমার নিজের খেয়ালের ঝোঁকে পড়িয়া যা' কিছু করিলাম—সব তাতেই আমার দুর্ণাম রটিল—সেই মহারহস্য—যার কথা সাধুদল বলিয়া থাকেন—তাহা এখনো কি নিষ্ঠুরভাবে গোপন রহিয়াছে !

ওরে হাফিজ, (প্রিয়কে) যদি কাছে পাইতে চাও তো তাহার কাছে হইতে দূরে থাকিও না। যখন প্রিয়কে দেখিবি তখন সমস্ত সংসারকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—দূরে যাক সংসার !

২

ওহে প্রিয়তম,

চন্দ্রমাসম ছটা তোমারি উজ্জ্বল মুখ হইতে অপরূপ সৌন্দর্য্যছটা তোমারি থুঁতির ভাঁজটুকু হইতে—প্রভু যখন এই সব বাঞ্ছা (বাঞ্ছিত ?) আমাদের সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে—তখন আমাদের হিয়া শান্ত হইবে—তখনি তোমার কেশভার ছড়াইয়া তুমি বসিবে।

আমার ওষ্ঠাগত প্রাণ তোমার দর্শন চায়। এই অগ্রসর হইল—এই পশ্চাৎ ফিরিয়া গেল—কি আদেশ তোমার ?

যখন আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাও তখন ধূলা হইতে এবং রক্ত হইতে তোমার বস্ত্রাঞ্চল দূরে রাখিও। এই পথে অনেক লোক তোমার জন্য আত্ম বলিদান করিয়াছে।

আমার (অশান্ত) হৃদয় সব ছারখার করিল। হৃদয়ের মালিক (গুরু)কে জানাও—আমি আমার শপথ তোমাদের শপথ করিয়া বলিতেছি।

তোমার চোখের পলকে কেহই কোন আনন্দ লাভ করিল না। অতএব ইহাই উত্তম যে তাহারা তাহাদের 'সতীত্ব-বসন' তোমার মাতালদের কাছে বিক্রয় করুক।

ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন আমাদের অদৃষ্ট হয়ত একদিন জাগিয়া উঠিবে—কারণ তার চোখে একবিন্দু জল পড়িয়া (উঠিয়া ?) তোমার মুখ আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই হাওয়ার স্রোতে তোমার কপোলের একমুঠা গোলাপ ভাসাইয়া দাও—হয়তো আমি নিঃশ্বাসে তোমার গোলাপ বাগানের পরাগ-গন্ধ অনুভব করিলেও করিতে পারি।—

ওহে জামের-ভোজ-ওয়ালা সাকী—তুমি বাঁচিয়া থাক। তাই আমাদের সাধ—যদিও তোমার ঢালা-ঢালিতে আমাদের পেয়ালা ভরিল না।

উপান্ত-প্রান্তর হইতে যদিও আমরা দূরে আছি—আমাদের আকাঙ্ক্ষা দূরে নাই। তোমার রাজার আমরা দাস—এবং তোমার আমরা স্তুতিগায়ক।

ওহে রাজার রাজা—সমুচ্চ তারকা! দোহাই ঈশ্বরের আমাকে একটি ভিক্ষা দাও—যেন আকাশের মত তোমার সভাতলের ধূলি আমি চুম্বন করিতে পারি।

হাফিজ একটি প্রার্থনা করিতেছে—শোন। 'তথাস্তু' বল। আমার প্রতিদিনের খাদ্য যেন তোমারি সুধাক্ষরণকারী ঠোঁটদুটি হয়।

৩

সাকী, সুরার আলোকে আমাদের পেয়ালা দ্যুতিমান কর। গায়ক গাও—বল জগতের কাজ আমাদের সাধমতই সম্পন্ন হইয়াছে!

পেয়ালায় আমরা প্রিয়তমের মুখচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছি। ওহে অজ্ঞ মূর্খ—যারা আমাদের অনিবার সুরাধারাপানের আনন্দের খবর জানো না।

যত লাজুক চোখ যত (ক্ষুদ্র) ঋজুদেহের সৌন্দর্য্য শুধু ততদিনই—যতদিন না দেবদারুদ্রুমের মত মন্দগমনে আমাদের cypress (আমাদের পাশে) চলিয়া আসে।

যার প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত—সে লোক কখনো মরে না—জগতের ইতিবৃত্তে আমাদের জীবনেতিহাস অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

অভ্যুত্থানের দিনে ও সব লাভে কুলাইবে না। শেইকের শাস্ত্রসম্মত রুটিতে বেশী ফল হইবে না—আমাদের শাস্ত্রছাড়া পানিতেই বেশী ফল হইবে।

ওরে অনিল, তুই প্রিয়তমদের (গোলাপশয়ন) অথবা (গোলাপবাগান ?) এর কাছ যদি বহিয়া যাস ত, খবরদার ভুলিয়া যেয়ো না প্রিয়তমদিগকে আমাদের খবর দিতে।

হে অনিল, স্মরণ করিয়া করিয়া চেষ্টা করিয়া আমাদের নাম করিতেছ কেন। বিস্মরণ সেইদিনই আসিবে—যেদিন আমরা বিস্মৃত হইব।

আমাদের হৃদয়চোর প্রিয়ের কাছে মাদকতা বড় প্রিয়—তাই আমাদের রাশ সে মাদকতার হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

আমাদের হাজি কিবামের দানের মধ্যে আকাশের মত নীল একটি সমুদ্র এবং একখানি পূর্ণচন্দ্রের মত নৌকা টলমল করিতেছে।

শীতলবায়ুতে টুলিপের মত আমার হৃদয়টি আটকা পড়িল—অদৃষ্টপাখী এখন তুমি কবে আমাদের ফাঁদে আট্‌কা পড়িবে ?

হাফিজ, তোর চোখ হইতে একফোঁটা অশ্রু ফেলিতেই থাক্। হইতে পারে একতার পাখী একদিন আমাদের জালে পড়িবে।

৪

ওহে সুফি এস,—দেখ, পেয়ালার মুকুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এসো রক্তরাগ মণির রঙের আমাদের সে সুরা—তার দ্যুতি দেখিতে পাইবে এখন এস।

আংকাকে (আংকা একটি fabulous পাখী—অদ্ভুত তার কাহিনী) কেহ ধরিতে পারে না। তোমার জাল গুটাও। কারণ এখানে তোমার হাতে কেবল হাওয়ারই জাল আছে।

ঐহিকের সুখের চেষ্টা দেখ। আদমের যখন আর পানী ছিল না, তখন সে নিরাপদ ঘরওয়ালা বাগানটিও ত্যাগ করিয়াছিল।

কালের ভোজে দু-এক গ্লাস খাও—পরে চলিয়া যাও। এখন চিরসহবাস আকাঙ্ক্ষা করিও না।

হায় প্রাণ ! যৌবনের তেজ অন্তর্হিত হইয়াছে—জীবন হইতে তুই একটি গোলাপও তুলিলি না। এখন বুড়া হইয়াছ—এবার যেমন নামকাম তেমন একবার দক্ষতা দেখা (in supplication and lamentation to God)।

অবগুণ্ঠনের নীচেকার রহস্যের কথা মাতাল বদমাইসদের কাছে জিজ্ঞাসা কর—এ রহস্য সম্ভ্রান্ত সভ্য জাহিরেরা জানে না।

তোমার দুয়ারের চাতালে আমরা দাঁড়াইয়া আছি—আমাদের উপর তোমার অনেক কাজের দাবী। মহাশয়, আর একবার ফিরিয়া চাও—তোমার নফরদের দিকে।

সুখের বাসনা সেইদিনই ছাড়িয়া দিয়াছি যেদিন আমার প্রাণ তার রাশ তোমার প্রেমের হাতে তুলিয়া দিল। হাফিজ জামানিদের পেয়ালার শিষ্য। হাওয়া যাও নফরের সেলাম নিয়া জামের শেইকের কাছে জানাও।

৫

ওহে সাকী ওঠ ওঠ, পেয়ালা দাও।

কালের দুঃখের মাথায় ধূলা ছড়াইয়া দাও।

আমার করতলে মদের পেয়ালা দাও—যেন আমি (মাতাল হইয়া) বুকের উপরকার এই নীলবাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি।

পণ্ডিত সাধুদের মুখে আমার দুর্ণামই রটিয়াছে কিন্তু নাম কামের জন্য আমরা ত আকাঙ্ক্ষিত নহি।
আমার জ্বলন্ত হৃদয়ের নিঃশ্বাসধূম্রে এই অপরিপক্ক (অবিবেচকের) দল ভস্ম হইয়া গিয়াছে।
আমার ভগ্নছিন্ন হৃদয়ের গোপন কথাটি জানিতে পারে ছোট বড়র মধ্যে এমন একটি বন্ধু পাইলাম না।
আমার চিত্তসুখ একজন আছে—তাকে লইয়া আমি সুখী—সে একবার আমার হৃদয়ে বিহার করিয়াছিল।
মাঠের Cypress-এর দিকে সে আর ফিরিয়া চায় না যে একবার silver limb-এর Cypress দেখিয়াছে।
হাফিজ, দিনরাত দুখে ধৈর্য্য ধরিয়া থাক—যেন শেষে একদিন তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

৬

আমার হাতে আমার হৃদয় আর নাই। ওহে সাধুগণ—দোহাই ঈশ্বরের। হায় কষ্ট! অবশেষে গোপন রহস্য আর গোপন থাকিতে পারিবে না! আমরা ভাঙ্গানৌকা ডুবিনৌকার লোক! সুবাতাস, একবার ওঠ। হয়তো আবার প্রিয়তমের মুখ দেখিতেও পারি।
দশদিন ধরিয়া আকাশ যাদুমন্ত্রে উজ্জ্বল নির্ম্মল হইয়া আছে। আমাদের লুটের মাল হচ্চে সখাদের মাধুর্য্য।
কালরাত্রে গোলাপ এবং সুরার সভায় বুলবুল মধুরস্বরে গাইয়াছিল—
"ওহে সাকী সুরা দাও, ওরে মাতালের দল বেঁচে ওঠ।"

একখানি চিঠি

সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি রথীর অধ্যাপনা কার্য্যে তোমার যত্নের ত্রুটি হইবে না তাই আমি এত নিশ্চিন্ত আছি। বিদ্যালয় খুলিলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে আমি সেই কথাই ভাবি। নূতন দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার সংকল্প হইয়াছে। বিপিন বাবু ত শীঘ্রই আসিবেন। আরো একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে তুমি বোধ করি রথীর প্রতি পূরা মনোযোগ দিতে পারিবে। রথীকে সাহিত্যে যথার্থভাবে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে তুমি ছাড়া আর কাহারো প্রতি আমি নির্ভর করিতে পারি না। কেবল সাহিত্যে কেন, তুমি তাহাকে মনুষ্যত্বেও অগ্রসর করিতে পারিবে। আজ আমি তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি,[১] হয়ত তোমাকে তাহা সে দেখাইতেও পারে। সে দিবারাত্রি বিদ্যালয়েই থাকে এই আমার অভিপ্রায়। তাহা হইলে তাহার মন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না।

যদিও স্থানটি রমণীয়, চারিদিক ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পাখীর কলগানের বিরাম নাই, দিক্‌প্রান্তে তুষার শিখরশ্রেণী তাহার নীল কুহেলিকার আবরণ মাঝে মাঝে মোচন করিতেছে তবু

১ রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' ২, প্রথম পত্র

আমার মন নিয়ত তোমাদের কাছে পড়িয়া আছে। পাখা থাকিলে হঠাৎ এক-এক সময়ে তোমাদের সভার মাঝখানে গিয়া আবির্ভূত হইতাম। আমাদের বাংলাদেশের সেই ঝোড়ো বৈশাখের মাঠ তাহার ধূলিধ্বজা ও মেঘের উত্তরীয় দোলাইয়া আমাকে ডাকিতেছে।

আমার পক্ষে একটা সুখবর আছে। মোহিতবাবু এখানেই আসিতেছেন। আজ রবিবারে তিনি ছাড়িবেন। তাহা হইলে বুধ বৃহস্পতিবারের মধ্যেই তিনি আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন। তাঁহার সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করিবার আছে। আজকাল Myersএর Human Personality and its survival after death নামক বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছি। মনস্তত্ত্বের অপরূপ রহস্যের মধ্যে তলাইয়া গেছি। আশ্চর্য্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানা-স্থানেই আমি এই সকল কথা বলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে আমি নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের বার্ত্তা নানা ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ সময়েই এই প্রয়াস আমার নিজের ইচ্ছাকৃত নহে— আমার অন্তঃপুরবাসিনী "কৌতুকময়ী" আমাকে দিয়া কখন কি লিখাইয়া লইয়াছেন তাহা আমাকে তখন জানিতেও দেন নাই। মোহিতবাবুকে এই মনস্তত্ত্বের রহস্যতলে একবার নামাইয়া দেখিতে চাই— তিনি তত্ত্বজ্ঞানের ডুবারি— তাঁহার কাছে তলদেশের যদি কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

Naturalist in Laplata পড়িতেছ শুনিয়া বড় খুসি হইলাম। ঐ বইটি পড়িয়া আমি নিবিড় আনন্দ পাইয়াছি। কোন ইংরাজি বইয়ে আমি প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের এমন আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা কেবল ঘরে বসিয়া বই পড়িয়া পড়িয়াই মাটি হইলাম— মুক্ত আকাশের নীচে চীৎ হইয়া পড়িয়া তৃণশ্যামল বসুন্ধরাকে যদি এমন একাগ্রমনে পড়িতে পারিতাম তবে ধন্য হইতাম। প্রকৃতিদেবীর অন্তঃপুরের মধ্যে এমন করিয়া আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। ইংরাজের মধ্যে বোধ করি এই একটি লোককে দেখিলাম। মেটারলিঙ্কের "মৌমাছি" এমনি আর একটি পড়িবার বই।

চিঠির সেই দুখানি খাতা মোম জামা দিয়া মজবুৎ করিয়া মুড়িয়া রেজেষ্টি করিয়া পাঠাইয়ো। কুঞ্জবাবুকে বলিয়া দিলে তিনি বোধ হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যাহাতে রসিদ ফিরিয়া পাও এমন রেজেষ্টি করিতে বলিয়ো।

আজ ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। একে চারিদিকে নীল পর্ব্বতমালা, তাহাতে আকাশে স্তরসঞ্চিত মেঘ, বেশ ঢাকা পড়িয়া গেছি। আজ ছুটি। গুরগুর করিয়া মেঘ ডাকিতেছে। বাদ্‌লার হাওয়া দিয়াছে। শ্যামল বনের উপর সজল মেঘের ছায়া ঘনাইয়াছে। উদ্বিগ্ন দাঁড়কাক কোথায় আশ্রয় লইবে স্থির করিতে না পারিয়া তারস্বরে দুশ্চিন্তাপ্রকাশ করিতেছে। আজ তোমাদের বাঁধের ধারের তালীবনশ্রেণীর উপরেও এতক্ষণে বোধ হয় মেঘ করিয়া আসিল।

অজিতের চিঠি পাইয়া খুসি হইয়াছি। কালবৈশাখী ঝড়ের নেশায় তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই কি? এখানে পাহাড়ের মধ্যে সে মদিরারস নাই।

আজকাল আমার শরীর ভালর দিকে চলিয়াছে। তোমরা সকলে কেমন আছ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিবার

দুই বন্ধু

শ্রীলাবণ্যলেখা চক্রবর্তী

সতীশচন্দ্রকে একবারমাত্র বালিকাবয়সে দর্শন করিয়াছিলাম— সেবার তিনি তাঁহার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লইয়া বরিশালে আমাদের পল্লীভবনে গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, বহির্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ আটচালায় খেলিতেছিলাম, এই সময় দুই তরুণ প্রবেশ করিলেন, একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর মর্মভেদী, অপরজনের মুখ বড়ই স্নেহভরা, চোখের দৃষ্টি শান্ত-স্নিগ্ধ— তিনিই দু-একটি প্রশ্ন করিয়া কাহাকে যেন ডাকিতে বলিলেন। পুকুরপাড়ের সুপারি ও নারিকেলগাছের শ্রেণীর মধ্যে পথ ধরিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন, সে দৃশ্যও একটু একটু মনে পড়ে।

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতি আমার এই পর্যন্ত। আমার শ্বশুরপরিবারে সতীশচন্দ্র তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে বিশেষ একটি আসন লইয়াছিলেন, সেই কথাই যেরূপ শুনিয়াছি লিখিব।

এফ. এ. পাশ করিয়া সতীশচন্দ্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসিলেন। সতীর্থ অজিতকুমার বয়সে কয়েক বৎসরের ছোট হইয়াও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন; ক্রমশ অজিতকুমার জানিলেন, সতীশচন্দ্রের বাসস্থান নাই, দুইদিন নিয়মিত আহারও হয় নাই। অজিতকুমার নিজেই তখন বালক, এমন অর্থসংগতি নাই যে বন্ধুকে সাহায্য করেন। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে অনেক রাত্রি জাগিয়া বাড়িতে তিনি পড়াশুনা করিতেন; নিজের আহার ঢাকা দেওয়া থাকিত, তাহাই দুইজনে ভাগ করিয়া খাইতেন। ক্রমে তিনি মাকে বলিলেন, সতীশ বাড়িতে থাকিলে তাঁহার পড়াশুনার সুবিধা, দুজনেই বি. এ. পড়েন, আর সতীশও তাঁহার নিজ ব্যয়ভার বহন করিবেন।

অজিতকুমারের জননী বলিতেন, 'অজিতের পিতৃবন্ধু, পরিবারের অভিভাবকস্থানীয় কেহ কেহ অজ্ঞাতকুলশীল এই যুবককে পরিবারে আশ্রয় দেওয়ার অনুকূলে ছিলেন না। কিন্তু দুই-চারদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম, সতীশ যে-সে ছেলে নয়, সে এ পৃথিবীর স্বার্থকলুষমুক্ত, সম্পূর্ণ অপার্থিব ধাতুতে গড়া। যেমন তার অসামান্য জ্ঞানানুরাগ, তেমনি তার বিনয় ও স্বভাবের মাধুর্য। সমাদরে উৎকৃষ্ট আহার্য দিলে যেমন খুশি, শুধু ডালভাতেও সেইরূপ তুষ্টি, কিছুতেই তার বিরক্তি ছিল না। খাইতে ডাকিতে গিয়া দেখিতাম, অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুজনেই পাঠে বা গভীর আলোচনায় নিমগ্ন, খাবার প্রায় ঢাকা পড়িয়া থাকিত। সতীশের মুখে চোখে একটি দিব্যভাব বিরাজ করিত। সে বড় আত্মভোলা ছিল, শিশুর প্রতি যেমন দয়া হয় তার প্রতিও তাই হইত।'

শুনিয়াছি, অজিতকুমার একদিন ভৃত্যকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতেছেন দেখিয়া সতীশচন্দ্র তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া অনুযোগ করিলেন, 'তুমি উহাকে তিরস্কার করিলে কেন?' অজিতকুমার উত্তর দিলেন, 'ওর নির্বুদ্ধিতা অসহ্য।' সতীশচন্দ্র বলিলেন, 'তা হোক। বহু পুরুষ ধরিয়া উহাদের দাস করিয়া রাখিয়া আমরা উহাদের সেবা আদায় করিতেছি, আমাদের চাপেই উহাদের মানসিক শক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে। আমরা যে মানুষ ওরাও তাই—আমরা কিছু উহাদের প্রভু নই; ওরা যে-সব কাজ করিয়া দেয় আমরা বিনিময়ে বেতন দিই, এই পর্যন্ত।' — সেকালে এরূপ মনোভাব সুলভ ছিল না।

বি. এ. পড়িবার সময়ই সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন, সে ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

‘এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

‘এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্পবয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয়, অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

‘আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল ক'রে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

‘একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

‘কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় ক'রে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে-ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজী সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারো মধ্যে পাই নি। যে সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজী ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নিচেকার পইঠা পার ক'রে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে, সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য

শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।'

—'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (বিশ্বভারতী), আষাঢ় ১৩৪৮

'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। তারপরে সেই কবি-বালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

'বি. এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রী করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে, অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল।…তার পরে যে-সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না, এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতিমুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

'এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত, সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দু-জনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দন-মন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

'এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে

কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল-তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।'[১]

—"আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন

অজিতকুমারও সতীশচন্দ্রের অনুগামী হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি মাকে বলিলেন, 'কি হইবে বি এ. ডিগ্রী লইযা, ডিগ্রীতে কি বিদ্যা বেশি হইবে?' মা বলিলেন, 'তুমি এখনো নাবালক, তোমাকে যে এত চেষ্টা করিয়া বি. এ. পড়াইলাম তাহা কি পরীক্ষা না-দিবার জন্য? তুমি যদি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দাও যে আসিয়া বি এ পরীক্ষা দিবে তবেই সতীশের সঙ্গে তোমাকে শান্তিনিকেতনে যাইতে দিব।' সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতনে আসিলে অজিতকুমারও সেখানে আসিতেন; অজিতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একখানি চিঠিতে দুই বন্ধুর সাহিত্যচর্চার একটি চিত্র পাই—

ওঁ

Thompson House
Almora

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি পাইয়া বড খুসি হইলাম। তোমরা যে দুটি মধুকরের মত শান্তিনিকেতনের নীলাকাশ শতদলের প্রচ্ছন্ন মধুটুকু স্তব্ধ হইয়া আনন্দে উপভোগ করিতেছ ইহা আমার পক্ষে সুসংবাদ। তোমরা যেখানে যাত্রা করিতেছ তাহার পথ কাহাকেও দেখাইয়া দেওয়া চলে না। শান্তিনিকেতনে আমি এতদিন ধরিয়া এত লোক জোটাইয়াছি, কত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই মাঠের উপর দিয়া মৌন সন্ন্যাসীর মত চলিয়া গেছে,—কে বা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে প্রশ্ন করিয়াছে, কে বা এই দিগন্তপ্রসারিত আকাশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া বিশ্বলোকের সহিত অন্তরাত্মার নিগূঢ় যোগ অনুভব করিয়াছে? তোমরা, কি বিশ্বের, কি মানবপ্রকৃতির, কি সংসারের, কি সাহিত্যের বহির্দ্বারের জনতা ছাড়াইয়া নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর স্বহস্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ ইহাতে আমি আশান্বিত হইয়াছি। পাণ্ডবগণ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাকে ছাড়িয়া একা কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন। তোমরাও পুঁথিগত অভ্যস্ত বিদ্যার পথ, সহস্রের পথ, সমালোচকের পথ ছাড়িয়া নিজের অন্তরতম ধ্রুব আদর্শের এক মহাপথ ধরিয়া সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইবে এই আমি আশা করিতেছি। সতীশের সম্মুখে একটি সার্থক পরিণাম প্রতীক্ষা করিয়া আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি— তুমিও তাহার সঙ্গী হইবে এই আমার কামনা।…ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া অজিতকুমার শান্তিনিকেতন যাত্রা করিতে উদ্যত হন, তাঁহার মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জননীও বিপদের মুখে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি

১ সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, এই সংখ্যার অন্যত্র তাহা মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক

করেন নাই। রবীন্দ্রনাথও এই সঙ্গে যাইবেন এইরূপ স্থির হয়; কিন্তু সময় যে এরূপ আসন্ন তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই— সতীশচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের শেষ দেখা হইল না। 'অজিত' 'অজিত' বলিতে বলিতে সতীশচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া অজিতকুমারের বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইল। সংবাদ জানিয়া সতীশচন্দ্রের পিতামাতা দিদি সকলেই অজিতকুমারের গৃহে আসিলেন। সতীশের মাতা অজিতকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সর্বক্ষণ ক্রন্দন করিতেন— 'তোকে দেখে আমি সতীশের শোক সংবরণ করতে চাই— ওরে, সে যে আমার বহু দুঃখের বহু তপস্যার ধন, সে যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ এসেছিল।' সতীশের মাতার চরিত্র কতকটা 'গোরা'র হরিমোহিনীতে আঁকিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বলিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া অজিতকুমার সতীশচন্দ্রের চরিত্র ও শিক্ষণরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছেন—'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থখানি বহুকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহা হইতে বিস্তারিত উদ্ধৃত করিতেছি।—

'তৃতীয় বৎসরে সতীশচন্দ্র রায় এই আশ্রমে আসিলেন। 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থে এবং তাহার ভূমিকায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় আরও বেশি করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ তিনি এই আশ্রমের আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

'তিনি অল্পবয়স্ক কলেজের ছাত্র ছিলেন কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের রসসমুদ্রের মধ্যে তিনি অহোরাত্র ডুবিয়া থাকিতেন; সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা, ফরাসীস্ ও জর্মণ কবি ও রসজ্ঞদের রচনার ভাবরস সকাল হইতে দ্বিপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ও রাত্রির অনেক প্রহর পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া আনন্দে এমন ভরপুর হইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। যে তাঁহার নিকটে আসিত তাহাকে তিনি সেই নেশা ধরাইয়া দিতেন। ব্রাউনিংএর কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার আলোচনা পাঠ করিলে সেই আশ্চর্য রসগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ভাবরস তাঁহার কাছে পুস্তকের ছাপা পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল মনে করিলে ভুল হইবে, সেই ভাবরসকে তিনি অপর্যাপ্ত অফুরন্ত উপভোগ করিতেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে। তিনি যে নেশা ধরাইতেন সে নেশায় আমাদের সকলকে তিনি ক্ষুদ্র আলাপ ও প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জঞ্জাল হইতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-উৎসবক্ষেত্রে বসাইয়া দিতেন; প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ পূর্ণ হইয়া উঠিত। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—সমস্ত আকাশ যে আনন্দ তাহা আমরা তাঁহার মূর্তি দেখিলেই এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিতাম।

'এ প্রকার সৌন্দর্যভোগ প্রায়ই দেখা যায় মানুষকে খুব অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে লইয়া যায়— অনেক কবির জীবনের ইতিহাসে তাহা আমরা দেখিয়াছি। সতীশ এমন প্রবল ভোগী ছিলেন, অথচ আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। যখন ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহার নিঃস্ব অবস্থায় যাহা থাকিত তাহাই দান করিয়া বসিতেন, ছেঁড়া মলিন বস্ত্র পরিয়া ও মাদুরে শয়ন করিয়া কাটাইতে তাঁহার কষ্টবোধ হইত না। কলিকাতায় তাঁহার বাসায় তাঁহার হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশা দেখিলে সেখানে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে হইত। দারিদ্র্য যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কররূপে ঘিরিয়া আছে

তাহা সেই নিয়তরসপিপাসু কবিটি বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেনই না। আনন্দের সম্পদ তাঁহার এতই অধিক পরিমাণে ছিল।

'তাঁহার বিদ্যালয়ে আত্মোৎসর্গ এক দিনেই স্থির হইয়া গেল। তাঁহার পরিবারের ঘোরতর দৈন্যদশা, পরীক্ষা দিয়া মানুষ হইলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল, তিনি এখানে আসিয়া আপনাকে নিঃশেষে দান করিলেন। অথচ সে ভাব তাঁহার মনেই ছিল না, তিনি বরাবরই ভাবিতেন যে তিনি অত্যন্ত অযোগ্য কৃপাপাত্র— নিজের সম্বন্ধে লেশমাত্র অভিমান তাঁহার মুখে কোনোদিন কেহ দেখেন নাই।

'কলিকাতার বাসাবাড়ির মলিন, অন্ধকারপূর্ণ, দারিদ্র্যময় গৃহকোণকে যে স্বর্গলোক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কাছে বোলপুর তো স্বর্গেরও বাড়া। শিশু যেমন তাহার মাতৃদুগ্ধ অহোরাত্র শোষণ করিয়া বাড়ে, তিনি এই আশ্রমপ্রকৃতিকে এই আদর্শকে এই কর্মকে আনন্দকে শোষণ করিয়া দিনরাত রসে, মাধুর্যে, ঔদার্যে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহিলেন। না তাঁহার কাজের বিরাম ছিল, না তাঁহার রচনার বিরাম ছিল, না সৌন্দর্য উপভোগের বিরাম ছিল। আশ্রমবালকদের মধ্যে সেই আনন্দের বিদ্যুৎসঞ্চার তিনি করিয়াছিলেন, তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত যে তাহারা পৃথিবী-মাতার স্পর্শ পাইতেছে। বুঝা যাইত Three years she grew in sun and shower-এর কবি মিথ্যা কথা লেখেন নাই।

'তাঁহার অধ্যাপনা তেজে আনন্দে আবেগে এমনি পরিপূর্ণ ছিল যে তাহা ভাবসৃষ্টিরই মতো বোধ হইত। তাঁহার আনন্দ যে কি প্রচণ্ড কি প্রবল কি ভয়ঙ্কর তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই— কারণ দুঃখের বিষয় আমাদের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহার নিদর্শন সামান্য। পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়মনের সত্য উদ্বোধনকার্য যাহাতে হয়, সেইদিকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। সতীশের অধ্যাপনায় সেই কাজটি হইত। তিনি বাংলা পড়াইতেন,—যেখানেই রচনার মধ্যে কোনো বর্ণনার আভাস আছে সেখানে তাহার স্ফুটনে বালকদিগকে লাগাইতেন, তাহারা মানসচিত্রে সমস্তটা দৃশ্যের খুঁটিনাটি আশপাশ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়া লইতেন; এম্‌নি করিয়া তাহাদের কল্পনাবৃত্তির বোধন হইত। ছন্দ শুনাইয়া ছন্দবোধ এবং ছন্দরচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন। সাহিত্য পড়াইতে গেলে যে তাহার ভিতরের আসল জিনিস রসবোধ কি করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয় তাহা ইনি জানিতেন আশ্চর্যরূপে। প্রকৃতি-গ্রন্থেও ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট করিতে এই প্রকৃতির ভক্তটি ওস্তাদ ছিলেন। তাহাদের কাছে প্রকৃতির একটি রূপও অগোচর থাকিত না, প্রতিদিনের আবহাওয়া— সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান— মেঘবৃষ্টি, ফুলফলের উন্মীলন, পক্ষিপরিবারের নানা কথা— সমস্তই চোখের সামনে মেলা ছিল। "কোথা গিরগিটি বাহিরিয়া আসে, মাথার জটার করাত প্রকাশে," এবং "কোথায় গোসাপ, থরজিভ্‌ লুহি লুহি ধীরে চলে, সেথায় শুকনো পাতাগুলিতলে"— তাহাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জানা ছিল। বর্ষায় তাহারা বাহির হইত, জ্যোৎস্না রাত্রে কে তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিবে? বৈশাখের ঝড়ে তাহারা ধুলায় গড়াগড়ি যাইত— তিনি তাহাদের উপভোগকে,

কল্পনাকে, হৃদয়কে, এমনি করিয়া জাগাইয়া ছিলেন। "গুরুদক্ষিণা" যদি কেহ ভাল করিয়া পড়েন, তবে এই কথার পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন, কারণ ও বইটি যেন আশ্রমেরই স্বহস্তের রচনা।

'অবশ্য প্রতিভা আমাদের অদৃষ্টে সকল সময় জুটিবে না তাহা জানি, সুতরাং সেজন্য আক্ষেপ মিথ্যা। কিন্তু আমি গোড়াতেই বলিয়াছি যে এ আশ্রমের মর্মগত সাধনা একটি আছে, যাহা ইহার আদিগুরুর সাধনা ছিল। সে হচ্ছে সত্যের কাছে ফলাফল বিচারহীন আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ নিজের অহংকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া। নিজের দিকে কিছুই না টানিয়া রাখিয়া, সত্যের দিকে সমস্তই মেলিয়া ধরা। ত্যাগ যদি ধনের ত্যাগ বা আনন্দের ত্যাগ হয়, আরামের বা সুখের ত্যাগ হয়, তবে তাহা সত্য ত্যাগ হয় না, তাহা ত্যাগের বাহিরের রূপ হয় মাত্র, কারণ সত্য ত্যাগ একমাত্র আত্মত্যাগ। আপনাকে ভোলা। সতীশের সেই আপনাভোলা ত্যাগ ছিল— সেই দিক্ দিয়া— প্রতিভার দিক্ দিয়া নয়— তিনি আশ্রমের এত ভিতরে গিয়াছেন। তাঁহাকে দিয়া আমাদের আদর্শের সত্যতা ও তাহার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষবৎ বুঝিবার সাহায্য হইয়াছে।

'[ব্রহ্মবান্ধব] উপাধ্যায় মহাশয়ের সময়ে ছাত্রগণ কঠোর নিয়মসংযমে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বলিষ্ঠ হইবার দিকে উৎসাহ পাইয়াছিল। সতীশের সময়ে সে শিক্ষা পুরাপুরি ছিল এবং সেই সঙ্গে আনন্দের শিক্ষা, বিশ্ববোধের শিক্ষা আসিয়া আশ্রমকে কেবল বাহিরের দিক্ হইতে নয় ভিতরের দিক্ হইতে গড়িয়া তুলিল। সতীশের সহযোগীগণ অনেকেই খুব পৌরুষভাবাপন্ন দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সুতরাং অভ্যাসের দিক্ হইতে তাঁহারা বালকদিগকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিলেন। দুয়ের সামঞ্জস্যে তখন আশ্রমশ্রী চমৎকার খুলিয়াছিল।'

এই তো গেল আশ্রমজীবনের কথা; অজিতকুমারের ব্যক্তিজীবনে সতীশচন্দ্র কি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন অনেক চিঠিপত্রে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এইরূপ একটি চিঠির একাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করি। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অজিতকুমার পনেরো বৎসর জীবিত ছিলেন। এমন দিন অল্পই গিয়াছে যেদিন তিনি সতীশচন্দ্রের কথা আলোচনা করেন নাই। চিঠিপত্র ও খাতা হইতে উদ্ধার করিয়া সতীশচন্দ্রের রচনা তিনিই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহারই উৎসাহে পিয়ার্সন সাহেব সতীশচন্দ্রের রচনার অনুরাগী হন ও ইংরেজিতে 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি কোনো কোনো রচনা অনুবাদ করেন। মৃত্যুর দু-একমাস পূর্বে অজিতকুমার বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর স্থৈর্য ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল সতীশের জীবনে।

ওঁ

পূর্ণিমারাত্রি
বৃহস্পতিবার
বাংলা ১৩১৬

...আজ সতীশের মৃত্যুবাৎসরিক— মাঘী পূর্ণিমার দিন আজ। সতীশকে তুমি জান না, নামই শুনে থাকবে। গুরুদেব আজ বলছিলেন যে তাঁর মত একদিকে অমন ভাবরসে সৌন্দর্যে মহত্ত্বে উদ্বেল হৃদয় অন্যদিকে অমন কঠোর তপস্বী অত বড় ত্যাগী তিনি আর কাউকে দেখেন নি—বলছিলেন

যে তাঁকে ভিতর থেকে যদি কেউ চালনা করে থাকে তা সতীশ করেছেন।··· গুরুদেবকে তিনি কি করেছেন্ তা আমি জানি না কিন্তু আমি তাঁকে বাদ দিয়ে অস্তিত্বহীন। অত আর কাউকে ভালবাসিনি— ভালবাসতে পারব কিনা তাও জানি না। আমার সমস্ত জীবনকে ভিতর থেকে তাঁরি অদৃশ্য সত্তা আজও গড়ছে। তিনি আমায় তাঁর সহচর করে নিয়েছিলেন কেন তা তিনিই জানেন। আমি কি। অতখানি সত্য হওয়া সে কি আমার কাজ। একদিন হয়ত একমুহূর্তে সত্য হই, প্রতিদিন তো হই না— সমস্ত জীবনভোর তো হই না। আমার সে মোহমুক্ত দৃষ্টি কোথায়? প্রকৃতি আমার কাছে শূন্য— তার সঙ্গে সে উন্মাদ পরিচয় কোথায়, সে অব্যবহিত মিলন কোথায়? তবু তিনি যে এত বড়— তিনি আমায় বেছে নিয়েছিলেন। জগতে তাঁকে কেউ চেনেনি, আমি তাঁকে জানি। আমার হৃদয়ে তাই তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই।······

সতীশ আমাকে যদি ভাল না বাসতেন তবে আজ আমার দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। তিনি সকলের সব অসম্পূর্ণতা ভেদ করে দিব্যচক্ষে সবাইকে বড় করে দেখতে পারতেন। ভালবাসা তাই করে। সে কি পাত্রাপাত্র যোগ্যাযোগ্য বিচার করে।······ সে আমার মানস শরীরকে জন্ম দিয়েছে—আমি তার রক্তমাংসে গঠিত সে আজ আমাকে শূন্য করে কখনই রেখে যাবে না।

অজিত

স্বীকৃতি

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত সতীশচন্দ্রের দুইটি কবিতা, হাফিজের অনুবাদ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী, অজিতকুমারের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সতীশচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অজিতকুমারের মৃত্যুর পরে এই দীর্ঘকাল নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে এই সকল পাণ্ডুলিপি তিনি যত্ন ও ধৈর্যের সহিত রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তিনি সাহিত্যরসিকদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত সতীশচন্দ্রের পত্রাবলী শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত।— বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

কবি-তাপস সতীশচন্দ্র

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে ধর্মচর্যার মতো ক'রে জীবনের গভীরতম সাধনায় পরিণত করবার আদর্শ আমাদের কাছে আজ নূতন ব'লে মনে হয় না। বোধহয় অত্যুক্তি হবে না এ-কথা, বললে যে তার প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালস্থায়ী শিল্পীজীবনে আমরা এই আদর্শের একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। কাব্যরচনা ও জীবনরচনা যে কেমন ক'রে একই বৃহৎ-রচনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ হয়ে ওঠে তারই অব্যর্থ প্রমাণ আমরা দেখেছি আমাদেরই সমকালীন একটি কবির জীবনে, এ বড়ো কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করেছে, সেই কাব্যই আবার তাঁর জীবনকেও ক্রমাগত রচনা করেছে, রূপ দিয়েছে। একটি পুরাতন চিঠিতে এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে অতি চমৎকার বুঝিয়ে বলেছেন।—

"আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগত, জীবনের অন্তর্জীবন স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠেছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।"

উপমার সাহায্য নিয়ে তিনি তাঁর জীবনকে তাই বলেছেন বীজকোষ, যাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনা পদ্মের দলগুলির মতো একে একে বিকশিত হয়েছে। কাব্য ও জীবনের এই যে অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ— আমাদের কাছে আজ আর তা কোনো অবচ্ছিন্ন, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ কল্পনার বিষয় নয়। অতি দুর্লভ এই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফলে কবি বা সাহিত্যিকের জীবন সম্বন্ধে ধারণাও আমাদের অত্যন্ত বৃহৎ ও গভীর হয়েছে। তাঁদের কাছে দাবি বেড়ে গেছে মানব জীবনের সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত। শুধু কলানৈপুণ্যই একমাত্র মাপকাঠি রইল না কোনো কবিপ্রতিভার, কারণ কবির কবিতা আমাদের দৃষ্টিতে আজ রূপ, রূপক, ভাষা বা ছন্দের নিপুণ কলাকৌশল মাত্র নয়। কবি অথবা শিল্পীর জীবনে কাব্য বা শিল্পের শুধু কেবল চর্চা নয় 'চর্যা'য় পরিণতি না দেখতে পেলে কোথায় যেন আমরা একটি গভীর অসম্পূর্ণতা বোধ করতে থাকি। অন্তত সে ধরনের আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা দেখলেও কোনো শিল্পী বা কবিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ব'লে বাতিল করবার প্রবৃত্তি হয় না। একদিন সাহিত্যের রাজ্যে যাঁদের দুর্বিনীত আধুনিকতার ধ্বজাবাহী বলে জানতাম আজ যখন তাঁদের মুখেও প্রশ্ন শুনি, "সাহিত্যের উপর আমাদের কি শুধু এই দাবি যে সে আমাদের অবসরের সুখসঙ্গী হবে? কিংবা আজ এই মুহূর্তে আমরা যা ভাবছি, করছি, চাচ্ছি, তারই একটা জলজ্যান্ত ছবি এঁকে খুশি করবে? কিংবা সাংসারিক জীবনে আমাদের যত

কষ্ট, বিপদ, দুশ্চিন্তা, তা থেকে রক্ষা পাবার রাস্তা বাৎলাবে ?" এবং তাঁদের যখন বলতে শুনি, "সাহিত্য অবশ্যতই নীতিনির্ভর", "সাহিত্য চিত্তশুদ্ধিরই জনক", "চিত্তশুদ্ধির গভীরতার অনুপাতেই সাহিত্যের স্তরভেদ", "সাহিত্যের প্রভাব ধর্মের প্রভাবেরই মতো"-- তখন আশ্চর্য না হয়ে বরং আমাদের ইতিপূর্বের উক্তিগুলির সত্যতা আরো সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি।

রবীন্দ্র-'কাব্যগ্রন্থে'র সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেন একদা তাঁর একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "অনেক সময় আমরা কবিহৃদয়ের গভীরতা, seriousness প্রভৃতির উল্লেখ করে থাকি কিন্তু তার একটি concrete দৃষ্টান্ত দেখলে তবে কথা সার্থক হয়। আমার সৌভাগ্য এই যে আমি এক কবিকে দেখেছি। অন্য কত জায়গায় কবিকে অনুমান করতে হয়— সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া অন্য জিনিষ।" যে কবির মধ্যে তাঁর সমগ্র কাব্যচর্চা একটি সুসংগত জীবনচর্যায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল, মোহিতচন্দ্রের এ উচ্ছ্বাস নিঃসন্দেহে সেই জাগ্রত কবিমূর্তি সন্দর্শনের আনন্দোচ্ছ্বাস। 'আমি এক কবিকে দেখেছি'— এই কয়টিমাত্র কথায় কত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কী বৃহৎ সৌভাগ্যের কথাই না বলা হয়েছে !

সতীশচন্দ্র রায় সম্বন্ধেও কোনো কথা লিখতে গেলে সর্বাগ্রেই ঘোষণা করতে ইচ্ছা হয়— আমরাও এক কবিকে দেখেছি। তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দেখবার বয়স নিয়ে জন্মাই নি, তবু মনে হয় যেন তাঁকে অনুমানে নয়, স্পষ্টই দেখেছি এবং জেনেছি ; অতি নিকট থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রাণের ভাষায়। নিতান্তই স্বল্পপরিসর তাঁর যে রচনা, স্থানে স্থানে অপরিণত বোধ হলেও এত অব্যর্থ তার আবেদন। সে রচনার কিছু পেয়েছি হাতের কাছে মুদ্রিত আকারে (দুষ্প্রাপ্য হয়েছে আজ তাঁর সে মুদ্রিত রচনাবলীও), বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে সন্ধান ক'রে কিছু পেয়েছি তাঁর আগ্রহ-অধীর হস্তাক্ষরে, নিতান্তই জীর্ণ দশায়। তাঁর রচনার আর যা পেয়েছি তা অক্ষরে নয়, আভাসে, নানা লগ্নে, শান্তিনিকেতনের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে— প্রত্যূষের জনবিরল আম্রকুঞ্জে ও শালবীথিকায়, প্রখর মধ্যাহ্নের রৌদ্রপিঙ্গল তরঙ্গায়িত খোয়াইডাঙায়, সায়াহ্নে সুবিশাল প্রান্তরসীমার সুদূর সূর্যাস্তচ্ছটায়, মধ্যরাত্রে আকাশ-ভরা স্তব্ধতার অজস্র নক্ষত্রলীলায়—কবিমনের সে রাজ্যে "মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত প্রান্তর মুখোমুখী হইয়া চাহিয়া থাকে, তরুলেখাশূন্য চক্রবালে···মৃত্তিকা অসীম আকাশসমুদ্রের প্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া যেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে।" সেখানে "বিরাট বোলপুরের মাঠ,—রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয়, সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায় এবং অন্ধকারে চান্দ্রমসী ভাষা তারকী ভাষা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে।" "কিন্তু মাঠের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শান্তিনিকেতনের দিকে, পিছনের দিকে প্রেরণ করিলে গাছগুলি বড় চমৎকার। এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কেমন গাঢ় সবুজ স্নিগ্ধ পাতার রাশি! চমৎকার! কোনো হোমের জলন্ত বহ্নির মধ্যে নবজলধরমূর্তি গোপবেশ বিষ্ণুর মতো ; ছেলেদের দারুণ জ্বরের সময়ে মায়ের সস্নেহ হাত-বুলানোর মতো।" —সতীশচন্দ্রের রচনার এই জীবন্ত পরিবেশের মাঝখানটিতে দাঁড়ালে তাঁর সতেজ সবল, অথচ অত্যন্ত কোমল কবিমানসটির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করা যায়। অনুভব করা যায় পৃথিবীর উদয়-অস্তাচলের যুগল-ঘাটে সূর্যকিরণস্রোতে সহসা একদিন ভেসে এসে ঠেকেছিল যে কিশোর কবিজীবন, ইন্দ্রনীল আকাশ ও স্বর্ণবর্ণ রবিকিরণ কী প্রত্যক্ষভাবে তার মর্মের গভীরে নেমে মধু-ভাণ্ডারটিকে পলে পলে পূর্ণ ক'রে তুলেছিল ; তার জীবনের দলগুলিকে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ও রসে কী পরিপূর্ণভাবে সরস ও সঞ্জীবিত করেছিল।

১২৮৮ সালের মাঘ মাসে বরিশালে উজিরপুর গ্রামে সতীশচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৩১০ সালের মাঘীপূর্ণিমায় বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি বসন্তরোগে মারা যান। মাত্র বাইশটি বৎসরে অকস্মাৎ-অসমাপ্ত এই জীবনটিকে অপ্রত্যক্ষ বলে বোধ হয় না এক মুহূর্তের জন্যেও। সতীশচন্দ্রের কয়েক-পৃষ্ঠার 'ডায়ারি' থেকে অনায়াসে উদ্ধার করা যায় তাঁর জীবনের যে আলেখ্য তা অনুমানের বিষয় নয় একেবারেই, প্রাণের সরসতায় তা একান্তই সজীব।—

"ছেলেবেলার 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত! বর্ষাবিদ্যুতের গর্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল। ভিতরে থাকিতে আমার বিরক্ত লাগিত। মা পিসিমা ভাই বোনের স্নেহের মধ্যে আমার একটি সুন্দর বাল্যঘর ছিল। সেই আমাদের সরল অথচ সাধারণ হইতে তফাৎ dignity-বিশিষ্ট ঘরটিতে কত শান্তিই ছিল। রামায়ণ পড়া, যাত্রা শোনা, মা পিসিমা দিদি এবং আরো নানা লোকের কি একটি শান্তির ভাব! শুধু অশান্ত ছিলেন বাবা! কিন্তু তাঁরও হৃদয় কত মধুর! স্নেহ কি অপার!

"অনেক দুঃখ গেছে কিন্তু সে বাহ্যিক। আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই দীঘি, সেই বটগাছ আমার কাছে দেবতার মতো বোধ হয়।…

"…সে উজিরপুর গ্রাম। সে এক ইটের প্রকাণ্ড ভাঙাবাড়ি—এখানে যেমন হাওয়ার শব্দ শুনিতেছি, সেখানেও এমনি ছিল…। কিন্তু সেখানে হাওয়া আসিয়াছিল বড় বড় বাঁশবন অশ্বত্থকুঞ্জ সুপারিকুঞ্জের মধ্য দিয়া এলিয়া ঢেউ খেলাইয়া— আর রব তুলিয়াছিল ভাঙাদালানের উপরে-ওঠা তরুণ সব অশ্বত্থবটের উপরে।…মধ্যাহ্নকাল। সকলে ঘুমাইয়াছিল।…তখন বাহির হইতে বড় জ্যেঠা মহাশয় আমাকে ডাকিয়াছিলেন। বুড়ো আমাকে ভালবাসিতেন। বাস্তবিক রক্তের টান কি মধুর। জ্যেঠামহাশয়ের poetic mind ছিল। ৫৫।৫৬ বৎসরের দুর্জনতা সত্ত্বেও সেদিনকার নির্জন দুপহরের রসে তাঁহার বুকের মধ্যে ভাল লাগিয়াছিল। বুকের মধ্যেই বলা যাউক। তিনি আমাকে ডাকিয়াছিলেন উড়ন্ত একপাল পাখির প্রয়াণ দেখাইবার জন্য—…। নির্মল উজ্জ্বল আকাশ—পরিতুষ্ট মেঘ, সরস বনরাজি, নিস্তব্ধ পোড়োবাড়ি, বুড়া জ্যেঠার স্নেহ—…। আমার সেই গ্রাম্য বাড়ি, সেই দারিদ্রক্লিষ্ট পিতা মাতা ভগ্নী, culture-এর অভাবে uncouth, অথচ পরম সুন্দর ভাই এবং আর একটি কালো মেয়ের কথাও মনে পড়িতেছে।"

"কিন্তু সেই সুখের বাড়িতেই আমার বিনাশের বীজও ছিল। অতি প্রশংসায় vanity অলক্ষ্যে তাঁহারা আমার হৃদয়ে জন্মিতে দিয়াছিলেন। তারপর স্কুলে গিয়া, বিশেষতঃ বরিশালে স্কুল কলেজে এই vanity বাড়ে। আরও এক কথা এই যে বরিশাল স্কুলে বাহির হইতে আমাদের উপর morality imposed হইত। আমরা ভিতর হইতে সাড়া না দিয়া বাহিরেই imposition-এর অনুরূপ সাড়া দিতাম। তাছাড়া বিশ্রীভাবে জীবন যাপন করায় ঐ সময়ে একটা কেমন খারাপ হইয়া গেছি। এখনো তার জের টানিতেছি। কিন্তু ওরি মধ্যে গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়। অবশ্য আগেও একটা কবিতার আস্বাদ পাইয়াছিলাম। ছেলেবেলা হইতেই কাব্য পড়া আমার আনন্দ।… কিন্তু গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে

আসিয়া ঠেকিয়াছি।...কি মধুর মধুর কিরণ! কবিতা কেন আসে না? গান কেন আসে না? চিত্রাঙ্গদা কাব্যে পড়িয়াছি চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে, প্রথম যেদিন অর্জ্জুনকে দেখিয়া প্রাণে প্রেম আইল সেই মুহূর্ত্তেই কেন ভাবাবেগের প্রেরণায় সমস্ত শরীর লাবণ্যে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিল? আমিও তাই বলি নিবিড় রবিকিরণ স্পর্শানন্দে সমস্ত হৃদয় কেন চরমতম সুরটি ধরিয়া গাহিয়া উঠে না? কিন্তু একদিন গাইব। সেই সঙ্গে সমস্ত জীবনের গান গাইব।"

সতীশচন্দ্র যখন কলকাতায় বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। অল্প কিছুকাল আলাপের পরেই সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে ১৩০৮ সালের শেষে তিনি তৎকালীন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।

সে সময়ের সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তখন সে কিশোর বয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সংকোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র-মুখে অল্পই কথা। কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণ প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।...বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।"

এর পরের দুটি বছর শান্তিনিকেতন বাসের কালই সতীশচন্দ্রের যথার্থ সাহিত্যরচনা ও সেই সঙ্গে জীবনরচনার কাল। কল্পনার মুক্ত ক্ষেত্র থেকে কর্মের সংকীর্ণ সুনির্দিষ্ট ধূলিধূসর ক্ষেত্রে নেমে এসেও তাঁর সংকল্পের গৌরব তিনি হারান নি, তাঁর অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি—এ সাক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর অনেক লেখায়। "সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম-চেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্তি দেখিতে পাইত, তাহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল।"—এই হল আশ্রমগুরুর নিজের আন্তরিক বিশ্বাস। সতীশচন্দ্রের জীবন ও মনের তৎকালীন ভাবটিও কিশোর কবি নিজেই অতি সবল ও আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর ডায়ারিতে: "আজকাল এমন সৌন্দর্যময় পুরীতে সন্ধ্যামধ্যাহ্নের রঙের তাপের শীতলতার ঢেউয়ের মধ্যে, রবিবাবুর সুন্দর হৃদয়ের স্পর্শের মধ্যে, সরল বালকগুলির স্নেহ ভক্তির মধ্যে আছি, বেশ আছি। আজকাল মনে হয় হে দেবতা, যে তৃষ্ণা মিটাইয়া পান করাইতেছ সংসারের আঘাতের মধ্যে লইয়া গেলেও আমি ভয় পাইব না।" অন্যত্র তাঁর আকুল কণ্ঠস্বর শুনতে পাই: "দেবতা, আমার জীবনের মহত্ত্ব যেন কখনো না ভুলি, আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে যেন জড়ত্বের গোলে পড়িয়া কখনো উপহাস না করি। আমার ঈশ্বরকে আমি পাইব। কারণ এই অল্পদিনের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের কিছু কিছু আস্বাদ পাইয়াছি।—প্রকৃতি তাহায় সন্ধ্যার তামসীবর্ণে চান্দ্রমসীবর্ণে কি শান্তিই প্রাণে বর্ষণ করিয়াছে! মধ্যাহ্নের আকাশে রৌদ্র হোমাগ্নি জ্বালিয়া কি রসই প্রাণে সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের স্পর্শ কখনই মানুষের স্নেহের ভিতর দিয়া ছাড়া প্রাণে পড়িতে পারে না।... সে ভালবাসা আমি পাইয়াছি। ঈশ্বরকেও আমি পাইব। অসীম শান্তিকেও আমি পাইব। অন্তর-দেবতার কাছে জীবনের ভিতর খুলিয়া বসিব, তাহাতে আমার চক্ষেও জীবনটি ফুটিয়া উঠিবে—জীবনের সুর আমার কানেও বাজিয়া উঠিবে। আজকাল মনে হইতেছে যেন একটি সুরের কাছাকাছি আসিয়াছি।"

যে-জীবনে এতখানি আশ্বাসের সংবাদ, কালের নিষ্ঠুর ফুৎকারে তার আকস্মিক নির্বাণ এতই তাই বেদনাদায়ক। সতীশচন্দ্রের ঐকান্তিক এই জীবনজিজ্ঞাসাকে এ-যুগের কবিসাহিত্যিকেরা কী দৃষ্টিতে নেবেন তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। শুদ্ধমাত্র আধ্যাত্মিক আত্মালোচনার চোরাবালি যে এর লক্ষ্য নয় তার প্রমাণ তিনি তাঁর ডায়ারির পাতাতেও রেখে গেছেন; কিন্তু সবচেয়ে তার বড়ো প্রমাণ পাই কবির সাহিত্য-তৃষ্ণার নিবিড়তা ও সংবেদনশীল প্রসার দেখে, সাহিত্যচর্চার অনলস একাগ্রতা লক্ষ্য ক'রে, এবং তাঁর কাব্য ও গদ্যরচনাগুলির স্বতঃস্ফূর্ত বহির্বিকাশের প্রাণশক্তি দেখে। তিনি যেমন সৃষ্টির বুকে ব'সে সৃষ্টিকর্তা ও nature-কে সর্বদাই palpably অনুভব করেছেন (এ তাঁর নিজেরই ভাষা), আমরাও তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে বিচরণ করবার সময় তেমনিই palpably কিশোর কবির সান্নিধ্য ও সজীব সাহচর্য অনুভব করতে থাকি, কবোষ্ণ একটি মৃদু নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেতে থাকি আমাদের সর্বাঙ্গে। সার্থক আত্মপ্রকাশের এই যে অব্যর্থ ইঙ্গিত ও ইশারা পাই তাঁর রচনার সর্বত্র, আনন্দের সুসংযত অথচ সুগভীর উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত হতে থাকি প্রতি নিয়ত— এতেই আর কোনো আশঙ্কা বোধ করি না তাঁর আত্মালোচনার এত অক্লান্ত প্রয়াসে। যে আত্মার এক প্রান্ত সর্ব্বদা দ্বিধা ও জিজ্ঞাসায় সংক্ষুব্ধ তারই অন্য প্রান্তে সমস্ত মোহমুক্ত কী সুস্পষ্ট সুগম্ভীর আত্মপ্রত্যয়। কোনো 'বলহীনে'র আত্মসন্ধান এ একেবারেই নয়: "এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে। এখনো অনেক কষ্টে বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিতে হইবে। সমস্ত স্বদেশকে, জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাণকে শান্ত হইতে শান্ত, নিবিড়লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্যবেক্ষণশক্তিকে সুমার্জিত করিতে হইবে।

"কবিতা রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত-সুন্দর গদ্য-ধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা সৌন্দর্য এবং বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই কল্পনামূর্তিগুলি করে বাহির হইবে?—আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।" ভারতের মাটি ও রসে সদ্য প্রাণ পেয়েছিল শ্যামল ও সজীব এই-যে জীবনাঙ্কুর, আলোর প্রেরণায় অনুক্ষণ এর এই ক্ষুব্ধ আন্দোলন অন্ধকারকে অবলীলায় উপহাস জানিয়েছিল মুক্ত আকাশের এবং সেই আকাশ-পারের অম্লান আলোক-উৎসের সন্ধানে। কবির নিজের মুখেই অন্যত্র সংবাদ পেয়েছি তাঁর বলবান হৃদয়টির: "morbid কাহাকে বলে না সেইটাই আজকাল ভাল করিয়া বুঝিতেছি। কারণ প্রকৃতির বিরাট আনন্দের মধ্যে দাঁড়াইতে শিখিতেছি। কি আশ্চর্য প্রকৃতি!…কাল প্রকৃতির রুদ্রবেশ দেখিয়াছি; পৃথিবীর সুমধুর সান্ত্বনাও বুঝিয়াছি—আমার morbid না হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

আমার জীবনে কবি সতীশচন্দ্র আমারই নিজের আবিষ্কার, এ গর্ব আজ যদি সর্বসমক্ষে করি আশা করি তা মার্জনীয় হবে। অতি বালক বয়সে শান্তিনিকেতনের শালতরুচ্ছায়ায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। সে কেবল সাক্ষাৎ মাত্র, জানাশোনা বা পরিচয় হতে সময় লেগেছিল। অনেক পরে কলেজ-জীবনে অকস্মাৎ হাতে এসে পড়ল তাঁর দুষ্প্রাপ্য 'রচনাবলী'

গ্রন্থখানি—কী এক ইন্দ্রজালে "রৌদ্রমুগ্ধ কবি" স্বয়ং যেন অবতীর্ণ হলেন আমার কিশোর জীবনে। সেই থেকে কত নিভৃত মুহূর্তে জানাশোনা ক্রমশঃ গভীর হয়েছে তাঁর সঙ্গে। অগ্রজ-সমান এই কবির সমীপস্থ যখনই হয়েছি, অত্যন্ত আপনার ভাষায় সান্ত্বনা পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি ; জীবনের বহু শুষ্কপ্রায় মুহূর্তে রসের সন্ধান পেয়েছি, বহু অন্ধকার লগ্নে আলোক লাভ করেছি, "তপ্ত সুমধুর, সোমরসসম আলো"—শুধু বুদ্ধি বা জ্ঞানের দীপ্তি নয়, সে আলো সহৃদয়তায় সুতপ্ত, আনন্দের রসে মধুর ও সরস। সম্প্রতি বন্ধুজনের সহায়তায় তাঁর পত্রাবলীর কয়েকখানি হাতে পেলাম। হৃদয় ও মস্তিষ্কের কী অবাধ শুভমিলন দেখলাম সেগুলির মধ্যে। "সাহিত্যকে আমি ব্রতস্বরূপ লইয়াছি!"—লক্ষ্যহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট কোটি জীবনের ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক যেন সহসা কেঁপে উঠল কিশোর কবির এই সাগ্রহ কণ্ঠস্বরে। "সাহিত্য-আলোচনার জন্য যে-পরিমাণ সাধুতা, চরিত্রবল, পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষের দরকার" আজও যে "তা অনেক সাহিত্যযশোলিপ্সু যুবা পুরুষেরই নাই"—কবির সে অনুযোগ নম্র মনে বার বার স্বীকার ক'রে নিজেকে ধিক্কৃত করলাম। কানের কাছে সর্বদাই গুঞ্জন করেছে কবির ডায়ারির কয়েকটি পংক্তি : "আমি কোমল, আমি সুন্দর, সৌন্দর্যপ্রিয়, শান্তিনিষ্ঠ,— আমি সৌন্দর্যরচনা করিবার শক্তি রাখি, আমি কবি।" সতীশচন্দ্রের সমস্ত চিঠিগুলির উপর দিয়ে এই আশ্বাসবাণী দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো হু হু করে বহে চলেছে শুনতে পেলাম।

সতীশচন্দ্রের পরলোক গমনের প্রায় বছর পাঁচেক পরে তাঁর মৃত্যুতিথিটি স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ কবিবন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি পত্রে লেখেন : "...সতীশের জীবনটুকু আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সে আমাদের বিদ্যালয়কে শক্তিও দিয়েছে সৌন্দর্যও দিয়েছে—স তপোঽতপ্যত। এবং সে আনন্দে নন্দিত হয়েছে। তার সেই জীবনের দামটি ক্রমেই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে থাকবে। আমাদের বিদ্যালয়ের মূল সুরটি, সেই কবি তপস্বী তরুণ যুবা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ত্যাগ এবং লাভের সম্পূর্ণতাটুকু তার ঐ কয় দিনের জীবনে সে পবিত্র এবং মধুর ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছে— আমাদের সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে তার সেই সুরটি নিশ্চয়ই ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। তার নির্মল জীবনের তীর্থসলিল একেবারে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে, সে আমাদের বিদ্যালয়ের অভিষেক ক'রে গেছে।...সতীশের মৃত্যুদ্বারা আমাদের এই সাধনা অমৃতের অধিকার লাভ করেছে।... তোমার আজকের চিঠিখানি পড়ে আমার বিশেষ উপকার হল—কত উপকার হল তা তুমি জানতে পারবে না। ইতি ২৪শে মাঘ ১৩১৫।" অনেক সময়ে কৌতূহলী হয়ে ভেবেছি, সতীশচন্দ্রের সাধনোন্মুখ কবিজীবন বাইশ বৎসরে পরিসমাপ্ত না হয়ে যদি তার পূর্ণপ্রবাহ লাভ করত তবে কোন্ পরিণামে গিয়ে পৌছত ? জানি না কেন এই প্রশ্নটি মনে যখনই উদয় হয়েছে কেবলই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে'র শচীশ-চরিত্র জেগে উঠেছে আমার চোখের সামনে—যে-'শচীশ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছে', যে-শচীশকে 'দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে', যে-মানুষটির 'ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া দেখা দেয়,' যে-শচীশ তার জ্যাঠামশায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, এবং সর্বোপরি যে-শচীশকে তার কলেজের সমবয়সী বন্ধু শ্রীবিলাস অন্ধের মতো 'একমুহূর্তে ভালোবাসিয়াছে', যে-শচীশ 'সেই বন্ধুর সহিত তর্কে 'অম্লানমুখে' বলে 'আমি কবি'। শচীশ ও শ্রীবিলাসের মধ্যে সতীশচন্দ্র ও অজিতকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুজীবনের ছায়াপাত এমনই কি অসম্ভব ! শ্রীবিলাসের শচীশকে দেখার মতো

ক'রেই একদিন অজিতকুমারও কি স্পষ্টই দেখেন নি যে, সতীশ 'জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর-একদিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল'। যদিও শচীশের মৃত্যুতিথি হিসাবে নয়, তবুও বিশেষ ক'রে 'মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িবার' তিথিটিতেই একটি স্বল্পায়ু জীবনের পরিসমাপ্তি এবং সেই সমাপ্তিটিকে 'জন্মান্তরে'র দ্যোতনায় 'অশেষ' ক'রে তোলার আগ্রহ এত ঐকান্তিক কেন রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়? শচীশ-চরিত্র, বলা নিষ্প্রয়োজন, সতীশচন্দ্রের অবিকল প্রতিচ্ছবি অবশ্যই নয়; কিন্তু কবিকল্পনার জারকরসে রসায়িত সতীশচন্দ্রের মানসমূর্তি অনেকাংশে হওয়া সে চরিত্রটির পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব! বলা প্রয়োজন, আমার এ জল্পনার অনেক পরে লক্ষ্য করেছিলাম যে, 'চতুরঙ্গে'র ইংরেজি অনুবাদ Broken Ties-এ রবীন্দ্রনাথ নিজেই শচীশকে বদলে "সতীশ" করেছেন।

আয়োজন-মাত্রেই যে-কবিজীবনের অবসান ঘটেছে, কাব্যে ও সাহিত্যে যে কবি আপনার দেয় সম্পূর্ণ ক'রে ঢেলে দিয়ে যাবার সুযোগ বা অবকাশ পায়নি, যে সবেমাত্র কেবল নিজের জীবনটিকেই তিলে তিলে গড়ে তুলছিল বিশ্বসাহিত্যের, বিশ্বকবির ও বিশ্বপ্রকৃতির সাক্ষাৎ প্রেরণায় একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে—সতীশচন্দ্রের মধ্যে দেখেছি সেই তরুণ তপস্বী কবিকে। তাঁর সেই সাধনার আলোকে অগ্নি-অক্ষরে পাঠ করেছি রবীন্দ্রনাথের বড়ো বেদনার বাণী: "সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে-প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।" স্বদেশের সাহিত্যের নিত্য-দীপোৎসবে যে-দীপ পরিপূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে নি তার জন্য শোক করা আজ বৃথা, কিন্তু যে-জীবনপ্রদীপটিকে নির্বাত-নিষ্কম্প জ্বলতে দেখেছি সতীশচন্দ্রের রচনার অন্তরালে, অনির্বাণ তার প্রেরণায় জীবনের অন্ধকারে আজও অনেক কবিসাহিত্যিক নিঃসন্দেহে তাঁদের পথের সন্ধান পাবেন।

সতীশ-প্রসঙ্গ

সংকলন

সতীশচন্দ্র রায়

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্ত্তি মন্দিরে-প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্তচিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য্য তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিক দিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক— কলেজে পড়িতেছে— সঙ্কোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র— মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুরষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানপ্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক শুদ্ধ-শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইযা মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনকার্য্যকে যথার্থ ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজসম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালযের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম— তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল— "আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না— প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে-সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে। যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে— কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে— নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনাসম্পদ্ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়। সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্য্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না— বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্ম্মল ঈশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন— ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্প বয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্ব্বলতা-অপূর্ণতা সমস্ত দীনতার মধ্যে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না। লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও আত্মনাম-ঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়— তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও সে অহঙ্কার অনুভব করে নাই— সে প্রতিদিন নম্রমধুর প্রফুল্ল ভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না!

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ— এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খর্ব্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুই-একটা কাঁটাগুল্ম, এবং উইয়ের ঢিবিতে মিলিয়া এক-একটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়িবিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহাগহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে— সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর-সহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীরা খড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভার-মন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্ত্তশব্দে ধুলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে— এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময়কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শাল-তরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্য্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্দ্ধদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্‌ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "গুরুদক্ষিণা" নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে— ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল— ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই— এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্‌বোধিত প্রফুল্ল নবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্ত্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল— সে-সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে— সেগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য— অতএব সেই কথাকয়টি কেবল আমি রাখিলাম— তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল' নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মম্‌তাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি— ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়।

মম্‌তাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে— তাজমহলের সুষমাসৌষ্ঠবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ— সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণ শক্তি লইয়া যায় নাই।

পত্র

ব্রহ্মবিদ্যালয়,
বোলপুর।

…আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেখিয়াছি তাজমহল দুটি ভাবে মনকে ক্ষুব্ধ করে। দিনের আলোকে মলিন নরনারীর মধ্যে, ধূলা, শুষ্ক যমুনা, রেলের চীৎকার, ইংরাজের মূর্ত্তিমান কর্ম্মবেগ রেলগাড়ির দৌড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ লীলার মধ্যে— তাজমহলটাকে বড়ই বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির রসে এই মর্ম্মরের রঙীন লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত সংসারের সঙ্গে সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কবরটি যেন একটা উচ্চ জমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Harmonious সৌষ্ঠব, ইহার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, ইহার বিরল চিত্রবিলাস— সমস্ত লইয়া ইহা যেন আমাদিগকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় পূজার ভাবে আচ্ছন্ন নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলায় তরঙ্গায়িত অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাসের ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে হয়, চারিদিক্ হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত লোক উঠাইয়া দিয়া একটি নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের ক্ষান্ত উৎসার উৎসমুখগুলির রুদ্ধ শোকের প্রতি কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিষ্ঠুর ভাব। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে তাজের perfect harmonyটি যখন মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাজকে আর নির্জ্জীবভাবে পার্থিবভাবে দেখিবার জো নাই। তখন তাজকে বাহুল্যবর্জ্জিত একটি নিগূঢ় গীতের মত করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যখন দূরে আছি, তখন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছি।…

এই গেল আমার মনের কথাটা— এখন কবিতার সৌষ্ঠব কতদূর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিল্লী, আগ্রা, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া মনে আরও অনেক ভাব উঠিয়াছে— বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে যেন খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছি।…

বুদ্ধগয়ায় যখন অশোক-রেলিং দেখিলাম— রাঙা পাথরে যক্ষ আঁকা, যক্ষী আঁকা— বাড়ীটি গাছপালায় ঢাকা, নির্জ্জন— চারিদিকে স্তূপ— একজন জাপানী penitent জাপান হইতে প্রেরিত বুদ্ধের কাছে থাকে— তিব্বত হইতে, সিমলা হইতে গরীব দুঃখী আসিয়া বাস করিতেছে— বর্ম্মা হইতে কতকগুলি ঘণ্টা উপহার পাঠাইয়াছে— তখন মনে হইল, ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে— কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এশিয়া-সুন্দরী সেখানে তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় এমনভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই।

কিন্তু বুদ্ধদেব আজ স্তম্ভিত। আপনি যে হিমালয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সেইরূপ আজ—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" এই প্রচণ্ড করুণার উৎসটির স্তম্ভিত গাম্ভীর্য্যের নাড়া প্রাণে অনুভব করিয়াছি। অন্ধকার পৃথিবীর সহিত মিল নাই ; চতুর্দ্দিকে নূতন রাগিণী উঠিয়াছে— তাই বুদ্ধদেবও যেন ধরণীর বক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে "মন্দির" লিখিয়াছেন— রচিয়াছিনু দেউল একখানি— তাহাতে আপনি এই বুদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন— বিশ্বের কর্ম্মের মধ্যে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন— তাহা যেদিন হইবে, সেদিন সত্যসত্যই পৃথিবীতে নূতন আলো আবির্ভূত হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরূপেই বুঝিয়াছি। কারণ উহার আগের পর্দ্দা হইতে যে একটি গান উঠিতেছে, তার স্বর শুনিয়া এবার আমাকে অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে যেন পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যসাধারণের হৃদয় একটি নারী এবং দিব্য-সংবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যখন ভালবাসে তখন নারী এক অপূর্ব্ব আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধদেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুখ নারীহৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল— কল্যাণকর্ম্মে উৎসব বিস্তার করিয়া কলাকাণ্ডে মঙ্গলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লীলায় ক্রমে সেই আনন্দমিলনের উৎসব থামিয়া গেল। আজ যেন বুদ্ধগয়ার পাহাড়গুলির মধ্যে শুষ্ক নৈরঞ্জনা ও মাহীর তীরে ছায়াঢাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইয়া সেই নারী অন্ধের মত অ-বচনার মত মন্দিরবক্ষকোটরে সেই পুরুষের ছবি লইয়া বসিয়া আছে। আজও তার অবসন্ন হস্ত বর্ম্মা এবং তিব্বত হইতে সমাগত কাঙালীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে— কিন্তু— "সে প্রচণ্ড গতি অবসান!" ফল্গুর মধ্যে যে অপরিচ্ছন্ন নরনারী কাপড় ধুইতেছে তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কি কোনো যোগ আছে? ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ —কে যে-সাহেব বিনা অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হুকুম করিতেছে তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয়? তা ছাড়া, আমরা যে স্বচ্ছন্দ মনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ? স্তম্ভিত প্রকাণ্ড পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি এবং অল্প একটুকুন অশোকের রেলিং এখানো যা বজায় আছে— তার আনন্দহিল্লোলিত ভক্তিভঙ্গিসুন্দর ছবিগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় এইরকম একটা দুঃখের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে! এই স্তম্ভিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবসাদের মেঘ ঘনাইয়া আনে যে চোখের জলে আর কিছুই দেখা যায় না— আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।…[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৩১০ চৈত্র বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন ; পরে গুরুদক্ষিণা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ১৩১১ শ্রাবণ বঙ্গদর্শনে এই 'গদ্যকাব্যটির' সমালোচনাপ্রসঙ্গে পুনরায় সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই দুইটি রচনা একত্র গ্রথিত হইয়া 'বিচিত্র প্রবন্ধে' (১৩১৪) প্রকাশিত হয়। বিচিত্র প্রবন্ধের নূতন সংস্করণে এ রচনাটি আর মুদ্রিত হয় না, গ্রন্থান্তরে সংকলনের অপেক্ষায় আছে— সতীশচন্দ্রের প্রসঙ্গে এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল। সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি রচনা বর্তমান সংখ্যায় "দুই বন্ধু" প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবরাত

কবি ও বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের অকাল-মৃত্যুতে

'তত্ত্ব' ভুলেছিনু আমি 'উপাধি'র লোভে
　ভুলেছিনু সারদে তোমায় ;
সহসা শোকের ঝড়ে— মনের সংক্ষোভে
ক্ষুব্ধ আমি, ডাকি তোরে, আয় মাগো আয় !

আজ গাহিব না গান আনন্দ-লহরী,
　গাঁথিব না বন্দন-মালিকা ;
আজ শুধু তুলসীর মঞ্জুল মঞ্জরী
দিব জলে, নিবাইব শোক-বহ্নি-শিখা।

একা, হায় ! আজ আমি নিতান্ত একাকী—
　দেবরাত ! তুমি আজ নাই !
আজ আমি সঙ্গীহীন, মিথ্যা হবে নাকি
এ সংবাদ ?—কুসংবাদ, সত্য সে সদাই ।

শূন্য আজি গুরু-গৃহ, শূন্য তপোবন,
　বক্ষে গুরু মৌনতার ভার ;
মনের জগতে মোর মারী হয়ে যেন
একদিনে হয়ে গেছে সব ছারখার।

আজ হ'তে একা আমি ভ্রমিব এ বনে,
　তুমি আর আসিবে না ভাই ;
অশ্বিদ্বয় সম মোরা ছিনু দুই জনে,
আজ আর দুই নাই— ভাবি শুধু তাই।

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক,
　দুটি মন দৃপ্ত তেজীয়ান ;
বৃথা হ'ল আশা তরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল— সব অবসান।

দেশের গৌরব কোথা, গৌরব ভাষার,
　কোথা হায় উদ্দেশ্য মহান—
পুণ্য ভাব-উদ্বোধন ? হায় রে আশার
দাস !—বৃথা, সব বৃথা, আশা অভিমান !

শুক্রের শিষ্যত্ব আমি লয়েছিনু ব'লে
　ক্ষুণ্ণ তুমি হয়েছিলে ভাই ;
কা'লের শাসনে আজ তুমি গেছ চ'লে,
ক্ষুণ্ণ আমি, মর্ম্মাহত, শূন্য-পানে চাই !

শূন্যে উঠিয়াছে আজ পূর্ণিমার চাঁদ,
　কবি তুমি দেখিবে না তায় !
কোথা তুমি ? কেন হায়— মৌন মনোসাধ ;
অশ্রু আজ আঁধার করিছে পূর্ণিমায় !

বসন্ত আসিবে ফিরে দুই চারি দিনে,
　তুমি একা রহিবে নীরব ;
পল্লবিত মুকুলিত রমিত বিপিনে
তুমি শুধু জানিবে না বসন্ত উৎসব।

মুকুলে আশ্চর্য্য গন্ধ— সুপক্ক ফলের,
　জানিতাম মোরা সে বিশেষ ;
আজ মনে পড়ে কথা সুদীর্ঘ কালের—
দুঃখ শুধু সে মুকুল হ'ল স্বপ্ন-শেষ ;

হ্রদতীরে পল্লবের লম্বশাটপটে
　সাজে পুনঃ 'বৃক্ষ-সভাসদ',
কাহারে বলিব ? তুমি নাহি যে নিকটে—
দূর হ'তে দূরে গেছ চ'লে। সেই হ্রদ—

শোভিত পলাশ ঘাসে তেমনি দু'কূল,
　নেচে ফিরে খঞ্জন শালিক ;
জলে দোলে বারুণীর তরঙ্গিত চুল,
তুমি নাই, কে দেখিবে ? স্তব্ধ চারিদিক।

শফরী লীলায় কাঁপে ছায়ার ভুবন,
　মায়ার ভুবন কাঁপে তায় ;
কেন এ মায়ার মোহ, ছায়ার সৃজন,
কে বুঝিবে, কে বুঝাবে, জানে কেবা হায় ?

বর্ষাদিনে গুরু-গৃহে আমা দোঁহাকার
গুরু হ'ত মেঘের গর্জ্জন ;
তাছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর,
ভেসে যেত উপদেশ— গম্ভীর বচন।

তারি সনে ভেসে যেত দূর ভবিষ্যতে
কি কুহকে দোঁহাকার মন ;
দেখিতাম সাম্য-রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমুন্নত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ।

জগৎ ভাসিয়া যেত ভাবের বন্যায়,
বেঁচে থাকা হ'ত সে মধুর ;
মুছে যেত অত্যাচার, ঘুচিত অন্যায়,
কোথা সে স্বপন আজি ? দূর— চিরদূর !

কালাগ্নি-জর্জ্জর-তনু, শ্মশানে বর্জ্জিত
বন্ধুহীন হে বন্ধু আমার,
সর্ব্বভুক বিশ্বগ্রাসী কাল-কবলিত ;
এ অশ্রুতর্পণে জ্বালা জুড়াক তোমার।

উচ্চারিয়া মন্ত্র-বাণী যমে করি' জয়
প্রাণ তুমি লভ' দেবরাত !
অমর বাণীর বরে হয়ে মৃত্যুঞ্জয়
ফিরে এস ; পুনঃ মোরা দোঁহে এক সাথ—

গাঁথিব অশোক-ফুলে বিজয়-মালিকা,
নব গান গাব এ ধরায়,
পরাবে যশের টীকা কল্পনা-বালিকা,
প্রভেদ না রবে আর ধরা অমরায়।

এস মন্ত্রবলে হেরি মানবের মন,
তত্ত্ব তার শিখি সংগোপনে,
এস মায়াবলে মোরা হেরি ত্রিভুবন,
এঁকে লই ছবি তার সজনে বিজনে।

"অনেক বলিতে আছে বাকি আমাদের"—
মুখে তব ছিল সদা ওই,
বলিলে দুজনে মিলে বলা হ'ত ঢের,
দেবরাত ! একা আমি পারি তাহা কই ?

দেবরাত ! দেবরাত ! বাণীর সেবক !
দেবরাত[১] ! নির্ম্মল-জীবন !
দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল পাবক
কী নিদ্রায় মগ্ন হায়— কি দেখ স্বপন !

মাঘ, ১৩১১ **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**

---

১ "ঋষি দেবরাত"-এর পূর্বনাম শুনঃশেপ। শুনঃশেপ তাঁহার "জন্মহেতু আঙ্গিরস অজীগর্তের পুত্র" ছিলেন এবং "কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ" হইয়াছিলেন। ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্ত একশত গাভীর বিনিময়ে তাঁহার পুত্রকে যজ্ঞের পশুস্বরূপ বিক্রয় করেন, এবং আরও দুইশত গাভীর পরিবর্তে যজ্ঞানুষ্ঠানে "নিয়োজন" (যূপে বন্ধন) করেন ও "শাস" (অসি) হস্তে "বিশসন" (বধ) করিতে প্রবৃত্ত হন। শুনঃশেপ ঋক্‌মন্ত্রের উচ্চারণে "দেবতার আশ্রয়" লইয়া পাশমুক্ত হন। অনন্তর তিনি উক্ত যজ্ঞের "হোতা" বিশ্বামিত্র ঋষির অঙ্কে দেবগণ কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিলেন। "তদবধি শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত (দেবদত্ত) নামে প্রথিত হইলেন।"

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" গ্রন্থের 'সপ্তম পঞ্জিকা'র ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে' প্রথম হইতে 'ষষ্ঠ খণ্ড' পর্যন্ত "শুনঃশেপের উপাখ্যান" বর্ণিত হইয়াছে।

দেবপ্রসাদে সতীশচন্দ্রও আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে পুত্রস্থানীয় হইয়াছিলেন।

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংকলন

'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' হইতে

রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি

একজন যুবা কবি বসন্ত প্রত্যুষে,
কলিকাতা নগরীর দ্বিতল মন্দিরে,—
নূতন রৌদ্রের রাশি, নীল নীলাকাশ
সমস্ত সম্মুখে করি'— সুন্দর বাতাস
কপালে কপোলে কর্ণে চক্ষুতে লভিয়া
কল্পনা-প্রদীপ্ত ভালে লিখিছেন লিখা—
—বঙ্গ-সমুদ্রের দ্বীপে,— সেই যে সন্দীপ—
তাঁর এক মন-গড়া সুহৃদের কাছে।
—কবিদের খেলা!— যাক্, লিখিছেন যথা—

বন্ধুবর ; শীত গেছে, বাতাস তরল !
সুগভীর নীলাকাশ সুস্থ, সুবিমল,
ধ্যানসম নির্ব্বিকার। বৃহৎ গগনে
রৌদ্র উঠিয়াছে জাগি আনন্দিত মনে।
বহু কথা মনে পড়ে— গ্রামের প্রান্তরে
দুটি বড় বড় পক্ষী হরষঅন্তরে
উড়িয়া, বঙ্কিম পথে আসিছে নামিয়া,—
রৌদ্রভার বুকে ঠেলি', পৃষ্ঠে অনুমিয়া,
শুভ্র পাখে আঘাতিয়া, পদে আচড়িয়া—
আমার চিত্তও যেন উঠিয়া পড়িয়া
রৌদ্র-সমুদ্রের মাঝে সাঁতারি গভীর
ক্রীড়া আজি করিতেছে। ওই নগরীর
লোকজন—স্কন্ধে রাখি' সারঙ্গ পুরাণ,
ভিখারী আসিয়া গায় ব্রজগোষ্ঠ গান,
সহসা অনেকগুলি শিশুর নয়ন
চাহি' থাকে তার দিকে। করি' গুঞ্জরন
সারঙ্গ ব্যথিছে বাল-বালিকার প্রাণ।
ভিখারী সে— জানাইত কি তার সন্ধান—
তবু তার মুখ যেন একটু সুন্দর,
হেতু— ওই সারঙ্গের গুঞ্জরিত স্বর
আর এই রৌদ্ররাশি— সঙ্গতির গুণে
কুৎসিতে'ও ফুটে রূপ।— যাক্ তাহা শুনে
তোমার কি ফল ? সেই— কি লিখিতেছিনু ?
হাঁ সেই যে রৌদ্ররাশি হর্ষে সন্তরিনু !
তারপর কি করিনু ?— উড়িয়া উড়িয়া
উর্দ্ধমুখে, চক্রে চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আবার নামিয়া এনু।— প্রাণ যেন ভরা।
আজি যেন সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ ধরা।
অভাব কোথাও নাই— প্রাণের গহ্বর
আজি যেন রশ্মিজালে পুরা ভরভর।
তাই যবে স্বাস্থ্যহর্ষে বাড়াইনু হাত—
"বাহুডোর পূর্ণ কর হে মধু প্রভাত"
—এইরূপ আকাঙ্ক্ষিয়া (জান ত, মানব
মানবেই চায়, কিছু নহে অভিনব)—
"বাহুডোর পূর্ণ কর হে রৌদ্র-সাগর"—
অমনি তোমায় যেন পেনু, বন্ধুবর !
কোথা তুমি ? কোথা ? মোর দৃষ্টিতে ত নাই ?
—পরাণ কিছুতে আজ হারিবে না ভাই !
বলে প্রাণ—"চক্ষে নাই ? তা'তে কি রে ? সেই
সমুদ্রের দ্বীপে আছে স্মরণে কি নেই ?
—সেই যে চারিদিকেই উথলে সাগর
পাতালের বাসুকির গরজে পাগর—
সেই যার তীরমুখী উর্ম্মির উপর
বেত্রতরী তুলি দিয়া জেলের কোঙর,

হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্য মাঝে,
জল উঠি' উচ্ছুসিয়া চারিধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি', কাৎ করি তরী
—শিশুদের কোলাকুলি !— জেলে উঠি' পড়ি'
হাসিয়া ভাসিয়া উঠে— তরণী সরল
সমুদ্রের বুকে ভাসি' চলে কলকল।
স্থূল কেশরাশিসম গোছান' সে জাল
ছত্রাকারে মেলি' পড়ে, খুঁজিয়া পাতাল
ডুবি' যায়—কালো কালো ডম্বুরের মত
সারে সারে চারিধারে ভাসে শত শত—
নীল জল, নীলাকাশ, দ্রাণ রৌদ্রভার,
গম্ভীর জেলের ছেলে, মৎস্যের শীকার !
সেই যে নূতন দ্বীপ ! জীর্ণ পুরাতন
হর্ম্ম্য কিম্বা মসজেদ, মন্ত্রভবন,
মিনার কি অট্টালিকা কিছু যেথা নাই—
যেথায় অল্পই আছে মানুষের ছাই।—
বালুকার ভূমি শুধু, দীর্ঘ তৃণদল,
স্থানে স্থানে নীলপুঞ্জ নবীন জঙ্গল।
ভূবিৎ তাদের সেই জীবজীর্ণ শিলা
যেথায় খুঁজিতে গেলে পাবে শুধু টিলা
সমুদ্রের বালুকার, শুক্তিশেষ, শ্বেলা
আর নানা প্রকারের মৎস্যহাড় মেলা।
সেই যে পক্ষীর দল, উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে
মাঝে মাঝে ঋতুচারে যেথা এসে থাকে,
ভুনিক্ষিপ্ত থালাসম সারি লুটাইয়া
সুদীর্ঘ সৈকতভূমে, ত্বরায় বসিয়া
কত কলরব করে। সেই যে সে দ্বীপে—
মনে নাই ?—এক যে নিরালা অন্তরীপে
একটি ভবন আছে ? সেথায় খেলায়
একটি বালক উঠি' সকাল বেলায়,
গো মহিষ অজ মেষ পশ্বাদির সনে—
মা তাহার, কোন দিন সারিয়া রন্ধনে,
ক্ষণেক বিশ্রাম তরে, গুয়াবনচ্ছায়'
কটিতে রাখিয়া হাত কখনো দাঁড়ায়
সহসা দর্শন করি' চক্রবালাবধি—
বালুচর রৌদ্রোজ্জ্বল, উর্ম্মি নিরবধি,
পাখীদের অত্যুদার স্বচ্ছন্দ প্রচার,
নীলাকাশ আর সেই নীল জলভার।
মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত— সেই যে বাড়িছে ?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি' তরুছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখপৃষ্ট প্রাণে প্রতি বিন্দু অনুভব—
মনে নাই ?— হাঁ হাঁ মনে পড়েছে পড়েছে।
সেই যে মহান বন্ধু— তার সঙ্গে দেখা
যখন যৌবনকূলে ফিরেছিনু একা
মহত্ত্বের সৌন্দর্য্যের গভীর বিরাম
অন্বেষিয়া ব্যগ্রপ্রাণে। কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্ব্ব ছাপ পড়ে যেথা ? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড় জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দৃঢ়বাহু— ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু দুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশ্বস্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা' নলে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন—

এই খুঁজি' মনে মনে করিতে ভ্রমণ ;
তব সঙ্গে দেখা বন্ধু বহু বহু বার।
তবু কোন দিন তব গৃহ খুঁজিবার
আবশ্যক পড়ে নাই। আজি এ কিরণে,
নভোভার বহি' বুকে আনন্দিত মনে,
সত্যই যখন মোর পত্র লিখিবার
আবশ্যক হ'য়ে পল অতি অনিবার—
জানিলাম তব নাম— প্রাণ দিল কহি'।
পোষ্টাফিস্ বাক্স হ'তে এই পত্র বহি
পিয়ন নিবে না কভু। আমার লিখন—
আমি এক রাজহংস করেছি পালন—
(নলদময়ন্তীদূত তার বংশধর)
সে এখনি পাখা মেলি' এই রৌদ্রপর—
লয়ে যাবে তব পাশে। পত্রখানি পড়ি,
রেখো, বন্ধু, মোর তরে আয়োজন করি—
বসিব সমুদ্রকূলে— গুয়াবনচ্ছায়—
ধর, কোন স্তম্ভীভূত উচ্চ মৃত্তিকায়।
দুদণ্ড আলাপ হবে মাতাপুত্র সনে—
(যে মাতা সমুদ্র দেখে সারিয়া রন্ধনে)

ততক্ষণ পাখীগুলি উড়িবে আকাশে।
কচ্ছপ আসিবে চলি' সিকতার পাশে।
বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস্ কলকল্ পুনঃ চলি' যায়, কেউ
কোন দিকে নাহি আর— রৌদ্র জলজল।
বিদায় সুহৃদ তবে। আলো বক্ষ চাপে
ওরি মাঝে যেন তব হৃদিস্পন্দ কাঁপে।
যাই তবে, দেখা হবে যাই ; বন্ধুবর,
সমুদ্রে কেমন এবে জলে দ্বিপ্রহর !

এ এক আশ্চর্য্য চিঠি ! কোন্ পোষ্টাফিসে
ছাড়িব বুঝে না পাই। কই, দশদিশে
রাজহংস বলেও ত কিছু না নেহারি !
কবিদের কাণ্ড সব ! যাক্ দিনু ছাড়ি—
এ পত্র সমুদ্র মাঝে। এ কলিকাতায়
দাঁড়াইয়া পরাণের সমুদ্রবেলায়
দিনু ছুঁড়ি পত্রখানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জলপন।

প্রাতঃপ্রবুদ্ধা

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল।
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল !
কুন্তলে তোর বিকল কুসুম
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগনতল !
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা, বল্।

ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে দুটি—
নয়নভৃঙ্গ তদুপর পড়ে লুটি !
আভাময় অতি ললাট-কিশোর
সারা মুখখানি আলো করি তোর
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি !
ফুলসম দুটি কপোল উঠেছে ফুটি !

কখন্ তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস !
স্খলিত আঁচল তুলি দিলে রাখি'
উরঃ কলি পরে, সযতনে ঢাকি
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ?
—আপনার রসে হাসিয়া মধুর হাস ?

বল্ সখি তোর স্বপনের কথা বল্—
দেখেছিস্ তুই নিশার গভীর তল ?
রতনআলয়ে ত্রিদশ কিশোর—
হাত ধরাধরি চলেছে কি তোর ?
চুমি নেছে হরি বরষের আঁখিজল ?
বল্ বল্ তোর স্বপনের কথা বল্।

নিশীথিনী

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল !
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী-গগনে লাগে মধুরসজোয়ারের টান !
রস-ভরা বহে বায়ু বনস্পতি শাখায় সঞ্চরি—
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি।
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লেগেছে শিশির
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর !
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

রাজকন্যা

এক ছিল রাজকন্যা। কই, তাহাকে ত আর দেখিতে পাই না। একখানি গল্পের বই লই—একি !— কেবল যত সুরবালা, কমলমণি, ললিতা, নলিনী, নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র, মনোমোহনের গল্প ! কলিকালে কাংস্যপাত্রে ভোজন শাস্ত্রে লিখিত আছে— কলির শেষে কি অবশেষে এই সব সুরবালা পুরবালা রাজকন্যার সিংহাসনও অধিকার করিয়া বসিবে? সে রাজকন্যা কি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রের সঙ্গে সাতসমুদ্র পার হইয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করিয়াছে? না, এই রেলগাড়ি ষ্টীমার প্রভৃতির আক্রমণে সাতসমুদ্র সাতটি কূপমাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে— রাজকন্যাগণের গোপন ভবনগুলির পাশ দিয়া ইলেকট্রিক্ ট্রাম চলিয়াছে এবং এই যে ললিতা গলিতা প্রভৃতি নায়িকাগণ, ইহাদিগকেই এখন রাজকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? রাজকন্যাগণের ইতিহাস হঠাৎ কেন বন্ধ হইয়া গেল? আমি ত ঐজন্যে ইতিহাসের এক পৃষ্ঠাও পড়িতে পারি না— এবং নিশ্চয় বলিতে পারি তারাখচিত কৃষ্ণসন্ধ্যার মত সুন্দরী কাফ্রীরাজকুমারী ক্লিয়োপেট্রার কাহিনীসংবলিত রোমের ইতিহাস পাঠ্য না থাকিলে আমি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

এক ছিল রাজকন্যা। কবে ছিল কেউ জানে না, কিন্তু তাহার ইতিহাস ত লিপিতে এবং শ্রুতিতে এতকাল চলিয়া আসিতেছিল! "সাল-সরল-ব্যালোল-বল্লীলতাচ্ছিন্ন" তপোবনে রক্তাশোকতরুর মূলে বসিয়া বৃদ্ধঋষি শ্রুতি শুনাইতেন— শিষ্যমণ্ডলীর বুক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত— বৃদ্ধা দিদিমাও কোমলতম

বর্ণমিশ্রণের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ছাদে বসিয়া রাজকন্যার শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেন, নাতিমণ্ডলীর বুক কি করিয়া উঠিত, এই প্রবন্ধই তাহার পরিচয়রূপে গণ্য হউক।

বাস্তবিক পুরাতন ইতিহাসবেত্তাদের পরে বুড়া দিদিমাই রাজকন্যার শ্রুতিধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। তখন সমস্ত পায়রাগুলি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে— তাহাদের পাখার ঘোর ঝট্পটি এবং তুমুল বক্‌বকম্ শেষ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে যে যার আপন খোপে বসিয়া গিয়াছে;— দূরে সন্ধ্যার অন্ধকার হইতেও ঘনতর শীতল রসে চক্ষুকে সিক্ত করিয়া দেবদারু গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পশ্চাতে পীতপাণ্ডুরবর্ণের বর্ষা ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতবেগে চাঁদ উঠিতেছে; পশ্চিমাকাশের সিন্দুরাভা ক্রমেই বৃদ্ধের চক্ষুর মত অন্ধকারের মধ্যে ঘোলা হইয়া যাইতেছে; উপরে একটিমাত্র তারা, আমার মাথার মধ্যে দিদিমার একটি আঙুল শিথিলভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে— তখন দিদিমা আরম্ভ করিলেন, এক ছিল রাজকন্যা।

দিদিমার সেই শ্রুতি মনে লইয়া ক্রমে আমাদের রাজকবিগণের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। দিদিমার এবং রাজকবিদের বর্ণনাগুলি মিলাইয়া দেখি, রাজকন্যার কি মহিমা! কত বিচিত্র নদনদী, কত রহস্যময় প্রাসাদকক্ষ, কত অদ্ভুত মন্ত্রতন্ত্র, কত করুণা, কত অনুনয়, কত দীর্ঘভ্রমণান্তে মিলন, কত পলায়ন! কত পুরাতন প্রাসাদের পশ্চাৎস্থিত গুপ্ত অলিন্দে সহচরীসহিত রাজকন্যা এই সান্ধ্য পান্থের নেত্রহরণ করিয়াছিল,— হায়, প্রতীক্ষাপরা ধৈর্য্যশীলা রাজবালিকা,— তোমার প্রাসাদবলভিকার কুলায়প্রত্যাগত শুভ্র পারাবতের মত আমার হৃদয়ের সকরুণ আশীর্ব্বাদগুলি সেই অনতিধূসর সন্ধ্যার মধ্য দিয়া পত্রপুষ্পতরুর আড়াল দিয়া, শুভ্রপাখা উড়াইয়া তোমার দেহবল্লরীর চারিদিকে গিয়া ভিড় করিয়াছিল।

কত মরুভূমির প্রান্ত ধরিয়া রাত্রির অবসানসময়ে ধূস্তুরশ্বেত তারাস্রগ্দামের নিম্ন দিয়া অসিলতার মত কৃশাসুন্দরী অসিচর্ম্মধারী তাতারকুমারের ঘোড়ার পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘতর করিয়া কালো পর্ব্বতের উপত্যকাভিমুখে ধাইয়া চলিয়াছিল,—হায়, পলায়নপরা উদ্দাম সম্রাটসুতা, আমার হৃদয়ের উৎসাহ বিদ্যুদ্দীপ্তি ধারণ করিয়া তোমার নেত্রবিদ্যুতের খরঋজু পথে নিঃসৃত হইয়া গিয়াছিল! বর্ষার মেঘ কাঁদিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, উচ্চপ্রাসাদকক্ষে রাজবালিকার অশ্রু শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্তের অবসানেও সমান ঝরিতেছে! সহস্র ভক্ত পূজা সাঙ্গ করিয়া, বর লইয়া, ফল লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল— তবু এই বিজন শরৎরাত্রির অশ্রুস্নাত অনন্তজ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া সরোবরতটে একাকিনী রাজকন্যা ফুল তুলিতেছে! তরলাক্ষি, তুমি যখন সৈরিন্ধ্রীবেশে এক রাজভবন হইতে আর এক রাজভবনে ফিরিয়া তোমার হারানো ধনের অন্বেষণ করিতেছিলে— মধ্যাহ্নে বিশ্রামতন্দ্রায় রাজপুরী নীরব— তখন বাগানের বৃক্ষশাখার ভিতর হইতে আমিই শুকের মত রক্তচঞ্চুটি বাহির করিয়া, বিশ্রব্ধভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তোমার অনিমেষ অশ্রুকলুষিত চক্ষুদুটি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। চপলাক্ষি, তুমি যখন প্রগল্ভ বণিককুমারের বেশে সিডনের বন্দরে আপণ হইতে আপণান্তরে ফিরিয়া, মণিতরল করনখে মণিমুক্তার প্রতিবিম্ব ধরিয়া জহরৎ কেনার ছলনা করিতেছিলে— তখন আমিই আপন দ্বারস্থিত উচ্ছ্রায়াঙ্কিত রঞ্জিত গ্রীক্ মৃৎপাত্রোপরি পার্শ্বে ভল্ল রাখিয়া অ্যাপোলো-প্রতিম গ্রীক্‌যুবার দৃঢ়সুন্দর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার বেণীগোপন উষ্ণীষটিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমি দেশে বিদেশে রাজকন্যাগণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, আমি তাহাদের রহস্য জানি। বাল্যকালে, যখন মুখের গঠন ভাল করিয়া ফুটে নাই,— ভাব

তরল জলের মত সর্ব্বাঙ্গে ছলছল করিয়া বেড়াইত, তখন হইতে রাজকন্যার প্রতিবিম্ব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। আমাদের ভাবোদ্বোধিত যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা অমর, তাহা কোনদিন যাইবে না। রাজকন্যা সেইরূপ আমাদের একটি চিরদিনের জিনিস। ব্যবধানই ইহার সৌন্দর্য্যের চারিদিকে ইন্দ্রজালের ঘের টানিয়া দিয়াছে। রাজকন্যাগণ কোন্-একটি দূর বাগানের মধ্যে প্রাসাদের কক্ষে চিরকাল বাস করিতেছে। জ্যোৎস্না এবং রৌদ্রে সুখ-স্পর্শ ছায়া ফেলিয়া সে বাগানের চারিদিক্ যেমন বৃক্ষমালা, স্তব্ধতা এবং মর্ম্মরে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তেমনি তাহাদের চতুর্দ্দিকে আরও কত বেড়া! রাজকন্যাকে ঘিরিয়া তাহার নিজ হৃদয়ের প্রণয়লজ্জার বেষ্টন, পিতার আদেশের বেষ্টন, কুলমর্য্যাদার বেষ্টন! পৃথিবীর বলবান্ রাজপুত্রগণের হৃদয়গুলির পক্ষে এই সব মধুর এবং কঠোর বেষ্টন্ ভেদ্ করিবার প্রলোভন কি দুঃসাহসোদ্দীপক! অ-দৃষ্ট রাজকন্যার মোহে শতশত নদী পর্ব্বত পিছে ফেলিয়া রাজপুত্র চলিয়া যায়।— আবার একএকদিন সন্ধ্যাকালে নদীজল দেখিয়া রাজকন্যার চক্ষুদুটির কারুণ্য রাজপুত্রের হৃদয়ের মধ্যে গলিয়া আসে। তখনি আমরা হঠাৎ রাজকন্যাকে আর একভাবে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, রাজকন্যা একাকিনী। নানাবেষ্টনের মধ্যে উপগূঢ় রাজকন্যা ব্যবধানের জন্য বাহিরের সকলের কাছে যেমন চিরবিস্ময়কর এবং বলবান্ রাজপুত্রের কাছে যেমন দুঃসাহসোদ্দীপক তেমনি আপনার কাছে সেই ব্যবধানের জন্যই কি নিতান্ত করুণ নহে? জানি, তাহার অলঙ্কার শিঞ্জিতভাষে তাহার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবের স্তুতি গাইয়া থাকে; জানি, সখীগণ তাহার কানে সর্ব্বদাই মধুরালাপ বর্ষণ করিয়া থাকে; বুঝি, তাহার নিভৃত মর্য্যাদাময় অবস্থানে তাহার সম্ভোগসুখকে অবারিত করিয়া দেয়— তবু কি হঠাৎ একদিন আরতির সন্ধ্যায় রাজকন্যার বুকের মধ্যে সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে না? মনে হয় না, এই ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তাহাকে চিরকাল এক কাম্যলোকের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিবে? হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে রাজার হর্ম্ম্য এবং দরিদ্রের কুটীর এক সমান অস্পষ্টতায় মিলিয়া গেলে, মনে হয় না, ঐ ধরণীর পথ সুন্দর, উহারি মধ্যে বাহির হইয়া পড়ি, ঐ পথে সহজেই হৃদয়বানের সন্ধান পাইব? কিন্তু থাক্— তাহাতে কাজ নাই। রাজবালিকার চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইয়া স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হোক। তুমি তোমার দুর্ভেদ্য বেষ্টনাবলীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া বলদর্পিত রাজকুমারগণকে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত কর এবং আমরা রাজপুত্র না হইয়াও তোমাদের কাহিনী পড়িয়া দুঃসাহসিকতা এবং প্রেমের জটিল ব্যূহমধ্যে আপনাদিগকে একবার ছুটাইয়া দি। রাজকন্যা চিরকাল পরে পরে তাহার সুখ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক— প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া পৃথিবীর উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক— সুরবালা এবং পুরবালাতে কাব্যজগৎটি পরিপূর্ণ হইয়া না যাউক। আমি সুরবালা-পুরবালাদের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে চাই না, তাহাদের আমি অভক্তও নহি— কিন্তু সেই পুরাতন রাজকবিগণ এবং বৃদ্ধা দিদিমাদের আশ্চর্য্য বর্ণনায় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী রাজকন্যা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে— হঠাৎ বাল্যসন্ধ্যার বর্ণপ্রবাহের অন্তরাললক্ষ্য তাহার ঐ সৌধচূড়া হইতে দৃষ্টি নামাইয়া, আধুনিক কাব্য-জগতের দিকে চাহিলেই অনিবার্য্য প্রশ্ন উঠে,— এক যে ছিল রাজকন্যা? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই চতুরা সখীবর্গ! কোথায় গেল তাহাদের পিঞ্জরস্থ স্ফুটবাক্ পাখী, কোথায় গেল সেই দুঃসাহসী অশ্বারোহী রাজকুমার!—

জনশূন্য পৃথিবী

হে মহাকায় ধূর্জ্জটি, তোমার জটার ভারে স্তম্ভিত হইয়া আর কতকাল তুমি ঘুমাইয়া থাকিবে? একবার জাগো। বুদ্ধি বলিয়া যে একটা খাপছাড়া জিনিষের তাড়নায় কলের ধোঁয়ায়, গির্জ্জার চূড়ায়, সঙিনের খোঁচায়, কলমের আগায় তোমার ধরণী ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে!— তুমি তোমার তিনটি রক্তনেত্র মেলিয়া এই পৃথিবীর চারিদিকে একবার তোমার ভাঙের রস ছাঁকিবার বিপুল বস্ত্রখণ্ডটি বুলাইয়া লও! সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাউক! আঃ! আমরা একবার মরিয়া যাই!

এস, আমরা সকলে মিলিয়া মরিয়া যাই। যে যেখানে আছ, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া নদীতে ডুবাইয়া দিয়া, হাতা-বেড়ী জলে নিক্ষেপ করিয়া, সব কৃতকর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া— এস, আমরা একদিন শ্রাবণের শেষরাত্রে বিলকুল নির্ম্মূল হইয়া মরিয়া, চিহ্নমাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া যাই। কেহ শোক করিবার না থাকুক, কেহ সান্ত্বনা দিবার না থাকুক, সংবাদপত্র ও তাহার খবর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাউক— বিরাট্ তুহিন-স্তূপ যেখানে বিগলিত-কলেবরে মহানন্দে তরঙ্গ ফুলাইয়া চলিয়াছে, সেই উত্তর-সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া— বিন্ধ্য-আন্দিস-ককেশস্-হিমালয়ে, গোবী-সাহারা-আরবে, উজ্জ্বলনীল মার্কিন্ পাম্পাসে, ভারতের শ্যামহরিৎ বনবিস্তারে,— দ্বীপ হইতে দ্বীপে, অন্তরীপ হইতে অন্তরীপে— সমুদ্র ডিঙাইয়া, পর্ব্বত উৎরাইয়া— শম্ভুর বিরাট্ জনহীনতা এক শ্রাবণদিনে, কৃষ্ণপক্ষীয় শেষরাত্রে, মানুষের সমস্ত দুর্গ ভাঙিয়া, সমস্ত পরিখা ভরাট্ করিয়া ফেলিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিক্— সমস্ত অধিকার করিয়া লউক!

পৃথিবীর বিজনতার মধ্যে মানুষ কতটুকু স্থান জুড়িয়া আছে? ব্রিটিশ ভারতে চন্দননগর!— ততটুকুও নয়। মানুষ তাহার কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-শৃঙ্খলিত ভাষায় কতটুকু আকাশকে মুখরিত করিয়াছে?— অতি সামান্য! মানুষদানব পরশুরামের মত কুড়ালি লইয়া, পাগলের মত তাহার চারিদিকে কোপাইতেছে— তবু এই অসীম বিজনতার মধ্যে যদি ইঞ্চিভোর পথ খুঁড়িয়া উঠিতে পারিল! হে বিরূপাক্ষ, তোমারি সঙ্গী বেতালগণ চারিদিকে পাহারা দিতেছে। উত্তরের আয়ত তুষারাসনে বিপুল শুভ্রকায় তোমার নন্দী স্বস্ত্যয়ন করিতে বসিয়াছে,—সমুদ্রের অতলতায় গুপ্ত থাকিয়া লক্ষলক্ষ যক্ষ নিঃশব্দে প্রবালমুকুতায় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, অন্ধকার-গিরিগুহায় বসিয়া কৃষ্ণকায় ভৃঙ্গী আপন-মনে শৃঙ্গবাদন করিতেছে; মরুভূমিতে তোমারি রক্তচন্দনচর্চ্চিত রক্তচক্ষু পুরোহিত মৌন হইয়া বসিয়া আছে— এবং বনে বনে তোমারি গৌরীর তরুণী সখীগণ চাপল্যে, গীতে, খেলায়, বেদনায়, ঋতূৎসবে নিজ নিজ হৃদয়ের বিচিত্রতা বিকশিত করিতেছে। ইহারি মধ্যে স্থানে স্থানে ইটের উপর ইট তুলিয়া তাহার ফুকরে ফুকরে মানুষ আশ্রয় লইয়াছে! হে শম্ভু, একটিমাত্র আঙুলের আগায় তোমার ভাঙে-ভিজান বস্ত্রখানি ধরিয়া, তুমি একমুহূর্ত্তে সমস্ত লেপিয়া-মুছিয়া লইতে পার।

একটি প্রান্তরে একটি ভাঙা কুটীর। গৃহস্থ মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, এখনো জীর্ণ গৃহটি দাঁড়াইয়া আছে। ভাঙা-ঘরগুলির উপরে ঝড়বৃষ্টি দুর্দ্দমবেগে হানিয়া আসিল! ঐ মেঘলবর্ষা যে তাহার লক্ষ জলতন্ত্রীতে বিদ্যুতের মেরজাপ মারিয়া সেতার বাজাইয়া আসিয়া ধরণীর বুকের মধ্যে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছে— ঐ ভাঙা কুটীরটাই তাহার একমাত্র বাধা। কে ছাড়িয়া গিয়াছে— কা'র স্মৃতি প্রাণে লইয়া

এ গৃহ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে!— বর্ষা এবং ধরণীর মিলনোৎসুক বক্ষ-দুটির মধ্যে একটা উদ্বেগের মত ঐ ঘরটা দাঁড়াইয়া আছে। উহাকে ভাঙিয়া সমান করিয়া দাও! সেইরূপ, সেই শ্রাবণরাত্রির প্রভাতে মানুষের চিহ্নমাত্র না থাকুক!

আর, ত্রিলোচন একবার মনে করিলে কতক্ষণই বা লাগে! একটি তরঙ্গ-অঙ্গুষ্ঠের আন্দোলনে ইংরাজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ— মার্কিনি, জাপানি, রুশিয়ান— সমস্ত জাহাজ টিপিয়া শেষ করা যায়! ভাঙে-ভিজান বস্ত্রখানিতে একটি কণা শ্মশানভস্ম মাখাইয়া ঘর্ষণ করিয়া দিলে নিউইয়র্কের দশতলা-বারতলা বাড়ীগুলা ধরণীর কলঙ্করেখার মত তখনি মুছিয়া যায়, ধোঁয়াকালীভূষামাখা লণ্ডন, সোনার কালীতে ছাপান একখানি ছবির মত প্যারিস্, ম্যুনিসিপালিটি-গবর্মেণ্টহাউস-সমেত নগরাধম কলিকাতা, বস্ত্রটির কোণে বিন্দুমাত্র কালিমাচিহ্ন রাখিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়! শম্ভুদেব, তরুলতিকার বিপুল শ্যামলস্রোত এই সকল ইষ্টকপুঞ্জের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়া ফিরিয়া গেছে— বাধা দূর হইলেই বনলক্ষ্মী দেখিতে দেখিতে ছায়ায়, গন্ধে, মর্ম্মরে, কূজনে-গুঞ্জনে তোমার বিজনগিরিবাসিনী পার্ব্বতীর নিভৃত বিহারস্থলী রচনা করিয়া দিবে! যাক্,— যাক্,— আবার সমস্ত সোনা-রূপা মাটির ভিতরে লুকাইয়া পড়ুক; যাক্,— যাক্,— কঠিন হীরক তাহার কৃষ্ণকায় ভ্রাতা অঙ্গারের সঙ্গে আবার একাসন গ্রহণ করিয়া ধরণীমাতার বক্ষকোটরে নির্ব্বিশেষে লালিত হৌক— পৃথিবীর উপরে আর কোন জিনিষের কিছুমাত্র মূল্য না থাকুক। তার পরে মেঘাবরোধে সমস্ত ধরণী ব্যাপিয়া সুগম্ভীর শ্রাবণনিশা প্রসারিত হৌক এবং বর্ষাধারে সমস্ত ধৌত করিয়া নবারুণরঞ্জিত নবীন প্রভাতটিকে জাগ্রত পৃথিবীর মাথার উপরে পঞ্চাননের পঞ্চমুখের শৃঙ্গধ্বনিতে উদ্ঘোষিত করিয়া দিক্!

বিজনতায় ত আমাদের সব লইয়াছে। আদি পিতামহ মনু সেইখানেই গেছেন এবং মনুর শেষতম উত্তরপুরুষও সেইখানকারই যাত্রী— রামচন্দ্র সেইখানেই শরাসন ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার কপি-অক্ষৌহিণীর তুচ্ছতম পুচ্ছধারীটিও সেইখানেই তাহার দুর্দ্দম চাপল্য বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিজনতার সহচরী নিদ্রা প্রতিদিন সন্ধ্যার ধূসর পালঙ্কে স্বর্ণাঞ্চল পাতিয়া দিয়া তাহার মদিরাবেশময় বাহুপাশে জনতার আবর্ত্ত হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে! তাই, এস,— সেই শ্রাবণরজনীতে ঘুমাইয়া আর যেন না উঠি। বাদলের দিনে যেমন "মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে" দিনটি চলিয়া যায়, এস, সেইরূপ আমরাও সেদিন নিদ্রার আড়াল ধরিয়া মৃত্যুর চিরবিজনতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাই। এস সকলে মরি! মরি— কিন্তু— এ কি, সকলেই যে অবিশ্বাসে হাসিয়া উঠিতেছে? যেন আমি কতগুলি বৃথা গর্জ্জন করিলাম।— কেহ বা আমাকে 'হতভাগা' বলিয়া করুণা করিতেছে!— আমি কি বড় দুঃখে মরিতে চাহিতেছি? তাহা হইলে একা মরাটাই যেন বিবেচনার কাজ— আমি নিতান্ত অবিবেচক নহি। হাঃ! আমার মনের ভাবটা কেহ বুঝিতে পারিল না! তাই ত বলিতে যাইতেছিলাম মরি— কিন্তু— ওইখানেই থামিয়া গেলাম। কিন্তু এবার শোন। মরি, কিন্তু আজ রাত্রে (কল্পনা কর, সেই শ্রাবণের শেষরাত্রি) আমি সেই 'দেয়াগরজনে' মুখর 'শাঙন' রজনীর রাধিকার মত সুখস্বপ্নে অধীর হইয়া বসিয়া আছি! আমি দেখিব না বটে, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া মাতিয়া উঠিতেছি— কাল পৃথিবী কি সুন্দর রূপ ধরিয়া দেখা দিবে। সমস্ত কলকারখানা, পোষ্টআফিস, জেলখানা, ইস্কুল, আফিস, রেলের রাস্তা সাফ হইয়া গেলে কাল প্রভাতে সমুদ্রপর্ব্বতবনমরুতুষারবিচিত্রা নবীনা কুমারী পৃথ্বী বৈকুণ্ঠধামের কোন্ দেবনন্দনের প্রণয়-কুতূহলে আপনার নির্জ্জন বাসরে জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিবে! কোথায় গেল

প্রকৃতির বাক্‌চেষ্টা বা মিথ্যা মুখরতা! কোথায় গেল প্রকৃতির বোধচেষ্টা বা সহস্র সিদ্ধান্তের আবর্জ্জনা! কোথায় গেল বাগীশ্বর বুদ্ধিমান্ মানুষ! পৃথিবী আবার তাহার মূঢ়তায় সতেজ, তাহার বর্ণবিলাসে স্বাধীন-সুন্দর! ধরণি, ধরণি, কোথায় তুই মাতা? কোথায় তুই লক্ষ সন্তানের পালনবিব্রতা গম্ভীরা অপ্রগল্‌ভা কল্যাণী! আজ তুই তোর কর্ত্তব্যবিব্রত মাতৃজীবন ত্যাগ করিয়া একি প্রগল্‌ভা প্রণয়চঞ্চলার বেশে সাজিয়া বসিয়াছিস!

মেঘচ্ছবি

আমাদের প্রান্তরে মেঘবৃষ্টির ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রান্তরই বটে শৃঙ্খলমুক্ত বর্ষা-প্রকৃতির সুযোগ্য ক্রীড়াঙ্গন। মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত প্রান্তর মুখোমুখী হইয়া চাহিয়া থাকে; তরুলেখা-শূন্য চক্রবালে, যেখানে মৃত্তিকা অসীম আকাশসমুদ্রের প্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া যেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে, দৃশ্যপটের সেই দূরান্তসীমায়,— শূন্যতার অবাধ বিস্তারে এক অগাধ এবং কঠোর ঔদাসীন্য ব্যঞ্জিত দেখিতে পাই; আর এক দিকে, যেখানে ধরণী-আকাশের সঙ্গমরেখায় এই সুদূর হইতে লক্ষ্যগোচর একসারি চিত্রবৎ স্পন্দহীন তালগাছ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ওই অগাধশূন্যতাকে প্রতিহত করিতেছে, ওখানকার দৃশ্যটি কি সকরুণ! ঐ দূরলক্ষ্য ক্ষীণ তালগাছ ক'টি দেখিয়া আমার মনে কেমন-একটু অসহায়তার ভাবের সঙ্গে একটি করুণা আবির্ভূত হয়। বিশ্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে ওই ঋজুক্ষীণ জীবনরেখা-কয়েকটি বাস্তবিকই বড় সকরুণ!

কিন্তু চারিদিকেই, ঔদাসীন্য এবং কারুণ্যে সকলি ভরিয়া আজ ব্যাকুলতার নিবিড় সঞ্চার। ঐ যে তালীশ্রেণীর পশ্চাতে ঘন-নিবদ্ধ মেঘস্তর বিলম্বিত হইয়া তালীবনশ্রেণীতে কৃষ্ণকোমল সজলস্পর্শে গভীরতর কারুণ্য অর্পণ করিয়াছে। এবং পশ্চিম দিগন্তেও ঐ নির্লিপ্ত শূন্যতার অন্তর আজ বৃহৎ বাষ্পোচ্ছ্বাসতরঙ্গে গদ্গদ এবং ব্যাকুল।

আমাদের ধরাতলের বাষ্পোচ্ছ্বাসে বুঝি আজ গগনের জ্যোতির্লোক অবরুদ্ধ; দীর্ঘায়িত গুরু গুরু মেঘধ্বনিতে বুঝি আজ পৃথিবীর মর্ম্মবেদনা আকাশপ্রাঙ্গণে শব্দায়মান। শূন্যতার উদাসীন ললাটে চিন্তাকালিমা, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক নিরুদ্ধ, আকাশপ্রাঙ্গণে সিন্ধুনির্ঘোষ, ধরণীর বনে প্রান্তরে নিবিড়তর মলিনিমা— আজ ধরণীগগনের সহানুভূতির দিন, আজ অপেক্ষার দিন, আজ অশ্রুজলে মিলনের দিন, আজিকার দিনান্তের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ধরাতলে অভিসারের এক রজনী আবির্ভূত হইবে।

কোথা হইতে কোথা চলিলাম? কিন্তু আজিকার দিনেই সহজেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন আজ রাত্রির মত প্রায়, সমস্ত সুখ আজ দুঃখের মত প্রায়। নীপসুন্দরস্মিতাসুন্দরি, তোমার হাস্য আজ সিন্ধুতলের রত্নের মত অন্ধকার। স্মরচাপ-ভ্রূ-বিলসিতা, তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা আজ ঘনঘোর আকাশের মত বাষ্পময় অন্ধকারে আবিষ্ট। কোথায় রাত্রি? কোথায় রাত্রিমুখে সন্ধ্যা? আজ কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইব? তাহার নীলাকাশভরা কোমলতা হইতে নীলাভায় বিগলিত হইয়া আজ কখন্ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! ঘনবিন্যস্ত মেঘের রন্ধ্রে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইব কি? কিন্তু না,— আজিকার সন্ধ্যা অপূর্ব্বতর। এ কি অভিনব সন্ধ্যা। বিকচজবাপুষ্পরাগরক্ত এই

সায়াহ্নকাল। ক্ষণকালের জন্য একটি রক্তমেঘ হইতে কোমলতর রক্তাভা নির্গত হইয়া এমনি তীব্র উজ্জ্বলতা ধারণ করিল যে, মনে হইতেছে, যেন বিশ্বকর্ম্মার অগ্নিকুণ্ডে দেবসেনাপতির বহ্নিদগ্ধ কঠিন লৌহবর্ম্ম নির্ম্মাণ হইতেছে। রক্তাভার নিম্নদেশে পৃথিবীও একটি বনচ্ছবি মিলাইয়া দিল, বৃষ্টিধৌত মেঘচ্ছায়াচকিত নিবাত-নিষ্কম্প বনচ্ছবি এমনি প্রগাঢ় সবুজ যে, ঐ ছবিটিকেও যেন কার্ত্তিকেয়ের একটি কঠিন তাম্রঢালের উপরে উৎকীর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। মেঘে এবং বনে মিলিয়া একখানি রক্ত-পীত-নীল-হরিত-তরঙ্গায়িত প্রগাঢ়বর্ণ তাম্রপত্রে খচিত বৃহৎ ছবি।

এই চিত্রখানির, এই প্রতিমাখানির বেদিকা— এই অপার মুক্তপ্রান্তর,— এই ছায়ামলিন সিক্ত-সুগন্ধি তৃণক্ষেত্র। ধীরে ধীরে সিক্ত মাঠের প্রতি অণুটিতে সন্ধ্যারাগ প্রবেশ করিয়াছে। কোথাও কালো ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেতের স্থানে স্থানে বর্ষার জলরাশি সঞ্চিত হইয়া আছে। ঐখানেই আকাশের বর্ণে ভূবেদিকা অতিশয় সুরঞ্জিত। ঐ যে বাঁধের বর্ষাস্ফীত তীরতরুমূলচুম্বিত জলরাশি দেখিতে দেখিতে সমস্ত অবয়বে সিন্দূর হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা জলকান্তি জম্বুরস-কষায়িতবৎ ঈষৎ বেগুনী। ধরণী-গগনের সহানুভূতির মধ্যে, পরস্পরের সিন্দূরী অনুরঞ্জনের মধ্যে বসিয়া মনে হইতেছে যেন আমার চারিদিকে নানাবর্ণদস্তর একটি বিরাট দাড়িম ফল ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে— চারিদিকেই এই স্বচ্ছতা, সরসতা এবং বর্ণবিলাস। আজ আমার স্তম্ভিত দুঃখিত হৃদয়। তাহা না হইলে চিত্তপটে এই মেঘচ্ছবি বিম্বিত হইয়া, শত উপমায় জীবন্ত হইয়া এক অলকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিত। তাহা হইল না,— সন্ধ্যার ছায়ায় আমার অদৃশ্য বীণা পদতলে ফেলিয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। সিন্দূরলেখা ক্রমে ম্লানিমায় বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাসূচী

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা

সংখ্যাবিচারে সতীশচন্দ্রের রচনা স্বভাবতই স্বল্পকায়, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা আরও সামান্য তাহার কারণ, এই সংখ্যায় প্রকাশিত সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলেন— তাঁহার গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ও পৃষ্ঠপোষিত সমালোচনী পত্রে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই উদ্যোগে, সতীশচন্দ্রের কয়েকটি মাত্র রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহারও কতকগুলি বিনাস্বাক্ষরেই মুদ্রিত হয়।

বঙ্গদর্শন

ভগ্ননগরে প্রেমসম্মিলন[১]	১৩০৮ চৈত্র
আরো একটি কথা[২]	১৩০৯ বৈশাখ
বিদেশী বন্ধু	১৩০৯ আষাঢ়
প্যারাসেলসাস[৩]	১৩০৯ আশ্বিন, ও কার্তিক
স্বপ্নপ্রয়াণ[৪]	১৩০৯ পৌষ
জনশূন্য পৃথিবী	১৩০৯ চৈত্র
সন্ধ্যার একটি সুর[৫]	১৩০৯ চৈত্র
রাজকন্যা	১৩১০ বৈশাখ
দুয়োরাণী	১৩১০ জ্যৈষ্ঠ
মেঘচ্ছবি	১৩১০ আশ্বিন
চণ্ডালী	১৩১০ মাঘ
পত্র[৬]	১৩১০ চৈত্র
তাজমহল	১৩১০ চৈত্র
আগ্রাপ্রান্তরে	১৩১০ চৈত্র
আজি	১৩১১ বৈশাখ
নিশীথিনী	১৩১১ বৈশাখ

---

১ ব্রাউনিঙের "Love among the ruins" কবিতার অনুবাদ। বিনাস্বাক্ষরে প্রকাশিত

২ ব্রাউনিঙের "One word more" কবিতার আলোচনা

৩ ব্রাউনিঙের "Paracelsus"-এর আলোচনা

৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা

৫ বিনাস্বাক্ষরে প্রকাশিত কবিতা

৬ সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩১০ চৈত্রের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের "পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "পত্র" ঐ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, এবং "তাজমহল" ও "আগ্রাপ্রান্তরে" কবিতা-দুইটি উহার অনুবৃত্তিস্বরূপ প্রকাশিত হয়।

সমালোচনী

প্রাতঃপ্রবুদ্ধা[৭]	প্রথম বর্ষ	৩য়-৪র্থ সংখ্যা।	১৩০৮ [-০৯ চৈত্র-বৈশাখ]
আত্মসমর্পণ[৭]	প্রথম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা।	১৩০৯ [আষাঢ়]
[৭]সুন্দরী[৮]	প্রথম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা।	১৩০৯ [আষাঢ়]
পুস্তক-সমালোচনা[৯]	প্রথম বর্ষ	৭ম সংখ্যা।	১৩০৯ [শ্রাবণ]
ক্ষণিকা[১০]	প্রথম বর্ষ	৯ম সংখ্যা।	১৩০৯ [আশ্বিন]

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা

সতীশচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার কোনো রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের উদ্যোগে, তাঁহার লিখিত উতঙ্কের কাহিনী **গুরুদক্ষিণা** নামে 'বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (আগস্ট ১৯০৪)।— ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 'সমালোচনা' লেখেন, তাহা ১৩১০ চৈত্রের বঙ্গদর্শনে পূর্বপ্রকাশিত তাঁহার "পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়" প্রবন্ধের সহিত পরে যুক্ত হইয়াছে।— 'গুরুদক্ষিণা'র এ যাবৎ কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে।

---

৭ স্বাক্ষরহীন কবিতা

৮ একই শিরোনামের অন্তর্গত স্বাক্ষরহীন দুইটি কবিতার প্রথমটি 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিও সতীশচন্দ্রের রচনা, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; নিম্নে সেটি উদ্ধৃত হইল—

২

বৈষ্ণব-সমান আমি পরম বিশ্বাসী
জানি জানি— পূর্ণ তব এ সৌন্দর্য্যরাশি
চিত্রকান্তি নাগিনীর এ নহে বিলাস।
জানি ওই ললাটের সৌম্য গৌরাভাস
উষা-শশধর-সম ভক্তিনমস্কার
রাখিছে গোপন করি'। ওই কম্বুগ্রীবা
প্রণয়নির্ভরে ত্বরা বিলুণ্ঠিতভার
ছিন্ন মৃণালের মত হেলি পড়ে কিবা
জানি তাহা। জানি জানি এ লাবণ্য লোল
বয়স লুকায় সুখে সন্ধ্যাপদ্মসম
ওই তব বক্ষোময় যৌবন-হিল্লোল
ভাঙি' পড়ে প্রেমভারে তরঙ্গ-উপম
—জানি আমি— স্খলি' পড়ে ত্বরা গর্ব্বস্তূপ
অনিন্দ্য মধুর রাখি' তব মুগ্ধরূপ।

সমালোচনীর এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'কবিতা-গুচ্ছে' স্বাক্ষরহীন আরো দুইটি কবিতা আছে।

৯ প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' ও কুমারী শান্তিময়ী দেবীর 'আভাস' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। এগুলি 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে প্রকাশিত হয় নাই।

১০ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র সমালোচনা

১৩১৯ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশচন্দ্রের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিয়া **সতীশচন্দ্রের রচনাবলী** প্রকাশ করেন (ডিসেম্বর ১৯১২)।[১১] এই 'রচনাবলী'র 'কবিতা'-অংশে চৌত্রিশটি (তন্মধ্যে ব্রাউনিঙের এই তিনটি কবিতার অনুবাদ আছে—"Love among the ruins", "Meeting at night" ও "Parting at morning") ও 'গদ্য' অংশে আটটি রচনা স্থান পাইয়াছে এবং সর্বশেষে "তাঁহার কয়েকদিনের মাত্র একটি ডায়ারী" মুদ্রিত হইয়াছে।

ইংরেজি অনুবাদ

উইলিয়ম পিয়ার্সন ও সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হইবার পর সতীশচন্দ্রের রচনায় বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

অনুবাদ	মূল	পত্রিকার সংখ্যা
The Taj Mahal	তাজমহল	সেপ্টেম্বর ১৯১৩
Midday	মধ্যাহ্নে	ফেব্রুয়ারি ১৯১৬
Evening	অপরাহ্ণে	ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

মিঃ পিয়ার্সন সতীশচন্দ্রের ডায়ারির যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা ১৯২২ সালে মডার্ন রিভিউর অক্টোবর সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। মিঃ পিয়ার্সন সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থেরও ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন— ইহা ("The Gift to the Guru") গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল— SHANTINIKETAN/The/Bolpur School/of Rabindranath Tagore/By/W. W. Pearson /Illustrated By/Mukulchandra Dey/New York/The Macmillan Company/1916.

১৯১৬ সালে আমেরিকায় এক বক্তৃতায় ("My School", *Personality*, 1917) রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 'গুরুদক্ষিণা'র এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি তাহা উদ্ধৃত করেন; সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাংলা প্রবন্ধের বক্তব্য হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র বলিয়া উহা এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল—

. . . . Fortunately for me, Satish Chandra Roy, a young student of great promise, who was getting ready for his B.A. degree, became attracted to my school and devoted his life to carry out my idea. He was barely nineteen, but he had a wonderful soul, living in a world of ideas, keenly responsive to all that was beautiful and great in the realm of nature and of human mind. **He was a poet who would surely have taken his place among the immortals of world-literature if he had been spared to live,** but he died when he was twenty, thus offering his service to our school only for the period of one short year. With him boys never felt that they were confined in the limit of a teaching class ; they seemed to have their access to everywhere. They would go with him to the forest when in the spring the sal trees were in full blossom and he would recite to them his favourite poems, frenzied with excitement. He used to read to them Shakespeare and even Browning,—for he was a great lover of Browning,—explaining to them in

১১ সতীশচন্দ্রের পুস্তক দুইখানি প্রকাশের ইংরাজি তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

Bengali with his wonderful power of expression. He never had any feeling of distrust for boys' capacity of understanding ; he would talk and read to them about whatever was the subject in which he himself was interested. He knew that it was not at all necessary for the boys to understand literally and accurately, but that their minds should be roused, and in this he was always successful. He was not like other teachers, a mere vehicle of text-books. He made his teaching personal, he himself was the source of it, and therefore it was made of life stuff, easily assimilable by the living human nature. The real reason of his success was his intense interest in life, in ideas, in everything around him, in the boys who came in contact with him. He had his inspiration not through the medium of books, but through the direct communication of his sensitive mind with the world. The seasons had upon him the same effect as they had upon the plants. He seemed to feel in his blood the unseen messages of nature that are always travelling through space, floating in the air, shimmering in the sky, tingling in the roots of the grass under the earth. The literature that he studied had not the least smell of the library about it. He had the power to see ideas before him, as he could see his friends, with all the distinctness of form and subtlety of life . . . .

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রচনা

সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত হইবার পূর্বেই অকালে সতীশচন্দ্রের জীবনান্ত হয়। তাঁহার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে যে কয়টি লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে তাঁহারা এই কবিকিশোরকে আর বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের প্রায় চল্লিশ বৎসর পর কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখিয়াছেন, "যে বলিষ্ঠ ও সরস কাব্যবৈদগ্ধ সেই ক-দিনে তার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম এ দীর্ঘ জীবনে আর কোথাও তা দেখিনি।"— রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন, সতীশচন্দ্রের প্রিয়সুহৃৎ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পরলোকগমনে যে কবিতা লিখিয়াছেন, অভিন্নহৃদয় বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁহার যে চরিত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল। সতীশচন্দ্র-প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি রচনার নির্দেশ নিম্নে দেওয়া হইল—

"৺সতীশচন্দ্র রায়" (কবিতা), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'সমালোচনী', তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১১

"স্মৃতি", জগদানন্দ রায়, 'শান্তিনিকেতন', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

"কবি সতীশচন্দ্র রায়", শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিচিত্রা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

"LOOKING BACK : a summer vacation at Santiniketan", Rathindranath Tagore, *The Visva-Bharati Quarterly*, August 1939

"শান্তিনিকেতনের স্মৃতি", সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

"রবীন্দ্রস্মৃতি : কবি সতীশচন্দ্র রায়", শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'দেশ', ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯

"রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের পরিশিষ্ট : সতীশচন্দ্র রায়", শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশ', ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

শ্রীহলধর হালদার

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমলতা দেবীকে লিখিত। পূর্বানুবৃত্তি

508 W. High St.
Urbana Ill.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আবার কিছুদিন এখান থেকে বিলাতে পৌছন পর্য্যন্ত খুব একটুখানি নড়াচড়া চল্‌বে। কোথায় কখন থাকব এখনো কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারিনি— পথে পথেই সময় কাটবে। এই বেড়ানোতে বৌমার যথেষ্ট উপকার হচ্চে এই মনে করে আমি আনন্দ বোধ করচি। ভিতরে ভিতরে বৌমার মনের খুব একটা পরিণতি হচ্চে তার আর সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে আমরা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নিয়েই উঞ্ছবৃত্তি করে মরচি, মানুষের জীবন বলে যে একটা মস্ত বিদ্যালয় আছে সেখানকার দরজা আমাদের পক্ষে কত সঙ্কীর্ণ। মানুষের জীবন যে কত বড়, তার গ্রহণের শক্তি এবং ত্যাগের শক্তি যে কত প্রবল তা প্রত্যক্ষ দেখতে না পেলে আমরা নিজের সত্য পরিচয় পাইনে— সেইজন্যে এমন ভাগ্যহীন দরিদ্রের মত এমন কৃপণের মত দিন কাটাই। এদেশে এসে বৌমা যথার্থভাবে মানবচিত্তের যে সংসর্গে আসতে পারচেন তাতে আপনা আপনিই তাঁর চিত্তের উদ্বোধন হচ্চে। আশা করচি, জীবন উৎসর্গ করাতেই যে জীবনের সার্থকতা এ কথা ক্রমশই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে।

কাল সুরেনের চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে খুব সম্ভব মে মাসে সে বিলাতে আসবে। যদি আসা হয় তাহলে আমি ভারি খুসি হব। আমি থাকৃতে থাকৃতে এলে অনেক বিষয়ে আমি তার অনেক সুবিধা করে দিতে পারব।

টুলু এসেছে শুনে খুব খুসি হলুম— তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। আমাদের আশ্রমের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মেয়েদের ডাক পড়চে এইটে আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় বলে মনে হচ্চে— আমরা যাঁর পূজার আয়োজন করতে বসেছি তাঁর পূজার অর্ঘ্যরচনায় মেয়েদের হাত না থাকলে তিনি প্রসন্ন হবেন কেমন করে? শুভদিন আস্‌চে— আমাদের আয়োজন ক্রমশই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

37 Alfred Place
South Kensington.
London.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি যে দৃষ্টি থেকে আমাদের সমস্ত ক্ষতিলাভ গণনা করতে চাচ্চি সেটাকে আমার নিজের একটা বিশেষ নতুন জিনিষ বলে ধরে নিয়ো না। আমার নিজের বিশেষ দিকটাতে আমি খুবই ছোট— সেখানে আমি বিষয়ী, সেখানে আমি হিসাবী, সেখানে আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং বিরাহিমপুরের জমীদার, সেখানে কোনো লোকসানই আমার সহ্য হয় না। কিন্তু সেই-খানেই আমি বাঁধা পড়ে থাকৃতে পারব না এবং কাউকে বাঁধা পড়ে থাকৃতে বলব না। আমার সেই নিজের অন্দরের খিড়কির দরজায় বসে আমার ব্যবসায় চলবে না— আমাকে সদর রাস্তায় বেরিয়ে আস্‌তে হবে,— এই রাস্তাই সবচেয়ে পুরাতন এবং প্রশস্ত, এই রাস্তাই সকলের রাস্তা। যদি বল এ রাস্তায় ঠক্‌তে হবে সে আমি জানি, ঠকবার জন্যেই কোমর বেঁধে বেরতে হবে। এ রাস্তায় যাঁরা সম্পূর্ণ ঠকেছেন তাঁরাই সম্পূর্ণ জিতেছেন। আমি তাঁদের দলের লোক নই— কিন্তু তবু বারবার মন বলে যে তাঁদেরই পদচিহ্ন ধরে চলতে হবে। এই বড় রাস্তাতেই তাঁদের পদচিহ্ন আছে, আমার খিড়কির রাস্তায় নেই। কাজেই আমার সেরেস্তার খাতা খুলে এই বয়সে কেবল আমার জমাখরচের হিসাব মিলিয়ে চল্‌তে পারব না। এরকম চলা পরিহার করাকে পাকা চালে চলা বলে না সে আমি কি জানিনে? খুবই জানি। কেননা সেই পাকা চালের মামুলি অভ্যাস আমার হাড়ের মধ্যে আছে। কিন্তু তবু আমি তার দিকে ওকালতি করতে পারিনে। আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে বোকা হতে হবে, বিবেচক লোকদের কাছে আমাকে উপহাস্য হতে হবে নইলে আমার পরিত্রাণ নেই। একদিনে হয়ে উঠবে না বোধ হচ্চে শিশুর মত একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে টল্‌তে টল্‌তে চলা আরম্ভ করতে হবে— কিন্তু তবুও সেই মাথা তুলে চলাই অভ্যাস করব, চিরদিনই ধূলোর দিকে মুখ করে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে পারব না। দাঁড়িয়ে চলবার চেষ্টার বিপদ আছে, হয়তো পড়তে হবে, এবং পড়লেই মানুষ হাসে— বলে, "কেমন, আমি আগেই বলিনি, যার যে দিকে সামর্থ্য নেই তার সে দিকে বড়াই করতে যাবার দরকার কি?" সত্যি কথা, কিন্তু তবুও শিশু চিরকালই নিরাপদে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে এ কথা বলা শোভা পায়না। বারবার পড়বার ভয় শিরোধার্য্য করে নিয়েই তাকে মাটির উপরেই ষোল আনা নির্ভর ত্যাগ করে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সেই দিকেই তাকে উৎসাহ দাও, সাহায্য কর— তাকে নিরাপদের উপদেশ দিয়োনা, তাকে নির্ভরসার কথা বোলোনা। যেটা সবচেয়ে বড় পন্থা সেইটেই সবচেয়ে দুর্গম এই জন্যে ভরসা যদি দিতে হয় উৎসাহী যদি করতে হয় তবে সেইদিকেই করতে হবে— সুবিধা সুযোগের দিকে করবার কোনো দরকারই নেই— কেননা সে যে মাটির মত আপনিই নীচের দিকে টানচে— কারো ঘাড়ে ধরে সে দিকে চেপে রাখবার কোনো প্রয়োজনই হয় না। এই কথা মনে নিশ্চয় জানতে হবে যে বড় পথে চলবার নিষ্ফলতারও মূল্য আছে। সেই নিষ্ফলতার বেদনা ও বিদ্রূপকে ভয় করাই হচ্চে তপোভঙ্গের প্রধান

হেতু। এই রাস্তায় নিষ্ফলতার মূল্য এবং ঠকে যাবার পুরস্কার স্বয়ং অন্তর্য্যামীর কাছে থেকেই পাওয়া যায়— মানুষ এখানে মাপ করে না, উপহাস করে এবং বলে বড় রাস্তায় চলবার ভড়ং করাও একটা বড়াই মাত্র এবং হাতে হাতে তার পরিচয় পাওয়া গেল। মানুষ যেখানে অকৃতার্থ, সাধারণ মানুষ সেইখান থেকেই তার বিচার করে আর মানুষ যেখানে কৃতার্থ ঈশ্বর সেইখানেই তাকে দেখেন। আমরা কথায় কথায় বলে থাকি অমুক লোকটা আইডিয়া নিয়ে বড় বড় কথা বলে কিন্তু ব্যবহারে তার পরিচয় পাইনে কিন্তু মানুষ যেখানে সত্য সেখানে দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? বীজের মধ্যে যেখানে অরণ্য কাজ করচে সেখানকার খবর কি আমরা পাই? ইতি ১৮ই বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, টাকার প্রয়োজন কোন্‌খানে বেশি কোন্‌খানে কম সে কথা আমাদের আদর্শ অনুসারে আমরা বিচার করি বটে কিন্তু সে বিচার সম্পূর্ণ নিষ্ফল। পৃথিবীতে আমরা বারম্বার দেখেছি টাকা দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রয়োজন সাধন হয়নি— অধিকাংশ স্থলে তার উল্টো হয়েছে। অতএব তুমি যে মনে করচ টাকা-কড়িতে বিশেষভাবে রথীদের প্রয়োজন আছে সেটা নিতান্ত একটা অন্ধ সংস্কার মাত্র। কথাটা যদি সত্য হত তাহলে কেবলমাত্র বড়মানুষের ঘরেই মানুষ মানুষ হত, গরিবের ঘরে হতনা। রথী যদি আজ তার সম্পত্তি হারায় তাহলেই সে যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন থেকে ভ্রষ্ট হবে এ কথার সিকি পয়সা মূল্য নেই— ও সমস্ত কেবলমাত্র নিজের অস্থিমজ্জাগত দুর্ব্বলতাকে ভদ্র আবরণে চাপা দিয়ে রাখবার ছল মাত্র। তুমি যে ভাবচ সংসারে আমি টাকার ভোগ সেরে সুরে ঠাণ্ডা হয়ে বসেছি সে কথা ঠিক নয়। কোনোদিনই আমি টাকা ভোগ করিনি, ঈশ্বরের প্রসাদে আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমার হাতে টাকা ছিলনা, যেটুকু ছিল নিজে ভোগ করিনি দরিদ্রের মত টানাটানি করেই ত আমার দিন গিয়েছে— এমন কি বই কেনা আমার সবচেয়ে সখ ছিল, কিন্তু কখনই সাধ পূর্ণ করে বই কেনবার সামর্থ্য আমার হয়নি। ছেলেদের সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিয়েছি বটে কিন্তু তারা আহার বিহার বেশভূষায় বরাবর দরিদ্রের মতই মানুষ হয়েছে। এই যে আমাকে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত টানাটানি করে চালাতে হল তাতে আমার কিম্বা আমার সম্পর্কীয় কারো কি কোনো ক্ষতি হল? হতে পারে আমার পরিবারের যারা অর্থভোগ করতে চায় তারা পুরোপুরি করতে পারেনি— কিন্তু সংসারে কোন্ ক্রোরপতির ছেলেই বা তা পারে— এবং যে ছেলে ভোগের মধ্যে মানুষ হয়েছে তাদের যে ভাগ্য প্রসন্ন তাও ত দেখিনি। রথীর বয়সে আমার হাতে কি ছিল? কিছুই না। কিন্তু কিই বা না ছিল? যদি আমার পিতামহের বিষয় অক্ষুন্ন থাকৃত, যদি আমার পিতা মনে করতেন ছেলেদের ভোগের জন্যই তাঁর টাকা আর কিছুর জন্যে নয় তাহলে তাঁর সে সম্পত্তি নিয়ে আমার কি সদ্গতি হত? বিষয়ীর দৃষ্টি দিয়েই যদি বিষয়কে দেখতে যাই তাহলে যা গলার হার হতে পারত তাকে গলার ফাঁসি করা হয়— আমি কি স্নেহ করে রথীর গলায় সেই ফাঁস পরাব? আমি আজ যদি টাকার উপর মমতা করি তাহলে রথীকে আমি যে টাকা দেব সেই সঙ্গে সেই টাকার মমতাও দেব— তাকে সোনা দেব কিন্তু সোনার শিকল গড়িয়ে দেব— তেমন সোনায় তার কাজ নেই— আমি দারিদ্র্যকে ভয় করতে

চাইনে· নিজের ছেলের জন্যেও না। রথীর মনে যদি সেই ভয় থাকে তাহলে সে ভয় থেকে কে তাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাবে? আমি ত না। তুমি লিখেছ আমি যে ধন ত্যাগ করব সে আমার ত্যাগ নয় সে রথীর ত্যাগ। এ কথা তুমি ভাল করে ভেবে লেখনি। মানুষ যাকে স্নেহ করে সে নিজের চেয়ে বেশি। কত কৃপণ অসহ্য দুঃখ ভোগ করে ছেলের জন্যে টাকা জমিয়ে যায়— কেননা ছেলের মধ্যেই সে ভোগ করতে চায়, কেননা ছেলে যে তার নিজের চেয়ে বেশি— এইজন্যে ছেলের ভোগ তার নিজের ভোগের চেয়ে বড়। রথীকে যদি আমি কোনো ভোগ থেকে বঞ্চিত করি তবে সে আমার নিজেকে বঞ্চিত করার চেয়ে অনেকগুণে কঠিনতর। কিন্তু তাতে আমি কুণ্ঠিত হতে পারিনে— কেননা আমি যে সম্পদকে বড় বলে জানি অথচ নিজের জীবনে যাকে সম্পূর্ণ লাভ করবার সুযোগ পাইনি, সেই সম্পদের অধিকার রথীর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা না করে আমি থাকতে পারিনে। রথী মনের সাধে বড়মানুষী করে বেড়াক এ ইচ্ছা আমি কিছুতেই করতে পারব না— এবং রথী যদি নিজে সেই ইচ্ছা মনে পোষণ করে তবে তা যেন সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়— তবে সেই দিক থেকে সে যেন দুঃখ পায় এই কামনাই আমি করব। পুত্রের মধ্যে পিতা পূর্ণতর হবে এই হচ্চে সৌভাগ্যের কথা— রথী যদি বিষয়ী হয় তবে রথীর ভাগ্য মন্দ এবং আমার তার চেয়েও মন্দ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বৌমা,

আজ সকালে আমরা লণ্ডনে এসে পৌচেছি। সাউথ কেন্সিঙ্‌টনে যে ঠিকানায় আরবারে ছিলুম আসচে সপ্তাহে সেইখানে যাব— এখন সেখানে জায়গা খালি হয়নি। আমরা ওলিম্পিক বলে যে জাহাজে চড়ে আটলান্টিক পার হয়েছি সেই জাহাজটা বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজ। শান্তিনিকেতন থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত যতটা, ততটা লম্বা হবে। আমরা যে ডেকের ক্যাবিনে ছিলুম— সে ডেকটা পঞ্চমতলার ডেক অর্থাৎ তার উপরে থাকে থাকে আরো চারতলা ক্যাবিন আছে— এবং তার নীচেও অনেকতলার ক্যাবিন। এর থেকে বুঝতে পারবে জাহাজটা কত উঁচু। তা ছাড়া শয়নাসন আরাম বিরাম আহার বিহারের যে ব্যবস্থা সে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ছদিন মাত্র মেয়াদ কিন্তু এই ছদিনের জন্যে রাজকীয় আয়োজন এই বিপুল ভোগের বোঝা বহন করে বেড়াবার যে শক্তি তা কল্পনা করলে বিস্মিত হতে হয়— কোথাও লেশমাত্র মলিনতা বা শিথিলতার চিহ্নটুকু নেই— এতবড় একটা উদ্যোগ কিন্তু কোনোখানে প্রয়াসের কোনো লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায়না। আমাদের মস্তিষ্কে হৃৎপিণ্ডে পাকযন্ত্রে যেমন অহরহ একটা বিচিত্র এবং বৃহৎ চেষ্টা চলছে— অথচ আমরা সমস্তকে যেমন অনায়াসে বহন করে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি— এ কতকটা যেন সেইরকম। যে শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ও সচেষ্ট থেকেও আপনাকে সুবিহিত পারিপাট্যের মধ্যে সমাবৃত রাখতে পারে তাকে দেখে মনের মধ্যে সম্ভ্রম জন্মায়— বিশেষতঃ এই জিনিষটা আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাইনে— সেখানে শক্তির রথ গোরুর গাড়ীর মত— তার সামর্থ্য অল্প, সে চলে কম, সে শব্দ করে বেশি— তার বাহন বেচারা অবিশ্রাম ল্যাজমলা খায় এবং তার চালকেরও মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম নেই।

আমাদের আশ্রমবিদ্যালয়ের ললাট থেকে এই কষ্টের কুঞ্চনরেখা এখনো ঘোচেনি— আমাদের ত্যাগের মধ্যে চেষ্টার মধ্যে ক্লেশ রয়েছে— যতদিন আমাদের মধ্যে দীনতা থাকবে ততদিন এই ক্লেশের ভার আমাদের বহন করে চল্‌তে হবে— ততদিন এর চাকার ভিতর থেকে আর্ত্তস্বর শুনতে পাব। কিন্তু তবু এ ক্লেশ স্বীকার করতে হবে— এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা করলে চলবেনা। কেননা চল্‌তে চল্‌তেই তবে চলবার বাধা ক্ষয় হয়। আমাদের আত্মার দীনতা ধনের দীনতার মত নয়— দান করতে করতেই তার দৈন্য হ্রাস হতে থাকে, তার ভার বহন করবার দুঃখটা বহন করার দ্বারাই দিনে দিনে লঘু হয়ে আস্‌তে থাকে। বস্তুতঃ শ্রমের দ্বারাই তার শ্রান্তি দূর হয়ে আসে— এইটেই কি আমরা আমাদের আশ্রমের সাধনার ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনি ? কিন্তু অধীর হলে চলবেনা— জীবনের কার্য্য ইমারৎ গেঁথে তোলার মত নয়— কতখানি অগ্রসর হল কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়না— এমন কি অনেক সময়ে বিরুদ্ধ আকারেও সে আপনাকে প্রকাশ করে। সেই জন্যে আমি বাইরের দিক থেকে সফলতার বিচার করতে চাইনে— আমি কেবল এইটুকুই দেখতে চাই আমি যেন সত্য হতে পারি। আমি এই জানি আমার উপর যে দাবি আছে সে আমাকে যেমন করে হোক্ পূরণ করতেই হবে— এ দাবি অন্যে স্বীকার করচে কিনা সে কথা বিচার করতে গেলেই নিজের দায় অন্যের স্কন্ধে চাপাবার দুর্বলতা মনকে পেয়ে বসে। আমার অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার যা বোঝাপড়া আছে তাই আমি জানি— আমি আর কিছু জানিনে— জানবার চেষ্টা করতে গেলে পদে পদে ভুল বিচার করি, তাতে কেবল অপরাধ বাড়তে থাকে। আমাদের দাবি হচ্চে কেবল দেবার দাবি— অন্যের কাছ থেকে পাবার দাবি কিছু নয়— এই কথাটি যেন প্রসন্ন মনে অন্তরের মধ্যে জাগরূক রাখতে পারি।…

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাজশেখর বসু

আজ যাঁকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্মরণ করছি, তাঁকে আমরা কবিবর বলি না, মহাকবিও বলি না, শুধুই কবি বলি ; কারণ, যা যত বড় তার নাম ততই ছোট, যেমন দেশ কাল মন প্রাণ বিদ্যা বুদ্ধি। কবি শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ— ক্রান্তদর্শী, অর্থাৎ যাঁর কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রকাশ পায়। এই অর্থ মনে রাখলে আর কোনও বিশেষণ যোগ করার দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকে এতই অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন যে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার কখনও অন্ত হবে না। লোকে তাঁর কীর্তির যে অংশ নিয়ে সাধারণত চর্চা করে তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য। বাংলা পদ্য আর গদ্য রীতির যে পরিবর্তন মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ; তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার আসন পেয়েছে ; তিনি জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতবাসীর মুখ উজ্জল করেছেন— এইসব কথাই বার বার আমাদের মনে উদয় হয়। সাহিত্য বললে আমরা যা বুঝি তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং তার উপাদান অসংখ্য। এই সভায় রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলছি।

যে দেশে যে ধর্ম প্রচলিত তার প্রভাব সে দেশের সাহিত্যের উপর অবশ্যই পড়ে। বাংলা সাহিত্যের বদনাম শোনা যায় যে, এ কেবল হিন্দুরই সাহিত্য, সুতরাং অহিন্দু বাঙালীর অনুপযুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলের প্রভাব প্রচুর, তবুও তা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত জনের প্রিয় হ'ল কেন ? এর কারণ, ইওরোপীয় মধ্যযুগের অন্তে রেনেসাঁসের সময় পণ্ডিতগণ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছিলেন, সমগ্র ইওরোপের ঐতিহ্যকেই তাঁরা নিজের ব'লে গণ্য করেছিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়েও তাঁরা অবাধে পেগান দেবদেবীর পুরাণকথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের ধর্মহানি হয় নি। পিউরিটান হ'য়েও মিলটন গ্রীক বাগ্‌দেবীর বন্দনা করেছেন। কেবল ধর্মবিশ্বাস দ্বারা সাহিত্য শাসিত হয় না— এই ধারণা হয়তো খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ইওরোপের গুণীসমাজ বুঝেছিলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির তথা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকলেই ধর্মবিশ্বাসের হানি হয় না। হয়তো অনেকে মনে করতেন যে পেগান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তো খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যও আছে, তাতেই প্রথমটির দোষ খণ্ডন হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের গোঁড়ামি অনেকটা কমে গেছে, তার ফলে শিক্ষিত সমাজ পেগান ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য সমদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েও নির্ভয়ে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন ক'রে কাব্য লিখেছিলেন। তিনি এই কাজ বিনা বাধায় করতে পেরেছিলেন, কারণ ধর্মান্তরিত হ'লেও তিনি পূর্ব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষগ্রস্ত হন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর স্বধর্মীরা তাঁর রচনার কোনও খবরই রাখতেন না। তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দিলেন যে ভাল হ'ক বা মন্দ হ'ক দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ফেলবার নয়, জাতীয় সভ্যতার ধারা বজায় রাখবার জন্য সাহিত্যে তাকে যথোচিত স্থান দিতে হবে, এবং স্থান দিলেই তার ফলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রশ্রয় পাবে এমন নয়। 'গোরা' গল্পের নায়কের মতে সমস্ত প্রাচীন সংস্কারই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং পানুবাবুর মতে সে সমস্তই বিষতুল্য বর্জনীয়। এই দুরকম গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে উদার দৃষ্টিতে কি করে সাহিত্য রচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তাঁকে বাঁ দিক আর ডান দিক থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছে, কারণ সকল পাঠকের সাহিত্যিক উদার দৃষ্টি নেই। ইওরোপীয় রাজনীতিকদের মুখে এখনও আমরা শুনতে পাই যে Christian Ideal বা খ্রীষ্টীয় আদর্শ না মানলে কোনও রাষ্ট্রের নিস্তার নেই। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও যে মহৎ আদর্শ থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন না। সেইরকম এদেশের অনেকে মনে করেন যে সনাতনী বা ইসলামী আদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণাদি প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপযুক্ত স্থান দিয়েও সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপর টেনে এনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, উৎকৃষ্ট ইওরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যকেও সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক করা যায়। এই লক্ষণের ফলেই রবীন্দ্রসাহিত্য অনেক অহিন্দু পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে। আশা করা যায়, এই পথে অগ্রসর হয়েই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় হ'তে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে আধুনিক ও যুক্তিবাদী, তথাপি তাঁর কাব্য নাটক আর গল্পে এদেশের প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। তিনি লোকব্যবহারেও যে অনুরূপ যোগসূত্র রেখেছিলেন তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ কীর্তি আর আভিজাত্যের গণ্ডি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখেন নি, কোনও আলাপপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন, দেশের জনসমষ্টির তুলনায় তাঁদের সংখ্যা খুব কম; তথাপি শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণিত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ এক মুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। কার কোন বিষয়ে কতটুকু দৌড় তা বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, অনেক সময় উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূরও জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার একটি কারণ। 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'— এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজ স্বভাবের এক দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

২৫ বৈশাখ ১৩৫৫, জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে অধিনেতার অভিভাষণ।

হাজার বছরের পুরানো বাঙলা ও বাঙালী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাহিত্য সর্বদাই সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি— তাহা শুধু আজিকার দিনে নয়, হাজার বৎসর পূর্বের দিনেও। হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের বাঙলায় যে সকল সাহিত্য রচিত হইয়াছে সেই সকল দোঁহা ও চর্যাপদগুলির ভিতরেও সেই হাজার বৎসরের প্রাচীন বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির পরিচয় নানাভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে; এই সকল দোঁহাকার এবং গীতিকারগণ ধর্ম-অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করিলেও তাঁহাদের ভিতরে যে সত্যকার সাহিত্য-প্রতিভা ছিল বহু স্থানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি— দুই-ই অমূর্ত; এই অমূর্তকে মূর্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে সাহিত্য হয় না। তাহা করিতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার। জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিকের রূপ ব্যতীত রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী-জীবন এবং তাহার পারিপার্শ্বিক বাঙলা দেশকে পদে পদে এই দোঁহা-গানগুলির ভিতরে আসিতে হইয়াছে। দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব, সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্থূলজীবনের চিত্রে ও ভাষায়। বাঙলার প্রাচীনতম গানগুলির ভিতরে তৎকালীন দেশ ও সমাজ-জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটি পরিচয় দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

চর্যাপদকে আমরা যখন বাঙলা সাহিত্য বলিয়া আলোচনা করিব তখন সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ সরকার তাঁহার শাসনকার্যের পরিচালনার জন্য ইচ্ছামত শিকল টানিয়া পূর্বে-পশ্চিমে এবং উত্তরে-দক্ষিণে বাংলাদেশের যে সীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমি এখানে প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সীমানা-নির্ধারণ-রূপ গবেষণার অবতারণা করিতে চাহি না, তবে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মোটের উপরে বলা যায়, চর্যাপদের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়াছে যে বাঙলাদেশ তাহা নিম্ন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিয়দংশ লইয়া একটি বৃহৎ ভূভাগ। এই সত্যটি বিস্মৃত হইয়া চর্যাপদের আলোচনায় আমরা অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছি। চর্যার ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন এগুলি প্রাচীন উড়িয়া, কেহ বলিয়াছেন প্রাচীন বিহারী, কেহ বলিয়াছেন প্রাচীন মৈথিলী, কেহ বলেন এগুলি খাঁটি প্রাচীন বাঙলা। কিন্তু এই সকল বিতর্কের অবসান হয় চর্যার ভাষার একটি পরিচয় দিলে, সে পরিচয় এই, ইহা দশম হইতে দ্বাদশ শতকের 'বৃহত্তর গৌড়ে'র ভাষা।

এই চর্যাপদগুলির ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঙলার ধর্ম, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি, সেই সম্বন্ধেই এখানে একে একে আলোচনা করিব।

চর্যাপদগুলির আলোচনা করিতে হইলে বৌদ্ধ সহজিয়া দোঁহাগুলিরও একই সঙ্গে আলোচনা

করা উচিত, কারণ এই দোঁহাগুলিও 'বাঙলা-সাহিত্য'। এখানে বাঙলা সাহিত্য কথাটি আমি 'বাঙলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য' এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া 'বাঙলার সাহিত্য', অর্থাৎ বাঙলা দেশে বাঙালী কবিগণ কর্তৃক একই কবিমানস লইয়া লিখিত সাহিত্য— এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা দেখি, যাঁহারা চর্যাকার ছিলেন খুব সম্ভব তাঁহারা অনেকেই পশ্চিমী অপভ্রংশে এই দোঁহাগুলি রচনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী একই। এইরূপ দুই ভাষা প্রয়োগের কারণ কি? ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তৎকালীন রাজপুত রাজপরিবারগুলির আভিজাত্যের ফলে এই পশ্চিমী অপভ্রংশ একটা সর্বভারতীয় আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল, এই কারণেই বাঙালী কবিগণও পশ্চিমী অপভ্রংশে দোঁহা রচনায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এই পশ্চিমী রাজবংশীয় আভিজাত্যই প্রধান কথা বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই দোঁহা রচনার সাহিত্যিক ঢঙটি একটি পশ্চিমী ঢঙ, এবং এই সাহিত্যিক ঢঙটি এবং তৎসঙ্গে তাহার ভাষাটি জনসমাজে প্রসিদ্ধি এবং প্রিয়তা লাভ করিয়াছিল; সেই জন্যই বাঙালী কবিগণও দোঁহা রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং দোঁহা রচনা করিতে গিয়া তাহার ভাষাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক-একটি সাহিত্যিক ঢঙ ও ভাষা এক-এক সময়ে যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন আছে। পালি-সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে 'গাথা' পাই তাহার ভাষা সংস্কৃতও নয় কোনও বিশেষ প্রাকৃতও নয়; আসলে মনে হয় ওটা কোন স্থানীয় ভাষা নয়, একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা। পরবর্তী কালের আমাদের 'ব্রজবুলী' ভাষার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি; উহা মিথিলার ভাষাও নয়, মধ্যবর্তী কোন জনপদের ভাষাও নয়, আসলে উহা একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা— একটা বিশেষ জাতীয় সাহিত্যের বাহনরূপেই তাহার উদ্ভব; এই জন্যই উড়িষ্যায়, মিথিলায়, বাঙলায়, আসামে যেখানেই যিনি এই বিশেষ জাতীয় সাহিত্য-রচনায় প্রণোদিত হইয়াছেন তিনিই এই বিশেষ ভাষাটিকেও কমবেশি গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

চর্যাকারগণ বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন। সত্য-উপলব্ধির জন্য এই বৌদ্ধ সহজিয়াগণের একটি বিশেষ সাধনা ছিল[১], সেই বিশেষ সাধনার পথকেই তাঁহারা সহজ পথ বলিতেন; অন্য সকল পথই তাঁহাদের মতে বক্র বা কুটিল। বাঁকা পথ শুধু ভুলায়, সত্যকে লাভ করিতে দেয় না। এইজন্য সহজিয়াগণ তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে তৎকালীন প্রচলিত এদেশের অন্য সকল ধর্মকেই নানাভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রসঙ্গেই আমরা এদেশে প্রচলিত ধর্মমত সকলের একটা আভাস পাই।

চর্যাপদে ও দোঁহাবলীতে বেদধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায়। অবশ্য দু-এক স্থানে যে 'বেদাগমে'র উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে বেদ ঠিক বেদ নয়, সেখানে তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্ররাশির প্রতিনিধি। যেমন—

জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥—চর্যা, ২৯

১ এ-সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

"যাহার (যে সহজ স্বরূপের) বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, তাহা কিরূপে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হইবে ?"

বাঙলাদেশ কোন দিনই বৈদিকধর্মের দেশ নয়, বেদাচার-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাঙলাদেশে আগমন অনেক পরবর্তীকালে। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় হইতে বাঙলাদেশের আর্যীকরণ আরম্ভ হইলেও ঠিক বেদবিধি বাঙলাদেশে কোন দিনই খুব প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তবে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বর্ণহিন্দুগণ পশ্চিমদেশ হইতে ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া যাগ-যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন করাইতেন এবং বেদপাঠ করাইতেন এরূপ প্রমাণ তৎকালীন ঐতিহাসিক তথ্য এবং কিংবদন্তী উভয়ের ভিতরেই পাওয়া যায়। এইরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন কিছু কিছু যে এদেশে তখন ছিল তাহার আভাস সরহপাদের নিম্নোক্ত দোঁহাগুলির ভিতরেই পাওয়া যাইবে।

বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউবেউ ॥
মট্টী [পাণী কুস লই পড়ন্তঁ।
ঘরহিঁ বইসী] অগ্‌গি হুণন্তঁ ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ

"ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না, এই ভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়। তাহারা মাটি-জল-কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়; কার্যবিরহিত (ফলহীন) অগ্নি-হোমের ফলে শুধু কটুধূমের দ্বারা চোখ পীড়িত হয়।"

এই প্রসঙ্গে সরহপাদ দণ্ডী সন্ন্যাসিগণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোইঅই হংসউএসেঁ ॥
মিচ্ছেহিঁ জগে বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লে ॥

"একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবদ্‌বেশে (সবাই) ঘুরিয়া বেড়ায়—হংসের (পরমহংসের) উপদেশে জ্ঞানী হয়; মিথ্যাই জগৎ ভ্রমের বশে বাহিত হয়, তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানে না।"

শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের পূজায় বিশ্বাসী হিন্দুগণের উল্লেখও পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ হিন্দুধর্মের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা ব্যতীতও কতগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাই এখানে লক্ষণীয়।

এই সময়ে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃই ইহা বাঙলা দেশের হিন্দুবৌদ্ধ যুগ— কোন্ ধর্ম যে প্রবলতর ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুগে জৈনধর্মেরও বাঙলাদেশে যে প্রসার ছিল সে কথা উপেক্ষণীয় নহে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বহু পূর্বেই যে পশ্চিম-বঙ্গে এবং উত্তর-বঙ্গে জৈনদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কথিত আছে স্বয়ং মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, রাঢ়ের অসভ্য লোকেরা তাহার দিকে কুকুর

লেলাইয়া দিয়াছিল। হিউয়েন্ সাং উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-বঙ্গে অনেক নির্গন্থ (জৈন) দেখিয়াছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধন এবং সমতটে দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের প্রাচুর্য ছিল। সরহপাদের দোঁহাগুলি পড়িলে মনে হয়, এই যুগেও বাঙলা দেশের ঘাটে পথে অনেক জৈন ক্ষপণক যোগীর দেখা মিলিত। ইহাদের বর্ণনা করিতে সরহপাদ বলিয়াছেন—

দীহণক্‌খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্‌খ উবেসেঁ॥

"দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উৎপাটিত করে। ক্ষপণকেরা পথভ্রান্ত বেশে মোক্ষের উদ্দেশে নিজেদের বহিয়া লইয়া চলে।"

দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের কতগুলি বিশেষ বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান ছিল। তাহারা নগ্ন থাকিত বলিয়া তাহাদের নাম দিগম্বর। তাহাদের বিশ্বাস তীর্থংকরগণ আহার ব্যতীতই বাঁচিয়া থাকেন; তাহারা হাতে ময়ূরপুচ্ছের ঝাড়ন বা পশুপুচ্ছের চামর বহন করে, দুই হাতে মাথার কেশ উৎপাটন করে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সরহপাদ বলিয়াছেন—

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণেঁ অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ॥
পিচ্ছীগহণে দিঠ্‌ঠ মোক্‌খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভোঅণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ॥

"যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হইত তাহা হইলে কুকুর-শিয়ালেরও মুক্তি হইত; লোমোৎপাটনে যদি সিদ্ধি থাকে ত যুবতীর নিতম্বের সিদ্ধি; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত তবে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ হইত; উচ্ছিষ্টভোজনে জ্ঞান হইলে জ্ঞান হইত হাতি-ঘোড়ার।"

বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য, হীনযানের যে কোনই প্রভাব ছিল না তাহা নহে। আমরা দোঁহাগুলির ভিতরে থেরবাদী বৌদ্ধগণের উল্লেখ পাই। থেরবাদিগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

চেল্লু ভিক্‌খু জে স্থবির-উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজ্জিউ বেসেঁ॥
কোই সুত্তন্তবক্‌খাণ বইট্‌ঠো।
কোবি চিন্তে কর সোসই দিট্‌ঠো॥

"চেল্ল (দশশিক্ষাপদী) এবং ভিক্ষু (কোটিশিক্ষাপদী) যাহারা— স্থবিরের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে; কেহ সূত্রান্তব্যাখ্যান করিয়া বসিয়া থাকে (দ্রব্যাদি লোভে), কেহ বা দেখিয়া দেখিয়া সর্বধর্ম (গ্রহণ) করে চিত্তে।"

অন্যদিকে একদলে ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে; সেখানে আছে আগম আর তর্কশাস্ত্র; কেহ ভাবে মণ্ডলচক্র— অঙ্কে করে চতুর্থতত্ত্বের উপদেশ।

অণ্ণ তহি মহাজাণহিঁ ধাবই।
তহিঁ সুতন্ত তক্কসথ হই॥
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই।
অণ্ণ চউত্থতত্ত দীসই॥

এই সকল প্রচলিত বৌদ্ধধর্মেরও বিরুদ্ধে ছিলেন সহজিয়ারা, তাই ধ্যান-ধারণা এবং সমাধির সাধনার পথে অগ্রসর হন নাই তাঁহারা। ধ্যান-সমাধিতে সুখদুঃখের পরানিবৃত্তি নাই, তাই পূর্ববর্তীদের লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥—চর্যা, ১

মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে মন্ত্রযানের ভিতর দিয়া বজ্রযানে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মন্ত্রতন্ত্র, ধারণী-জপেও তাঁহাদের মন ছিল না, এই সকলের বিরুদ্ধেও বহু স্থানে তাঁহারা বহু ভাবে বিদ্রোহ জানাইয়াছেন।

বহু প্রকারের যোগি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই এই গান ও দোঁহাগুলিতে। সরহপাদ বলিয়াছেন তাঁহার দোঁহায়—

অইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী॥
অক্‌খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী॥

"আর্য যোগিগণ ছাই মাখে দেহে, মাথায় বহে জটাভার, ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে; চোখ বুজিয়া আসন বান্ধে এবং কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধে।"

এই যুগে তান্ত্রিক কাপালিকধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল মনে হয়। সহজিয়াগণও অনেক সময় কাপালিক যোগী হইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য ইঁহাদের কাপালিক আদর্শ প্রচলিত কাপালিক আদর্শ হইতে অনেকটা পৃথক্ ছিল; ইঁহাদের মতে 'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপালিকঃ', অর্থাৎ মহাসুখকে পালন করে যে সেই কাপালিক। এই আদর্শ লইয়া কাপালিক হইতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,—

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ॥
....
তু লো ডোম্বী হাউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥

"আলো ডোম্বি, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ,—এই জন্য নিঘৃণ কাহ্ন হইয়াছে নগ্ন কাপালী যোগী। তুই হইতেছিস ডোম্বী, আমি কাপালী, তোর জন্য আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।" সহজিয়া মতে

এই কাপালী যোগী ও ডোম্বীর মিলনের তাৎপর্য যাহা তাহা আমি স্থানান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি[২] ; এখানে শুধু লক্ষণীয়, সহজিয়াদের চারিদিকে যে কাপালিক ধর্ম প্রচলিত তাহার রূপটি। অন্য একটি পদেও কাহ্নুপাদ নিজের সহজিয়া যোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে কাপালী যোগীর চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন—

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে॥
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ॥
আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
রাগদ্বেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার॥
মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী॥—চর্যা, ১১

"নাড়ীশক্তি রূপ খাট দৃঢ় করিয়া ধরা হইল ; অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজে। কাহ্ন কাপালী যোগী আচারে প্রবেশ করিল, এবং দেহনগরী একাকারে বিহার করে। আলি কালি ঘণ্টা ও নূপুর তাহার চরণে, রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণ করিল। রাগদ্বেষ মোহের ছাই লইয়া সে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লভে। ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া, মাকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।" এখানকার সব সাধন-রহস্য বাদ দিয়া মোটামুটি জানিতে পারি, কাপালী যোগীরা বীরনাদে ডমরু বাজাইতেন, একা একা বিচরণ করিতেন, পায়ে ঘণ্টা-নূপুর এবং কর্ণে কুণ্ডল দিতেন, গায়ে ছাই মাখিতেন, ঘরের আত্মীয়-পরিজন সব ত্যাগ করিয়া যোগী হইতেন।—পুরুষেরা যেমন এইরূপ সব ত্যাগ করিয়া কাপালী যোগী হইতেন নারীরাও সেইরূপ 'স্বামী খাইয়া' যোগিনী সাজিতেন, ইহারও আভাস আছে। যেমন সরহপাদের একটি দোঁহা—

ঘরবই খজ্জই সহজে রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ।
ণিঅপাস বইট্‌ঠী চিত্তে ভট্‌ঠী জোইণি মহু পড়িহাঅ॥—৮৫নং

"গৃহপতিকে খায়, সহজে বিরাজ করে, রাগ-বিরাগ করে ; নিজপাশে বসিয়া চিত্তে ভ্রষ্টা যোগিনী আমার নিকট প্রতিভাত হয়।"

দোঁহা এবং চর্যাপদগুলির ভিতরে আর এক শ্রেণীর যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা প্রাচীন রসসিদ্ধ। এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই নাথসিদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন রূপ। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।[৩] প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন-মত হইতেই এই রসসিদ্ধ-মতের উৎপত্তি। ইহারা মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ বিশ্বাস করিতেন না, জীবন্মুক্তির সাধক ছিলেন। রসায়নের সাহায্যে এই স্থূল দেহকেই সিদ্ধদেহে এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়া ইহারা অবিনাশী হইতে চাহিতেন। এই

২ এই লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ৩ ঐ

অবিনাশিত্ব লাভই যোগীর মৃত্যুঞ্জয় শিবত্ব লাভ। তাই তাঁহাদের প্রথম সাধন ছিল রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করা। রসসিদ্ধাদের 'রাসায়নিক রসে'র (পারদ) স্থান গ্রহণ করিল নাথসিদ্ধাদের সহস্রারস্থ চন্দ্র হইতে ক্ষরিত সোমরস।

রস-রসায়নের সাহায্যে মুক্তিলাভ সম্ভব এইরূপ বিশ্বাসী প্রাচীন যোগিসম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভিতরেও পাই। পতঞ্জলি বলিয়াছেন— 'জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ', অর্থাৎ সিদ্ধিসকল জন্ম হেতু, ঔষধি হইতে, মন্ত্র, তপঃ এবং সমাধি হইতে সম্ভব হয়। এই ঔষধি হইতে সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে— 'ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেত্যেবমাদি'; ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতিও বলিয়াছেন যে, এই ঔষধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ অর্থ রসায়নের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ। এই মতটিই নাথসিদ্ধাদের ভিতর দিয়া দশম হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে একটি বিশেষ শৈব মতবাদে পরিণত হইয়াছিল। বাঙলা দেশেও সেই সিদ্ধসম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। বাঙলা দেশে প্রচলিত এই রসসিদ্ধদের বিরুদ্ধেও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ কঠোর মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই রসায়নবাদী রসসিদ্ধাগণ জন্মও স্বীকার করিতেন, মৃত্যুও স্বীকার করিতেন, রস-রসায়নের সাহায্যে এই জন্মমৃত্যুর উর্ধ্বে উঠিয়া শিবত্ব লাভ করিতে চাহিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াগণ আদৌ জন্ম এবং মৃত্যু স্বীকার করিতেন না; অস্তিত্ব-নাস্তিত্ববুদ্ধি উভয়ই বিকল্পজাত, সুতরাং যেখানে আসলে জন্মও নাই মৃত্যুও নাই সেখানে রস-রসায়নের দ্বারা কি হইবে? সরহপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

অহ্মে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা॥

"অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না, জন্ম মরণ ভব কিরূপে হয়। যেরূপ জন্ম, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মৃতের ভিতরে কোন বিশেষ (পার্থক্য) নাই। যাহারা এখানে জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত তাহারাই করুক রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা।"[৪]

এইবারে আমরা চর্যাপদে বর্ণিত তৎকালীন বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।[৫] সমাজ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আসে জাতির প্রশ্ন। অবশ্য জাতি কথাটাকে আমরা race এবং caste এই উভয় অর্থেই ব্যবহার করি। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটিকে আমি ইহার প্রাচীন race অর্থেই গ্রহণ করিতেছি।

বাঙলা দেশ অনার্যপ্রধান দেশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বাঙলা দেশে ছিটাফোঁটা করিয়া আর্য জাতি এবং তাহাদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমদানি হইতে

---

৪ তুলনীয়—অরে পুত্তো বোজ্ঝু রস-রসণ সুসণ্ঠিঅ অবেজ্জ। ইত্যাদি। সরহপাদের দোঁহা।

৫ ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে (পৃ. ৩৬-৩৮) এ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

থাকে। কিন্তু এই বহিরাগত উপাদান বাঙলা দেশে প্রকারে বা পরিমাণে কখনও এমন প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই যাহাতে সে স্থানীয় সকল উপাদানকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া একেবারে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। আজ পর্যন্তও বাঙালী জাতি এবং বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আর্য জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট বিপুলায়তনের পিছনে বাঙালী জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গাধাবোটের মতন সর্বদা বাঁধিয়া না দিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে যদি একটু স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি তবে তাহাকে আমরা হয়ত আরও বেশি এবং আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইব।

আর্য জাতির যে কিছু কিছু লোকের আগমন ঘটিয়াছিল বাঙলাদেশে তৎপূর্বে যে সকল অনার্য জাতির বাস ছিল এই দেশে তাহাদের ভিতরে কোল জাতিই ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজকার দিনেও আমাদের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোল উপাদান একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি এই চর্যার যুগে সমাজের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চর্যাগুলির ভিতরে সেইজন্যই তাহারা এত প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। চর্যাকারগণ নিজেরা একেবারে নিরক্ষর অসংস্কৃত সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না— চর্যাগুলির ভিতরে তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের চোখেও বারবার সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশে এই শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডালের কথা, তাহাদের বাসস্থান, চরিত্র এবং জীবন-যাত্রার কথা যখন এত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে এই সকল লোকও তৎকালীন বাঙালী জাতির একটা বড় অংশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় এই সকল আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিল, এবং পরে ইহারাই যে সমাজের নিম্নস্তরে ভিড় করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণও ইহার ভিতরে পাওয়া যায়।[৬]

শবরদের কথা ও তাহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা এই চর্যাপদগুলিতে নানাভাবে দেখিতে পাই। এই শবর বাস করিত বড় বড় পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে।

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহি কিঅ বাস। —কাহ্নুপাদের দোঁহা, ২৫ নং

শবরপাদের একটি গানে এই শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের অতি চমৎকার একটি বর্ণনা পাইতেছি।

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিএ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥

---

৬ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ' পুস্তিকায়ও এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুঞ্চিআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম ণিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

"উচা উচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা; ময়ূরের পাখা পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার— আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—কর্ণকুণ্ডলবজ্র ধারণ করিয়া। তিন ধাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী— উভয়ে প্রেমের রাত্রি পোহায়। হৃদয় তাম্বুল, মহাসুখে কর্পূর খায়, শূন্য নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্য ধনু, নিজ মনরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণ বেঁধ। উন্মত্ত শবর গুরু রোষে, গিরিবরের শিখরসন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া ?"

এখানে দেখিতেছি জনবসতির দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর-শবরীর বাস, ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় ছিল শবরীর প্রসাধন, কানে ছিল তাহার কুণ্ডল। ভোলানাথ শবর শবরীকে যাইত ভুলিয়া (নেশার ঝোঁকে), শবরীকে আবার তাহাকে ডাকিয়া ঘর সামলাইতে হইত। ঘরের খাটিয়ায় পড়িত তাহাদের বিছানা, নিবিড় ছিল মিলন। তাম্বুল-কর্পূর মিলনের রসপরিপোষণ করিত। শরধনু দিয়া শিকারেই হইত জীবিকা নির্বাহ। ক্রোধপরায়ণ শবর পর্বতকন্দরে চলিয়া যাইত অনেক দূরে, একা খুঁজিত তাহাকে শবরী।

শবরপাদের অপর একটি গানে দেখিতে পাই—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
… … …
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কপাসু ফুটিলা ॥
… … …
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারিবাসে গড়িলারে দিআ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥

"গগনে গগনে লগ্ন বাঁড়ি, হৃদয় কুঠারে তাহাকে উপাড়িয়া (ফেলিলে) কণ্ঠে নৈরামণি শবরী বালিকা জাগে। আমার সে গগন-সংলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল দেখিতেছি, কি সুন্দর তাহাতে

কাপাস-ফুল ফুটিয়াছে। কাগনী পাকিয়া উঠিয়াছে— তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটুও জাগে না, মহাসুখে ভোলা হইয়া আছে। চারিপাশে বাঁশের কঞ্চি দিয়া (বেড়া) গড়িল, তারপরে তুলিয়া শবর সব পুরিয়া লইল, শকুন-শিয়াল সব কাঁদে।"

এখানকার সকল তত্ত্বব্যাখ্যা ছাড়িয়া দেখি, পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের কাছে ছিল শবর-শবরীর বাড়ি, চারিদিকে তাহার কাপাসের ফুল। কাগনী (ধান্যবিশেষ) ছিল তাহাদের প্রিয়তম খাদ্য, কাগনী পাকিলে তাহাদের উৎসব ; এই কাগনী তাহারা রক্ষা করিত বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়া। পার্বত্য মাঠে শকুন-শিয়ালের ছিল উৎপাত, তাহারা শস্য নষ্ট করিত— ঘরে আনিয়া শস্য পুরিয়া লইলেই নিশ্চিন্ত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। চর্যাপদগুলির ভিতরে শুধু দুইটি গান শবরপাদ কর্তৃক রচিত, সেই দুইটি গানই শবর-শবরীর জীবন-যাত্রা লইয়া ; শবরপাদ নিজেও কি শবর জাতির লোক ছিলেন ?

এই জনবসতি হইতে দূরে উচ্চভূমিতে বাসের কথা আরও দু-একটি পদে দেখিতে পাই— যেমন, 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী' ইত্যাদি।

কোলজাতীয় লোকগণের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় নিষাদরূপে। এই নিষাদগণের বৃত্তি ছিল ব্যাধবৃত্তি। ব্যাধের হরিণশিকারের সুন্দর বর্ণনা পাইতেছি কয়েকটি চর্যায়। ভুসুকুপাদের একটি কবিতায় পাই—

কাহেরে ঘেণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥

"কাহার কাছে মিলিয়া আছ কি ভাবে ? চৌদিক বেড়িয়া যে হাক পড়িতেছে। আপন মাংসে হরিণ সকলের বৈরী, ব্যাধেরা যে ক্ষণকালের জন্যও ভুসুকুকে (ভুসুকুরূপ হরিণকে) ছাড়ে না।" এই প্রসঙ্গে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা পাইতেছি তাহাও চমৎকার।

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর ণিলয় ণ জাণী ॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই ॥　—৬নং

"(ভয়ে) তৃণ ছোঁয় না হরিণ, না খায় জল ; হরিণ জানে না হরিণীর নিলয়। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন তুমি হরিণ, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তূর্ণগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না ; ভুসুকু বলে, মূঢ়ের হৃদয়ে এ-কথা পশে না।"

অন্য একটি পদেও ভুসুকুপাদ বলিয়াছেন—

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।
হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি ॥
মাআজাল পসরি রে বাঁধেলি মাআহরিণী।
সদ্‌গুরুবোহেঁ বুঝিরে কাস্থ কদিনি ॥ —২৩নং

"যদি তুমি ভুসুকু ব্যাধ হইবে, তাহা হইলে পাঁচজনকে মার ; নলিনীবনে প্রবেশ করিতে একমন হও। জীবন্তে হইল প্রভাত, মরণে হইল রজনী ; মাংস বিনে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিল। মায়াজাল প্রসারিত করিয়া বধ করিলি মায়া-হরিণী ; সদ্‌গুরুবোধে বুঝি কাহার কি তত্ত্ব।"

নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ পাই কয়েকটি গানে। আজকের দিনের মতন হাজার বৎসর পূর্বেও এই ডোম্বীর বাড়ি ছিল নগরের বাহির-প্রান্তে, তখনও সে ছিল নেড়া বাঁমুনদের নিকটে অস্পৃশ্যা।

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥

এই ডোম্বী নৌকায় আসা-যাওয়া করিত এবং দেশে দেশে বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রয় করিত। নলনির্মিত পেটিকা (নড়পেড়া) ছাড়িয়া লোকে বাঁশের এই সব জিনিস গ্রহণ করিত।

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥

আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশের নানাস্থানে এই জাতীয় যাযাবর নিম্নজাতীয় স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পাই ; তাহারা নৌকাতেই সর্বত্র গমন করে, নৌকাই তাহাদের ঘরবাড়ি ; কয়েকদিনের জন্য কোন স্থানে ওঠে, রাস্তাঘাটে বসিয়া অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার বাঁশের জিনিষ তৈয়ার করে এবং লোকালয়ে তাহা বিক্রয় করে। লোকেরা অনেক সময়ে ঘরের বাক্সপেটিকা রাখিয়া এই সকল শৌখিন জিনিস ব্যবহার করে। এই সকল নিম্নজাতীয়া নারীরা অনেক সময় নৃত্যগীতপরায়ণা হয় এবং তাহা দ্বারাই লোকের মন ভুলায়। এখানে ডোম্বীর বর্ণনায় দেখিতেছি, একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী।

এক সো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

এখানে একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির উপরে নৃত্যের বর্ণনার ভিতর দিয়া ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল নিম্নজাতীয়া যাযাবর নারীগণের এই জাতীয় নৃত্যকুশলতার কথা পরবর্তী কালেও অনেক শোনা গিয়াছে। এই নৃত্যগীতকুশলতার সঙ্গে এই ডোম্বী-নারীগণের চরিত্রেও হয়ত চঞ্চলতা আসিত এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণেরও তাহারা মনোহারিণী হইয়া উঠিত। অপর দিকে উচ্চনীচ-জাতি-সংস্কারবর্জিত কাপালিকগণেরও বোধহয় ইহারা যোগসঙ্গিনী হইত। এই সত্যেরই আভাস পাওয়া যায় কাহ্নপাদের আর একটি পদে—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরী-আলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝে কাবালী ॥
... ...
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই ॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥

"কিরূপ হাঁলো ডোম্বি, তোর চাতুরী ?—তোর অন্তে কুলীন জন, মাঝে কাপালী! কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্নু গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর অধিক ছিনালী নাই।"

আমরা বাঙলার নগরে এবং পল্লী-অঞ্চলে এখনও আর-একজাতীয় নিম্নশ্রেণীর গায়ক-গায়িকা দেখিতে পাই যাহারা লাউ-বাকলের সহিত বাঁশের ডাঁট লাগাইয়া তাহার সহিত তন্ত্রীযোগে একরূপ বীণাজাতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে এবং তাহারই সাহায্যে নাচগান করিয়া দেশবিদেশে ঘোরে। এই জাতীয় গায়ক-গায়িকার উল্লেখ আমরা চর্যাপদেও পাইতেছি।

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।
সুন তান্তিধনি বিলসই রুণা ॥
... ...
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ —১৭নং

"সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড— সব এক করিল অবধূতী। আলো সখি, বাজে হেরুক-বীণা; শোন তন্ত্রীধ্বনি— কি সকরুণ বাজে। বজ্রাচার্য নাচে, গায় দেবী— এই ভাবে বুদ্ধ-নাটক হয় সুসম্পন্ন।"

এখানে 'বুদ্ধ-নাটক' কথাটি লক্ষণীয়। এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোনও বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন। এই নাচগানের সাহায্যে নাটক-করার ভিতর দিয়াই কি বাঙলা নাটকের উৎপত্তি? সংস্কৃতেও ত 'নৃত্ত' হইতেই 'নাট' এবং 'নাটক' হইয়াছে অনুমান করা হয়।

অপর একটি কবিতায় দেখিতে পাই, ডোম্বীর পার্বত্যগৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে জল সিঞ্চন করা হইতেছে। সে আগুনের খরজ্জ্বলা বা ধূম দেখা যায় না, মেরুশিখরের ভিতর দিয়া সে গগনে প্রবেশ করিতেছে—

ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পানী ॥

নউ খরজালা ধূম ন দীসই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ॥

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথা বলা হইয়াছে—

দাঢ়ই হরিহর ব্রাহ্মণ নাড়া।
ফীটই ণবগুণ শাসন পাড়া ॥

তত্ত্বব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া বাহ্যিক অর্থ কি ইঙ্গিত করিতেছে? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও কি ডোম্বীরই প্রতিবেশী ছিল? তাই ডোম্বীর ঘরের আগুন গিয়া ব্রাহ্মণের ঘর সহ তাহাকেও পোড়াইয়া দিল? না নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহর জল সিঞ্চন করিতে আসিয়া পুড়িয়া মরিল? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও যেমন পুড়িয়া মরিল, তেমনি আবার ডোম্বীর ঘরবাড়ি সব পুড়িয়া যাওয়াতে, আর 'নবগুণে'র বা পৈতার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কড়া শাসন ডোম্বীর উপরে রহিল না! সাধনতত্ত্বের দিক দিয়া অবশ্য 'হরিহর ব্রাহ্মণ' বা 'হরিহর ব্রাহ্ম', অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সন্ধাভাষিক অর্থ রহিয়াছে।

অন্যত্র এই ডোম্বীকে দেখিতে পাইতেছি পাটনীরূপে, ভাঙা নৌকায় নদী পারাপার করে—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরেঁ বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গীপোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি ॥
... ...
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥

"গঙ্গা-যমুনা মাঝে বহে নাও—তাহাতে মাতঙ্গকন্যা ডোম্বী জলে ডুবিয়া ডুবিয়া লীলায় করে পার। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধিয়া গগনরূপ সেঁউতিতে জল সেঁচ, জল যেন নৌকার সন্ধিতে ঢোকে না। কড়িও লয় না, বুড়িও (এক পয়সা) লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানে না, তাহারা কূলে কূলেই ঘুরিয়া বেড়ায়।" বেশ বোঝা যাইতেছে, এই নিম্নশ্রেণীর ডোম্বীরা পাটনীর কাজ করিয়া সাধারণত বেশ কড়ি-বুড়ি কামাই করিত।

আজিকার দিনের 'ঘটি-বাঙালে' প্রভেদ এবং বিরোধ তখন হইতেই ছিল মনে হয়। সরহপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা ॥

'বঙ্গে জায়া নিয়াছ, পরে ভাগিল তোমার বুদ্ধি (বিজ্ঞান)।' অন্যস্থানেও দেখিতে পাই, বঙ্গে তখন পর্যন্ত আর্যেতর জাতিরই প্রাধান্য ছিল, ফলে বঙ্গের সহিত রাঢ়-বরেন্দ্রের (পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এবং এ-জাতীয় বিবাহের দ্বারা পতিত হইতে হইত। ভুসুকুপাদ একটি গানে বলিয়াছেন—

বাজ্‌ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

"বজ্রনৌকা পদ্মাখালে বাহিলাম, দয়াহীন বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। আজ ভুসুকু বঙ্গালী হইল, নিজ গৃহিনী চণ্ডালী লইল।"

এখানে দেখিতেছি, পদ্মার খালে নৌকা বাহিয়া পদ্মার ওপারে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল; বঙ্গ বড় দয়াহীন— তাই নৌকায় যাহা কিছু ছিল ডাকাতে লুটপাট করিয়া লইল। আরও দেখিতেছি ভুসুকু বঙ্গে আসিয়া চাঁড়ালী বিবাহ করিয়া একেবারে খাঁটি বাঙাল বনিয়া গিয়াছে।

চর্যাপদগুলির মধ্যে তৎকালীন বাঙলাদেশের বহুশ্রেণীর কর্মজীবীর বর্ণনা পাই, ইহাদের ভিতরে কৈবর্ত (মৎস্যজীবী), তাঁতী, ধুনুরী, ছুতোর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নদীমাতৃক বাঙলাদেশে মৎস্যজীবী কৈবর্তজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। কাহ্নপাদের একটি পদে এই কৈবর্তধর্মের উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হইয়াছে—

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥

নৌকায় বসিয়া মাঝনদীতে একরকমের জাল ফেলিয়া ছোট বৈঠা বা দাঁড় বাহিয়া জেলেরা ভাসিয়া চলে; কখন কোথায় মাছ পড়িবে ঠিক নাই, ভাসিয়া চলিতে চলিতে জালে হঠাৎ মাছ পড়ে, জাল তুলিয়া মাছ ধরিতে হয়; ইহাই মাছ ধরিবার 'মায়াজাল'। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে তখনও এরূপ মায়াজাল পাতিয়া মাছ ধরা হইত বোঝা যাইতেছে।

শান্তিপাদের একটি পদে (২৬নং) ধুনুরীর উল্লেখ পাইতেছি। চর্যাকার বলিতেছেন—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥
...   .
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুণ লইআ অপণা চটারিউ ॥

"তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া একেবারে নিঃশেষ করিলাম! তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্য করিয়া লইলাম, পুনরায় তাহা লইয়া নিজেকে বিলীন করিলাম।"

তন্ত্রিপাদ (তান্তিপা) রচিত ২৫ সংখ্যক পদটি পাওয়া যায় নাই; ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাহার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে একটি সংস্কৃত ছায়াও রচনা করিয়াছেন। ইহার ভিতরে দেখিতে পাই, এই পদটিতে বস্ত্র-বয়নের রূপকেই সকল তত্ত্বব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[৭] সেখানে

৭ দ্রষ্টব্য Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryāpadas, পৃ ৫৪

দেখি, কালপঙ্কের তাঁত বস্ত্র বয়ন করিতেছে। ইহার ‘আমি’ই হইল তাঁত, আপনার ভিতর হইতেই আসে সব সূতা— সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া বুনিয়া গগন ভরিয়া ফেলা হয়।

দু-একটি পদে ছুতারদের অস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যেখানে বলা হইয়াছে, ‘জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই’— সেখানেই বোঝা যাইতেছে যে তরুর ছেদন এবং ভেদনের ভিতরে একটা কৌশল ছিল, সে কৌশল এ-বিষয়ে কৌশলীদেরই জানা ছিল, সাধারণের ছিল তাহা অজানা। অন্যত্র নৌকাগঠনের প্রসঙ্গেও আমরা এই ছুতারবৃত্তির আভাস পাই।

নদীমাতৃক বাঙলাদেশ, নদীমাতৃকতার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত বাঙলার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে! এই নদীমাতৃকতার প্রভাব পাইতেছি এই চর্যাপদগুলির ভিতরেও; পদগুলি সাগর-নদী-খাল-বিখালের বর্ণনায় ভরা। প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলি এবং গুহ্য-সাধনতত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে এই সাগর-নদী-খাল-বিখালের রূপকেই।

ভবনই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

নদীর এই অতিরিক্ত কাদাভরা দুই কূল বাঙলাদেশের নদীর বৈশিষ্ট্যসূচক বটে। মহাসুখ-লাভরূপ পরমনির্বাণের পথে অগ্রসর হইবার সাধনাকে প্রায়ই নদীর পথে নৌকায় অগ্রসরের রূপকে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমার্থসাধনার সহিত নদীস্রোতে উজাইবার রূপক অবশ্য ভারতীয় শাস্ত্রে আরও অনেক পাওয়া যায় এবং দেহস্থ প্রধান তিনটি নাড়ীর সহিত ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি নদী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উপমা অতি প্রসিদ্ধ; তথাপি মনে হয়, এই নদী খাল এবং তাহাতে নানাভাবে নৌকা বাহিবার রূপক চর্যাকারগণ অনেক বেশি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার ভিতরে বাঙলার নদীমাতৃকতার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গঙ্গা, যমুনার মাঝে ডোম্বী কিরূপে পাটনী হইয়া লোকজন বিনা কড়িতেই পারাপার করিতেছে (১৪ নং); মাঝনদীতে নৌকা লইয়া মায়াজাল বাহিবার কথাও পূর্বে দেখিয়াছি (১৩ নং)। শান্তিপাদ একটি গানে বলিতেছেন—

কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ (১৫নং)

এখানে যাত্রীকে কূলে কূলে ঘুরিতে বারণ করা হইতেছে— মাঝখানে রহিয়াছে সোজা পথ (সহজ পথ)। সম্মুখে রহিয়াছে যে সমুদ্র, তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত, না বোঝা যায় থই— সম্মুখে না যদি দেখা যায় আর কোন নাও বা ভেলা, তবে এ পথের অভিজ্ঞ পথিকগণের নিকটে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শূন্য প্রান্তরে না যদি মেলে কোন পথের দিশা, তবু ভ্রান্তি

বাসা উচিত নয় আগাইয়া যাইতে; সোজা পথে গেলেই মিলিবে সকল সিদ্ধি। ডাইনে বাঁয়ের দুই পথ ছাড়িয়া চলিতে হইবে কেলি করিতে করিতে, এই সহজ পথে ঘাট-ঝোপ-ঝাড়, বাধা-বিঘ্ন কিছুই নাই, চোখ বুজিয়া নৌকায় চলা যায় এই পথে।

বাঙলাদেশের খাল-বিখালের উল্লেখ দেখি অনেক প্রসঙ্গে—

বাম দহিণ জো খাল-বিথলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

পথে যাইতে বাঁকে বাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক রহিয়াছে খাল-বিখাল; সরহ বলিতেছে, এই সব বাঁকা খাল-বিখালের ভিতরে প্রবেশ করিও না, আগাইয়া যাও একদম সোজা পথে।

নদীমাতৃক বাঙলা দেশের প্রধান যান-বাহন ছিল নৌকা। এই কারণেই বোধহয় যোগতন্ত্রের রহস্য বলিতে গিয়া চর্যাকারগণ নানাভাবে এই নৌকা বাহিবার রূপক গ্রহণ করিয়াছেন। দু-একটি কবিতায় নৌকা বাহিবার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে, এবং তাহার ভিতর দিয়া বাঙলা দেশের মাঝিমাল্লাদের একটি চমৎকার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরহপাদের একটি কবিতায় দেখি—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ॥
কুল লই খর সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ॥

"কায় নৌকা, খাঁটি মন হইল তাহার দাঁড়,—সদ্‌গুরুবচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া ধর নাও, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী (নেয়ে) নৌকা গুণে টানে; ঠিক সহজেই গিয়া মিলিত হও, অন্য দিকে যাইও না। পথে আছে ভয়, বলবান্ দস্যু; ভবতরঙ্গে সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়,—সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে (অর্থাৎ গুণের নৌকা খরস্রোত উজাইয়া বহুদূরে—দিকচক্রবালে যেখানে আকাশ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে সেইখানে অদৃশ্য হইয়া যায়)।"

কম্বলাম্বর পাদের একটি পদেও এই নৌকাযাত্রার বর্ণনা পাইতেছি। মাঝিরা সাধারণতঃ একটা ছুঁচলো খুঁটি বা গোজ নদী বা খালের কূলে কাদা মাটিতে পুঁতিয়া তাহার সহিত কাছি বা দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধিয়া রাখে। নৌকায় কোথায়ও রওনা হইতে হইলে প্রথমে এই খুঁটি বা গোজটি তুলিয়া কাছি ছাড়িয়া দিতে হয়। তারপরে মাঝগাঙে আসিয়া চারিদিক চাহিয়া শুনিয়া নৌকার দাঁড় বাঁধিয়া বাহিয়া যাইতে হয়। এখানেও বলা হইয়াছে—

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ ॥ ৮ নং

"খুঁটি উপাড়িয়া কাছি মেলিল; হে কামলি,[৮] সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিয়া চল। পথে চড়িয়া চারিদিকে চায়; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?"

এই নৌকা বাহিবার প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা ক্ষীণ আভাস পাই। নৌকাতেই দেশের সর্বত্র ব্যাবসা-বাণিজ্য হইত। সোনারুপার বাণিজ্যও বাঙলা দেশে ছিল এবং নৌকায় করিয়াই সোনারুপার ব্যাবসা-বাণিজ্য হইত। কম্বলাম্বরের উপরিউক্ত কবিতাটির প্রথমেই দেখিতে পাই,—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রুপা থোই নাহিক ঠাবী ॥

"সোনায় ভরতি আমার করুণার নৌকা, রুপা থুইবার আর ঠাঁই নাই।"

চারিদিকে নদীনালা খালবিল থাকিবার জন্য নানাবিধ সাঁকোর সহিতও বাঙালী বহুদিন হইতেই পরিচিত। চাটিলপাদ একটি কবিতায় বলিয়াছেন, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে নদীর পারাপার করিতে পারে সেই জন্য তিনি বেশ মজবুত একটি কাঠের সাঁকো প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। বড় গাছ ফাড়িয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইয়াছে, টাঙ্গি দ্বারা ইহাকে শক্তপোক্ত করা হইয়াছে।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ ৫ নং

চর্যাপদগুলির ভিতরে তৎকালীন বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনের দু-একটি চিত্র পাওয়া যায়। কুক্কুরীপাদের একটি গানে আছে—

আঙ্গণ ঘরপণ স্থন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ২ নং

"অঙ্গন ঘরের কাছেই, শোন হে অবধূতি, কানেট (কর্ণভূষণ) চোরে নিল অর্ধরাত্রে। শ্বশুর ঘুমাইয়া পড়িল, বহুড়ী আছে জাগিয়া, কানেট চোরে নিল, কোথায় গিয়া তাহা মাগিবে।"

পদগুলি পড়িলে মনে একটি ছবি ভাসিয়া ওঠে। ঘরের বহুড়ী রাত্রেও কর্ণভূষণ পরিয়া শুইয়াছিল, মাঝরাত্রে ঘুমের ভিতরে চোর আসিয়া তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বুড়া শ্বশুর এখনও ঘুমে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া আছে বহুড়ী, অসাবধানে কানের অলংকার চুরি হইয়া গেল, কোথায় আবার

৮ যাহারা মজুরী খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদিগকে এখনও পূর্ববঙ্গে কামুলা (∠কামুলিয়া ∠কামলিয়া) বলে।

পাওয়া যাইবে এই অলংকার ? যেমন চোরের ভয়, যেমন বিত্তনাশের মনস্তাপ, তেমনই আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়, তাই সারারাত বহুড়ী আছে জাগিয়া।

ইহার ঠিক পরের পংক্তিগুলি—

দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

অর্থাৎ, "দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে চিৎকার করিয়া ওঠে, রাত্রি হইলে কোথায় চলিয়া যায় ?"—প্রভৃতি বহুড়ীর চঞ্চল চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। পদটি আমাদিগকে অসংযতস্বভাবা কুলনারী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্লোক

দিবা কাকরুতাদ্‌ভীতা রাত্রৌ তরতি নর্মদাম্।
তত্র সন্তি জলে গ্রাহা মর্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী ॥*

স্মরণ করাইয়া দিবে। দেখা যাইতেছে, অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে এই উক্তিটি সে কালে বাঙলার জনসাধারণের ভিতরে বেশ প্রচলিত ছিল।

এই পদে এবং পূর্বের আরও দু-একটি পদে যে চোরডাকাতের উল্লেখ পাইয়াছি তাহার উল্লেখ আরও দু'একটি পদে পাওয়া যায়। বাসগৃহে শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন ছিল। তাই কাহ্নুপাদের একটি পদে দেখি—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ-ভণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥　—৩৬ নং

"শূন্যবাসে তথতা প্রহরী ; মোহভণ্ডার সকলই লওয়া হইয়াছে ছিনাইয়া।"

ঘরের দুয়ারে দৃঢ়ভাবে তালা লাগাইবারও ব্যবস্থা ছিল। সরহপাদের দোঁহা "জই পবণ-গমণ-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই" প্রভৃতির ভিতরে ইহার আভাস পাই।

গৃহিণী নারীর প্রতি পুরুষের অভিভাবকত্ব এবং শাসন তখনও কিঞ্চিৎ কঠোর ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত দোঁহাগুলিতে এরূপ অনুমানের যথেষ্ট উপাদান মিলিবে।

অইস উএসে জই ফুড় সিজ্মই।
পবণ ঘরিণি তহি ণিচ্চল বজ্মই ॥

"এইরূপ উপদেশে যদি ঠিক সিদ্ধি হয়, তবে পবন-গৃহিণী তথায় নিশ্চল হইয়া হত হয়।"

ণিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই ॥

"নিজ ঘরে ঘরণী যে পর্যন্ত না মজে তাবৎ কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায় ?"

ঘরের কর্তা এবং গিন্নী একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া তখনকার দেশাচারের পক্ষে ছিল একেবারে অবিচার।—

---

৯ শ্লোকটির পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—

দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।
তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তত্ত্বং জানন্তি তদ্বিদঃ ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় এই শ্লোকের উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

ঘরবই খজ্জই ঘরিণিএহি জহিঁ দেসহি অবিআর।

কাহ্নুপাদের একটি কবিতায় তৎকালীন বিবাহের একটি সুন্দর বর্ণনা পাইতেছি—

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

"ভব ও নির্বাণ হইল পটহ-মাদল, মন-পবন দুই করণ্ডকশালা; জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে করিলাম অনুত্তরধাম।"

এখানে বর লইয়া শোভাযাত্রার একটি সুন্দর দৃশ্য পাইতেছি। পটহ-মাদল, করণ্ডকশালা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য সহ প্রচুর আনন্দকোলাহলের ভিতরে এই শোভাযাত্রা চলিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও এইরূপ একটি বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়[১০]—

যতেক মহাপাত্র চারিভিতে সাজে।
শঙ্খ দুন্দুভি সিঙ্গা চারিপাশে বাজে॥
সিঙ্গা ডম্বুর বাজে, কাংস্য করতাল।
পাঢ়া মাদল ভেরু দোসর কাহাল।
... ...
করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী।
বেণু বাঁশী সরমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী॥ —ব. সা. প. সংস্করণ

উপরের চর্যাটি পড়িয়া আরও মনে হয়, সেই দিনেও বাঙলা দেশে বিবাহে বরপক্ষ বেশ যৌতুক পাইত এবং ভাল যৌতুকের লোভে বোধহয় নীচকুল হইতে কন্যা গ্রহণেও আপত্তি ছিল না। এখানে/ দেখি, ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম গেল, অর্থাৎ কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক যে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই বর খুশী।

দাবা খেলা তখন বোধহয় বেশ প্রিয় ছিল। কাহ্নুপাদের একটি চর্যাগানে এই দাবা খেলার বিস্তারিত বর্ণনা পাইতেছি—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর॥

১০ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা' দ্রষ্টব্য

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥
ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ ॥

"করুণার পিড়িতে নয়বল (দাবা) খেলি, সদ্‌গুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে দিও না ; উপকারি-উপদেশে কাহ্নুর নিকটে জিনপুর। প্রথমে ব'ড়ে তুড়িয়া মারিলাম, তারপরে গজবর তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, আমি ভাল দান দেই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।"

দাবার 'কোঠে'র চৌষট্টি ঘর বা কোঠা— একটা কিছুর উপরে 'কোঠ' পাতিয়া খেলিতে হয়। এখানে 'ঠাকুর' হইলেন রাজা। প্রথমে হইল 'ব'ড়ে'র চাল, সুযোগ বুঝিয়া গজ দিয়া অনেকগুলি ঘায়েল করিতে হয়। 'মন্ত্রী' দিয়া 'রাজা'র গতিবিধি বন্ধ করিতে পারিলেই কিস্তিমাৎ।

বিরুবাপাদের একটি গানে শুঁড়ী বাড়ি এবং মদের ব্যবসায়ের একটি বাস্তব বর্ণনা পাইতেছি—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
... ...
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল ॥ —৩ নং

এখানে দেখিতেছি, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে, সে চিকন বাকলের দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ীর ঘরের চিহ্ন দেখা গিয়াছে দুয়ারেই, দুয়ারে সেই চিহ্ন দেখিয়া মদের গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসিয়াছে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে, গ্রাহক যে ঘরের ভিতরে একবার ঢুকিল আর তাহার কোন সাড়াশব্দ নাই। সরু নালে একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে— বিরূপা সাবধান করিতেছে, বারুণী সরুনল দিয়া ঘড়ায় স্থির করিয়া ঢালিতে।

থোকাথোকা বাঁকা তেঁতুল ফল এখন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু এই বাঁকা তেঁতুলের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে স্থান ছিল। চর্যায় দেখি, 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই,'—'গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।' আমরা ছেলেবেলায় মাঘ-মণ্ডলের ব্রতে গান শুনিয়াছি,

আম ফলে থোকা থোকা তিতৈল ফলে বাঁকা।
ছাওয়াল সূর্যাই বিয়া করে মায়ের ঝোলায় টাকা ॥

সাঁওতালীদের গানে উল্লেখ আছে এই তেঁতুল গাছের। একটি গানে আছে,—"আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রূপার, সে-সব সাজগোজ কী করে ভুলব।

আমাদের উঠানে ঐ প্রকাণ্ড বড় তেঁতুল গাছ, তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সে সব, উঠান ঝাঁট দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব[১১]।"

পূর্বে বাঙলার পার্বত্য নদীর নিকটবর্তী বনভূমিতে অনেক হাতী বিচরণ করিত। সরহপদের একটি দোহায় আছে,—

মুক্কউ চিত্তগএন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅণগিরী ণইজল পিএউ তহিঁ তড় বসউ সইচ্ছ॥

"চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর, এ বিষয়ে আর কোন বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগন গিরির নদীজল সে পান করুক, তাহার তটে সে বাস করুক স্ব ইচ্ছায়।"

কাহ্নপাদের একটি কবিতায় দেখিতে পাই, বন্যহাতী বদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু মদমত্ত হাতী সব খাম্ভা ভাঙ্গিয়া, দড়ি-দড়া ছিঁড়িয়া গিয়া নিকটবর্তী নলিনীবনে প্রবেশ করিত।

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউঁ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনী বন পইসি নিবিতা॥ —৯ নং

মহীধর পাদের গানেও এই মত্ত গজেন্দ্রের বর্ণনা পাইতেছি,—

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধারই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্ণ বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্ত পইত ণিবাণা॥

"ধাইতেছে আমার মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র,—নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া লইতেছে। পাপ-পুণ্য দুই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সব খাম্ভা মোড়াইয়া দিয়া গগনশিখরে গিয়া পৌঁছিয়া সে একেবারে শান্ত হইতেছে (নির্বাণে প্রবিষ্ট হইতেছে)।"

বীণাপাদের একটি গানে হাতী ধরিবার সন্ধি বলা হইয়াছে—সারিগানের সুরে হাতীর মনকে আগে বশ করিতে হয়।—

আলিকালি বেণি সারি মুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥ ইত্যাদি। —১৭ নং

আগেকার দিনে মুষিকের অত্যাচারও কম ছিল না। অন্ধকার রাত্রে তাহার আনাগোনা আরম্ভ হইত। সে সব জিনিস তচ্‌নচ্‌ করিত, গর্ত খুঁড়িত এবং উপরে (মাচায় বা গোলায়?) উঠিয়া আমন ধান খাইত।

ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ (হরঅ?) অমণ ধাণ॥ —২১ নং

১২। সাঁওতালী গান, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

সরকারী পরিভাষা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিভাষা-সংসদের "সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা" —প্রথম স্তবক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটির দাম চার আনা। বাংলা ভাষাকে যাঁরা ভালবাসেন, এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, পুস্তিকাটি তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

পুস্তিকাটি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে একটা কথা এই বোঝা গেল, যে আজ যদি কেউ আমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে বলে, যে, জাতে-ওঠা বিদেশাগত বাংলা শব্দগুলোর ত কথাই নেই, দেশজ, তদ্ভব, এমন কি বহুপ্রচলিত তৎসম শব্দগুলিকেও যথাসম্ভব বর্জ্জন ক'রে বাংলা দেশের রাজকার্য্য অতঃপর আমাদের চালাতে হবে, তা চালাতে হয়ত আমরা পারি। কিন্তু সংসদ্‌কে এই রকম মাথার দিব্যি কেউ কি দিয়েছিল, তাই ভাবি।

পুস্তিকাটির মুখবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীসুকুমার সেন বলছেন, "শাসনকার্যে সচরাচর ব্যবহৃত শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য···পরিভাষা-সংসদ্ গঠিত হয়।" কথাটার মানে এই দাঁড়ায় যে শাসনকার্য্যে এমন কতগুলি শব্দ এতকাল চলছিল যা বাংলা নয়, এবং সরকার তাদের জায়গায় এমন-সব শব্দ এখন গ্রহণ করতে চান যা বাংলা। মুখবন্ধেরই অন্যত্র সুকুমারবাবু কথাটাকে আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: "বহুপ্রচলিত বাংলা শব্দগুলি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ত্যাগ করা অনুচিত হইবে।"

মনে হল, সংসদ্‌কে যা করতে বলা হয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা তা ক'রে উঠতে পারেননি বা করেননি; এবং যা তাঁদের করতে বারণ করা হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে তা করেছেন। "প্রতিশব্দগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সুখোচ্চার্য হওয়া চাই," সরকারের এই নির্দ্দেশও সংসদ্ খুব বেশী মান্য করেছেন ব'লে মনে হল না। সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা যে দুতিন জায়গায় করেছেন, ফল মারাত্মক হয়েছে।

আমরা বাঙালীরা রাজকার্য্যের প্রয়োজনেই হোক বা যে কারণেই হোক বাংলায় যখন কথা বলি তখন যে-সব শব্দ ব্যবহার করি তাদের মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) জাতে ওঠা ইংরেজী শব্দ, অর্থাৎ যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ বহুব্যবহারে এবং বাংলা উচ্চারণের নিয়মাদি দ্বারা শাসিত হয়ে বাংলা হয়ে গিয়েছে। যেমন আপিল, পাগলাগারদের গারদ, হাসপাতাল, ইত্যাদি।

(২) যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দ এই রকম ক'রে জাতে উঠতে পারেনি।

(৩) জাতে-ওঠা আরবী-ফারসী শব্দ। যেমন, আমলা, আসামী, খাজনা, গ্রেপ্তার, ইত্যাদি।

(৪) তদ্ভব শব্দ। যেমন, দোভাষী, কেরাণী, ভাতা, ইত্যাদি।

(৫) তৎসম এবং অর্দ্ধতৎসম শব্দ। যেমন বিচারক, কর্ম্মচারী, ইত্যাদি।

(৬) দেশজ শব্দ। যেমন, ডাকাতী, দাঙ্গা, ঢেরাসই, ইত্যাদি।

একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলি ছাড়া অন্য কোনোও শ্রেণীর শব্দ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করলে সংসদ্ ভাল করতেন, কেননা "বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত" কেউ তাঁদের তা করতে বলেনি, এবং বহু-প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি পরিত্যাগ করবার সপক্ষে বিশেষ বা অবিশেষ কোনোও যুক্তি থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সংসদ্ বহু আয়াসে আহরণ যা করেছেন তার চেয়ে বর্জ্জন করেছেন ঢের বেশী ; এবং যা আহরণ করেছেন তার বেশীর ভাগ কোনোও কালে বাংলা হয়ে উঠবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ, কিন্তু যে শব্দগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে বলছি, তারা জাতবাংলা এবং বাংলা-ভাষার সম্পদ্।

প্রথমতঃ, সংসদ্ যেসব শব্দ আহরণ করেছেন, আহরণের আদৌ কোনোও প্রয়োজন ছিল কিনা সে-বিচারের মধ্যে না গিয়েই তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমার মনে হয়, সংসদ্ একটা দিক্ খুব বেশী ভেবে দেখেননি, সেটা এই, যে, তাঁদের আহৃত শব্দগুলো ভাষায় চলবে কিনা! সংস্কৃত শব্দমাত্রেই যে খুব "সহজে বাংলার সহিত মিশিয়া" বাংলায় চলে তা নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আমরা নিয়েছি, এখনও নিচ্ছি, কিন্তু এই নেওয়াটা নির্ব্বিচারে হয়েছে বা হয় ব'লে আমার মনে হয় না। খুব পণ্ডিতী বাংলায় যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁরাও টিকটিকিকে "জ্যেষ্ঠী", ছানাকে "আমিক্ষা", বধিরকে "এড়", পৃথিবীকে "ক্ষ্ম" বা খোঁপাকে "ধম্মিল্ল" লেখেন না। কেন লেখেন না বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়, মোটামুটি এইটুকু বললেই এখনকার মত কাজ চলা উচিত, যে, বাংলা ভাষার জা'ত, মেজাজ, ধাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব শব্দ খাপ খায় না, যেসব শব্দ আমাদের বাঙালীদের কানে বাংলার মত শোনায় না বা ভাল শোনায় না, এবং যেসব শব্দ ভিন্নার্থক অন্য বাংলা শব্দের মত শোনায়, অত্যন্ত দায়ে না ঠেকলে সে-সব শব্দকে সহজে আমাদের ভাষায় আমরা গ্রহণ করি না।

তাছাড়া ভাষায় ত লোকে কেবল লেখাপড়া করে না, ভাষায় লোকে কথা বলে, এবং পরিভাষাও ভাষা। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যথেচ্ছ সংস্কৃত শব্দ নেওয়া চলে, সেই শব্দগুলিকে নিয়ে এতই কম লোকের এতই কম কারবার। Chromaticকে সেই কারণে স্বচ্ছন্দে "বর্ণাপেরণ", Periodicকে "পর্য্যাবৃত্ত", Edogenousকে "অন্তর্জনিষ্ণু", Coccyxকে "অনুত্রিকাস্থি" বলা যায় ; কিন্তু স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় কাজে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত লোক উৎসাহ-সহকারে এখন যোগ দেবে, তা নিয়ে ভাববে, কথা বলবে, এই আমরা চাই। আমরা কি সত্যই আশা করি, যে তারা অতঃপর একজন আর-একজনকে ডেকে বলবে বা বলতে পারবে, "ওহে, আজ অবরধর্মাধিকরণে ন্যায়াধীশ অবকাশের সময় আযুক্ত আধিকারিককে ডেকে উপমহা প্রৈষাধিকারিকের ছেলের সঙ্গে উপপ্রাদেশিক-পরিবহণ-মহাধ্যক্ষের মেয়ের বিয়ের খবরটা ঠিক কিনা জানতে চাইছিলেন"? এমন পরিভাষা করতে হবে, যা লোকে সহজে বুঝবে কেবল নয়, স্বচ্ছন্দে বলবে। পরিভাষাগুলি কেবল সরকারী দপ্তরের কাগজপত্রে চলবে, বাইরে চলবে না, এ যদি হয় ত সে চলা হবে জবরদস্তির চলা। রাজকীয় ক্ষমতা যাঁদের হাতে আছে তাঁরা ইচ্ছা করলে এ জবরদস্তি করতে অবশ্যই পারেন, কিন্তু তাতে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব ইংরেজ আমলে যতটা ছিল প্রায় ততটাই থেকে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে।

ইংরেজ সরকারের পক্ষ হয়ে একটা কথা বলতে চাই। তাঁরা এদেশের সরকারী কাজে জবরদস্তি ক'রেই ইংরেজী চালিয়েছিলেন, কিন্তু সে জবরদস্তির মধ্যে প্রতারণা ছিল না। এটা ভুললে চলবে না, যে তাঁরা বাংলার নামে ইংরেজী বা ইংরেজীর নামে গ্রীক চালাননি। ফলে আমরা একদিকে যেমন একটা প্রাণবান্, ঐশ্বর্য্যময় নূতন ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলাম, অন্যদিকে তেমনই আমাদের নিজের ভাষায় নিজস্ব কথাগুলো ব্যবহার করা নিয়ে কোনোও বাধার সৃষ্টি তার থেকে হয়নি। কিন্তু সংসদের সঙ্কলিত পরিভাষা যদি বাস্তবিক বাংলায় চলে এবং তার ফলে একটিও বাংলাশব্দকে আমাদের ছাড়তে হয়, সে ক্ষতি হবে নিছক ক্ষতি, তার বিনিময়ে লাভের ঘরে কিছুই আমাদের জমা হবে না।

সংসদ্ আমাদের এই ব'লে প্রবোধ দিচ্ছেন, যে, ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করবার জন্যে যাঁরা এতদিন পরিশ্রম করেছেন, তাঁরা তার এক চতুর্থাংশ সময় ব্যয় করলে এই শব্দগুলোকে আয়ত্ত করতে পারবেন। আজ যা দুর্বোধ, ক্রমে তা আর দুর্বোধ থাকবে না।—ঠিক কথা। কিন্তু বোধগম্য হচ্ছে কিনা সেইটেই একমাত্র দেখবার জিনিষ ত নয়? বুঝতে ত ইংরেজী শব্দগুলোও পারছিলাম, পরিভাষা করবার প্রয়োজন তা সত্বেও কেন হচ্ছে, না, সে শব্দগুলো বাংলা নয়। আমার বক্তব্য এই, যে, সংসদের তৈরি পরিভাষার অধিকাংশ শব্দ আমাদের ভাষায় চলবে না, কারণ প্রমাতামহী-সম্পর্কিত হওয়া সত্বেও বাংলাভাষার জাতের এরা কেউই প্রায় নয়। আরক্ষিকের চাইতে পাহারাওয়ালা, এমন কি পুলিশও বেশী বাংলা।

সরকার যদি কাল ঢেঁটরা পিটিয়ে ঘোষণা করেন, যে অতঃপর সরকারী পরিভাষায় 'হযবরল' মানে হবে সাপ, ত সাধারণ বুদ্ধির লোক কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পরে সরকারী কাগজপত্রে 'হযবরল' কোথাও দেখলে সাপই বুঝবে, বেজী বুঝবে না; কিন্তু অন্ধকারে ঐ জাতীয় জীব পায়ের কাছে একটা পড়লে "সাপ! সাপ!" ব'লেই লাফাবে, হযবরল ব'লে নয়। আমরা সরকারী কাগজপত্রে লিখব "আরক্ষিক", কিন্তু আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে "পুলিশ, পুলিশ" ব'লেই চেঁচাব, ইংরেজী সম্বন্ধে খুব বেশী শুচিবাইগ্রস্তরা "পাহারাওয়ালা, এই পাহারাওয়ালা" ব'লে চেঁচাবেন। পরিভাষা-সংসদের সঙ্কলিত অনেক শব্দ এই 'হযবরল' গোছের। সেগুলো সংস্কৃত থেকে নেওয়া, হযবরল কথাটাও ইংরেজী নয়।

আমার অভিযোগ এই নয়, যে, সংসদ্ "অতিমাত্রায় সংস্কৃতের দ্বারস্থ" হয়েছেন। সংস্কৃত এই দেশেরই ভাষা, বাংলার সঙ্গে তার প্রমাতামহী সম্পর্ক, এবং তার ঐশ্বর্য্যেরও শেষ নেই; তার দ্বারস্থ হতে লজ্জা নেই, তাতে দোষেরও কিছু নেই। আমার অভিযোগ এই, যে, যদিও সংসদের অধিকাংশ সভ্যেরই বাংলায় পাণ্ডিত্য দেশবিশ্রুত তবু এই পরিভাষা-রচনায় তাঁরা গবেষণা-বৃত্তির পরিচয় যত দিয়েছেন, বাংলা-জ্ঞানের পরিচয় সে পরিমাণ দেননি। সংস্কৃত শব্দ নিতে চান, বেশ ত, যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাংলায় বহু-কালাবধি চলছে, প্রথমে সেগুলিকে নিন, তারপর সেগুলিকেই ভেঙেচুরে, জোড়াতাড়া দিয়ে, নতুন নতুন শব্দ গঠন ক'রে দেখুন কতটা কাজ তাতে চলে, তারপরেও যদি প্রয়োজন হয়, না-হয় নিন অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু, বুড়ী প্রমাতামহীর কাছ থেকে নেওয়া যে সম্পদে ঘর ভ'রে রয়েছে তার দিকে না তাকিয়ে, "বাংলায় পরিভাষা রচনা করিতে গেলে গত্যন্তর নাই" ব'লে তেড়ে গিয়ে হঠাৎ আবার তাঁরই দরজায় হাত পাতা কেন?

সংসদ্ বাংলাজ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে দেননি এ অভিযোগ কেন করেছি তা বলছি।

প্রথমতঃ কোন্ ধরণের শব্দ বাংলার সঙ্গে বেশ মিশে গিয়ে বাংলা হয়ে চলবে, বাংলার মতিগতি

বিচার ক'রে তা স্থির করবার বিশেষ কোনোও চেষ্টা যে এঁরা করেছেন, পুস্তিকাটি পাঠ ক'রে তা মনে হয় না। পুস্তিকাটিতে সন্ধি-সমাসের ছড়াছড়ি, অথচ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা সন্ধি-সমাস বর্জ্জন করার দিকে। তারপর অর্থবিভ্রাট। 'আসন্ন করণিক' শুনলে মনে হয় না কি, যে এমন কেরাণীর কথা হচ্ছে যে এখনও ঠিক কেরাণী হয়ে ওঠেনি, তবে হব হব হয়েছে? কিন্তু ওটা সংসদের রচিত Chamber Clerk কথাটার পরিভাষা। 'একান্ত সচিব' শুনলে বাংলার সাড়ে পনেরো আনা লোকের মনে এই ধারণাটাই কি অস্পষ্ট ক'রে হবে না, যে, এমন একজন সচিবের কথা হচ্ছে যিনি কায়মনোবাক্যে সচিব? কিন্তু সংসদ্ ওটাকে Private Secretary কথাটার বাংলা হিসাবে চালাতে চান। 'আসন্ন' এবং 'একান্ত' কথা-দুটো বাংলায় যে কি অর্থে চলে, সংসদের সভ্যরা তা জানেন না, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পরিচয় নেই এমন কেউ যদি তা ভাবে তবে তাকে কি খুব বেশী দোষ দেওয়া চলবে? 'অপর' কথাটা বাংলায় বিশিষ্টার্থে চলে। 'অপর কর্ম্মসচিব' বললে আমরা তাই বুঝব, just another কর্ম্মসচিব, Additional Secretary নাও বুঝতে পারি। 'সাক্ষর আরক্ষিক' শুনলে Literate Constable বুঝবার আগে মনে হবে, একটা সইসাবুদের কথা হচ্ছে। 'দুষ্কৃতি বিমর্শ' কথাটা কানে শুনলে কে না মনে করবে, যে, কুকাজ একটা কিছু ক'রে মন খারাপ করবার কথা হচ্ছে, কিন্তু শুনে খুসী হবেন, ওটা Criminal Investigationএর বাংলা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পরিভাষায় auditorএর বাংলা 'হিসাব পরীক্ষক', কিন্তু সংসদ্ তার নতুন নামকরণ করতে চান 'নিরীক্ষক'। 'নিরীক্ষণ' কথাটা বাংলায় কি অর্থে চলে সেটা তাঁদের ভাবা উচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় commerce 'কারবার', সংসদ্ সেটাকে বলতে চান 'ব্যাপার'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় law 'আইন, বিধি, নিয়ম, সূত্র,' সংসদ্ সেটাকে বলতে চান 'ব্যবহার'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় civil হচ্ছে 'দেওয়ানী', কিন্তু সংসদ্ সেটাকে বলতে চান 'ন্যায়'। ব্যাপার, ব্যবহার, ন্যায়, এই কথাগুলি বাংলায় যে একেবারে ভিন্ন অর্থে চলে এবং খুবই বেশী চলে একথাটা সংসদ্ ভুলে গেলেন কেমন ক'রে? Registrationএর সংসদ্-প্রস্তাবিত পরিভাষা 'নিবন্ধ', বাংলায় তার মানে হয় প্রবন্ধ, নয়ত নিয়ম। Reviser 'পরিশোধক', পরিশোধ করা মানে কি? Corrector 'শোধক,' কিন্তু শুদ্ধ করা ও শোধন করা বাংলায় ঠিক এক অর্থে চলে না। অন্যকিছুর সাহায্যে শুদ্ধ করাকে বলে শোধন; অশুদ্ধি আমরা হয় শুদ্ধ করি, নয় সংশোধন করি, সুতরাং কথাটা হওয়া উচিত 'সংশোধক'। বাংলায় এমন মেধাবী কে জন্মেছে যে সংসদের পরিভাষা আয়ত্ত করবার পরেও 'চার বিভাগ' শুনলে প্রথমেই ভাববে না যে চারটে ভাগের কথা হচ্ছে? কিন্তু সংসদের পরিভাষায় কথাটা "Intelligence Department"এর বাংলা! ঘোড়ার একদিনের গম্য পথকে যে কারণে আমরা 'আশ্বীন' বলি না এবং বড় শ্যালিকাকে 'কুলী' ব'লে সম্বোধন করি না, সেই কারণেই যে ধোপা দৌড়চ্ছে না তাকে 'ধাবক' আমরা বলব না।

কেন তা জানি না, সংসদ্ কয়েকটি শব্দকে নিজেরাই দুরকম অর্থে প্রয়োগ করেছেন। Departmentও বিভাগ, আবার Partitionও বিভাগ, বাঁটোয়ারা নয়। Planning Officer পরিকল্পক, বেশ ভাল; কিন্তু Designerও পরিকল্পক; একজনের মাইনে আর-একজনের কাছে চ'লে গেলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে জানি না। নির্বাহক কথাটা শুনতে এমনই কি শ্রুতিমধুর যে Manager ও Steward দুজনকেই ঐ ব'লে ডাকতে হবে?

তারপর দেখতে পাচ্ছি, এমন কতগুলি শব্দ সংসদ্ গ্রহণ করতে চাইছেন, অভিপ্রেত অর্থটিকে যারা ঠিক প্রকাশ করে না, বা সম্পূর্ণ অর্থটিকে প্রকাশ করে না। ব্যবস্থা-পরিষদের whipকে সংসদ্ বলতে চাইছেন 'প্রতোদক'। Film fanকে 'চলচ্চিত্রের ব্যজনী' ব'লে অনুবাদ করলে যতটা খারাপ হয়, এ অনুবাদ ততটা খারাপ নয় তা স্বীকার করি, কারণ whip কথাটার অর্থ বাস্তবিকই চাবুক, সংস্কৃত 'প্রতোদ' কথাটার অর্থও তাই। কিন্তু Parliamentary Whipএর সঙ্গে চাবুক whipএর এতই দূর সম্পর্ক যে তার জন্যে এত গবেষণা ক'রে চাবুক অর্থের একটা অচল সংস্কৃত শব্দ খুঁজে বের করবার কোনোও প্রয়োজন ছিল না। Whipএর যা কাজ, 'প্রতোদক' কথাটার মধ্যে তার কোনোও ইঙ্গিত নেই। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে Coroner অর্থে 'কারণিক' পাচ্ছি; মনে হয়, খুবই সুষ্ঠু প্রতিশব্দ, ধ্বনিসাদৃশ্য হেতু মনে রাখাও সহজ, কিন্তু সংসদ্ Coronerকে বলতে চান 'আশুমৃতপরীক্ষক'। Oxford Concise Dictionaryতে Coronerএর অর্থ পাচ্ছি: "Officer···holding inquest on bodies of persons supposed to have died by violence or accident ;" এখন জিজ্ঞাস্য, holding inquest on মানে কি পরীক্ষা, আর, হত্যা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাতে যারা মারা যায় তারাই কি 'আশুমৃত'? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় insolvent মানে 'দেউলিয়া', সংসদের প্রস্তাবিত পরিভাষায় কথাটা 'অবিত্ত'। কিন্তু অবিত্ত মানে ত বিত্তহীন, নির্ধন? মানুষ কপর্দ্দক-শূন্য হলেই সঙ্গে সঙ্গে insolvent হয়ে যায় না। 'নিয়ন্ত্রণ' বা 'দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ' মাত্রেই rationing নাও হতে পারে, rationingএর বাংলা হওয়া উচিত বরাদ্দ-বিধান বা ঐ রকমের কিছু। Import exportএর বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহীত বাংলা প্রতিশব্দ আমদানি রপ্তানি; সংসদ্ কথাদুটোকে করতে চান 'আগম-নির্গম।' প্রথমতঃ বাংলায় 'আগম' অর্থ আয়, আগমন-কাল; যেমন অর্থাগম, বর্ষাগম। দ্বিতীয়তঃ আগম-নির্গম কতকটা নিজে নিজে হবার মত জিনিষ, আমদানি রপ্তানিও হয়, কিন্তু আমদানি রপ্তানি আমরা করিও। Criminal Sessionsকে 'দণ্ডাধিকার' বললে সেটা যে sessions, দায়রা, তা একটুও বোঝা যাবে কি? 'প্রকীর্ণ ভাণ্ডারী', 'প্রতিমা শিক্ষক', ব্যাকরণসম্মত কথা নয়।

সংসদের আহরণ-নীতির সমালোচনা একটি অবান্তর প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করি। অপ্রচলিত এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রতি সংসদের পক্ষপাত সর্ব্বত্রই যে চোখে পড়ে তা কিন্তু নয়। যেসব কাজ প্রধানতঃ অহিন্দুরা করে, এবং যেসব অল্প মাহিনার কাজ সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা করে, মনে হল যেন সংসদের বিবেচনায় সেগুলির এবং সেই-সমস্ত কাজ যারা করে তাদের সংস্কৃত নাম না হলেও চলে। যেমন, ঢালাইকর, দপ্তরী, আদায়-সরকার, নক্সাকার, গ্যাসওয়ালা, গ্যাসমিস্ত্রী, জমাদার, রাজমিস্ত্রী, ওস্তাদ-ছুতার, ইত্যাদি। কেরাণীরা যদিও বেশীর ভাগ অল্প বেতনেই কাজ করেন তবু তাঁরা স্কুল-কলেজে পড়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভদ্র শ্রেণীর লোক, তাই ব'লে বোধহয় তাঁদের জন্যে 'করণিক' এই সংস্কৃত নামটি গ্রহণ করতে সংসদ্ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। কেরাণীরা এতে একটুও যদি খুসী হন ত ভাল।

এবারে সংসদের বর্জ্জন-নীতির সমালোচনাতে চ'লে আসা যাক।

ভূমিকাতে সংসদ্ বলছেন, "বাংলা আর এখন ইংরাজীতে যাহাকে বলে building language তাহা নহে, ইহা borrowing language হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহা নিজের বিশিষ্ট উপাদানের সাহায্যে নূতন শব্দ আর গড়িয়া তুলিতে অভ্যস্ত নহে।" বাংলার "নিজের বিশিষ্ট উপাদান" বলতে সংসদ্ যে কি

বোঝেন তা ঠিক স্পষ্ট হল না। কিন্তু তারপরেই সংসদ্ যে বলছেন, "মাতৃস্থানীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া বা সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়যোগে সংস্কৃত মতে নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইয়া ব্যবহার করে"—এটা একদেশদর্শিতার কথা। সংসদের রচিত পরিভাষার যে ক্রটি সব-চেয়ে বেশী আমাদের চোখে পড়েছে তা এই একদেশদর্শিতার ক্রটি। প্রয়োজন থাক বা না থাক সংস্কৃত থেকে ধার করব, এবং সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনোও ভাষার থেকে আমরা কখনোও যে কিছু ধার করেছি বা অতঃপর করতে পারি, পারতপক্ষে তা মানব না, এই একদেশদর্শিতা।

আমার বিবেচনায় বাংলা borrowing language চিরকালই ছিল, এখনও আছে। আর আগেও যেমন কেবল সংস্কৃত থেকেই শব্দসম্ভার আমরা ধার করিনি, নানা ভাষার থেকে করেছি, এখনও ঠিক তাই করছি। বাংলা অভিধানে যেসব শব্দ মেলে, বাঙালী বাংলা ভাষায় কথা বলতে, চিঠি লিখতে, দলিল সম্পাদন করতে, সাহিত্যরচনার কাজে যে-সমস্ত বিদেশাগত শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করে, সে-গুলিকে ধার ব'লে স্বীকার করবার মত সততা যদি আমাদের থাকে ত আমরা দেখতে পাব, আমাদের চোখের উপর প্রতিনিয়ত ঝুড়ি ঝুড়ি বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ ক'রে বাংলা তার নিজের শব্দসম্পদ্ বাড়িয়ে চলেছে। এ কাজ কোনোও কমিটি বসিয়ে হচ্ছে না এবং কোনোও কমিটির সাধ্যে নেই এর গতিরোধ করা।

দেশের সাধারণ মানুষ, ভাষা জিনিসটা যাদের রোজকার কাজে লাগে; এবং দেশের কবি সাহিত্যিকেরা, যাঁরা দেশের সাধারণ মানুষকে ভেবে কাব্যরচনা সাহিত্যরচনা ক'রে থাকেন, তাঁদের হাতে যতদিন ভাষাসৃষ্টির কাজটা থাকে ততদিন ভাষার মূলধনের অভাব কিছুতেই হয় না, প্রয়োজন হলেই সে তখন ধার করে এবং এমনভাবে করে যে বিদেশাগত শব্দগুলোকেও অনেক সময় আর বৈদেশিক ব'লে চেনা যায় না। কিন্তু এ কাজ পণ্ডিতদের দিয়ে করাতে গেলেই দেখছি বিপদ্ বেধে যায়, তখন বিনা প্রয়োজনে ধার জ'মে ওঠে এবং বাংলার সমাগোত্রীয় শব্দগুলিকেও সমগোত্রীয় ব'লে চেনা দুষ্কর হয়।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে এমনই একদল পণ্ডিত ভাষাসৃষ্টির কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। বিদেশাগত শব্দ দূরে থাক, তদ্ভব শব্দের ব্যবহারকেই তাঁরা অত্যন্ত অর্ব্বাচীনের কাজ ব'লে মনে করতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যের ভার সামলে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে বাংলার এক শতাব্দীরও বেশী সময় লাগল। সংস্কৃতের যেমন তদ্ভব আছে, আরবী-ফারসী-তুর্কী-ইংরেজী-পোর্তুগীস থেকে ধার করা অনেকগুলি শব্দেরও তেমনই তদ্ভব রূপ আছে; কিছুদিন হল আবার একদল পণ্ডিত এই জাতে-ওঠা বিদেশাগত শব্দগুলির নূতন ক'রে জাত মেরে তাদের বানানকে মূলানুগামী করবার কাজে উঠে প'ড়ে লেগেছেন। এঁদের ভয়েই এতদিন অস্থির ছিলাম; ভাবছিলাম, বাংলাকে borrowing language থাকতেও এঁরা আর দেবেন না, অন্ততঃ বিদেশাগত শব্দগুলিকে নিজের বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি দিয়ে শাসিত ক'রে একেবারে বাংলা ক'রে নিয়ে আত্মসাৎ করবার পথ হয়ত এই নানাভাষাবিৎ পণ্ডিতদের কড়া পাহারায় চিরকালের মত রুদ্ধ হ'ল। তারপর এবারে দেখছি, বিদেশাগত শব্দগুলিকে একেবারে ছেঁটে ফে'লে দেবার চেষ্টাটাই একটা বড় কাজ হয়ে উঠল। আর সরকার নিজেই যখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই অপচেষ্টার উদ্যোক্তা, তখন বাংলা ভাষার দিক্ থেকে অবস্থাটা কিঞ্চিৎ সঙীন হয়ে ওঠা অনিবার্য্য।

পরিভাষায় কয়েকটি 'বিদেশাগত' শব্দ রক্ষিত হয়েছে ; কিন্তু বেশ বোঝা যায়, সংসদ্ কোথাও বা নিতান্ত নাপারতপক্ষে এগুলিকে রেখেছেন, হয়ত তাড়াতাড়িতে সংস্কৃত প্রতিশব্দ জোটেনি ব'লে ; আর কোথাও বা কাজগুলি এবং লোকগুলি এতই তুচ্ছ যে হয়ত সেই কারণেই তাদের জন্যে সংস্কৃত নাম খুঁজে বের করবার পরিশ্রম তাঁরা স্বীকার করেন নি। কয়েক জায়গায় বৈদেশিক বাংলা শব্দগুলির পাশে পাশে বৈকল্পিক সংস্কৃত শব্দ একটা ক'রে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় যেন ভাবটা এই,—বৈদেশিক শব্দটাকে নিতান্ত যদি রাখতেই চাও ত আপাততঃ রাখতে পার, কিন্তু রাখবার প্রয়োজন কিছু নেই।

প্রয়োজন আছে কি নেই, তা দেখা যাক। একটি দৃষ্টান্তই এ জন্যে আশা করি যথেষ্ট হবে।

ভূমিকাতে সংসদ্ বলেছেন : "Accounts অর্থে 'হিসাব' শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে, এ-তাবৎকাল আমরা তাহা চিন্তা করি নাই।" বহুশত বৎসর ধ'রে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, নির্বোধ, আমরা কোটী কোটী বাংলাভাষী হিসাব অর্থে 'হিসাব' কথাটা ব্যবহার ক'রে এসেছি, না-হয় তার সুবিধা-অসুবিধার কথাটা চিন্তা না ক'রেই ; কিন্তু সংসদের পরামর্শ-অনুযায়ী 'গণন' শব্দটি সে জায়গায় গ্রহণ করলে আমাদের যে কি অসুবিধা হতে পারে সংসদ্ কি তা চিন্তা করেছেন ?

'গণন' কথাটা গ্রহণ ক'রে তার থেকে আরও গোটাদুই কথা সংসদ্ "অনায়াসে লাভ" করেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই লাভের খাতিরে 'হিসাব' কথাটা ছেড়ে 'গণন' গ্রহণ করবার মত বেহিসাবী কাজ বাঙালী যে কখনোও করবে এ দুরাশাকে তাঁরা যেন মনে স্থান না দেন। সে-পক্ষে একটু বেশী দেরিই হয়ে গিয়েছে বলতে হবে।

প্রথমতঃ গণন যে করে তাকে গণক বলা চলবে না, কারণ 'গণক' কথাটা বাংলায় বিশিষ্টার্থে চলে, সুতরাং বলতে হবে 'গাণনিক'। কিন্তু হিসাব কথাটার প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপকতর। যে-জিনিস মাপা যায়, গোনা যায় না, তারও হিসাব হতে পারে ; আমরা হিসাব ক'রে কথা বলতে গিয়ে সব সময় যে গুনে কথা বলি তা নয়। তারপর "এ মাসে বাজার-খরচ কত হ'ল গণন ক'রে দেখ" কেউ কোনোওদিন বলবে কি ? হিসাব দেওয়া-নেওয়া, হিসাব মিলানো, বেহিসাব, হিসাবী, হিসাব-নিকাশ, গরহিসাব, হিসাব-কিতাব, হিসাবপত্র, বাজার হিসাব, ধোপার হিসাব, এর যে কোনোও একটা জায়গায় হিসাব বদলে গণন বসিয়ে দেখা যেতে পারে সেটা চলবার মত হয় কিনা। জীবনের আর সর্ব্বত্র যে জিনিষটা 'হিসাব' শুধু রাষ্ট্রীয় কাজের প্রয়োজনে তাকে বলতে হবে 'গণন', এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা। Accountantকে হিসাবরক্ষক আমরা এতদিন বলেছি তা ঠিক, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বলেছি, হিসাবনবিশ। বাংলার বহুকোটী অশিক্ষিত লোক হিসাবনবিশ বলতে কি বোঝায় তা বুঝবে, হিসাবরক্ষকও বুঝবে, কিন্তু 'গাণনিক' কি পদার্থ বুঝতে হলে তাদের আগে বাংলা লেখাপড়া শিখে নতুন অভিধান রচনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হবে, কেননা বর্ত্তমান কোনোও বাংলা অভিধানে 'গাণনিক' কথাটা নেই। কিন্তু অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী জনসাধারণের কথা সংসদ্ খুব বেশী যে চিন্তা করেছেন, পরিভাষাগুলি দেখলে তা মনে হয় না। সেকথায় পরে আবার আসছি।

আসলে হিসাব কথাটাও ভয়াবহ নয়, নবিশ কথাটাও নয়, এবং কোনোও অসুবিধা বোধ করিনি ব'লেই এতকাল এত ব্যাপকভাবে কথাদুটোকে আমরা ব্যবহার ক'রে এসেছি। আমরা বাঙালীরা, বাঙালী হিন্দুরা, আমাদের পারিবারিক নামের পিছনেও নবিশ জুড়ে বেড়াচ্ছি। পত্রনবিশ, খাসনবিশ, মহলানবিশরা, যাঁদের মধ্যে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণও রয়েছেন, তাঁরা যদি সমাজে চলতে পারেন, হিসাবনবিশরাও চলবেন। Accountant Generalকে 'মহাগাণনিক' না ব'লে, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির উপযুক্ত কোনোও বিশেষণে বিশেষিত ক'রে হিসাবনবিশ বললে তাঁরও মর্য্যাদার কিছুমাত্র হানি হবে ব'লে মনে হয় না।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, জাতে-ওঠা আরবী-ফারসী-তুর্কী-ইরাণীয়-ইংরেজী-পোর্তুগীস-ওলন্দাজ শব্দগুলিকে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে বাংলার কি ব্রাত্যতা দোষ ঘটেছে, না, বাংলা সমৃদ্ধতর হয়েছে? আরও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, সরকার-নিয়োজিত এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সে ক্ষমতা কি আছে, যে একটা প্রথম শ্রেণীর, জীবন্ত, পরিপুষ্টিশীল ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা, তার সহস্রাধিক বৎসরের ঐতিহ্য-নির্দ্ধারিত গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে পারেন? বিদেশী শব্দ গ্রহণ করলে ভাষার জাত যায় না, এবং এই গ্রহণের পালা শেষ হয়নি আজও, হয়ত হবেও না কোনোওদিন, এ যদি তাঁরা মানেন, ত এত আড়ম্বর ক'রে এতদিন ধ'রে তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতি ঘেঁটে এই পণ্ডশ্রম তাঁরা কেন করেছেন?

যদি বলেন, সাধারণ কথাবার্ত্তায় আলাপে আলোচনায়, ভাষায় সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সর্ব্বত্র বিদেশাগত বাংলা শব্দগুলি চলতে পারে, কেবল সরকারী কাজে সেগুলিকে যথাসাধ্য বাদ দিয়ে চলতে চেষ্টা করতে হবে, ত তার মানে হবে না কিছু। কারণ সরকারী পরিভাষা মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন, তার কথাবার্ত্তার ভাষা, তার সাহিত্য, তার ব্যবসাবাণিজ্য, ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কবর্জ্জিত হয়ে থাকতে পারে না, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যেমন পারে। যদি তা পারত, এই পরিভাষার সমালোচনা কাগজে লিখে পাঠানোর কোনোও প্রয়োজনই হত না। সরকার নিজেকে নিয়ে যা খুসি করুন তাতে আমাদের কিছু এসে যেত না। কিন্তু এই পরিভাষা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে, এই হয়েছে আমাদের ভাবনা। আমাদের ভাষার গোবিন্দভোগের মধ্যে একরাশ কাঁকরের মত এই শব্দগুলি ছড়িয়ে যাবে। তাতে কাজ কিছুই হবে না, কারণ আমরা বাঙালীরা, বাংলা সাহিত্যসেবীরা, সংবাদপত্রসেবীরা জাতে-ওঠা বিদেশাগত বাংলা শব্দগুলিকে কিছুতেই ছাড়ব না, দেশের সাধারণ লোকেরাও ছাড়বে না, এবং কাঁকরগুলিকে যেখানেই পারব, বেছে ফে'লে কাজ চালাতে চেষ্টা করব। বাইরে যাঁকে বলব বা লিখব মহাপ্রৈষাধিকারিক, লুকিয়ে তাঁকে ডাকবিভাগের বড়কর্ত্তা বলব, বিপদে পড়লে 'পুলিশ, পাহারাওয়ালা' ব'লেই চেঁচাব, 'আরক্ষিক, আরক্ষিক' ব'লে নয়।

ভাষার ব্যাপকতর ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার সময় এ নয়। সরকারী কাজে এমন কতগুলি ইংরেজী শব্দ এতকাল চ'লে এসেছে যা এর পরেও চলবে; কারণ, শব্দগুলি এখন বাংলা। আর্দ্দালী, জেলখানা, পাগলা গারদ (guard-গারদ), টিকিট, ডেমি কাগজ, জুরী, নম্বর, নোট (একটাকার, দশটাকার), মাইল, পকেটমার, পিয়ন, পল্টন, ফী, বাণ্ডিল, ভোট, মিনিট, রোঁদ, সান্ত্রী, শীলমোহর, হাসপাতাল, ফাইল, কুপন, চেক, ইত্যাদি শব্দকে বাংলা ভাষার আসর থেকে বিতাড়ন এখন আর সহজ নয়।

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সংসদ্ কতকগুলি ইংরেজী শব্দকে তাঁদের রচিত পরিভাষায়

রক্ষা ক'রে গিয়েছেন। কতকগুলির বৈকল্পিক পরিভাষা দেওয়া হয়েছে, বেশীর ভাগেরই হয়নি। বেলিফ, ব্যাঙ্ক, বয়লার, বোতল, ইঞ্জিন, কম্পোজিটর, ড্রিল, ফেরোটাইপ, ফর্মা, গ্যাস, ফিটার, কিণ্ডারগার্টেন, লিফ্‌ট্, লিনোমনো, লিনোটাইপ, লিথো, লরি, মনোটাইপ, মোটর, আর্দালী, পিয়ন, পাদরী, প্রুফ, পাম্প, রোলার, সীলবেলিফ, সার্জেণ্ট, ওভারসিয়র, স্ট্যাম্প, সমন-বেলিফ, থিওডোলাইট, টিকিট, টিন, টাইপিস্ট্, প্রেস্‌নোট, এই ৩৫টি ইংরেজী শব্দ সরকারী কাজে চলতে যদি পারে, মহাভারত তাতে যদি অশুদ্ধ না হয়, তবে যে ইংরেজী শব্দগুলো বহু ব্যবহারে, এবং কোথাও কোথাও বাংলা উচ্চারণের নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়ে, বাংলাই হয়ে গিয়েছে, তাদের বিতাড়িত ক'রে, বাংলার পক্ষে সমস্তরকমের ভাবানুষঙ্গ ও ঐতিহ্য বর্জ্জিত, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণের চেষ্টাকে অপচেষ্টা ভিন্ন কি আর বলব ?

ইংরেজী সমস্ত শব্দকে নির্ব্বিচারে বর্জ্জন ক'রে তাদের জায়গায় বোধগম্য বাংলা শব্দ ও বাংলা শব্দের উপাদান নিয়ে সংসদ্ পরিভাষা রচনা করতে যদি পারতেন, আমরা সে পরিভাষা ব্যবহার করি বা না করি, তাঁদের উদ্যমের প্রশংসা করতে পারতাম। কিন্তু পুস্তিকাটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক-একবার এমনও মনে হয়েছে, যে, বৈদেশিক শব্দগুলোর সম্বন্ধে সংসদের আপত্তি এত মারাত্মক নয়, সুপ্রচলিত এবং বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ শব্দগুলি সম্বন্ধে যত। ব্যাঙ্ক বলতে পারব কিন্তু ব্যাঙ্কের কেরাণী বলা চলবে না, বলতে হবে 'ব্যাঙ্ক-করণিক'; বোতল বলতে পারব কিন্তু বোতল ধোলাইকর চলবে না, বলতে হবে 'বোতল-ধাবক'; কিণ্ডারগার্টেন চলবে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রী taboo, বলতে হবে 'কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষিকা'; রেল চলবে, এমনকি তার কোনোও বিকল্প পরিভাষায় নেই, কিন্তু রেলগাড়ী অচল, বলতে হবে 'রেলযান'। সংসদ্ জাতে ওঠা ইংরেজী শব্দ অনেক ছেড়েছেন, কিন্তু অন্যদিকে এমন কয়েকটি ইংরেজী শব্দকে রক্ষা করেছেন যারা এখনও জাতে ওঠেনি এবং কোনোও দিন হয়ত উঠতে পারবেও না। সংসদ্ যদি সেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিতে পারতেন, কিছু কাজ হত। আচ্ছা, পাম্প কথাটাকে দমকল বললে কি ভুল হয় ?

কতকগুলি আরবী-ফারসী জাতীয় শব্দকেও সংসদ্ পরিভাষায় রক্ষা করেছেন, এদেরও কতকগুলির বেলায় বৈকল্পিক সংস্কৃত শব্দ দেওয়া হয়েছে, কতকগুলির বেলায় হয়নি। আমিন, আতালিক, দপ্তরী, মেরামত, খাজাঞ্চী, সরকার, নকলনবিশ, দারোয়ান, নক্‌শাকার, সরদার, কারখানা, জমাদার, উকীল, কানুনগো, মোহাফেজ, খাসমহাল, তশীলদার, কুতনবিশ, ওস্তাদ, মুহুরী, মুন্সেফ, জারি (যেমন নামজারি), নাজির, কাগজ, চাপরাশী, পেশকার, পরোয়ানা, মুনশী, মহকুমা, দর্জি, দারোগা, হরপ, জেলাদার, বদলি, ইস্তাহার, দফা, তাগিদ, জরুরী, এই ৩৮টি আরবী, ফারসী, তুর্কী জাতীয় শব্দ পরিভাষায় স্থান পেয়েছে।

কথা হচ্ছে, আমরা 'আমিন' বলতে যদি পাই তাহলে 'প্রমাতা' কখনোও কি বলব ? 'সরদার পাহারাওয়ালা' বলতে পেলে 'প্রধান আরক্ষিক' বলতে কারও কখনোও ইচ্ছা হবে ? 'ছোট সরকারী উকীল', যাঁর বৈকল্পিক সংস্কৃত নাম পরিভাষায় কিছু দেখছি না, তাঁর পক্ষে 'ছোট আদালত' এবং 'ছোট আদালতের বিচারকই' কি যথেষ্ট নয়, বিকল্পে 'ন্যায়াধীশ অবরধর্মাধিকরণে'র প্রয়োজন কি জন্যে হচ্ছে ?

উপরে উদ্ধৃত ৩৮টি আরবী, ফারসী শব্দ যদি পরিভাষায় চলতে পারে, তবে বাংলার জাতে ওঠা বাকী আরবী-ফারসী-মূলীয় শব্দগুলি কি দোষ করল, যে তাদের সরকারী কাজে লাগালে পশ্চিম

বাংলা সরকারের জাত যাবে ? অছি (পরিভাষার ন্যাসপাল), আবকার, আবকারি (পরিভাষার অন্তঃশুল্ক), আইন, আড়ত, আড়তদার (পরিভাষার ভাণ্ডারী), আমলা (পরিভাষার আধিকারিক), আম-মোক্তার, আমমোক্তার-নামা, আসামী, আরজি, ইজারা, ইজারাদার, ইস্তফা, একতিয়ার, একরার, একরারনামা, কবুলপত্র, এজমালী, এজলাস, এজাহার, ওকালতনামা, ওয়ারিশ, ওয়ারিশান, ওরফ, কড়ার, এত্তেলা, ওয়াশিল, কবালা, কবুল, কবুলতি, কবুলিয়ত, কলম, কয়েদ, কামাই, কায়েম, কারকুন, কিস্তি, কৈফিয়ত, কোরফা প্রজা, খত, খয়ারাতী, খরচ, খাজনা, খানাতল্লাস, খারিজ, খাম, খালাস, খোরাকি, খুন, খুনী আসামী, খেসারত, খোরপোশ, গাফিলি, গাফিলতি, গায়েব, গোমস্তা, গোয়েন্দা, গ্রেপ্তার, চাকরী, চাকরান, জখম, জবানবন্দি, জবানী জমানত, জামিন, জমিজমা, জমিজেরাত, জমিদার, জরিপ, জরিমানা, জাল, জালিয়াতী, জিম্মা, জেরা, তকমা, তদবির, তদারক, তফসিল, তফসিলী, তমস্থক, তরফ, তলব, তসরুফ, তহবিল, তহবিলদার (পরিভাষার কোষপাল), তামাদি, তামাদী, তামিল, তারিখ, তালিকা, তালুক, তৌজি, দখল, দপ্তর, দপ্তরখানা, দলিল, দস্তখত, দস্তুরি, দাখিল, দাখিলা, দাখিলী, দাগ, দাগী আসামী, দাবি, দাবিদার, দাবিদাওয়া, দায়রা, দায়ের, দেওয়ান, দেওয়ানী আদালত (পরিভাষার ন্যায়াধিকরণ), দোয়াত, নগদ, নজরবন্দী, নজির, নথি, নাকচ, নমুনা নাবালক, সাবালক, নায়েব, নালিশ, পাইক, পেয়াদা, পেশ, পেশা, পেশাদার, ফরিয়াদী, ফর্দ, ফেরার, ফৌজদার, ফৌজদারী আদালত (পরিভাষার দণ্ডাধিকরণ), বকলম, বকেয়া, বাকী, বগয়রহ, গয়রহ, বন্দুক, বন্দোবস্ত, বরখাস্ত, বরাদ্দ, বরাবর, বাজেয়াপ্ত, বাতিল, বাদ, বাবত, বামাল, বাসিন্দা, বাহাল, বিলাতী, বীমা, বেকসুর, বেকার, বেগার, বেনামদার, বেনামী, মোকদ্দমা, মকুফ, মক্কেল, মৎলব, মনিব, মফস্বল, মবলগ, মামলা, মায়, মারফৎ, মজুদ, মঞ্জুর, নামঞ্জুর, মালগুদাম, মালিক, মালিকানা, মাশুল (পরিভাষার শুল্ক), মিয়াদ-মেয়াদ, মুচলেকা, মাহিনা, মুরুব্বি, মুলতুবি, মুসাবিদা, মোকাবিলা, মোক্তার, মোতায়েন, মৌজা, মৌরুসী, রদ, রপ্তানি, রসিদ, রাস্তা, রাহাখরচ, রুজু, রেজগি, রেয়াত, রেহাই, রেহান, রোকা (পরিভাষার স্মার), লাশ, লেফাফা, রোজনামচা (পরিভাষার দিনপত্রী), লাখেরাজ, লায়েক, শনাক্ত, শরিক, শহর, সামিল, শায়েস্তা, শিরনামা, সদরালা (পরিভাষার অবর বিচারক), সন, সফর, সবুর, সরবরাহ, সরহদ্দ, সরাসরি, সহি-সই, টিপসই, সাকিন, সাজা, সাবুদ, সাবেক, সালিয়ানা, সুদ, সুপারিশ, সেরেস্তা, সেরেস্তাদার, সোপরদ্দ, সোলেনামা, হলফ, হাওলা, হাওলাত, হাজত, হাজির, হাজরি, হাতিয়ার, হাবিলদার, হিস্যা, হুকুম, হুজুর, হুলিয়া, হেপাজত, এবং এমনিধারা আরও অনেক আরবী-ফারসী-মূলীয় শব্দ আছে যা বংশানুক্রমিক বহুব্যবহারে বহুকাল হ'ল বাংলা হয়েই গিয়েছে।—এমন দিন কখনোও কি আসা সম্ভব যখন বাঙালীরা সরকারী কাজের প্রয়োজনে এই কথাগুলি আর ব্যবহার করবে না ? Endorsement কথাটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় 'সহি'। সই, সহি বা দস্তখত না-হয় অপাংক্তেয়, কিন্তু পৃষ্ঠলেখ, অধোলেখ বংশপরিচয়ে যতই কুলীন হোন, তাঁরা ভাষার দরবারে ঢুকতে পারবেন ব'লেই যে বোধ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Excise 'আবকারি', supply 'সরবরাহ'। ও কথাদুটোকে 'অন্তঃশুল্ক' ও 'সংভরণ' কেউ বলবে ? বৈদেশিক ব'লে সরবরাহ না হয় চলল না, কিন্তু 'যোগান'ও কি অচল ?

এর থেকে তদ্ভব ও দেশজ শব্দগুলির কথায় আসা যেতে পারে। সংসদ্ 'হিসাব' ছেড়ে 'গণন' নেবার

পক্ষপাতী, কেননা একমাত্র গণন থেকেই 'গাণনিক' ও 'মহাগাণনিক' এই দুটো কথা "অনায়াসে লাভ" করা যায়। অপরদিকে তাঁরা 'ডাক' কথাটার বদলে 'প্রৈষ' গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। লাভক্ষতির কথাই যখন উঠল তখন জিজ্ঞাসা করতে দোষ নেই, যে, একমাত্র 'ডাক' কথাটার থেকে আমরা এতকাল কতগুলো কথা অনায়াসে লাভ করছিলাম সেটা সংসদ্ একবারও ভেবে দেখেছেন কি? ডাকঘর, ডাকপিয়ন, ডাকটিকিট, ডাকবাক্স, ডাকপেয়াদা, ডাকহরকরা, ডাকমুনসী, ডাকবাংলা ডাক বসানো, ঘোড়ার ডাক, ডাকগাড়ী, সকালের ডাক, বিকালের ডাক, ফেরত ডাক প্রভৃতির কাজ যদি 'প্রৈষ' দিয়ে না চলে তাহলে 'মহাপ্রৈষাধিকারিক' আমাদের কোন্ কাজে লাগবেন? কেরাণীবাবুরা 'আফিসে' নাহয় আর যাবেন না, কিন্তু তাঁরা করণিক হচ্ছেন ব'লে এরপর তাঁদের 'কাছারি'তে যাওয়াও কি বারণ? দেখতে পাচ্ছি, আফিস, কাছারি, এগুলোর নতুন নামকরণ হচ্ছে 'করণ'। চিরকুট, চিট, এগুলোকে অতঃপর 'স্মার' বলতে হবে। পূর্ব্ববঙ্গীয় কোনোও কর্মচারীকে 'স্মার' খুঁজে বের করতে বললে, দড়ি নিয়ে সে হয়ত মাঠেও বেরিয়ে পড়তে পারে। পাহারাওয়ালাকে এরপর আরক্ষিক বলতে পারলেই ভাল; কোতোয়াল, কোতোয়ালী, চৌকিদার, ঘাঁটি, থানা, ফাঁড়ি, এগুলোও হয়ত আর চলবে না। Contractorদের সঙ্গে সরকারের নিত্যসম্পর্ক, তাঁরা কি অতঃপর আর ঠিকাদার থাকতে পাবেন, না সংস্কৃত নাম তাঁদেরও জন্যে একটা হবে? Circle কথাটার বাংলা চাকলা, Circle Officer চাকলাদার, কিন্তু পরিভাষায় তারা হয়েছে 'মণ্ডল' ও 'মণ্ডলাধিকারিক'। দোভাষীকে দিয়ে বাংলা সরকারের আর কাজ চলবে না, তিনি হবেন 'ভাষান্তরিক' আর আদায়কারী হবেন 'সমাহর্তা'। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তৎসত্ত্বেও এদেশে চিরকালই মোকদ্দমার 'শুনানি' হবে, কেরাণীরা 'ভাতা' পাবে, 'ডাকাতে'রা 'ডাকাতী'ও করবে মাঝে মাঝে, অন্ততঃ চেষ্টা করবে, সরকার কোনোও কোনোও কাজে মাসের 'পয়লা' তারিখ থেকে 'ঠিকা' লোক নিয়োগ করবেন, তারা নিরক্ষর হলে 'ঢেরাসই' দিয়ে মাইনে নেবে, 'ঢোলশোহরত' বন্ধ হবে না, 'চৌহদ্দি' নিয়ে 'দাঙ্গা' 'সুরু' হবে এবং 'ডাকঘর' থেকে যে সমস্ত 'চিঠি' 'বিলি' হবে, সরকারী অনেক চিঠিও থাকবে তার মধ্যে।

এরপর সংসদের পরিভাষায় বাংলায় চলতি তৎসম শব্দগুলির অবস্থা কি প্রকার তা দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছি, সুপ্রচলিত তৎসম শব্দগুলিকেও বর্জ্জন ক'রে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করার দিকে সংসদের এতই বেশী ঝোঁক, যে, যেখানে সম্পূর্ণ পৃথক্ শব্দ জোটেনি সেখানে একটা উপসর্গ বা প্রত্যয় জুড়েই হোক, অথবা একটা উপসর্গ বা প্রত্যয় বাদ দিয়েই হোক, কথাগুলোর একটু অপরিচিত উদ্ভট চেহারা বানিয়ে দেবার চেষ্টা এঁরা করেছেন। অধ্যক্ষ হয়েছে অধীক্ষক, উপনিবেশ হয়েছে নিবেশ, সেবিকা হয়েছে সেবকা, শিক্ষয়িত্রী হয়েছে শিক্ষিকা, বিক্রেতা হয়েছে বিক্রয়িক, মিশ্রক হয়েছে মিশ্রকী, বাহন হয়েছে পরিবহণ, করনির্ধারণ হয়েছে করনির্ধার, আবাসী হয়েছে আবাসিক, আপতিক হয়েছে আপাতিক। এতে অসুবিধা তত নেই। কিন্তু কর্মচারী এরপর হবে 'আধিকারিক', আলোকচিত্র 'ভাচিত্র', সহকারী 'সহায়ক', তত্ত্বাবধানকারী 'অবধায়ক', উচ্চতর 'উত্তর' (যদিও বাংলায় ঐ নামীয় দিক্, জবাব ও পশ্চাৎ এই তিন অর্থেই কথাটা বেশী চলে), নিম্নতর 'অবর' (যদিও নিম্নতর কথাটার মধ্যে সে অবজ্ঞার ভাব নেই যা অবর কথাটার মধ্যে আছে; অবর-অধম, নীচকুলজাত; অবরবর্ণ-শূদ্রবর্ণ), অধ্যাপনা 'পাঠন', (হিসাব)-পরীক্ষা 'নিরীক্ষা', নিষ্পত্তি-সিদ্ধান্ত-বিচারফল 'আজ্ঞপ্তি', মজুরদের

(বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহীত) খেসারত বা ক্ষতিপূরণ ‘শ্রমিক নিষ্ক্রয়’, ইন্ধন ‘এধ’, যন্ত্রপাতি ‘সাধিত্র’, বিচারক ‘ন্যায়াধীশ’, কার্য্যালয় ‘করণ’, বিচারালয় ‘ধর্মাধিকরণ’ (যদিও ধর্ম কথাটা law অর্থে বাঙালী বোঝে না), ভারপ্রাপ্ত সহকারী ‘আয়ুক্তসহায়ক’, প্রহরী ‘আরক্ষিক’, কার্যাধ্যক্ষ ‘নির্বাহক’, অস্ত্রোপচার ‘শালাক্য’, শিক্ষাধীন ‘শৈক্ষ’, সংগ্রহ ‘আসাদন’, বাংলায় মাছও নেই মৎস্যও নেই—বলতে হবে ‘মীন’, অগ্রিম (হিসাব) ‘প্রাক্কলন’, ব্যবসায় ‘ব্যাপার’, পরীক্ষাগার ‘প্রয়োগশালা’, উর্দ্ধতন ‘উপরিক’, অধস্তন ‘অধরিক’, কোষাধ্যক্ষ ‘কোষপাল’ (সংসদের পরিভাষায় পালরা পালেপালে এসে আসর জমিয়েছেন), বিশেষজ্ঞ ‘নিবোধক’ বিশিষ্ট কর্মচারী ‘প্রাধিকারিক’, মুদ্রণ ‘মুদ্রিতক’, মূল্যনির্ণায়ক ‘অর্হাপক’, এবং চলাচল ‘সংসরণ’। অসুবিধা কিঞ্চিৎ হবে বই কি !

একটা কথা আমরা বোধহয় ভুলেই গিয়েছি। কথাটা এই, এবং এইটেই আসল কথা, যে, ইংরেজী আমলে আমাদের সরকারী কাজ কেবল যে ইংরেজীতেই সম্পন্ন হত তা নয়। প্রথমতঃ সরকারী terminologyতে অনেক এদেশীয় শব্দ ইংরেজরাও গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কাজ কেবল যে ইংরেজ-সরকার এবং তাঁদের দেশীয়-বিদেশীয় কর্ম্মচারীরাই করতেন তা ত নয়, যাদের শুভাশুভের দায় নিয়ে সরকার এবং যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর, আমাদের দেশবাসী সেই রকমের লক্ষ লক্ষ লোক পুরুষানুক্রমে জীবনের নানাক্ষেত্রে নানারকমে এই কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। তারা পঞ্চায়েত করেছে, ভোট দিয়েছে, ভোট পেয়েছে, খাজনা দিয়ে রসিদ নিয়েছে, পুলিশের কাছে এত্তেলা করেছে, ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়েছে, জামিন খুঁজেছে, সদরালার কাছে দরখাস্ত করেছে, দলিল রেজিষ্টারী করতে রেজিষ্টারী আফিসে গিয়ে ধরণা দিয়েছে, সমবায়-সমিতির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে, আইন-আদালত সম্বন্ধীয় সাধারণ-জ্ঞানের পরিচয়ে অনেকস্থলে অভিজ্ঞ উকীলদেরও হার মানিয়েছে। এদের মধ্যে একটু লেখাপড়া-জানারা বাংলায় মোক্তারি পাশ ক'রে, আদালতে দিনের পর দিন মুনশেফের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এরা ইংরেজীতে কথা বলত না। গুটিকয়েক ইংরেজী শব্দ নিরুপায় হয়ে কাজে লাগাত, এবং এদেরই কল্যাণে সেই শব্দগুলো বাংলার জাতে উঠে বাংলা হয়ে গিয়েছে। কোন্ ভাষায় কথা বলত এরা ? কে এদের হয়ে পরিভাষা রচনা ক'রে দিয়েছিল ? পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তাঁদের নিয়োজিত পরিভাষা-সংসদের সে-ভাষার সঙ্গে কি পরিচয় নেই ? যদি না থাকে ত পরিচয় তাঁরা করুন। এই পরিভাষা-রচনাতে যে পরিশ্রম ও সময় তাঁরা ব্যয় করেছেন তার একদশমাংশ ব্যয় করবেন। দেখতে পাবেন, অধিকাংশ ইংরেজী terminologyর বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজতে এই বর্ত্তমানকালেরই বাংলাদেশ এবং বাংলাভাষা ছেড়ে বেশীদূর তাঁদের যেতে হবে না। এঁরা আরও দেখতে পাবেন, সরকারী কাজের প্রয়োজনে যে বাংলাভাষা আপামর-সাধারণ সমস্ত বাঙালীরা এতকাল ব্যবহার ক'রে এসেছে, সংসদের বহু-আয়াস-সংগৃহীত অধিকাংশ শব্দই সেই ভাষার আসরে সমাদরের আসন, সম্মানের আসন কোনোওদিন পাবে না, কারণ সে-ভাষার সঙ্গে তারা জাতে মেলে না, মিলবে না।

বিনা প্রয়োজনেও ধার আমরা করতে পারি, ধার আমরা করি, শব্দগুলো যদি বেশ শ্রুতিমধুর হয়, সুন্দর হয় ; কিন্তু সে-কার্য্য কমিটি বসিয়ে করবার যে কোনোও প্রয়োজন আছে তা কেউ বলবে না। তাছাড়া সংসদের আহরণ-করা শব্দগুলির অধিকাংশ কারও বা মতে “শ্রুতিকটু এবং আড়ষ্টতা দোষে

দুষ্ট।" কেউ বা এগুলিকে বলেছেন, "দুষ্পাচ্য, কুশ্রাব্য এবং দুর্বোধ্য।" অবরবর্গীয় আয়ুক্তসহায়ক; সহনিরীক্ষাকরণিক; সহনিবন্ধক, মহাধর্ম্মাধিকরণ; ব্যবহারকরণিক, অবরধর্ম্মাধিকরণ; মুখ্যন্যায়াধীশ, অবরধর্মাধিকরণ; মুখ্য প্রতোদক; আপাতিক পরিচর; দোহবর্ধন আধিকারিক; উপআয়ুক্তক; প্রাক্কলনিক; নির্বাহী আধিকারিক; গণপুরুষ, পরিদর্শী উপদর্শক; পরিদর্শকরণিক; মহানিবন্ধ পরিদর্শক; সাধিত্রসংস্কারক; লেখ্যপাল; আবকাশিক; অধিযন্ত্রিক; আবাসিক; প্রতিমাশিক্ষক; সঞ্চকী; লেখ্য-প্রামাণিক; বরিষ্ঠ-সেবকা; ভরক; খণ্ডকাল আধিকারিক; পত্তনাধিকারিক; বৈনয়িক; নিদর্শনির্বাহক; অবেক্ষাধীন ন্যায়দর্শক; বালাধিকরণ; অক্ষি-শালাক্য-অধ্যাপক; প্রেষকার; অভিশংসক; প্রবাসনপাল; ব্যবহারবিবরণ প্রতিবেদক; শৈক্ষ সেবকা; প্রকাশনিবন্ধকরণ; লেখ্যনায়ক; অধিপুরুষ; সৈন্যগুল্ম; মাণ্ডলিক; জনসংভরণ; আসাদন; অবিত্তনিবন্ধক; আবাপনিক; ভূবাসন আধিকারিক; ব্যবহারদেশক; লঘুলিপিক; আকারক; সাধ্যপালাধ্যক্ষ; কার্যগ্রাহী; পরিযাণকরণিক, আত্যয়িক; তারিক; প্রাধিকারিক; আসেধক; মীনপোষ কৃত্যক; অধরিক কৃত্যক; পাটকশোধক; প্রপন্নাধিকার; চার; পরিবৃত্তি; প্রেষণ; লেখসাধন-করণ; শাবচার; ব্রজচার; আক্রমিক; চক্রচর;—কত নাম করব? কিন্তু এই ত কেবল পরিভাষার প্রথম স্তবকের কয়েকটি শব্দ; সবে কলির সন্ধ্যা; এমন আরও অনেক স্তবক নিশ্চয় নেপথ্যে রয়েছে। পাঠক যদি বলেন, এগুলিকে আয়ত্ত করা কিছুই শক্ত হবে না, ত তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করব না। সংসদ্ তাঁদের ভূমিকা এই ব'লে শেষ করেছেন: "ইংরাজী ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা এতদিন যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার একচতুর্থাংশও যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার (*sic*) আলোচনায় ব্যয় করি, তাহা হইলে যে সকল শব্দ আমাদের নিকট এখন অপরিচিত বোধ হইতেছে সেগুলি আর অপরিচিত বা দুর্বোধ থাকিবে না।" জিজ্ঞাসা করি, এই 'আমরা' কে? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, "ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য" আমাদের মধ্যে যারা এতদিন কিছুমাত্র পরিশ্রম করেনি, সংসদ্ তাদের কথা চিন্তা ক'রে এ পরিভাষা রচনা করেননি। কিন্তু তারাই যে দেশের সাড়ে পনেরো-আনা লোক, তাদের কথাটাও একটুখানি চিন্তা করা উচিত ছিল বই কি? তারা যদি পরিভাষার শব্দগুলিকে নিতান্ত আপনার ক'রে না নিতে পারে, না নেয়, সেগুলি না বুঝতে পারে, না বলতে পারে, ব'লে সুখ না পায়, নিত্যকার কাজে প্রয়োজন মত সেগুলিকে না লাগায়, তাহলে বলব, সংসদ্ পরিশ্রম যথেষ্ট করেছেন, পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের এই পরিভাষা-রচনা প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না, যদি জনমত-নির্দ্ধারণের জন্যে সরকার এই পুস্তিকাটির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন। শনিবারের চিঠির সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখিত এই বিষয়ক একটি আলোচনা প'ড়ে মনে হ'ল, ব্যবহারোপযোগী পরিভাষা রচনার কাজে সত্যকারের সাহায্য করতে পারেন এমন লোকের বাংলাদেশে অভাব নেই। নানারকমের সরকারী কাজে নানাভাবে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের মধ্যে ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন লোকও ত অনেক রয়েছেন? আমার মনে হয়, পুস্তিকাটি পাঠ করতে পেলে তাঁদের মধ্যে অনেকে এবং তাঁদের বাইরেও কেউ কেউ সরকারকে সুপরামর্শ দিতে পারবেন। যাঁরা যেরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সেইরকম কাজ সম্পর্কিত পরিভাষা রচনায় তাঁদের কাছে সাহায্য নিলে সরকার আখেরে লাভবান্‌ই হবেন।

কথা উঠতে পারে, মুখবন্ধে শ্রীসুকুমার সেন এও বলেছেন : "বাংলা প্রতিশব্দগুলি যেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গৃহীত না হইলেও বোধগম্য হইতে পারে। যে সমস্ত কারণে সংসদ্‌কে সংস্কৃতভাষার সাহায্য অধিকমাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একটি প্রধান।" কিন্তু সুকুমারবাবুর উপরি-উদ্ধৃত উক্তির অর্থ নিশ্চয়ই এ নয়, যে, বাংলা প্রতিশব্দগুলি বাঙালীর বোধগম্য হওয়ার চাইতেও অন্য প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হওয়াটা বেশী দরকার? অন্যান্য প্রদেশের চিন্তা এতই বেশী যদি সরকারের মনে ছিল, তাহলে সর্ব্বভারতীয় পরিভাষা রচনার জন্য অপেক্ষা করলেই ত তাঁরা ভাল করতেন। তা ছাড়া, পরিভাষার যে শব্দগুলি বাঙালীর পক্ষে বোঝা শক্ত হবে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে, সেগুলি ভারতবর্ষের কোনোও প্রদেশের লোকই বুঝতে পারবে না। সুতরাং অন্য প্রদেশগুলির দোহাইটা এক্ষেত্রে একেবারেই অচল। আর বাস্তবিক, সরকারী কাজের সম্পর্কে বাঙালী পুরুষানুক্রমে যে-সমস্ত আরবী-ফারসী-মূলীয়, দেশজ, তদ্ভব ও তৎসম শব্দ এতকাল ব্যবহার ক'রে এসেছে, ভারতে, অন্ততঃ উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র সেই শব্দগুলিই সচরাচর চলে। এরপর দক্ষিণ ভারতেও সেগুলিই সম্ভবতঃ চলবে, কারণ, হিন্দী আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে এবং এই শব্দগুলি হিন্দী ভাষারও উপজীব্য। এই শব্দগুলি এবং এই জাতীয় অন্য শব্দ ভেঙেচুরে, জোড়াতাড়া দিয়ে যে পরিভাষা রচিত হবে, তাই হবে সত্যকারের এবং ব্যবহারযোগ্য পরিভাষা।

আমরা যেগুলিকে দেশীয় রাজ্য ব'লে থাকি, তাদের রাজকার্য্য অনেক ক্ষেত্রেই দেশীয়ভাষার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই রাজ্যগুলিতে সন্ধান করলেও রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারযোগ্য পরিভাষা কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে।

আর দু-একটিমাত্র কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। আমাদের কোন্ পাপের ফলে জানি না, আমরা বাঙালীরা আজ দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। তা সত্ত্বেও আমরা আশা করছি, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদির সহায়তায় বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যের অনেকখানিকেই আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব। বাঙালীজাতি বলতে আমরা হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাংলাভাষীকেই বুঝে থাকি তা বলা বাহুল্য। এই ঐক্যসাধনা অত্যন্ত বেশী ব্যাহত হবে যদি পরিভাষা-সংসদের সঙ্কলিত এই উৎকট অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলি রাজদরবারের তকমা প'রে আমাদের ভাষার আসরে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

ঢাকায় মুসলমান ছাত্ররা রেডিও-প্রচারিত বাংলায় জবরদস্তি উর্দ্দুর মিশাল দেওয়ার বিরোধিতা করছেন দে'খে আশান্বিত হয়েছিলাম, পশ্চিমবঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজের ভিন্নরকম মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে নিরাশ হতে হল।

এত কথার পরেও কেউ কেউ বলতে পারেন, "সংসদের পরিভাষা-রচনা বাংলায় উর্দ্দুর মিশাল দেওয়ার সমপর্য্যায়ে পড়ে না। কারণ, বাংলা নিয়ে যেখানে কথা সেখানে সংস্কৃতে ও উর্দ্দুতে আকাশপাতাল তফাৎ (তফাৎটা শব্দ-নির্ব্বাচনের উপর কতখানিই যে নির্ভর করে তার পরিচয় পরিভাষাগুলির মধ্যেই রয়েছে); তাছাড়া, কথাবার্ত্তা ও সাহিত্যের ভাষাতে এই পরিভাষাগুলিকে যে মিশাতেই হবে এমন কোনোও কথা ত নেই?" বাস্তবিক, পরিভাষাগুলিকে যাঁরা সমস্ত রকম সমালোচনার ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে চান, তাঁরা বলছেন, "তোমরা কেন অকারণ ব'কে মরছ? বাংলা কথা একটাও তোমাদের

ছাড়তে হবে না, সুতরাং, 'পুলিশ পুলিশ' ব'লে যতখুসি চেঁচাতে তোমরা পারবে। ইংরেজ-আমলে বাংলায় যেমন যা তোমরা বলতে তাই বলবে, অধিকন্তু এই কথাগুলি রইল। ইচ্ছা হয় ব্যবহার ক'রো, নাও যদি কর ত এসে যায় না কিছু। মোদ্দা কথা, সরকারের জন্যে এই পরিভাষা,--তোমাদের জন্যে নয়; সরকারী কাজ এইতেই চলবে।" দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শাসক-সম্প্রদায়ের একটা বিভেদ কল্পনা না করতে পেলে যাঁরা খুসী হন না, এ হ'ল তাঁদের কথা। অনেক দিনের অভ্যাস, সহজে কি যায়? স্বীকার করি, এই পরিভাষাগুলিরও সাহায্যে সরকারী কাজ চলতে পারে, তবে সেটা যে জবরদস্তির চলা হবে, এবং সে জবরদস্তির ফল যে কি হবে তা ত আগেই বলেছি। নাহয় সরকারের তাতে এসে যাবে না কিছু, সরকার নিজের ভাষায় নিজের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। এক,—সরকারী ভাষাটা জনসাধারণের ভাষার থেকে আলাদা হওয়াটাই কি খুব মারাত্মক রকম দরকার? দুই,—যদি তা না হয়, তাহলে জনসাধারণের ভাষাটা কি দোষ করল যে সরকারী কাজে তাকে ব্যবহার করা চলে না? তিন,—সরকার যদি একটু নীচু জমিতে নেমে এসে জনসাধারণের ভাষাটাই ব্যবহার করেন, তাতে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই কি সুবিধা বাড়ে না? চার,—সরকারী কাজও যখন কাজ, তখন তার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধাটা বড় কথা, না কথাগুলি অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত হওয়াটা বড় কথা?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য, ভুল মানুষমাত্রেরই হয়ে থাকে। সংসদ্ নিশ্চয় একটা কিছু ধারণা মনে নিয়ে এবং ভাল কিছু করছেন ভেবেই এই পরিভাষাগুলি করেছেন। যদি প্রমাণ হয় তাঁদের সে-ধারণাটাতে ভুল ছিল, তবে সে ভুল স্বীকার ক'রে নিলে তাঁদের সম্মান আমাদের কাছে কিছুমাত্র কমবে না, বাড়বেই।

বাঙালীর আদি ধর্ম

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগত জীবনের সুস্পষ্ট একটি চিত্ররচনা দুরূহ। স্বভাবতই ধর্মকর্মগত মানসজীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল। তার উপর, বর্ণ, শ্রেণী ও কোমবিন্যস্ত সমাজে সে-জীবন জটিলতর হইতে বাধ্য। ধর্মকর্ম-ভাবনা বা সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোম ভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তাহা ছাড়া, নূতন কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করে না; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ লয় মাত্র, এবং তাহা একান্তই সমসাময়িক সমাজ- ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী- ও স্তর- বিশেষ অনুযায়ী। কোনো শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না; অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন-বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান-উপচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনি নিজেরাও সে-জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গতিতেই চলে এবং স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জটিল সমন্বয় সমানেই চলিতে থাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গতিপ্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা যত অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে, আজ আমরা যাহাকে হিন্দু ধর্মকর্মসাধনা বলিয়া দেখি বা যাহাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা বস্তুত আর্য ও প্রাক্‌-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। অরণ্যচারী হিংস্র উলঙ্গ অর্ধমানবের কোম হইতে আরম্ভ করিয়া কত কোম, কত শ্রেণী, কত স্তর, কত দেশখণ্ডের মানুষের ধর্মকর্মসাধনা যে এই চলমান আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও বেগবান প্রবাহ মিশাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ; ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে-প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে-প্রবাহ প্রশস্ত

ও বেগবান। সচেতন সক্রিয়তায় সমন্বয়ের এই কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ নায়কেরা, একথা যেমন সত্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিরোধটাও তাঁহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল একথাও তেমন সত্য। কিন্তু, প্রাথমিক বিরোধের পর স্বীকৃতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল তখন সমন্বয়ের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের নায়কত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। অন্যদিকে, প্রাক্‌আর্য বা অনার্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্য বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। জৈব প্রকৃতিই হইতেছে নিজের বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা ; চলমান আর্যপ্রবাহে স্বীকৃতি লাভের পরও বহু বিশ্বাস বহু সংস্কার বহু আচারানুষ্ঠান এই জৈব প্রকৃতির বলেই নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু কিছু মরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কিছু কিছু চলমান প্রবাহে স্বীকৃতিলাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, হয় অবিকৃত না হয় বিবর্তিত রূপে। অবান্তর হইলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্য-অনার্যের এই সমন্বয় ক্রিয়া আজও চলিতেছে ; আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম আজও লোকায়ত অনার্য ধর্মকর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান দেবদেবী ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করিতেছে, কোথাও তাহাদের চেহারার আমূল পরিবর্তন করিয়া, কোথাও একেবারে অবিকৃত রূপে। বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই এই সদ্যোক্ত সমন্বয়ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে ; মধ্যযুগে এই সমন্বয়-সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজও তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে এই সমন্বয়-সাধনার সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই, কিন্তু তখনকার দিনের বাঙালী সমাজে ও বাংলা সংস্কৃতিতে এর চেয়ে বড় সত্য কমই আছে। বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। শুধু বাঙালীরই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেই একথা সত্য। এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে, হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় এ-কথাটা না জানিলে অনেকখানিই অজানা থাকিয়া যায়।

বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া বাংলার কথাই বিশেষভাবে বলি, সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া লাভ নাই। অন্যত্র বলিয়াছি, ভারতীয় আদিবাসীরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীর মতো, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত ; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহা করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের

মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে শেওড়া গাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলাবৌর পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজননশক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির পূজা বহন করে। বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে সব বিধিনিষেধ প্রচলিত, যে সব ফলমূল—যেমন আখ, চালকুমড়া, কলা ইত্যাদি—আমাদের পূঁজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদূর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি· পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীকচিহ্ন, নানাপ্রকার আলপনা, গোবর, কড়ি প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায়, এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রীআচার, খৈ ছড়ানো· লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, বাসিবিবাহ, দধিমঙ্গল, চতুর্থমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসীদের দান। বস্তুত, বিবাহ ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ, এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তাই। পূজার্চনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনিপূজা, শ্মশানশিব বা ভৈরবের পূজা, শ্মশানকালীর পূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এই সব আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি অল্পবিস্তর রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটাইয়া। এই সব আচারানুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়; মাত্র দুই-চারিটি আচারানুষ্ঠানের জীবনেতিহাস আমরা জানি, যেমন চড়কপূজা, হোলি, ষষ্ঠীপূজা, চণ্ডী-দুর্গা-কালী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের পূজা, মনসাপূজা, পৌষপার্বণ, নবান্ন-উৎসব ইত্যাদি। অন্যত্র বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল কথা বলিবার বা আলোচনা-গবেষণার স্থান ও সুযোগ এই নিবন্ধ নয়, উপায়ও নাই; তবু ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথাটি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবে না।

২

এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান-উপকরণ সুপ্রচুর এবং তাহা বাংলার সর্বত্র পথে ঘাটে, বাঙালীর জীবনচর্যার নানা ক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা-

গবেষণা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা এ-সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের দিক্ হইতে এই সব ইঙ্গিত ফুটাইবার প্রয়োজনীয়তাও আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জরীপ ও অনুসন্ধান যে-ভাবে হইয়া থাকে, এ-ক্ষেত্রে আজও তাহার সূত্রপাতই হয় নাই। অথচ, বহুদিন আগে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় কিছু কিছু কাজও কেহ কেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-কাজ জন-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয় নাই বলিয়া তাহা যথার্থ ফলপ্রসূও হয় নাই।

অথচ, আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে 'ভদ্র', উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে যে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দেখি ও যাহাকে আমরা বাঙালীর ধর্মকর্ম-জীবনের বিশিষ্টতম ও প্রধানতম রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবী, জিন, শৈব ও বৌদ্ধতন্ত্রের বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপনমাত্র এবং তাহা সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক্ হইতে একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে বিস্তৃত, যে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটিরের কোণে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্য সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারিতলায়, নদীর পাড়ে, বটের ছায়ায়, জনহীন শ্মশানে, অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য-সংগীত-পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ-শোক-মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্যমনের, আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও কোথাও তাহা কণ্ঠ ও নিশ্বাসরোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিষ্প্রাণ কঙ্কাল শুধু বর্তমান; কোথাও কোথাও উপরের স্তরের চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে— নিশীথ অন্ধকারে লোকালয় অতিক্রম করিয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদীর্ঘ সংকটময় পথ ধরিয়া নদীর ধারে বা প্রান্তরের সীমান্তে শ্মশানের ধারে গিয়া লোকালয়েরই লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া তেমনই নিভৃতে গোপনে ফিরিয়া আসে; আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশক্তির জোরে সে তাহার নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আর্য ধর্মকর্মের একটি প্রান্তে; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশক্তিরই প্রাবল্যে আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই দিয়াছে বদলাইয়া। এই রুদ্ধ ও মৃত, মরণোন্মুখ অথবা চলমান ধর্মকর্ম স্রোতের সকল চিহ্ন তুলিয়া ধরিবার উপায় এখানে নাই; দুই-চারিটি ইঙ্গিত তুলিয়া ধরা চলে মাত্র।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শালিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় তুলিবার আগে নানাপ্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজো প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুষম আনন্দে মণ্ডিত; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার একটিতেও সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই এই সব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া যে সব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার মূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয়

করিয়াই নয়, শিল্পজীবনেও দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত; তাহারই কিছুটা আর্যীকৃত সংস্কৃতরূপ আমরা বিশ্বকর্মাপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মূলত এই ধরণের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন-যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রজননশক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য। এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের ভদ্রস্তরের আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে।

অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাংলার পাড়াগাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে, জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই থান উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়, কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও গড়িয়া দেয়। এই 'থান' বা স্থানে—সংস্কৃত রূপ দেবস্থান, বা 'দেওথান'—মূর্তিরূপী কোনো দেবতা অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, কিন্তু থাকুন বা না থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার নামে 'মানত' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকল প্রকারে; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে তাঁহার কোনো স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাংলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনো স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতিতন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো বিধান, কোনো বিধিনিষেধই ইঁহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারিণী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; দুইচারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাহা বলিতেছি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না; ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে। শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ গোবর্ধন আচার্য রাখিয়া গিয়াছেন। শক্রোত্থান বা শক্রধ্বজ পূজার কথা জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজা-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্রতুল নয়। এক-এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু- বা পক্ষী- লাঞ্ছিত ধ্বজা; সেই ধ্বজার

পূজাই বিশিষ্ট গোষ্ঠীর শিষে কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়, এবং সেই কোমগোষ্ঠীর যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষীপূজা হইতেই উদ্ভূত; বহুপরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায়ও তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন; দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষীপূজার অবশেষ; আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রাধান্যের প্রচার। দেব-দেবীদের সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে, সন্দেহ কি? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীচিহ্নলাঞ্ছিত ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। বেদী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বেশনগরের (মান্দাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ, মকরকেতন, ঋষ্যধ্বজের পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়কপূজা, ধর্মপূজা অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনো ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়িয়া ধর্মস্থান বা 'থানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

গাছপূজা নানাপ্রকারের মাতৃতন্ত্রীয় দেবীর পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, নানা লৌকিক দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপান্তে বসতির বাহিরে যেসব জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান হইত এবং এখনও হয় সেই সব পূজাস্থানকে আশ্রয় করিয়া বাংলার নানা জায়গায় নানা তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্যে বিধৃত হইয়া আছে। বটগাছের পূজা সম্বন্ধে কবি গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোক আছে :

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা॥

হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবেরের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, মূর্খ গ্রাম্য লোকের কুঠারাঘাত হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু মহিষের শৃঙ্গতাড়না।

সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবী পূজার একটি ভাল বিবরণ পাওয়া যায় :

তৈস্তৈর্জীরোপহারৈর্গিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালূরকোষৈর্যুবতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি॥

বর্বর [গ্রাম্যলোকেরা] নানা জীববলি দিয়া পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তারদুর্গার পূজা করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে, এবং দিনের শেষে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয়।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াছি। আখমাড়াই ঘরের বা যন্ত্রের যিনি ছিলেন দেবতা তিনি পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) নামে খ্যাত, আর পুণ্ড্র বা পুঁড় যে এক প্রকারের আখ তাহাতো অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার বলিয়াছি। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এই পণ্ডাসুরের পূজা এখনও প্রচলিত, সেখানে তিনি পড়াসর (সংস্কৃত পরাশর) নামে খ্যাত। এঁর পূজার অর্বাচীন একটি মন্ত্র এইরূপ :

পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রেস্তং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥
পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটি নিবাসিনে।
যজমান হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে॥

ধ্বজা বা কেতনপূজার মতন নানাপ্রকারের যাত্রাও বাংলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক ধর্মোৎসব এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুত্তনিকায়গ্রন্থে জানা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চ কোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করিতেন না; সেইজন্যই অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই; জনসাধারণের ধর্মোৎসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যাহত। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রাগুলির মধ্যে অগস্ত্যার্ঘ্যযাত্রা (দশহরার স্নান), অষ্টমী স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

যাত্রা প্রভৃতির মত ব্রতোৎসব ও ধ্বজাপূজা বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সংশয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন এবং সেইজন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধ হয় তাহাই।[১]

১ ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে, এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়ত ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রত কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বোধ হয় আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা; নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমা রেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত—যেমন নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ভঙ্গীতে ঘোরানো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে ও কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—

অন্তত, সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথ্যই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য সমাজে বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজননশক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনো প্রচলিত ব্রতের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ-তথ্য পরিষ্কার। অশোক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান তিনি পছন্দ করিতেন না; বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকারের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়িয়া তাঁহারই অনুমোদিত ধর্মমঙ্গলের পথে চলিবার জন্য। নারীসমাজে প্রচলিত এইসব মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে অশোক ব্রতানুষ্ঠানের কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, আর, সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় পুরাপ্রচলিত পূজানুষ্ঠানের ইঙ্গিতই হয়ত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল তখন, এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই, ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছিল; কারণ, এইসব পুরাণে দেখিতেছি, লৌকিক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া ঐ ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই সব অবৈদিক অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। প্রাক্-আর্য ও অনার্য নরনারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈদিক অস্মার্ত অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এইভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, আজও করিতেছে। যে-সব ব্রত এই ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, যে-সব করে নাই সে-সব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না; গৃহস্থ মেয়েরাই সে সব পূজা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে-সব ব্রতানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না আজ সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ব্রত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তবু, আজও যেসব ব্রত এই স্বীকৃতি-সীমার বাহিরে তাহাদের সংখ্যা কম নয়; সম্বৎসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এইসব বিচিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এইসব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। অগণিত এইসব ব্রতের মধ্যে কয়েকটি তালিকাবদ্ধ করিতেছি :

তাহার ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতাচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য।

বৈশাখে—পুণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), শিবপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা), চম্পা-চন্দন ব্রত (ঐ), পৃথ্বীপূজা ব্রত (ঐ এবং গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), অশ্বত্থপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ), ধানগোছানো ব্রত (ঐ), যাচা পান ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), থোয়াথুয়ি ব্রত (ঐ), রণে এয়ো ব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ), সন্ধ্যামণি ব্রত (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য প্রজনন শক্তির পূজা)।

জ্যৈষ্ঠে—জয়মঙ্গলের ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা)।

ভাদ্রে—ভাদুলি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তিলকুজারি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা)।

কার্তিকে—কুলকুলটি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), সেঁজুতি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তুষ্‌তুষ্‌লি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা)।

মাঘে—তারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), মাঘমণ্ডল ব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত (ঐ), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (ঐ), সসপাতা ব্রত (ঐ)।

চৈত্রে—নখছুটের ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা)।

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরো অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজননশক্তির পূজারূপে আদিবাসী কোমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শুভকর্মপঞ্জিকাতেও স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন, ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাংলার স্মৃতিগুলি হইতেই ছাঁকিয়া বাহির করা যায়; সুখরাত্রি ব্রত (কার্তিক মাস), পাষাণচতুর্দশী ব্রত (অগ্রহায়ণ), দ্যূতপ্রতিপদ ব্রত (কার্তিকের শুক্লপ্রতিপদ), কোজাগর-পূর্ণিমা ব্রত (আশ্বিনের পূর্ণিমা), ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত (কার্তিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত (কার্তিক), অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত, অশোকাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। এই সব ক'টি ব্রতের উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। জন্মাষ্টমী পূজা ও স্নানের কথাও জীমূতবাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রত একান্তই আদিম কোমসমাজের ব্রতগুলির পরিবর্তিত পরিমার্জিত রূপ, আবার কতগুলি আদিম কোমসমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্রতের সৃষ্টি। তিথিনক্ষত্র আশ্রয় করিয়া যে-সব ব্রতোৎসব তাহার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান একথা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। পুরাণগুলির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যেমন, শিবরাত্রি ব্রত, অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঋতু ব্রত, কৌমুদী ব্রত, মদন বা অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত, মহানবমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্রপুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, সৌভাগ্যশয়ন ব্রত, রসকল্যাণী ব্রত, অঙ্গারক ব্রত, শর্করা ব্রত, অশূন্যশয়ন ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই সব ব্রতের কোন্ কোনটি প্রচলিত ছিল বলিবার কোনো উপায় নাই।

৩

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে অন্তত দুইটি ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সুবিস্তৃত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। একটি ধর্ম ঠাকুরের পূজা ও আর-একটি চৈত্র মাসে নীল বা চড়কপূজা। মালদহ অঞ্চলে যে গম্ভীরার পূজা বা বাংলার অন্যত্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়কপূজারই বিভিন্ন রূপ। শিবের গাজন যেমন, ধর্ম ঠাকুরেরও তেমনই গাজন আছে এবং এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন্যটি 'কালিকা পাতা' বা 'কালি-কাচ' নৃত্য অর্থাৎ নরমুণ্ড হাতে লইয়া কালী বেশে নৃত্য।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের 'ধর্ম' বলিয়া মনে করিতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানিয়াছি ধর্ম ঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন এবং ধর্মপূজার পুরোহিতেরা তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া রাখেন একখণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগ্‌দী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়া পূজা গ্রহণ করেন না। স্তূপীকৃত পিষ্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়া ("মদ্যের পুষ্করণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল") ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও নরমুণ্ড লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে, ধর্ম ঠাকুর ছিলেন শূন্যমূর্তি; তিনি 'নিরঞ্জন', 'শূন্যদেহ', তাঁহার বাহন শাদা পেচক বা শাদা কাক। যে-প্রতীকের পূজা করা হইত তাহা কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড বা পাষাণনির্মিত কূর্মবিগ্রহ; তাহার উপর আঁকা থাকিত পাদুকাচিহ্ন। আদিতে যে তিনি প্রাক্-আর্য বা অনার্য দেবতা এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ-বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কিঅবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বর্তমান ধর্ম ঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজালাভ করিতেছেন। বৃন্দাবন দাসের "মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে" বোধ হয় এই ধর্ম ঠাকুরেরই পূজা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন, 'ধর্ম' শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো অস্ট্রিক্ শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর, এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দটি এবং তাহার পূজা (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হইতেই গৃহীত। রাজা হরিশচন্দ্র এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধও একই উৎস হইতে উদ্ভূত। মহিষবাহন ধর্মরাজ যমও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে যাহা সত্য নীল বা চড়কপূজা সম্বন্ধেও তাহাই। এই চড়কপূজা এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে-প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট 'বুড়া শিব' নামে আখ্যাত। এই পূজার পুরোহিত

সাধারণত আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র এবং গ্রহবিপ্রেরা যে ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি অনুযায়ী পতিত ব্রাহ্মণ এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। কুমীরের পূজা, জলন্ত অঙ্গারের উপর দোলা, কাঁটা ও ছুরির উপর ঝম্প, বাণফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা এবং দানো (ভূত) বারাণো বা হাজরা পূজা চড়ক পূজার বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান। এই শেষোক্ত 'দানো বারাণো' বা 'হাজরা পূজা'র স্থান সাধারণত শ্মশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া সোল মাছ এবং তাহার পুনর্জন্মের কাহিনী (মহাভারতের শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান তুলনীয়) চড়কের সং (কলিকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয়) প্রভৃতি জড়িত। চড়কপূজার পূজারীরা আজও আমাদের সমাজে সাধারণত জল-অনাচরণীয় স্তরের। সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়কপূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া, বাণফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপূজার মূলেও তাহাই; এ-ক্ষেত্রেও যে অজ-শিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা হয় সেটি প্রাচীন নরবলিরই আর্য-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূজার প্রচলন সেন-আমলে, তুর্কী বিজয়ের আগেই দেখা দিয়াছিল।

ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত আমাদের হোলি বা হোলাক ধর্মোৎসব। এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সর্বত্র যেমন বাংলাদেশেও তেমনই সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত। হোলাক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থে আছে; দ্বাদশ শতকের আগেই যে এই উৎসব বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। এই হোলি উৎসবের বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে ফাল্গুনী শুক্লাচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে হোলির সঙ্গে যে সব আচারনুষ্ঠান জড়িত সংস্কৃতিগত জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা গবেষণা হইয়াছে; ভারতের অন্যত্র যে-সব জায়গায় হোলির প্রচলন তাহাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলি ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ; তার পরের স্তরে কোনো সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু হোলির সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ-ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছল-চাতুরী ও তামাসা। তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কাম মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী (সপ্তম শতক), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতক), আলবেরুণী (একাদশ শতক), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতক) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক), সকলেই এই উৎসবের কথা বলিয়াছেন অল্পবিস্তর বর্ণনায়—প্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনা প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের অঙ্গ, এবং পূজাটা হইত মদন ও রতির, চৈত্র মাসে অশোক ফুলের সুপ্রচুর বর্ষণের নীচে। প্রাচীন বাংলাদেশে এই উৎসবের কথা জীমূতবাহনই বলিয়া গিয়াছেন, পরবর্তী সাক্ষ্য দিতেছেন রঘুনন্দন। মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোনো সময়ে

চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলি বা হোলাক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় এবং কাম-মহোৎসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, ষোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা-ওমরাহ্‌রা এবং হারেমের মহিলারা হোলি উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হোলি ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হোলির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর-কুমকুমের খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্য পথে। রামগড় গুহার এক লিপিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে-ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাৎই মানুষের ঝুলন। ঝুলনায় মানুষেরা—নরনারী উভয়ই দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোলা দিত মানবশিশুকে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য। হয়তো তাহারই প্রকাশ পরবর্তী সাহিত্যে; বালকৃষ্ণ বা বালগোপালকে দোলাইতেন মাতা যশোদা। তার পরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণরাধার ঝুলনলীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পরিগণিত হইয়া গেল। অল্‌বেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্রমাসে; গরুড়পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও তাহাই। পরবর্তী কোনো সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনীপূর্ণিমাতে আগাইয়া আসে (পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড এবং স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং হোলির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণকে দোলাইয়া তাঁহাদের উপর ফুল কুমকুম এবং আবীরগোলা জল ছড়ানো হইত এবং তাঁহারাও সহচরীদের উপর ফুল কুমকুম ইত্যাদি ছুঁড়িয়া মারিতেন। হোলির সঙ্গে পিচ্‌কারি খেলার যোগাযোগ এই ভাবেই। প্রাক্‌বৈদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এই ভাবেই বর্তমান হোলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলি বা হোলাক উৎসবকে বলা হয় শূদ্রোৎসব; হোলির আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর হইতেই আনিতে হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে নারীদের মধ্যে, বিশেষভাবে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পারণের তিন দিন বা সাত দিন তাঁহারা কোনো অগ্নিপক্ব খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খোঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রন্ধনাদি করেন না, এমন কিছু করেন না যাহাতে পৃথিবীর, মাতা বসুধার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে। কারণ, প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এই কয়দিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব, এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁহার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পারণ, দুইই আদিম কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা এবং তৎসংপৃক্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িত।

৪

বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের যেসব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কৌম সমাজের অনার্য অব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা ও উৎসবানুষ্ঠান এখনও সক্রিয় তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত পর্যন্ত ধরিতে চেষ্টা করিলাম। আর বেশি বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুইচারিটি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথা বলিতেই হয় যাঁহাদের জন্মই হইতেছে

এই আদিবাসী কৌম সমাজের ধ্যানধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, দুর্গা, কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতন্ত্রের দেবী, নারায়ণ শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জম্ভল, হারীতী, একজটা, নৈরাত্মা, ভৃকুটি প্রভৃতি দেবদেবীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না; কারণ, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই জানেন এই সব এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে আদিবাসী কৌমসমাজের বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু দুইচারিটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি যাঁহাদের পূজা বিশেষভাবে পূর্বভারতেই প্রচলিত এবং যাঁহাদের জন্মেতিহাস সুস্পষ্ট ভাবেই এই কৌমসমাজের ধ্যানধারণা- ও অভ্যাস- গত, অথচ সে-তথ্য সুস্পষ্ট জ্ঞাত ও স্বীকৃত নয়।

বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যায় মনসাদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন যে ভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপূজা নয়, ঘট-মনসা বা পট-মনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘটের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাঁহার পূজা অথবা শোলা বা কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার কাহিনী আঁকিয়া টাঙানো পটের সম্মুখে পূজাই সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক-পূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপূজা হইত তাহার কয়েকটি মূর্তি প্রমাণই বিদ্যমান। মনসাদেবী যে কি করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুরাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌমসমাজের প্রজননশক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো-না-কোনো রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যেসব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজননশক্তির প্রতীক। একটি মূর্তির পাদপীঠে "ভট্টিনী মট্টুবা" লিপি উৎকীর্ণ। এই লিপির অর্থ কি রাজমহিষী মট্টুবা না আর কিছু, বলা কঠিন। মট্টুবা তদ্ভব, না দেশজ— অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী হইতেই প্রমাণ হয়, মনসাদেবীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার রূপ সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কোনো কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক ও অমৃতকুম্ভ- ধারিণী। বলা বাহুল্য, এই সব উপকরণ সরস্বতীর, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তেলেগু- ও কানাড়ী- ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মঞ্চাম্মা নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসাদেবীর যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও অম্বাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাই আমাদের মনসা এবং অম্বাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসা পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মন রাজাদের আমলেই।

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর। এই দেবী বীণাবাদয়িত্রী এবং মনসার মত তিনিও সর্পবিষমোচয়িত্রী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্ববিষমোচয়িত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনিও শবরকন্যা। এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে, মনসাকে যেমন, তেমনই জাঙ্গুলীকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসাদেবীর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

প্রাক্-আর্যব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; ইঁহার নাম পর্ণশবরী। ইনি ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃক্ষপত্র পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী; এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন। ধ্যানেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারীসংহারিকা। সন্দেহ নাই যে, আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্যা দেবী ছিলেন: পরে কালক্রমে যখন আর্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁহার পরিচয় হইল "সর্বশবরানাম ভগবতী", সকল শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, চর্যাগীতির অনেকগুলি গানই তাহার প্রমাণ। একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি; পর্ণশবরীর ধ্যান এবং এই গানটির রূপকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহেরি
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গ অণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষরাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণি বাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
উমত-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়ির কই সে॥" —শবরপাদ, ২৮

পূর্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যেভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার নানা স্থানে, যেমন উত্তর-বঙ্গে, পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরের স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। নীলাচলক্ষেত্রে পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার

পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধরা পড়িবে, বিচিত্র কি? কালবিবেক গ্রন্থ ও পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মত নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া তালে বেতালে পূর্ণ উদ্যমে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত। যৌনলীলার নানা গান গাওয়া, কাহিনী বলা এবং তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী করাও এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এসব না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন! বৃহদ্ধর্মপুরাণে এ-সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধ আছে; এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা ও বোনদের সম্মুখে এবং শক্তিধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পূর্বোক্তরূপ আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা (এক, মনসার মূর্তিপূজা এবং আর-এক, তাঁহারই চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা) বাংলার অন্যান্য দুই-একটি দেবীমূর্তির ক্ষেত্রেও তাহাই। আমাদের দেশে লক্ষ্মীর পৃথক মূর্তিপূজা খুব সুপ্রচলিত নয়; বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি হিসাবেই তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্রাচীন বাংলায় তাহাই ছিল। সাহিত্যে ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিরূপিণী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর-একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাঁহার পূজা বাঙালী-সমাজে নারীদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত। এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্যপ্রাচুর্যের এবং ধনসমৃদ্ধির তিনি দেবী। এই লক্ষ্মীর পূজা ঘটলক্ষ্মী বা ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা, এবং এই পূজাব্রতের সঙ্গে যেসব ব্রতকথা এবং যে সব পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা স্ববিরোধী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌমসমাজের ঘটলক্ষ্মীর বা শস্যলক্ষ্মীর যে আদিমতর পূজা বা কল্পনা তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে নারীসমাজে সে-পূজা আজও অব্যাহত। আর, শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগরলক্ষ্মীর যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদিতে এই কৌম সমাজেরই পূজা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ-শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ষষ্ঠীপূজা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। ষষ্ঠীদেবীর কোনো মূর্তিপূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই; বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে ষষ্ঠীদেবীর মানস-কল্পনাই বোধ হয় হারীতীদেবীর রূপ-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠীপূজার ব্রতকথা এবং মহাবস্তু, সর্বাস্তিবাদী বিনয়পিটক, চীনা সূত্রপিটকগ্রন্থের সংযুক্তরত্নসূত্র ও ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থে হারীতীর জন্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ষষ্ঠী এবং হারীতীর জন্ম একই মানস-কল্পনায়, এবং দুয়েরই মূলে প্রজনন শক্তিতে এবং মারীনিবারক যাদুশক্তিতে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ধর্মাচারে হারীতী দেবীর মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু ষষ্ঠীপূজায় আজও কোনো মূর্তিপূজা নাই এবং শেষোক্ত পূজা এখনও নারীসমাজেই সীমাবদ্ধ; সন্তানকামনায় ও সন্তানের মঙ্গলকামনায় আজ এই পূজা বিবর্তিত। ষষ্ঠী-হারীতীর মারীনিবারক যাদুশক্তির পূজা এখন আশ্রয় করিয়াছে গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে।

এইখানেই যে প্রাক্-আর্য বাঙালী-সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা বলা

চলে না। বরং বলা উচিত, ইহা সূচনা মাত্র। বস্তুত এ-সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা এত কম হইয়াছে যে, রেখা রচনা ছাড়া, কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত কিছু বলিবার উপায় নাই। তবু, যেটুকু আমরা জানি এ-কথা নিসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী-সমাজে নারীদের মধ্যে এবং সাধারণ আর্য-ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের মধ্যে যে-সব লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত তাহা প্রায় সমস্তই প্রাক্-আর্য কৌমসমাজের দান।

প্রাক্-আর্য কৌম বাঙালী সমাজের ধ্যানধারণার কথা অন্যত্র কিছু বলিয়াছি। ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পূনর্জন্মবাদে বিশ্বাস, প্রজননশক্তি, যাদুশক্তি প্রভৃতি প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ-অশুভ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের ধ্যানধারণার অন্তর্গত ছিল। আজও সেই সব ধ্যানধারণা বাঙালীসমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে এবং আমাদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেক আচারব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আর্য কৌমসমাজের বিশ্বাস সক্রিয়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাষ্ঠ ও তাহার বিসর্জন, রান্নার পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যান্ন খাওয়ানো, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমস্তই আমরা আহরণ করিয়াছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে। মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁহাদের পূজাও ইঁহাদের ধ্যানধারণা হইতেই আহৃত। বাংলাদেশের বিবাহানুষ্ঠানে হোম, সম্প্রদান ও সপ্তপদীগমন ছাড়া যেসব স্ত্রী-আচার, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত তাহাও মূলত এই কৌমসমাজেরই দান।

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

আলোচনা

'সৎপাত্র' গল্প কাহার রচনা ?

[রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত স্বাক্ষরহীন গল্প 'সৎপাত্র' সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—"স্বসম্পাদিত নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট-গল্পের মধ্যে প্রথম হইতেছে 'সৎপাত্র'।... কেন বলিতে পারি না, সৎপাত্র গল্পগুচ্ছে আদৌ সংগৃহীত হয় নাই।" পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "ইতিপূর্ব্বে কোন সমালোচকের চোখেও পড়ে নাই।"

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইল। পাদটীকার মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গল্পটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রশান্তবাবুর পত্রে বর্ণিত কারণে গল্পটি গল্পগুচ্ছে মুদ্রিত হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য]

'সৎপাত্র' গল্পটি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের হাত থেকে কবির বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা যখন আমরা বিশ্বভারতী থেকে কিনে নিলাম তার কিছুদিন পরে গল্পগুচ্ছের একটি বিশ্বভারতী সংস্করণ ছাপানো স্থির হোলো। গল্পের তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দেখি যে কতকগুলি গল্প বাদ পড়েছে। সেইগুলি কবির কাছে নিয়ে গেলাম— তার মধ্যে 'পুত্রযজ্ঞ' আর 'সৎপাত্র' এই দুটি গল্পও ছিল। গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল, যে, সম্ভবতঃ কবির লেখা।

পুত্রযজ্ঞ ভারতীতে প্রথম ছাপা হয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। কিন্তু আসলে এটি কবির লেখা তাই কবি এই গল্পটিকে গল্পগুচ্ছের মধ্যে দিতে বললেন। এ সম্বন্ধে সমরবাবুর নিজের উক্তি ছাপা হয়েছে— দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃ ৪৩৮। শুধু একটা কথা মনে পড়ছে, যে, কবির কাছে শুনেছিলাম, ঐ গল্পের আখ্যানভাগটিও কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন।

তারপরে কথা হোলো 'সৎপাত্র' সম্বন্ধে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কবি বললেন—"'সৎপাত্র' গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিয়েছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা[১] নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল, একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলুম— কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।"

কবির স্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী 'সৎপাত্র' গল্পটি কবির রচনাবলীর অন্তর্গত করা হয়নি।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১ কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহার রচিত আরও কতকগুলি গল্প 'ভারতী' 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়।